ইউসুফ বিন তাশফিন

নসীম হিজাযী

এক বাচ্চা ছেলে দশাসই এক লোকের হাত ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। আগে আগে যাচ্ছে দুই কিশোর। লোকটি ডেকে বলল, 'সাদ, আহমদ, দাঁড়াও।'

সাদ ও আহমদ বাগানের ভাঙা দেয়ালটার কাছে পৌঁছে ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। সে তার বিশাল দেহটা নিয়ে ওদের কাছে এসে বলল, 'হাসান খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

'আলমাস চাচা, আমরা আজ মদিনাতুজ জোহরা দেখে যাব। কি হাসান! তুমি কি খুব কাহিল হয়ে পড়েছ?' বলল বড় ছেলেটি।

হাসান কোন জবাব না দিয়ে মুখ কালো করে এক পাথরের ওপর বসে পড়ল। তীর-ধনু নামিয়ে রাখল মাটিতে।

লোকটিও হাসানের পাশে এক গাছের গুড়িতে হেলান বসল। সামনে পা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সবাই একটু জিরিয়ে নাও। জোহরের নামাজ পড়ে আমরা সোজা বাড়ির দিকেই যাবো।'

সাদ মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিও কি ক্লান্ত হয়ে পড়লে, চাচা?'

'আরে ধুর! আমি কি কচি খোকা যে দশ মাইল হেঁটেই হাঁপিয়ে উঠবো!'

আহমদ হাসতে হাসতে বলল, 'ভাইজান, দু'মাইল হাঁটলেই আলমাস চাচা হাঁপিয়ে উঠেন, ভাব করেন যেন দশ মাইল হেঁটে ফেলেছেন।'

হাসান বিরক্ত হয়ে বলল, 'আলমাস চাচা ঠিকই বলেছেন। আমরা তো দশ মাইলেরও বেশী হেঁটে ফেলেছি।'

'আমি তো আগেই বলেছিলাম, তুমি আমাদের সাথে হেঁটে কুলাতে পারবে না। তোমার জন্য আজ আমরা কোন শিকার করতে পারলাম না।' আহমদ বলল।

'বাহ, তুমি নিজে পাহাড়ে চড়তে পারোনি, আর বলছ কি না আমার কারণে তোমাদের শিকার হয়নি?'

সাদ হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাসান, তুমি কি এখন সোজা বাড়ি যাবে, না আমাদের সাথে জোহরায় বেড়াতে যেতে পারবে?'

হাসান মুখ করুণ করে বলল, 'ওখানে না হয় আরেকদিন যাবো। আজ বাড়ি চলো না ভাইজান!'

আহমদ বলল, 'হাসান, মাত্র মাইলখানেক পথ বেশী হাঁটলেই জোহরা হয়ে যেতে

পারতাম। এ বাগানের ওপারেই নদী। আর নদীটা পেরোলেই মদিনাতুজ- জোহরা।'

অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছা নিয়ে উঠে দাঁড়াল হাসান। তীর ধনুক নিতে নিতে বলল, 'ঠিক আছে, চল তাহলে!'

আলমাসের খুব ঘুম পাচ্ছিল। হাসানকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বলল, 'তোমরা বরং ঘুরে আসো, আমি এই ফাঁকে এখানেই একটু ঘুমিয়ে নিই। ওখানে আমি বহুবার গেছি, আমার সেখানে দেখার কিছুই নেই। তবে তোমরা সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসো।'

আলমাস চাচা যাবে না শুনে হাসান আবার পাথরটার ওপর বসে পড়ল।

হাসানের বয়স সাত। ভাইদের সাথে সে শিকার করতে এসেছিল। আহমদ তার তিন বছরের এবং সাদ পাঁচ বছরের বড়। আলমাস তাদের পুরোনো নওকর। আলমাসকে তারা ডাকে 'আলমাস চাচা' বলে। আলমাস নামের সাথে 'চাচা' শব্দটা এমনভাবে জড়িয়ে গেছে, ছোট বড় সবাই তাকে 'আলমাস চাচা' বলেই ডাকে।

তিন ভাই গল্প-গুজবে মেতে উঠল। ওদিকে আলমাস ঘুমের ঘোরে নাক ডাকতে শুরু করেছে। সাদ বলল, 'চলো আগে এ বাগানটাই ঘুরে দেখি।'

হাসান পাথর থেকে নেমে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে বলল, 'তোমরা যাও, আমি যাব না।'

'ঠিক আছে, তুমিও তাহলে চাচার সাথেই থাকো, আমরা যাবো আর আসবো।'

সাদ ও আহমদ বাগানে ঢুকল। ভাঙা দেয়াল পেরিয়ে এগিয়ে গেল ভিতরের দিকে। বেশ কিছু দুর যাওয়ার পর দেখল আরো একটা দেয়াল দেখা যাচ্ছে। দেয়ালের ভেতরে পুরোনো ঘর-বাড়ি। দেয়ালের কাছে আসতেই ওরা ভেতরে শিশুদের শোরগোল ও হাসির আওয়াজ শুনতে পেল। দু'ভাই হঠাৎ থেমে গিয়ে একে অন্যের মুখের দিকে চাইল। সাদ বলল, 'মনে হয় এরা জোহরার শিশু। চলো দেখি ওরা কী করছে?'

ওরা পড়োবাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল। ভেতরের দৃশ্য দেখে ওরা তো অবাক! বাড়ির সামনে এক নয়নাভিরাম বাগিচা। আপেল গাছে আপেল ঝুলছে, ডালিম গাছে পাকা ডালিম। বাগানের এক কোণে বিশাল এক ইমারত। মনে হয় বহুদিন ধরে এ মহলে কেউ বাস করে না। কালের ঝাপটায় এখানে ওখানে ভেঙে পড়েছে। উপরে নড়বড়ে ছাদ, দামী কাঠের দরজা ও জানালার অবস্থাও সুবিধের নয়। মহলের সামনে টলটলে পানি ভরা পুকুর। পুকুরের মাঝখানে শ্বেতমর্মরের বিশাল মঞ্চ। মঞ্চে যাওয়ার জন্য রয়েছে পাকা সাঁকো। একদল বালক ওই মঞ্চে হৈ-হল্লা করছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে পাকা ডালিম ও আপেল গাছের দিকে।

একটু পর পুকুরের একপাশ থেকে লাঠি হাতে এগিয়ে এক ছেলে। সাঁকোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাক ছাড়ল, 'হুশিয়ার! সাবধান! বাদশাহ নামদার আসছেন, হুশিয়ার।'

সাদ ফিসফিস করে বলল, 'আহমদ, এরা রাজা প্রজা খেলছে।'

এ সময় গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আরেকটি ছেলে। তার মাথায় লম্বা

মুকুট। মঞ্চের ছেলেরা তাকে দেখেই হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু ছেলেটি মঞ্চের কাছে পৌঁছতেই সবাই দাঁড়িয়ে তাকে শাহী কায়দায় সম্মান প্রদর্শন করল। একটা পাথরকে সিংহাসন বানানো হয়েছে। বাদশাহ তাতে আসন গ্রহণ করলে সবাই আবার বসল। দু'একজন তখনও হাসাহাসি করছিল। বাদশাহ 'খামোশ' বলতেই সবাই নীরব হয়ে গেল।

শুরু হল দরবারের কাজ। যাকে রাজকবি করা হয়েছিল সে দাঁড়িয়ে বাদশাহর গুণগান করে কবিতা আবৃত্তি করল। তার কবিতা শেষ হতেই এক বুড়ো মালি টুকরী মাথায় হাজির হলো সেখানে। বলল, 'এই নিন, আমি আপনাদের জন্য আপেল নিয়ে এসেছি।'

দরবারে আবার হাসির রোল পড়ে গেল। বাদশাহ বার বার তালি বাজিয়ে তাদের থামালেন। মালি টুকরীটি বাদশাহর পায়ের কাছে রেখে দিল। বাদশাহ রেগে গিয়ে বলল, 'এরপর যদি কেউ হাসে, তাহলে আমি দরবার মুলতবী ঘোষণা করতে বাধ্য হবো।'

ছেলেরা পুনরায় শান্ত হয়ে বসলে শুরু হল গানের আসর। পালা ছেড়ে ওরা প্রচলিত গানের কলি আওড়াল। বাদশাহ খুশী হয়ে সবাইকে দুটি করে আপেল দিলেন।

সাদ ও আহমদ ততক্ষণে পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেদের মধ্য থেকে একজন ওদের দেখে বলে উঠল, 'আরে, এরা কারা?'

সবাই তাকাল ওদের দিকে। একজন বলল, 'এরা পাহাড়ী ডাকাত। আমাদের বাদশাহর ওপর হামলা করতে এসেছে।'

বাদশাহ হুকুম দিলেন, 'সিপাহসালার, এদের গ্রেফতার করো।'

সিপাহসালারের ভূমিকায় অভিনয় করছিল যে সে বলল, 'খালীজাহ! যদি ওরা তীর চালায়? দেখতে তো একেবারে জংলী মনে হচ্ছে।'

একজন দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের সিপাহসালার দেখছি বড়ই ভীতু। বাদশাহ নামদার! আপনি নিজে লড়াইতে না নামলে তো আর মান-সম্মান কিছুই থাকবে না দেখছি।'

বাদশাহ চিন্তায় পড়ে গেলেন। সাদ ও আহমদ ছেলেদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল। আহমদ বলল, 'ভাইয়া, চল ফিরে যাই।'

'তুমি কি ওদের ভয় পাচ্ছো?'

আহমদ বলল, 'না না, ভয় পাবো কেন?'

'তাহলে এসো, বসে বসে ওদের খেলা দেখি।'

দু ভাই হাত ধরাধরি করে পানির কিনারায় ঘাসের ওপর বসে পড়ল। নকল বাদশাহ সংগীদের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এই, চল, আমরা ওদের কাছে যাই। আমি ওদের সংগে আলাপ করব, আর তোমরা সে সুযোগে ওদের তীর ধনুক ছিনিয়ে নেবে।'

ছেলেরা মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়াল। বয়স ও গায়ে-গতরে নকল

বাদশাহকেই দলপতি মনে হচ্ছে। সে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কোত্থেকে এসেছ?'

'কর্ডোভা থেকে।' সাদ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল।

'এখানে কি করছো?'

'তোমাদের খেলা দেখছি।'

মখমলের টুপী মাথায় সাদের সমবয়স্ক একটা ছেলে বলল, 'তোমরা আমাদের সাথে খেলবে?'

'না, এ খেলা আমরা পছন্দ করি না।'

'কেন?' ছেলেটি আবার প্রশ্ন করল।

'তোমরা কবি ও বাদশাহর ভাবমূর্তি নষ্ট করছো।'

'তুমি কবিতা পছন্দ করো না?'

'না, কবিত্বকে আমি ঘৃণা করি।'

'কেন?'

'কাব্য চর্চা একজন সৈনিককে বিলাসী ও কাপুরুষ বানিয়ে ফেলে।'

নকল বাদশাহ বলে উঠল, 'এ কথা কে বলেছে?'

'আমাদের আব্বাজান।'

'তোমার আব্বা নিশ্চয়ই কোন জংলী?'

সাদের চেহারা লাল হয়ে উঠল। কোনক্রমে রাগ সামলে বলল, 'অসভ্য ও কাপুরুষরাই কেবল কারো বাপ সম্পর্কে এ ধরনের বাজে মন্তব্য করতে পারে।'

নকল বাদশাহ সৈনিকদের দিকে তাকালো। টুপীওয়ালা ছেলেটি বলল, 'তাহলে তোমরা কি খেলা পছন্দ করো?'

'আমরা ঘোড়ায় চড়া, তীর চালনা ও অসি খেলা পছন্দ করি।' সাদ জবাব দিল।

আহমদ বলল, 'গাছে চড়া আর সাঁতার কাটাও আমাদের প্রিয়।'

একজন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওই গাছে চড়তে পারবে?'

আহমদ সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। টুপীওয়ালা ছেলেটি সাদকে বলল, 'তুমি লেখাপড়া জানো?'

সাদ বলল, 'অল্পস্বল্প।'

নকল বাদশাহ প্রশ্ন করল, 'কি কি বই পড়েছ?'

সাদ কয়েকটি বইয়ের নাম বলল। বইয়ের নাম শুনে বাদশাহর সঙ্গীরা অবাক হয়ে গেল। নকল বাদশাহ ওদের প্রভাবিত হতে দেখে বলে উঠল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছো।'

সাদ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমাকে মিথ্যাবাদী বলার পরিনাম ভাল হবে না।'

নকল বাদশাহ চিৎকার করে বলল, 'সেনাপতি, এদের গ্রেফতার করো।'

দুই বালক আহমদের তীর-ধনুক ছিনিয়ে নিল। দুতিন জন সাদকে ধরার জন্য এগুতেই সাদ এক লাফে পাশে সরে গেল। বাকীরাও ছুটে এলো ওকে জড়িয়ে ধরতে।

সাদ চোখের পলকে তূন থেকে তীর টেনে ধনুকে চড়িয়ে বলল, 'খবরদার।'

ছেলেরা ভয়ে পিছু হটতে শুরু করল।

যারা আহমদের ধনুক ছিনিয়ে নিয়েছিল তারা তাতে তীর জুড়তে ব্যস্ত হল। আহমদ কিল, ঘুষি ও লাথি মেরে ওদেরকে কাবু করতে চাইল। সাদ হামলাকারীদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা আহমদের ধনুক ফেলে দাও। তা না হলে আমি তীর চালাতে বাধ্য হবো।'

সাদের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ওরা ধনুকটি মাটিতে ফেলে দিল। আহমদ নিজের ধনুক কুড়িয়ে নিয়ে তাতে তীর চড়াল এবং দ্রুত সাদের পাশে এসে দাঁড়াল। সাদ ফিসফিস করে বলল, 'দেখিস, খামোখা আবার তীর চালিয়ে দিস না।'

নকল বাদশাহ অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে আরও ভড়কে দেয়ার জন্য সাদ তীরের ফলাটি তার দিকে ঘুরিয়ে দিল। টুপীওয়ালা ছেলেটি তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'আরে করো কি, করো কি? ওর বাপ আসলেই সিপাহসালার। ও আহত হলে সৈনিকরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

সাদ বলল, 'ও পালাতে চেষ্টা করলে ঠিকই আমি তীর ছুঁড়বো।'

কম বয়সী কয়েকটা ছেলে বাগানের গেটে তখন হৈ চৈ করছিল। সাদ নকল বাদশাহকে বলল, 'এখন তোমার রাজ্য আমার দখলে। আমিই এখন তোমার বাদশাহ। আমি হুকুম করছি, তুমি এই মুহূর্তে পুকুরে লাফিয়ে পড়ো।'

'না, না, এ পুকুর খুব গভীর। সে সাঁতার জানে না, ডুবে মরবে।' ওকে বাঁধা দিয়ে চিৎকার করে বলল টুপী পরা ছেলেটি।

বাগানের বুড়ো মালি এতক্ষণ এসব কিছুকে খেলাই ভাবছিল এবং দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। কিন্তু নকল বাদশাহর ভয়ার্ত চেহারা দেখে এগিয়ে এসে সাদকে বলল, 'নিরস্ত্রকে খামোখা ভয় দেখানোয় বীরত্ব নেই। হিম্মত থাকে তো দুজনেই খালি হাতে লড়াই করো না কেন?'

'আমরা এখানে লড়াই করতে আসিনি। তবে ওর যদি শখ থাকে তাহলে আমিও খালি হাতে তার মোকাবিলা করতে রাজী আছি। আহমদ, তুমি সাবধানে সবার দিকে নজর রাখবে।'

নকল বাদশাহর নাম জিয়াদ। দেহ কাঠামোয় সে সাদের দেড়গুণ। সাদের চ্যালেঞ্জ তার আত্মসম্মানে ঘা দিল। সে নিজের মুকুট ও রেশমী জামা মালির কাছে জমা দিয়ে এগিয়ে এলো সাদের দিকে। সাদও প্রস্তুত, লড়াই শুরু হয়ে গেল।

যেসব ছেলেরা সাদের তীরের ভয়ে দূরে সরে গিয়েছিল তারা ফিরে এলো আবার। কিন্তু দরজার কাছে তিনজন কচি বালক খেলছিল, তারা ওখানেই রয়ে গেলো।

শুরুতেই জিয়াদ সাদকে পাজাকোলা করে মাটিতে ফেলে দিল। জিয়াদের সংগীরা আনন্দে চিৎকার শুরু করল। কিন্তু সাদ সংগে সংগেই উঠে দাঁড়াল। জিয়াদ তাকে ঠিক

মত দাঁড়াবার সুযোগ না দিয়েই তার মুখে প্রচণ্ড ঘুষি মারল।

তাল সামলাতে না পেরে সাদ দু'তিন কদম পিছিয়ে গেল। টুপী পরা ছেলেটি নিজে থেকেই রেফারীর দায়িত্ব নিয়ে নিল। সে বলে উঠল, 'দেখ জিয়াদ, তুমি কিন্তু কুস্তি লড়ছো, মুষ্ঠিযুদ্ধ নয়।'

কিন্তু সে কথা কানেই তুলল না জিয়াদ। সে এলোপাথাড়ি ঘুষি চালাল সাদকে লক্ষ্য করে। সাদ জিয়াদের পরবর্তী ঘুষিটা হাত দিয়ে ঠেকিয়ে সংগে সংগে জিয়াদের ঘাড়ে পর পর দুটি ঘুষি মেরে দিল। এরপর শুরু হলো ধস্তাধস্তি। দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে মাটির ওপর গড়াগড়ি খেতে থাকল। দর্শকরা হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগল ওদের।

২

আলমাসের নাক ডাকার শব্দ শুনতে শুনতে অনেকটা সময় পার করে দিল হাসান। অপেক্ষা করছিল ভাইদের ফিরে আসার। কিন্তু ওরা সেই যে গেছে আর ফেরার নাম নেই। অধৈর্য হয়ে একসময় সে উঠে বাগানের দিকে রওনা দিল। প্রথম বাগানটি পার হয়ে দ্বিতীয় বাগানের প্রবেশ পথে পৌছতেই সে ছেলেদের হৈ চৈ শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি সে বাগানের ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেল একদল অচেনা বালকের দ্বারা ঘেরাও হয়ে সাদ জিয়াদের সংগে কুস্তি লড়ছে। হাসান কিছু না বুঝেই দরজায় যে তিনটি ছেলে হৈ চৈ করছিল তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এদের একজন হাসানের সমবয়সী হলেও অন্য দুজন ছিল সামান্য বড়। হাসানের প্রথম ঘুষিতেই একটি ছেলে ধরাশায়ী হলো। সে চিৎকার দিয়ে আপেল গাছের আড়ালে লুকাল। এবার সে আরেকটি ছেলের ওপর হামলা চালাল। তার সংগী ছেলেটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের লড়াই দেখল, যখন বুঝল অবস্থা সুবিধের নয় তখন সেও গিয়ে লুকাল ভাঙা দেয়ালের আড়ালে।

তিন জনের মধ্যে দুজনকেই সটকে পড়তে দেখে হাসানের সাহস বেড়ে গেল। সে তুমুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রতিপক্ষের অবশিষ্ট ছেলেটির ওপর। কিন্তু ছেলেটিও ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে আঁচড়ে কামড়ে একে অন্যকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। টেনে করে দুজনেরই পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেল। শিথিল হয়ে এল উভয়ের পেশী। কিন্তু কেউ হার মানতে রাজী নয়। পালিয়ে যাওয়া দুজনের একজন এ সময় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এ দিকে দেখো। এখানেও ভীষণ মারামারি লেগে গেছে।'

এই ডাক-চিৎকারে টুপী পরা ছেলেটি দৌড়ে এসে ওদের ছাড়িয়ে দিল। হাসানের একটি চোখ ফুলে উঠেছিল আর তার প্রতিপক্ষের নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। ছেলেটি ওদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা মারামারি করছিলে কেন?'

'তুমি ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ, আমি ওকে কিছুই বলিনি। জানিনা এমন অকারণে কেন ও আমাদের ওপর হামলা চালাল।'

হাসান বলল, 'তোমরা আমার ভাইকে মারবে আর আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো?'

টুপীওয়ালা ছেলেটি ঘটনা বুঝতে পেরে বলল, 'আচ্ছা, ও তোমার ভাই? ও তো ওখানে তো কুস্তি খেলা হচ্ছে।'

হাসান আহমদকে শান্তভাবে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হল। টুপীওয়ালা ছেলেটি বলল, 'এসো, তুমিও কুস্তি দেখবে এসো।'

ওরা যখন কুস্তির ওখানে এসে পৌঁছল তখন খেলা প্রায় শেষ। জিয়াদকে সাদ প্রায় কাবু করে ফেলেছে। পটাপট ঘুষি চালাচ্ছে ওর নাকে মুখে। খুশিতে চিৎকার করে উঠল হাসান, 'ভাইজান, আরও এক ঘা লাগাও। জোরে, ভাইজান! জোরে। নাকে মার! হ্যাঁ, ঠিক আছে! চোখেও একটা লাগাও।'

মুখের কথার সংগে তার হাত-পা-ও সমানে উঠা-নামা করছিল। বাগানের বুড়ো মালির তাই দেখে হেসে গড়াগড়ি দেয়ার অবস্থা। অবশেষে জিয়াদ উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সে আর উঠে দাঁড়াবার কোন চেষ্টাই করল না।

বুড়ো মালি সাদের হাত ধরে বলল, 'সাদ, তুমিই জিতেছ। এখন তুমিই ওদের বাদশাহ।'

সাদ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমি সৈনিক হতে চাই, বাদশাহ হওয়ার আগ্রহ নেই আমার।'

জিয়াদ উঠে দাঁড়াল। মালির হাত থেকে তার জামা নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। মালি কয়েক কদম এগিয়ে বলল, 'আরে, তোমার মুকুট নেবে না?'

জিয়াদ ঘুরে মালির হাত থেকে মুকুটটি নিয়ে তা মাথায় দেয়ার পরিবর্তে একদিকে ছুঁড়ে মারল। জনাপাঁচেক ছেলে সংগী হল তার, বাকীরা সাদকে ঘিরে দাঁড়াল। সাদ ওদের পাশ কাটিয়ে আহমদ ও হাসানকে নিয়ে পুকুরের পাড়ে গিয়ে বসল।

এক ছেলে জিয়াদের মুকুটটি মাটি থেকে তুলে এনে ধূলাবালি ঝেড়ে বুড়ো মালির মাথায় পরিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন এ শাহী তাজের মালিক আপনি।'

এ কথা শুনে ছেলেরা সব হাসতে শুরু করল। মালি মাথা থেকে মুকুটটি নামিয়ে বলল, 'তওবা, তওবা, এ তাজ কি আমরা মাথায় দিতে পারি! এটা তোমরা নিয়ে যাও, যার মুকুট তার বাড়িতেই পৌঁছে দিও।'

'না, এটা ইসহাককে দিয়ে দাও, কারণ, সে তার আব্বাকে দিয়ে এটা বানিয়ে এনেছিল,' বলল এক ছেলে।

ইসহাক জোহরার এক বিখ্যাত কারিগরের ছেলে, কিন্তু সে মুকুটটি নিতে রাজি

হলো না।

অবশেষে মালি সাদকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমরা এ মুকুট দিয়ে তোমার নিশানা পরীক্ষা করতে চাই। আমি এটাকে তোমার কাছ থেকে ত্রিশ কদম দূরে রাখছি, দেখি এতে তুমি তীর লাগাতে পারো কি না।'

'ত্রিশ কদম দূর থেকে হাসানও ওটাকে নিশানা করতে পারবে। তারচে ওটাকে শূন্যে ছুড়ে মারেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন আমার নিশানা কতটা অব্যর্থ।'

'ঠিক আছে, সবটাই তোমার চাপার ধার, নাকি আসলেও কিছু পারো এবার দেখা যাবে।' এ কথা বলে মালি মুকুটটা নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। সাদ ধনুকে তীর চড়িয়ে তৈরী হল।

ছেলেরা অবাক বিস্ময়ে এ দৃশ্য দেখতে লাগল। মালি মুকুটটি শূন্যে ছুড়ে মারল। সাদ উড়ন্ত মুকুটটি লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল। তীর মাটি থেকে কয়েক গজ উপরে মুকুটটিকে গেঁথে ফেলল এবং পরক্ষণেই তীরবিদ্ধ মুকুট মাটিতে পড়ল।

মালি, 'সাবাস, সাবাস' বলে দৌড়ে গিয়ে মুকুট ও তীর তুলে নিয়ে এল। উপস্থিত বালকেরা হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল এবং তার প্রশংসা করতে লাগল।

সাদ মালিকে বলল, 'এবার আপনার মাথায় রাখুন এ মুকুট। আমার নিশানা মুকুট ভেদ করবে কিন্তু আপনার চুলও স্পর্শ করবে না।'

মালি ভয় পেয়ে বলল, 'সে কি ভাই! আমি এমন কি অপরাধ করলাম যে মারতে চাও?'

হাসান মালির কাছে গিয়ে বলল, 'ভয় পাবেন না, ভাইজান তো আমার মাথায় আপেল রেখেও তীরের নিশানা করেন।'

মালি বলল, 'দেখ ভাই! তুমি যদি আপেলকে নিশানা বানাতে চাও তাহলে গাছ ভরা আপেল আছে, যত ইচ্ছা নিশানা কর, কিন্তু তাই বলে আমি তোমার টার্গেট প্রাকটিসের নিশানা হতে রাজী নই।'

'কি ভীতুরে বাবা! ঠিক আছে আমাকে দিন, আমিই ওটি মাথায় নিয়ে দাঁড়াচ্ছি।' আহমদ মালির হাত থেকে মুকুটটি নিয়ে মাথায় দিয়ে বলল, 'ভাইজান, তীর ছুড়ুন, আমি প্রস্তুত।'

সাদকে তীর ছুড়তে দেখে মালি আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে হাততালি ও উল্লাসধ্বনি শুনে বুঝতে পারল বিপদ কেটে গেছে। সে তাড়াতাড়ি চোখ খুলে আহমদকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সত্যিই ভাই তোমার হাত খুব পাকা। তাই বলে অন্যের মাথার ওপর এভাবে নিশানা করা উচিত না।'

টুপি পরা ছেলেটি পানিতে রুমাল ভিজিয়ে হাসানের চোখ মুছে দিচ্ছিল। অপরিচিত একটি ছেলে নিজের ভাইকে আদর করছে দেখে আহমদও নিজের রুমাল ভিজিয়ে এনে

জন্য ছেলেটির নাক থেকে রক্ত মুছে দিতে লাগল। টুপীওয়ালা ছেলেটি হাসানকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি?'

'হাসান।'

'আর ওরা তোমার ভাই, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি খুব সৌভাগ্যবান। তোমার ভাইদের নাম কি?'

আংগুল দিয়ে ইশারা করে হাসান বলল, 'ওর নাম সাদ, আর ওর নাম আহমদ।'

হাসানকে নিয়ে ছেলেটি ওদের কাছে গেল। বলল, 'আমার নাম ইদ্রিস। আব্বার নাম আবদুল জব্বার। তোমাদের আব্বার নাম কি?'

'আবদুল মুনীম।' হাসান জবাব দিল।

লড়াইয়ে ব্যস্ত সাদ এতক্ষণ হাসানকে ভাল করে লক্ষ্য করেনি। এবার ওর অবস্থা দেখতে পেয়ে বলল, 'আরে হাসান! তোমার আবার কি হয়েছিল? তোমার এ দশা হলো কি করে?'

ইদ্রিস বলল, 'সেও কুস্তি লড়েছে।'

'কার সাথে?'

'এই ছেলের সাথে।' ইদ্রিস ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল, 'কতক্ষণ ধরে ওরা লড়ছিল জানি না, তবে দুজনকে থামাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে আমার।'

ছেলেটি বলল, 'দেখুন, আমি তো ওর সাথে লাগতে যাইনি। সে বাইরে থেকে দৌড়ে এসে প্রথমে ওলিদকে মারল। ওলিদ পালিয়ে গেলে আমাকে আক্রমণ করে বসল।'

হাসান বলল, 'আমি বাইরে থেকে এসে দেখি ভাইয়া এক জনের সাথে লড়াই করছে আর ওরা চেঁচিয়ে বলছে মারো, মারো। কেউ আমার ভাইকে মারবে আর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব?'

বাগানের বাইরে থেকে আলমাসের ডাক শোনা গেল, 'সাদ, আহমদ, হাসান, তোমরা কোথায়?'

সাদ গলা চড়িয়ে জবাবে বলল, 'আমরা আসছি চাচা।'

যাওয়ার সময় সাদ ইদ্রিসকে বলল, 'আমাদের জন্য তোমাদের খেলা নষ্ট হল, সে জন্য আমি খুবই দুঃখিত। বিশ্বাস করো, আমরা মারামারি করার নিয়তে এদিকে আসিনি।'

'এতে আপনার দুঃখ করার কিছু নেই। আপনি যে খেলা দেখালেন তা আরও মজাদার, আরো চিত্তাকর্ষক।'

বাগানের প্রবেশ পথে এসে দাঁড়াল আলমাস। ওদের দেখতে পেয়ে বলল, 'তোমরা এখানে! আমি ভাবছিলাম, তোমরা আমাকে ফেলেই বাড়ি চলে গেলে কিনা। যা

হয়রানিতে ফেলে দিয়েছিলে আমাকে। এসো, এসো, জলদি বাড়ি চলো।"

তিন ভাই যখন চলতে শুরু করল তখন মঞ্চের ওপর ছেলেরা আপেল ভাগাভাগি করছে। একজন ডেকে বলল, 'এই, একটু দাঁড়াও। তোমাদের ভাগের আপেল নিয়ে যাও।'

সাদ স্বরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, আমাদের বাগানে অনেক আপেল আছে।'

ওরা চলতে শুরু করল। ইদ্রিস ওদের দিকে তাকিয়ে রইল মুগ্ধ চোখে। তারপর হাঁটা দিল ওদের সাথে। বাগানের গেটে এসে ওরা আলমাস চাচাকে কুস্তির কাহিনী শোনাচ্ছে, ইদ্রিস বলল, 'তোমরা বেশ ক্লান্ত। আমাদের বাড়ি খুব কাছে। আমার সাথে চলো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর না হয় ঘোড়ায় করে তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবো।'

সাদ বলল, 'না ভাই, তার কোন দরকার নেই। আমরা হেঁটেই যেতে পারবো।'

'কিন্তু এ ছোট ভাইটি যে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমি তাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি। তার হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।'

আলমাস বলল, 'না না, হাসান খুব বাহাদুর ছেলে। কি হাসান, তুমি কি বেশী কাহিল হয়ে পড়েছ?'

অনেকটা পথ হেঁটে আবার এই কুস্তি লড়ার কারণে হাসান আসলেই বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ইদ্রিসের প্রস্তাব তার কাছে আল্লাহর রহমত মনে হচ্ছিল। কিন্তু আলমাস চাচার এই মন্তব্যের পর নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা যায় না, তাই সে মিনমিন করে বলল, 'না, আমি হাঁটতে পারব।'

ওরা আর কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। বাগান থেকে বের হয়ে পথে না নামা পর্যন্ত ইদ্রিসও তাদের সাথে সাথে এল। সাদ বলল, 'আর এগিয়ে দিতে হবে না। এবার তুমি ফিরে যাও।'

তিন ভাই ইদ্রিসের সাথে মোসাফেহা করে বাড়ির পথ ধরল। যতক্ষণ দেখা গেল ইদ্রিস দাঁড়িয়ে থেকে ওদের চলে যাওয়া দেখল।

কিছুক্ষণ চলার পর হাসান এক জায়গায় গিয়ে মুখ কাল করে বসে পড়ল। আলমাস বলল, 'কি হলো হাসান?'

হাসান করুণ স্বরে বলল, 'আমি আর হাঁটতে পারছি না চাচা! তোমরা চলে যাও, আমি এখানেই বসে থাকবো।'

আলমাস তাকে উঠানোর চেষ্টা করল কিন্তু হাসানের হাঁটার কোন শক্তি ছিল না, তাই সে মাটির ওপরই শুয়ে পড়ল। অবশেষে আলমাস হাসানকে কাঁধে নিয়ে হাঁটা শুরু করল।

হাসানকে কাঁধে নিয়ে মাইল দেড়েক চলার পর আলমাস মনে মনে বলল, 'ইদ্রিসের প্রস্তাব কবুল না করে ভুলই করেছি।'

হঠাৎ পেছন থেকে ঘোড়ার খুরধ্বনি ভেসে এল। সাদ মুখ ঘুরিয়েই ঘোড়সওয়ারকে

চিনতে পেরে বলল, 'আরে! ওতো ইদ্রিস।'

হাসান সাথে সাথে বলে উঠল, 'চাচা, আমাকে নামিয়ে দাও।'

আলমাস বলল, 'না না, তুমি চুপ করে বসে থাকো। হাঁটতে দিলে দশ কদম গিয়েই আবার মাটির ওপর শুয়ে পড়বে।'

হাসান জেদ ধরে বলল, 'আমাকে নামিয়ে দাও, নইলে আমি তোমার ঘাড় কামড়ে ধরবো।'

হাসান কেন নামতে চাচ্ছে আলমাস তখনও তা বুঝতে পারেনি। সাদ ও আহমদ কিন্তু হাসানের দুষ্টুমী দেখে হেসেই অস্থির। ওর দাপাদাপিতে আলমাস যখন তাকে কাঁধ থেকে নিচে নামাচ্ছিল তখনই ইদ্রিস এসে ওদের কাছে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল।

ইদ্রিস কোন ভূমিকা না করেই বলল, 'তোমরা এত দূর চলে এসেছ ভাবিনি। এসো, ভাই হাসান। তুমি ও আহমদ ঘোড়ায় চড়ে বসো।'

ইদ্রিস ঘোড়া থেকে নেমে এলে আলমাস বলল, 'তুমি খুব কষ্ট করলে। কিন্তু ঘোড়া ফেরত আনবে কে?'

'আমিও আপনাদের সাথে কর্ডোভা যাচ্ছি। ওখানে আমার মামার বাড়ি। আমি বাড়ি থেকে অনুমতি নিয়ে সেখানে বেড়াতে যাচ্ছি।'

আলমাস বলল, 'তাহলে হাসানকে সাথে নিয়ে তুমিই ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যাও।'

'না, না, আমি আপনাদের সাথে হেঁটেই যেতে চাই।'

আলমাস আহমদ ও হাসানকে ঘোড়ায় বসিয়ে লাগামের রশি ধরে আগে আগে হেঁটে চলল। সাদ ও ইদ্রিস গল্প করতে করতে চলল ওদের পেছনে।

ইদ্রিস হেসে বলল, 'কি অবাক কাণ্ড, হাসানের ডান চোখে আঘাত লেগেছে, আর তোমার ফুলে উঠেছে বাঁ চোখ। এদিকে জিয়াদের দু'চোখই ফুলে গেছে ভীষণভাবে। তুমি যখন ধনুকে তীর চড়াচ্ছিলে তখন আমি বেশ ভয়ই পেয়েছিলাম। ভাবছিলাম, না জানি তুমি খুনই করে ফেলো।'

'না না, আমি তো ওকে ভয় দেখাচ্ছিলাম।'

ইদ্রিস বলল, 'ওরা সবাই যদি তোমাকে আক্রমণ করতো, তাহলে আমি কি করতাম জানো?'

'হয়ত তুমি আমার বিরুদ্ধে লড়তে না।'

'আমি তোমার পক্ষে লড়তাম। আরও চারজনকে তুমি তোমার দলে পেতে।'

এ কথা শুনে আলমাস বলল, 'কেন তুমি আমাদের দলে আসতে?'

'কারণ জিয়াদ অন্যায় করছিল। অন্যায়ের সমর্থন করা পাপ।'

কর্ডোভার আবাসিক এলাকায় এসে পৌঁছল ওরা। প্রাচীর ঘেরা সুদৃশ্য এক বাগানের ভেতর দুর্গের মত এক বাড়ি। সাদ ওদিকে ইশারা করে বলল, 'ওটাই আমাদের বাড়ি।'

বাগানের গেটে এসে ইদ্রিস বলল, 'এবার আমাকে বিদায় দাও। আমি এখন আমার মামা বাড়ি যাবো। তিনি থাকেন শহরের আরেক মাথায়।'

সাদ বলল, 'আজ আমাদের এখানেই থেকে যাওনা।'

'না, কাল আসব। মামার অনুমতি না নিয়ে এখানে থেকে গেলে তিনি মনে কষ্ট পাবেন। কাল এসে আমি তোমাদের সাথে তীরন্দাজী অনুশীলন করবো।' ইদ্রিস আলমাসকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি আমাকে তীরন্দাজী শেখাবেন তো?'

আলমাস উত্তরে বলল, 'কবি না হয়ে সৈনিক হতে চাইলে তোমাকে আমি কর্ডোভার সেরা তীরন্দাজ বানিয়ে দেবো।'

'আমি কাব্য চর্চা করি না। ওখানে আমি অন্যের কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম, ভবিষ্যতে না হয় তাও করবো না।'

ইদ্রিসকে বিদায় দিয়ে ওরা তিন ভাই নিজেদের বাগানে প্রবেশ করল।

৩.

দেউড়ীর সামনে গাড়ি ও আস্তাবলে নতুন ঘোড়া দেখে আলমাস বলল, 'সম্ভবত মেহমান এসেছে।'

সাদ তার খালুর সাদা ঘোড়াটি চিনতে পেরে বলল, 'এটাতো খালুজানের ঘোড়া। মনে হয় গাড়িটাও তাঁরই।'

বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল এক চাকরাণী। সে বলল, খালুজান ছাড়া আরো মেহমান এসেছেন, তারা এখন মেহমানখানায় আছেন।

সাদ ও হাসান একে অন্যের দিকে তাকাল। এ অবস্থায় ওরা মেহমানদের সামনে পড়তে চাইল না। ওরা সামনে দিয়ে না গিয়ে বাগান ঘুরে পেছন দিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকল। বাসার কাজের মেয়ে ওদের ক্ষতবিক্ষত চেহারা দেখে হায় হায় করে উঠল। বলল, একি অবস্থা তোমাদের? খালাম্মা এসেছেন, তিনি তোমাদের এ অবস্থায় দেখলে কি বলবেন?'

সাদ ও হাসান নিজের ভয়েই তটস্থ ছিল, খালাম্মার কথা শুনে আরো ঘাবড়ে গেল। ওদের মা ঘরে বসে বোনের সাথে গল্প করছিলেন, চাকরাণীর চিৎকার শুনে বের হয়ে এলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'এই চেচাচ্ছিস কেন?'

হাসান অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সাদ সাহস করে বলল, 'তেমন কিছু হয়নি আম্মিজান, কুস্তি খেলে সামান্য আঘাত পেয়েছি।'

'উঁহু, কুস্তি নয়, তোমরা নিশ্চয়ই কোথাও মারামারি করে এসেছ। দেখো তো কি অবস্থা হয়েছে চেহারার? ছি, ছি, তোমাদের খালা এ অবস্থায় তোমাদের দেখলে কি ভাববেন?'

আহমদ বলল, "আম্মাজান, ভাইয়া আসলেই কুস্তি লড়ছিল। ছেলেটি কুস্তির নিয়ম না মেনে ভাইজানকে ঘুষি মারলে ভাইজানও তাকে আচ্ছামত ধোলাই দিয়েছেন।"

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই খালাম্মা হাসি মুখে এসে দাঁড়ালেন ওখানে। সাদ ও আহমদ তাকে দেখতে পেয়েই সালাম দিল। কিন্তু হাসান অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখল।

আম্মা বললেন, "কিরে হাসান, খালাম্মাকে সালাম করলি না?"

হাসান মুখ না তুলেই আস্তে করে সালাম করল। আম্মা বললেন, "ওকি হাসান, মুখ লুকিয়ে রেখেছিস কেন, তোল, মুখ তোল দেখি?"

হাসান মায়ের আদেশে মাথা তুলল ঠিকই কিন্তু মুখ ঢেকে রাখল হাত দিয়ে।

খালাম্মা তার মুখ থেকে যতই হাত সরাতে চেষ্টা করল, হাসান ততই চেষ্টা করল মুখ ঢাকতে। কারণ আঘাতের কারণে তার চোখ মুখ ফুলে গিয়েছিল। আম্মা এবার ধমকে উঠলেন, "হাসান, ওকি হচ্ছে, মুখ থেকে হাত সরা বলছি।"

অসহায় হাসান হাত দুটি সরিয়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। আম্মা বললেন, "আপা, ও বড় দুটোর চেয়ে বেশী দুষ্ট।"

খালাম্মা হাসানের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, "আপা, স্পেনের মাটিতে আজ সাহসী ছেলেই বেশী দরকার। ওকে তুমি বকাবকি করো না।" তারপর হাসানকে বললেন, "বাবা, তুমি যদি মার খেয়ে পালিয়ে না এসে থাক, তাহলে তোমার লজ্জার কিছু নেই।"

হাসান ঝটপট বলল, "আমি মার খেয়ে পালাইনি খালাম্মা।"

"তাহলে তুমি এত মন খারাপ করে আছো কেন?"

আহমদ বলল, "খালাম্মা, হাসান ভুল করে একটি ছেলেকে অযথা মেরেছে, এ জন্যই ওর মন খারাপ।"

খালাম্মা বললেন, "কিন্তু ঐ ছেলেটিও তো কম করেনি? আরেকটু হলেই তো চোখটি যেতো।"

হাসান বলল, "তার চেয়ে ওর অবস্থা আমার চাইতে খারাপ। ভুল বুঝে ওকে ওভাবে মারাটা আমার ঠিক হয়নি।"

৪.

স্পেনের অভিজাত বংশের সন্তান সাদ, আহমদ ও হাসান। তাদের পিতা আবদুল মুনীম কর্ডোভার শীর্ষস্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তি। কর্ডোভায় বিশাল জমিদারী ছাড়াও তার রয়েছে ঘোড়া কেনা-বেচার ব্যবসা। এ উপলক্ষে তিনি একাধিকবার, মরক্কো, মিসর, আরব এবং অন্যান্য দেশ সফর করেছেন।

একবার তিনি ঘোড়া বিক্রি করার জন্য সাইপ্রাস গিয়েছিলেন। সেখানে এক সিরীয়

ব্যবসায়ী তাকে বলল, 'আমার ছোট ভাই সাইপ্রাস নৌ-বাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিল। কিছুদিন আগে দুই কন্যা ও স্ত্রী রেখে সে মারা যায়। গ্রানাডার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির সাথে তার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। কয়েক বছর আগে হজ্জ করে ফিরে আসার পথে এই ধনী যুবক জাহাজ দুর্ঘটনায় পড়ে। তার ভাই তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই এক সময় সে যুবকের সাথে বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়।'

ব্যবসায়ী আরো বলল, 'ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী ছোট মেয়েকে নিয়ে গ্রানাডায় বড় মেয়ের কাছে চলে যেতে চাচ্ছে। আপনি তো কর্ডোভা যাচ্ছেন, যদি কষ্ট করে ওদেরকে আপনার সাথে নিয়ে যান তো আমার বড়ই উপকার হয়।'

আবদুল মুনীম বলল, 'আমার জাহাজ তো খালিই যাচ্ছে। ওরা যেতে চাইলে আমার কোন অসুবিধে নেই।'

ব্যবসায়ী বলল, 'বিশেষ কারণে আমি ওদের সাথে যেতে পারছি না। আমার ভাইয়ের এক বিশ্বস্ত চাকর ওদের সাথে যাবে। আপনি ওদের মালাকার তীরে নামিয়ে দিলেই চলবে। সেখান থেকে গ্রানাডা খুব দূরে নয়।'

তাকে আশ্বাস দিয়ে আবদুল মুনীম বলল, 'আপনি ওদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি নিজেই ওদেরকে গ্রানাডায় পৌঁছে দিয়ে যাবো।'

এ আলোচনার তিন দিন পর আবদুল মুনীমের জাহাজ সাইপ্রাসের বন্দর ত্যাগ করল। মহিলাদের জন্য তিনি জাহাজের একটি অংশ আলাদা করে দিলেন এবং তাদের কেবিন পর্দা দিয়ে ঘেরাও করে দিলেন।

বন্দর ত্যাগ করে জাহাজটি অল্প দূর যেতেই সহসা তা জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলো। জাহাজের কাপ্তান ছিল দক্ষ নাবিক। আবদুল মুনীম নিজেও জাহাজ চালনায় অভিজ্ঞ। তা ছাড়া বিশ্বস্ত ও সাহসী মাল্লাদের নিয়ে সফর করতেন তিনি। বিপদের সম্ভাবনা স্মরণ রেখে জাহাজের নিরাপত্তার স্বার্থে অস্ত্রপাতিও সব সময়ই মজুদ রাখতেন। তাই কোন জলদস্যুর জাহাজকে আবদুল মুনীম কখনই ভয় করেননি। কিন্তু এ যাত্রায় তার সঙ্গে দুজন মহিলা থাকায় তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে শংকিত হয়ে পড়লেন তিনি।

সন্ধ্যার সামান্য আগে জলদস্যুদের জাহাজটি তাদের চোখে পড়ে। আবদুল মুনীম কাপ্তানকে বলল, 'লড়াই না করে পারলে তাদের এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো।'

কাপ্তান ও জাহাজের মাল্লাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও জলদস্যুদের জাহাজের সাথে ক্রমেই তাদের দূরত্ব কমতে থাকে। কিন্তু দস্যুরা জাহাজটির ওপর চড়াও হওয়ার আগেই রাতের আঁধার নেমে এলে কাপ্তান সব বাতি নিভিয়ে রাতের অন্ধকারে যতটা সম্ভব জাহাজটিকে দূরে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। ফলে সে রাতে দস্যুরা ওদের আক্রমণ করার কোন সুযোগ পেল না। কিন্তু ভোরেই জলদস্যুরা জাহাজটিকে আবার দেখতে পেয়ে তার পিছু নিল।

আবদুল মুনীম বুঝতে পারলেন, সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব নয়। কাপ্তানের সাথে এ নিয়ে

পরামর্শ করলে কাপ্তানও বলল, 'লড়াই করা ছাড়া বোধ হয় আমাদের কোন উপায় নেই।'

ফলে আবদুল মুনীম লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নাবিক ও মাল্লাদের প্রস্তুত হতে বললেন।

রাতভর জাহাজটির পালাবার চেষ্টা দেখে জলদস্যুরা ভেবে নিল, জাহাজে লড়াই করার মত লোক ও গোলাবারুদ নেই। ক্রমেই ওরা আবদুল মুনীমদের জাহাজের নিকটবর্তী হতে থাকল এবং এক সময় তীরের আওতায় এসে গেল।

জলদস্যুরা আবদুল মুনীমদের জাহাজ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল কিন্তু কোন পাল্টা তীর তাদের দিকে ছুটে গেল না। পরপর কয়েকবার তীর নিক্ষেপ করার পরও যখন আবদুল মুনীমের জাহাজ থেকে কোন প্রতি আক্রমণ হলো না, তখন তাদের সাহস আরো বেড়ে গেল। দস্যু সরদার সাথীদের বলল, 'মনে হয় জাহাজে তেমন লোকজন বা মাল সামান নেই, তবে জাহাজটি নতুন এবং দামী। অযথা এটাকে ধ্বংস না করে দখল করে নিলেও মোটের ওপর লাভ কম হবে না।'

কিন্তু আবদুল মুনীমের জাহাজের কাছাকাছি আসতেই দস্যুদের ধারনা ভুল প্রমাণিত হলো। ডেকের ওপর দস্যুরা জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এ সময় অতর্কিতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে গেল তাদের দিকে। ফলে পাটাতনের ওপর দাঁড়ানো দস্যুরা নিজেদের তীর তাক করার আগেই আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে কাতরাতে লাগল। একই সাথে দস্যু জাহাজের বাদামে কয়েকটি মশালবাহী জ্বলন্ত তীর এসে বিঁধল। সাথে সাথে উড়ন্ত পালের কাপড় ও রশিতে আগুন ধরে গেল।

দস্যুরা দ্রুত নিজেদের জাহাজ ঘুরিয়ে আবদুল মুনীমদের জাহাজে সরাসরি ধাক্কা লাগাতে চেষ্টা করল। কিন্তু হুঁশিয়ার কাপ্তান আঘাত খাওয়ার আগেই হঠাৎ জাহাজ ঘুরিয়ে নিল। ফলে, জাহাজের সামনের ইস্পাতের চোখা অংশ দিয়ে আবদুল মুনীমের জাহাজকে গুঁতো মেরে খণ্ড-বিখণ্ড করার দস্যু সরদারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

ঘুরিয়ে নেয়ার ফলে জাহাজ দুটি পাশাপাশি টক্কর খেল। দস্যুরা চেষ্টা করল লাফিয়ে আবদুল মুনীমের জাহাজে চড়তে। যে কয়জন এ চেষ্টা করল প্রতিপক্ষের বর্শা ও তরবারি স্বাগত জানাল তাদের। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ কিছু সংগীকে লাশ হতে দেখে বাকীরা এ চেষ্টা বাদ দিল। ততক্ষণে দস্যু জাহাজের আগুন ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে।

এদিকে দস্যু জাহাজ থেকে ছোঁড়া মশালবাহী তীরের আঘাতে আবদুল মুনীমের জাহাজের বাদামেও আগুন ধরে গিয়েছিল। আবদুল মুনীম একদল মাল্লাকে আগুন নিভানোর জন্য পাঠিয়ে অবশিষ্টদের নিয়ে দস্যুদের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন।

সমুদ্রের খোলা বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে আগুনের জিহবা লকলকিয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দস্যু জাহাজের সর্বত্র আগুন ছড়িয়ে পড়ল। দস্যুরা আগুন থেকে বাঁচার জন্য সমুদ্রে নৌকা নামিয়ে দিল। আবদুল মুনীমের সঙ্গীরা মিঞ্জানিক দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করে দস্যুদের নৌকা ডুবিয়ে দিল।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আবদুল মুনীমের জাহাজের আগুনও ক্রমেই বেড়ে গিয়ে জাহাজটিকে গ্রাস করতে উদ্যত হলো। কাপ্তান বলল, 'জাহাজ বাঁচানো যাবে না। প্রাণে বাঁচতে চাইলে জলদি জাহাজ ছাড়তে হবে আমাদের।'

জাহাজে নৌকা ছিল দুটো। আবদুল মুনীম নৌকাগুলো পানিতে নামিয়ে মাল্লাদের আদেশ দিলেন, 'মহিলাদের এক্ষুণি নৌকায় চড়তে বল। আহতদেরও নৌকায় তুলে নাও।'

মাল্লাদের সাথে আবদুল মুনীম নিজেও আহতদের কাঁধে নিয়ে নৌকায় তুলতে লাগলেন। নৌকা দুটো জ্বলন্ত জাহাজকে পেছনে ফেলে কিছুদূর এগিয়ে গেল। আবদুল মুনীম নৌকায় চোখ বুলিয়ে হঠাৎ ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমাদের জাহাজে ফিরে যেতে হবে। মহিলাদের একজনকে আমরা জাহাজে ফেলে এসেছি বলে মনে হয়।'

তিনি আবারো নৌকার যাত্রীদের ওপর চোখ বুলিয়ে এক মহিলাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য! মা তার নিজের মেয়েকে জ্বলন্ত জাহাজে ফেলে এসে চুপচাপ বসে আছে! জলদি নৌকা ঘুরাও।'

'একজন মা সম্পর্কে আপনার এমন ধারণা করা উচিত নয়, আমি এখানেই আছি।' কথা বলল তার পাশে দাঁড়ানো এক সশস্ত্র সিপাই।

আবদুল মুনীম অবাক হয়ে দেখল, তার পাশ থেকে যে সিপাইটি কথা বলছে, তার মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ, হাতে রক্তমাখা তলোয়ার। পরে আছে একটি ঢিলা বর্ম।

আবদুল মুনীমের সংশয় দূর করার জন্য কাপ্তান বলল, 'আপনি লক্ষ্য করেননি, ইনি তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। তার বীরত্ব ও সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। কিন্তু তিনি এ তরবারি ও বর্ম পেলেন কোথায়?'

মেয়েটি জবাব দিল, 'এ তরবারি আমার আব্বার। শিরস্ত্রাণ ও বর্ম জাহাজেরই এক কামরায় পেয়েছি। পুরুষদের পোশাক খোঁজার জন্য আমি ওখানে ঢুকেছিলাম। ওখানকার সব বর্মই আমার শরীরের তুলনায় বড়। ফলে এ বেঢপ বর্ম পরেই আমাকে লড়তে হয়েছে।'

৫.

আবদুল মুনীম ও তার সাথীরা সারাদিন নৌকায় কাটিয়ে দিল। কোন জাহাজ এসে তাদের উদ্ধার করবে এ আশায় অপেক্ষার প্রহর গুণল, কিন্তু সন্ধ্যা অবধি কোন জাহাজ তাদের নজরে এল না। সন্ধ্যার একটু আগে উত্তর দিকে অনেক দূরে তারা একটি জাহাজ অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে সেদিকে নৌকা চালাতে শুরু করল। কিন্তু একটু পরই রাত হয়ে গেলে দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেল জাহাজটি। রাতের আঁধার এসে তাদের সব আশা

ভরসা নষ্ট করে দিল।

পরদিন দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল ওদের মন। খাদ্য ও পানীয় ফুরিয়ে এল। পিপাসার্ত হওয়ার পরও আবদুল মুনীম ও তার সাথীরা নিজেদের ভাগের পানির বেশীর ভাগটা আহত সাথীদের পান করাচ্ছিল।

দুপুর বেলা। পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল বৃদ্ধা। আবদুল মুনীম তার নিজের ভাগের পানি পান করতে দিল তাকে। আরেকটু পানি মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনিও সামান্য পান করে নিন। পরে হয়ত আর পাবেন না।'

মেয়েটি তখন এক জখমীর পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। সে বলছিল, 'নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। যে আল্লাহ আমাদেরকে দস্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, তিনিই এ কঠিন বিপদ থেকেও আমাদের রক্ষা করবেন।'

আবদুল মুনীমের কথা শুনে মেয়েটি বলল, 'আমার ভাগের পানি আমি আগেই পান করেছি। আপনি ভোর থেকে এ পর্যন্ত এক ঢোকও পান করেননি, এটুকু আপনিই খান।'

আবদুল মুনীম বলল, 'এ অবস্থায় আমি নিজেকে নিয়ে ভাবতে পারছি না, নিন পানিটুকু।'

তরুণী আবদুল মুনীমের হাত থেকে পানিটুকু নিয়ে আহত এক লোককে দিয়ে দিল আর বলল, 'এ অবস্থায় আমিও নিজের কথা ভাবতে পারি না।'

মেয়েটির নাম সকিনা। আবদুল মুনীম তাকে যত দেখছে ততই মুগ্ধ ও অভিভূত হচ্ছে। সে মেয়েটিকে দেখেছে জলদস্যুদের মোকাবেলায় নির্ভীকচিত্তে রুখে দাঁড়াতে, দেখেছে রক্তরঞ্জিত তলোয়ার হাতে পাকা সৈনিকের বেশে। এখন দেখছে কোমল হৃদয় সেবাপরায়ণ এক রমনীর বেশে। অথচ সর্বত্রই সে কত সাবলীল, কত অমায়িক ও আন্তরিক। তার সাহস ও বলিষ্ঠতা যেমন হৃদয়ে দাগ কাটে, তেমনি সঙ্গীদের জন্য তার ত্যাগ, সহমর্মিতা ও সহানুভূতিও হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সৈনিক বেশে ওকে দেখেই আবদুল মুনীম নিজের অন্তরে এক ধরনের মধুর কাঁপন অনুভব করেছিল, এখন কোমল হাতে আহতদের শুশ্রূষা করতে দেখে আবদুল মুনীম অনুভব করল, তার হৃদয়ের তারে কে যেন অংগুলের কোমল ছোঁয়ায় এক সুমধুর সুর বাজিয়ে যাচ্ছে।

আবদুল মুনীম নিজেকে তিরস্কার করল, অজানা অচেনা এক যুবতীকে নিয়ে কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়ানোর কি অধিকার আছে তার! কিন্তু শত তিরস্কারেও সকিনার চেহারা মন থেকে সে মুছতে পারল না। সকিনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও মনের আয়নায় বার বার সে দেখছিল সকিনার সেই তৃপ্ত মুখের ছবি, যখন সে নিজের ভাগের পানিটুকু আহত লোকটিকে পান করিয়ে গভীর তৃপ্তিতে ডুবেছিল। আবদুল মুনীম বহুদিন থেকে তার অন্তরের গোপন প্রদেশে যে জীবন সাথীর চিত্র এঁকে রেখেছিল, এতো সেই মুখ! তার মনে হল, সকিনা তার চির জনমের চিরচেনা মানসী। যৌবনের শুরু থেকে এ তরুণীই তার অন্তর তলে বাস করে আসছে। কল্পনার চোখে একেই তিনি দেখে এসেছেন সারাটি

জীবন।

তৃতীয় দিন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অনিশ্চিত সফরের ক্লান্তিতে আবদুল মুনীমের সাথীরা অবসন্ন অবস্থায় নৌকার ওপর শুয়েছিল। হাল ধরে বসেছিল আবদুল মুনীম। তার শরীরও নিস্তেজ। হঠাৎ অন্য নৌকার মাল্লা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ওদিকে দেখুন একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে।'

আবদুল মুনীম মাল্লার ইশারা করা দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যি সত্যি একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। তবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা না গেলে বেশ দূর দিয়েই জাহাজটি চলে যাবে। তিনি নৌকার আরোহীদের উঠে বসার জন্য ডাকলেন। হতাশা ও ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়া আরোহীদের মাঝে সহসা নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে, হাত ও কাপড় নেড়ে জাহাজটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু দুর্বলতার কারণে অনেকেই দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। চিৎকার করতে গিয়ে দেখল কারো গলা দিয়েই কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না।

জাহাজটি নোনা পানি কেটে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাতে পতপত করে উড়ছিল স্পেনের পতাকা।

আবদুল মুনীম একটি বৈঠার মাথায় কয়েক রঙের কাপড় একত্র করে বেঁধে সেটাকে মাথার ওপর তুলে নাড়াতে লাগল। জাহাজের জনৈক নাবিক তা দেখতে পেয়ে সেও হাত নেড়ে জবাব দিল।

একটু পর জাহাজের গায়ে নৌকা ভিড়ল। জাহাজ থেকে নাবিকরা নেমে এসে আহত ও অন্যান্য আরোহীদের ধরে জাহাজে তুলতে লাগল। সকিনা এসব কিছুই দেখছিল না, অচেতন হয়ে নৌকার ওপর পড়েছিল সে। আবদুল মুনীম তার কাছে গিয়ে হাটু মুড়ে বসল। ডাকল নাম ধরে, কিন্তু কোন জবাব পেল না। তার বাহু ধরে ঝাকুনি দিল আবদুল মুনীম। চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিল। সকিনা চোখ খুলল। বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল আবদুল মুনীমের দিকে। আবদুল মুনীম তাকে ধরে বসিয়ে দিল। হাতের ইশারায় দেখাল উদ্ধারকারী জাহাজটি। জাহাজ দেখে সকিনার ঠোঁটে এক চিলতে হাসির রেখা ফুটে উঠল। আবদুল মুনীমের মনে হল, প্রচণ্ড ঝড়ের শেষে প্রকৃতির বুকে নেমে এসেছে মধ্য রাতের নিস্তব্ধতা আর আকাশে ফুটে উঠেছে নবমীর চাঁদ।

৬.

জাহাজটি সাবৃতা যাচ্ছিল। পরদিন সন্ধ্যা। সকিনা জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখছে। আবদুল মুনীম তার পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, 'পরশু আমরা সাবৃতা পৌঁছে যাব। সেখান থেকে আমরা মালাকার জাহাজ পেয়ে যাব।'

সকিনা আবদুল মুনীমের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'আপনার জাহাজ ধ্বংস হয়ে

যাওয়ায় আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। আপনার কাপ্তানও মনে খুব আঘাত পেয়েছে দেখলাম। আমাদের নিয়ে আপনার এ সফর মোটেই সুখকর হলো না।'

'না না, বরং আপনাদের কারণেই সম্ভবত আমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে।'

সকিনা এর জবাবে কোন কথা খুঁজে না পেয়ে আবার সাগরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আবদুল মুনীম বলল, 'আমি এক আবেদন নিয়ে আপনার আম্মার সাথে দেখা করে এলাম। আমি একজন সৈনিক। ভদ্র মহিলাদের সাথে কিভাবে আলাপ জমাতে হয় আমি সে সব জানি না। তবু তিনি যে আমার আবেদনটি খারাপভাবে নেননি সে জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।'

আবদুল মুনীম একটু নিরব থেকে আবার মুখ খুলল, 'আপনার আম্মার সাথে আপনাকে নিয়েই কথা বলেছি আমি। আপনাকে বলতে বাঁধা নেই, নৌকায় শেষ যে রাতটি আমরা কাটালাম সে রাতটি ছিল আমার কাছে এক দুঃস্বপ্নের রাত। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। কিন্তু সে রাতে আমার বেঁচে থাকার অদম্য বাসনা জেগেছিল মনে। ভাবছিলাম, পরের দিন আল্লাহ যদি আমাদের উদ্ধারের জন্য কাউকে না পাঠান তাহলে হয়ত জীবনে আর কোন সূর্যোদয় দেখার সুযোগ আমার হবে না। চাঁদের আলোয় আপনার শুকনো চেহারা দেখে বার বার আপনার সাথে আলাপ করার ইচ্ছে জেগেছিল আমার মনে। কিন্তু আমি সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি?'

নিজের বুকের ভিতর অসহ্য এক কাঁপন অনুভব করল সকিনা। কিছু বলতে চাইল, কিন্তু ঠোঁট নাড়াতে পারল না। প্রচণ্ড এক আবেগ এসে কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিল তার। তবু কোন রকমে আবেগ সামলে সে বলে উঠল, 'কি বলতে চাচ্ছিলেন আপনি?'

'আমি বলতে চাচ্ছিলাম, মরণের আগ পর্যন্ত আমার হৃদয়ে একটি কথাই শুধু জেগে থাকবে, আমরা দুজন কেবল দুজনের জন্যই জন্মেছিলাম।'

সকিনা সংকোচ ও লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আম্মা আপনাকে কি বলেছেন?'

'তিনি তার কথা বলেছেন, কিন্তু তোমারও তো কিছু বলার থাকতে পারে! আমার জীবন সাথী হতে তোমার কি কোন আপত্তি আছে?'

সকিনা মুখ তুলে আবদুল মুনীমের চোখে চোখ রাখল। তারপর কোন জবাব না দিয়েই সেখান থেকে দৌড়ে পালাল। তার অন্তরে তখন ঝড় বইছে, পা কাঁপছে। চোখে এসে ভর করেছে আনন্দের অশ্রু। মায়ের কাছে এসে সকিনা এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর, 'আম্মি' বলে ঝাপিয়ে পড়ল মায়ের বুকে।

'কি হয়েছে, মা?'

সকিনা কি বলবে ঠিক করতে না পেরে বলে উঠল, 'কিছু না আম্মি, কিছু না।'

মা সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাছা, তুমি খুব ভাগ্যবতী।'

গ্রানাডা পৌঁছার কয়েকদিন পরেই আবদুল মুনীমের সাথে সকিনার বিয়ে হয়ে গেল। কর্ডোভার অভিজাত মহলে এ বিয়ে নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠল। লোকজন বলাবলি করতে লাগল, আবদুল মুনীম কর্ডোভার খান্দানী ঘরের একাধিক মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে নাম-গোত্রহীন এক মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তুলেছে।

সকিনা তার স্বামীর মান-মর্যাদা ও বংশ গৌরব সম্পর্কে কিছুই জানতো না। সে শুধু জানতো, তার স্বামী খুব বড় ব্যবসায়ী। কিন্তু কর্ডোভায় এসে স্বামীর আলীশান বাড়ি দেখে সকিনা অবাক হয়ে গেলো।

আবদুল মুনীম নববধুকে অন্দর মহলের এক সুরম্য কামরায় বসিয়ে রেখে মেহমানখানায় গেল অপেক্ষমান বন্ধুদের সাথে দেখা করতে। এই সুযোগে কর্ডোভার সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা এসে ঘিরে ধরল সকিনাকে। তারা নতুন বউয়ের বেশভূষা আর খোপা বাঁধার কায়দা কানুন নিয়ে নানা রকম টিপ্পনি কাটতে লাগল।

সকিনা দীর্ঘ সময় ধরে তাদের কথাবার্তা শুনেও বুঝতে পারল না তারা তার প্রশংসা করছে, না নিন্দা করছে। কর্ডোভার মহিলারা কথায় কথায় কবিতা আবৃত্তি করছিল। একজন কবিতা আবৃত্তি করলে অন্যজন তার ব্যাখ্যা দাবী করতো। এক তরুণী নববধুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বলুন তো এ কবিতার মানে কি?' এই বলে সে একটি কবিতা আবৃত্তি করল।

সকিনা নিরুত্তর, অসহায়। এসব প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। সে নির্বাক বিস্ময়ে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এক মেয়ে পেছন থেকে বলে উঠল, 'দেখো, আমার ভাবীকে বিরক্ত করো না। কবিতা নিয়ে তার কোন আগ্রহ নেই। গান হলে বলতে পারো, তিনি ভাল গাইতে পারেন।'

সকিনা সরল মনে বলল, 'না না, আমি গানও গাইতে পারি না। গানের ব্যাপারেও আমার কোন আগ্রহ নেই।'

'তাহলে আপনি কি জানেন?' মেয়েটি দুষ্টুমী ভরা চোখ নাচিয়ে সকিনাকে প্রশ্ন করল।

সকিনার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বলল, 'আমি কিছুই জানি না। যদি আপনারা আমার কাছ থেকে এ কথা শুনলে খুশী হন, তাহলে আমার বলতে কোন দ্বিধা নেই, আমি এক গরীব মায়ের এতীম মেয়ে। আমার বাপ-মা আমাকে কবিতা বা গান কিছুই শেখাননি। তাঁরা আমাকে কোরআন শিখানোই যথেষ্ট মনে করেছেন। তাঁরা আমাকে শিখিয়েছেন, পোশাক-পরিচ্ছেদ দিয়ে দেহ ঢেকে রাখতে, সৌন্দর্যের প্রর্দশনী করে বেড়াতে নয়। আমি যে পরিবেশে বড় হয়েছি, সেখানে একজন নারীকে কন্যা, স্ত্রী এবং

মা হিসাবে দেখা হয়। আপনাদের কাছে গর্ব করার মত আমার কিছুই নেই। তবে আমার কাছে যা আছে তা শুনতে হয়তো আপনাদের ভাল লাগবে না। একজন পবিত্র স্ত্রীর যে সব গুণ থাকা দরকার এবং আমার স্বামী যা পছন্দ করেন তার সবই আছে আমার কাছে। আর একজন গর্বিত স্বামী হওয়ার জন্য যে যোগ্যতা দরকার, আমার স্বামীরও তা পুরোপুরিই আছে।'

সকিনার বলার ধরন ও বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় এতক্ষণের হাস্যরসের পরিবেশ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। উপস্থিত সকলেই নতুন বউয়ের এ ধরনের স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ উচ্চারণ শুনে হতবাক হয়ে গেল। তার কথা শেষ হওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। অবশেষে একজন বয়সী মহিলা সকিনার কাছে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'মা! তুমি এসব মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশী গুণী ও জ্ঞানী। সত্যি, স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে আবদুল মুনীমের রুচি ও ভাগ্যের আমি প্রশংসা করছি।'

সকিনার দুলাভাই শেখ আবু ছালেহ গ্রানাডার ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত। সকিনার মা বড় মেয়ে-জামাই বাড়িতে কিছুদিন থেকে পুনরায় কর্ডোভায় ফিরে এলেন।

বিয়ের এক বছর পর আবদুল মুনীমের বড় ছেলে সাদের জন্ম হয়। সাদের জন্মের মাস তিনেক পর সকিনার আম্মা মারা যান। এর প্রায় বছর দুই পরে আহমদের জন্ম। সকিনার বড়বোনের কোন সন্তানাদি না থাকায় সাদ ও আহমদকে তিনি আপন সন্তানের মতই স্নেহ করতেন। দু'তিন মাস পরপর বড়বোন স্বামীসহ ওদের বাড়ি আসতো, না হলে সকিনা ও আবদুল মুনীম চলে যেতো গ্রানাডা।

বিয়ের পঞ্চম বছরে দুনিয়ায় আসে হাসান। হাসানের জন্মের পরের বছর আবদুল মুনীম হজ্জে যান। ফিরে আসার সময় তিনি পুত্রদের জন্য নিয়ে আসেন এক অবাক করা উপহার। উপহারটি এক জীবন্ত সিংহ ছানা। আফ্রিকার এক কবীলা সরদার আবদুল মুনীমকে এ সিংহ শাবকটি উপহার দেন।

আলমাস আবদুল মুনীমের বিশ্বস্ত চাকর। বিয়ের তিন বছর আগে আবদুল মুনীম তাকে মরক্কো থেকে নিয়ে আসে। নিজের যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততাগুণে আলমাস কিছুদিনের মধ্যেই আবদুল মুনীমের হৃদয় জয় করে নেয়। কর্ডোভার লোকেরা তাকে আবদুল মুনীমের ভাই হিসাবেই জানে। আবদুল মুনীমের অনুপস্থিতিতে আলমাসই তার সমুদয় বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনা করে।

আলমাসের বয়স চল্লিশের ওপর। কিন্তু তার স্বাস্থ্য ও গড়ন এখনো হাজার যুবকের মনে ঈর্ষা জাগায়। ঘোড়দৌড় ও তীর চালনায় তার নিপুনতা অবাক করে দর্শককে।

সকিনাকে জীবন সাথী পেয়ে আবদুল মুনীমের জিন্দেগী কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। জীবনের সব সুখ এসে বাসা বেঁধেছিল তার ঘরে। দুনিয়ার এমন কোন নেয়ামত ছিল না যার জন্য তার কোন আফসোস ছিল। স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে পরিতৃপ্ত, স্বামী

স্ত্রীকে নিয়ে গর্বিত। সন্তানেরা বাপ-মার আদর স্নেহে আপ্লুত। বন্ধুরা তাদের ভালবাসে, দুশমন ভয় পায়।

কিন্তু এতকিছুর পরও এক উৎকট পেরেশানী আবদুল মুনীমের অন্তর ক্ষতবিক্ষত করছিল। স্পেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা দিন দিন তার বেড়েই চলছিল।

বিয়ের আগে সে ছিল এক ঝামেলাহীন স্বাধীন মানুষ। নিত্যনতুন বিপজ্জনক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তে কোন পরোয়া ছিল না তার। জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই সে কাটিয়েছে কর্ডোভার বাইরে। নিছক অর্থ উপার্জনের জন্যই ব্যবসা শুরু করেনি আবদুল মুনীম, বরং ব্যবসায় উপলক্ষে দেশ-বিদেশ সফর করাই তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সকিনাকে বিয়ে করার পর তার জীবনের ছক গেল পাল্টে। ঘরের চার দেয়ালের সুখ যেমন তাকে টানে তেমনি বাইরের দুনিয়া তাকে ডাকে সময়ের দাবী মেটাতে। যখনই আবদুল মুনীম সাদ, আহমদ ও হাসানের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে যায় তখনই স্পেনের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকট তাকে নিয়ে যায় ভাবনার অতলতলে।

খণ্ড-বিখণ্ড স্পেন

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে স্পেনের মুসলমানরা ইতিহাসের এক শোচনীয় পর্যায় অতিক্রম করছিল। উমাইয়া শাসনের জৌলুসে তখন বেশ ভাটা পড়েছে। যে বিশাল সাম্রাজ্যের শক্তি ও দাপট পাশ্চাত্যের সম্রাটদেরকে সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে রাখতো, আত্মকলহের কারণে সে সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম আবদুর রহমানের উত্তরাধিকারীরা সুদীর্ঘ তিনশো বছর ধরে নিজেদের শ্রমে ও ঘামে যে বাগান ফুলে ফুলে সুশোভিত করে তুলেছিল, এখন তা শ্রীহীন ও মলিন অবস্থায় খাঁ খাঁ করছে। শাসকদের অযোগ্যতা, নেতাদের স্বার্থপরতা ও সুযোগ সন্ধানী আমীর ওমরাদের দলাদলির কারণে ছোট ছোট প্রায় কুড়িটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ল স্পেন। এসব রাজ্যের সিংহাসন নিয়েও চলছিল দলাদলি, সংঘাত ও সংঘর্ষ। আমীর ওমরারা নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে একেক সময় একেকজনকে গদিতে বসাতে লাগল। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির কোন স্বকীয়তা ছিল না, সে ছিল কুচক্রী আমীর ওমরাদের হাতের পুতুল।

নতুন শাসক ক্ষমতায় বসে গদীচ্যুত শাসকের ফাঁসী কার্যকর করতে না করতেই দেখা যেতো আরেকজন এসে সিংহাসন দখল করে বসেছে। সিংহাসনের এ নতুন দাবীদার আগেরজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে। দেশের মানুষ শাসকদের জানাযা পড়তে পড়তে কাহিল হয়ে পড়ছিল। পুরো স্পেন জুড়ে চলছিল এমনি অরাজক অবস্থা।

উমাইয়াদের শাসনামলে কর্ডোভা ছিল পাশ্চাত্যের কাছে এক স্বপ্নের শহর। এর শান শওকত ও জৌলুস চোখ ধাঁধিয়ে দিত তাদের। এমন একদিন ছিল যখন কর্ডোভার সেনাবাহিনী ফ্রান্সের রাজ ফটকে করাঘাত করলেও তাদের বাধা দেয়ার কেউ ছিল না। কর্ডোভার ভুবনখ্যাত স্থাপত্য শিল্পের কাছে বাগদাদের মহিমাও ম্লান হয়ে পড়েছিল।

ঐতিহাসিক, পরিব্রাজক ও কবিরা কর্ডোভার শিল্পকলা ও মনোরম বাগিচার যে বিবরণ দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করতে হলেও বিশাল গ্রন্থ রচনার দরকার। প্রথম আবদুর রহমান স্পেন দখল করার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাল ভাল গাছের চারা ও বীজ সংগ্রহের জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন। বাগানের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ দেখে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাগান বিশেষজ্ঞরা কর্ডোভায় ছুটে আসে। বাগানে সেচের জন্য গোয়াদেল কুইভার নদী থেকে নহর কেটে পানি আনার ব্যবস্থা করা হয়। সেই পানি মর্মর পাথরে তৈরী বিরাট সরোবরে জমা করে সেখান থেকে নানা রকম নলের সাহায্যে বাগানে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় গোটা শহর জুড়ে। সোনা, রূপা, তামা, পিতল নানা রকম মূল্যবান ধাতু দিয়ে বানানো হতো সেই সব নল।

নদীর তীর ঘেঁষে দীর্ঘ দশ মাইল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠে এ শহর। শহরে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী আমীর ওমরা এবং এক লাখের বেশী বিত্তবান মানুষের বাড়ি ছিল। শহরে ছিল সাতশো মসজিদ, নয়শো গোসলখানা। শত শত পাঠাগার ও অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

কর্ডোভা জামে মসজিদ তখনকার দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠতম স্থাপত্যশিল্প বলে স্বীকৃত ছিল। আজও বিশ্ব জুড়ে এ মসজিদের কোন তুলনা নেই। আমীর আবদুর রহমান আদ-দাখিল এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে তার উত্তরাধিকারীরা এ মসজিদের কারুকার্য, সৌন্দর্য ও বিস্তৃতিতে কে কতটা সফলতা লাভ করতে পারে তাই নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা করতো।

কর্ডোভার দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ ইমারতটির নাম ছিল মদীনাতুজ-জোহরা। স্পেনের খলিফায়ে আযম তৃতীয় আবদুর রহমান আন-নাসের তার প্রিয়তম রাণী জোহরার নামে এটি নির্মাণ করেন। এটাকে ইমারত না বলে শহর বললেও অত্যুক্তি হয় না। কর্ডোভা থেকে কয়েক মাইল দূরে 'উরুস' পাহাড়ের পাদদেশে এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। তৃতীয় আবদুর রহমান প্রতি বছর তার রাজকীয় আয়ের তিনভাগের এক ভাগই ব্যয় করতেন এই শানদার মহলের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে। অবাক হলেও সত্য, এ প্রাসাদে ঢুকার প্রবেশ পথই ছিল পনের হাজার। এর ছাঁদ ও দেয়াল ছিল মর্মর পাথরে তৈরী। জায়গায় জায়গায় ছিল পারদ ভরা সুদৃশ্য হাউজ। এসব হাউজে সূর্যকিরণ পড়ে নানা রকম প্রতিবিম্ব তৈরী করতো। ফলে সমগ্র মহলে ছড়িয়ে পড়তো আলোর বর্ণালী বিভা। তারই মাঝে গড়ে তোলা হয়েছিল সবুজের অপূর্ব সমারোহ, সুশোভিত বাগান ও স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা।

আজ মদীনাতুজ-জোহরার ভগ্নাবশেষ দেখে কেউ হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে না,

একদিন এখানে ইউরোপ ও এশিয়ায় দুর্দান্ত শাসক ও রাজদূতরা ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তৃতীয় আবদুর রহমান ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রচণ্ড প্রতাপ, শক্তি ও ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করতো। কাসরুল মাওক, কাসরুস সারওয়া, কাসরুত-তাও ইত্যাদি বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পগুলো কর্ডোভাকে অনুপম মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল।

আজ কর্ডোভা পরিণত হয়েছে এক মরা লাশে। সে লাশকে ক্ষত-বিক্ষত করছে ক্ষমতালিপ্সু একদল শকুন। ফলে নামগোত্রহীন কোন ব্যক্তি হঠাৎ করে চলে আসে শাসন ক্ষমতায়। দুদিন না যেতেই দেখা যায় বধ্যভূমি বা কয়েদখানা হয়েছে তার ঠিকানা। এভাবেই চলছে বছরের পর বছর। কর্ডোভার এ বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের ফলে স্পেনের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা একটি রাজ্য এবং প্রতিটি শহর শক্তিমান খান্দানের জমিদারীতে পরিণত হল।

গ্রানাডা ও তার আশপাশের এলাকা ছিল বনী জরীর অধিকারে। এভাবে সারকাসতা, টলেডো, কর্ডোভা, সেভিল, আলমিরিয়া, সেহালা, মালাগা এবং এরকম বিভিন্ন এলাকা বনী হুদ, বনী জান্নুন, বনী এবাদ, বনী জহর, বনী আফতার, বনী বকর, বনী হাম্মুদসহ বিভিন্ন কবিলার করায়ত্ব ছিল।

মোট কথা, সিংহের আসনে আসন গাড়ল পাতি শেয়াল। বাজপাখীর বাসায় বাসা বাঁধল কুৎসিত কাক। চোর, ডাকাত, লুটেরারা হয়ে গেল আদালত ও প্রশাসনের মালিক। প্রতারক, ধোকাবাজ ও বাটপারেরা গভর্ণর হয়ে গেল এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের। যদিও সে সব রাজ্যের সীমানা অনেক ক্ষেত্রে রাজধানী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, তবু তার শাসকরা নিজেদের আমীর, সুলতান, বাদশাহ এবং খলিফাতুল মুসলেমীন উপাধিতে ভূষিত করতো। তারা জরির কাজ করা রেশমী পোশাক পড়তো, মাথায় দিত মণি-মুক্তা খচিত শাহী তাজ। আর নিজেদের নামের সাথে জুড়ে দিত নানা রকম উপাধি।

ডাকাতি ও লুটের টাকায় কেনা দামী দামী উপহার তারা বড় বড় কবি ও আলেমদের ঘরে পৌঁছে দিত। তাই পেয়ে ওরা বিড়ালকে জনগণের সামনে তুলে ধরতো বাঘ হিসাবে। তাদের প্রশস্তি গেয়ে কবিতা লিখে বা ফতোয়া দিয়ে ঘরে ফিরতো সোনার মোহর নিয়ে।

কোন জাতি যখন বেঁচে থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তখন অপসাহিত্য ও অপসংস্কৃতি আফিমের নেশার মত জাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাই এসব শাসকদের দরবারে জ্ঞানীগুণী লোকদের পরিবর্তে জায়গা পেল চাটুকার, কবি, গায়ক ও ভাঁড়রা।

যে কবিরা একদিন তাদের কবিতা দিয়ে জাতিকে শোনাতো জাগরণী মন্ত্র, আশা আর উদ্দীপনার প্রাণ বন্যায় মাতিয়ে তুলতো যুব শক্তিকে, অগ্রগতির নকীব হয়ে ঘুরে বেড়াতো জনপদ থেকে জনপদে, তারাই যখন মেতে উঠল অযোগ্য শাসকদের প্রশংসা-গানে, তখন আর আশার কিছু রইল না সেখানে। কবিরা জাতির বিবেক না হয়ে নিজেদের বিবেক যদি বিকিয়ে দেয় অন্যের কাছে, তখন সে জাতিকে ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে

আসার জন্য ডাক দেয়ার আর কেউ থাকে না।

স্পেনে তখন যে আমীরের সৈন্য সংখ্যা আংগুলে গোণা যেতো তাকেও তার দরবারী কবি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম বিজয়ী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করতো। যে আমীর অর্থাভাবে পূর্ব পুরুষদের বিশাল প্রাসাদগুলো মেরামত করতে পারতো না, তাকেও তারা বানিয়ে দিতো আকাশচুম্বী দৌলতের মালিক। কবিতা লিখে পুরস্কারের আশায় নিজের আমীরের প্রশংসার সাথে সাথে অন্য আমীরের নিন্দায়ও এসব কবিরা ছিল ওস্তাদ। আর এসব শুনে সে আমীর মনে করতো, দুনিয়ায় তার মত মর্যাদাবান আর কেউ নেই।

কর্ডোভা, সেভিল ও গ্রানাডার অস্ত্র তৈরীর কারখানাগুলোতে অস্ত্রের পরিবর্তে তৈরী হতে শুরু হল বাদ্যযন্ত্র। শহরের যে সব স্থানে এক সময় জনসাধারণ সৈনিকদের তীরন্দাজী ও বর্শা নিক্ষেপের মহড়া উপভোগ করতো, এখন সেখানে শুনতে যায় কবিতা ও গানের জলসা। মদ্রাসাগুলোতেও জ্ঞান চর্চা ও দ্বীনি এলেমের পরিবর্তে চর্চা হতে শুরু করে বেহুদা কালামের।

জনসাধারণ সবসময় শাসকদের অনুকরণ করে। কর্ডোভার আমীররা যখন কাব্য ও সঙ্গীত চর্চায় মেতে উঠল তখন কৃষক, জেলে, মালী, ধোপা সবাই অশ্লীল কবিতা ও গানের চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে গেল। ইসাবেলার শাহী প্রাসাদে প্রমোদ আসর শুরু হলে তার প্রভাব পড়ল দিনমজুরের জীর্ণ কুটিরে।

ধ্বংস ও বিপদের সর্বগ্রাসী আগুন যখন তাদের মাথার ওপরে দাউ দাউ করে জ্বলছে, তখনও তারা গান বাজনার প্রেমেই বিভোর হয়ে রইল।

২.

উত্তর-কর্ডোভার শাসনকর্তা প্রথম ফার্ডিনাণ্ড এ অরাজকতার সুযোগ নিয়ে বেশ কটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য নিজের রাজ্যভুক্ত করে নিল। প্রথমে আত্মকলহে লিপ্ত কোন এক পক্ষকে সমর্থন করে সে সেই এলাকায় প্রবেশ করতো, পরে সুযোগ বুঝে তা দখল করে নিত। কোথাও আবার মোটা অংকের খাজনা ধার্য করে অনুগত কোন মুসলিম উপদলকে সে এলাকা শাসনের দায়িত্ব নিয়োজিত করতো। এ ধরনের শাসকরা ফার্ডিনাণ্ডকে মনে করতো নিজেদের ত্রাণকর্তা। তাই ফার্ডিনাণ্ডকে খুশি করার জন্য তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে ট্যাক্সের পরিমান নিজেরাই বাড়িয়ে দিত।

পারস্পরিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার এ যুগে সেভিলের শাসক মুতাজাদ বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কুটনীতি ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সে আশপাশের বেশ কিছু ক্ষুদ্র রাজ্য আপন রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। প্রতারণার ফাঁদে পড়ে জনসাধারণ তাকে স্পেনের ত্রাণকর্তা মনে করতে শুরু করলেও শীঘ্রই তাঁর নিষ্ঠুরতায় তাদের মোহমুক্তি ঘটে।

মুতাজাদ ছিল চরিত্রহীন, অহংকারী, জালিম ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির শাসক। জোচ্চোরি ও মাতলামীতে স্পেনের অন্যান্য শাসকদের চেয়ে সে অনেক অগ্রসর ছিল, কিন্তু কবিদেরকে সে খুবই ভক্তি করতো।

সে ছিল সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। বিলাসী জীবন যাপন সত্ত্বেও সে পরিশ্রম করতে পারতো। পরাজিত শত্রুকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করে সে তৃপ্তি পেতো। শত্রুর মাথার খুলিতে ফুলের চারা লাগিয়ে সেই চারাগাছ দিয়ে সে তার প্রাসাদের আঙ্গিনা সাজাতো। অনেক আমীর ওমরার মাথার খুলি সে শাহী প্রাসাদের এক কামরায় সাজিয়ে রেখেছিল। সামান্য অপরাধে আপন পুত্র ইসমাঈলকে নিজের হাতে জবাই করে তাঁর খুলিও সে সাজিয়ে রেখেছিল সেই কামরায়, এমনি নিষ্ঠুর ছিল সে।

মুতাজাদ গ্রানাডার ক্ষুদ্র শাসক বাদিউসের কয়েকটি শহর দখল করে নিলে বাদিউস পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শাসকদের নিয়ে মুতাজাদকে হত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু এক আমীরের কারণে তাদের চেষ্টা বিফল হয়, মুতাজাদ কোনরকমে প্রাণে বেঁচে যায়।

এ ঘটনার কয়েকদিন পর। মুতাজাদ তার রাজধানী সেভিলে সেই সব রাজ্যের শাসকদেরকে এক ভোজসভার দাওয়াত দিল। খাওয়ার আগে মেহমানরা সব শাহী হাম্মামখানায় ঢুকল হাত মুখ ধুয়ে নিতে। ধূর্ত মুতাজাদ মুচকি হেসে বাইরে থেকে হাম্মামখানার সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিল। সাথে সাথে হাম্মামে বাতাস প্রবেশের সব রাস্তাও বন্ধ করে দেয়া হলো। ফলে, এক সময় মেহমানরা হাম্মামখানার ভেতরই ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

এ ঘটনার পর মুতাজাদ গ্রানাডা ও তার আশপাশের রাজ্যগুলোর প্রচণ্ড ঘৃণা ও তীব্র শত্রুতার শিকার হয়। ফলে, প্রতিবেশীদের বিরোধিতার কারণে কয়েকবার কর্ডোভা আক্রমণ করেও বিফল হলো সে। মুতাজাদের আগ্রাসী আচরণে ভীত হয়ে খণ্ড রাজ্যের রাজারা কর্ডোভার খৃস্টান শাসক ফার্ডিনাণ্ডের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাকে রীতিমত খাজনা দিতে শুরু করে।

৪৪৭ হিজরীতে ফার্ডিনাণ্ড তার মুখোশ খুলে আসল চেহারা বের করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম শাসকদের সাথে কৃত মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করে সে ওদের কাছ থেকে কয়েকটি শহর ছিনিয়ে নেয়। ৪৪৯ হিজরীতে সারাগোসা এলাকারও কিছু অংশ সে নিজের দখলে নিতে সমর্থ হয়।

স্পেনে সেভিলের পর টলেডোই ছিল সব চাইতে শক্তিশালী রাজ্য। কয়েকদিন পর ফার্ডিনাণ্ড তারও কিছু অংশ দখল করে নেয়। টলেডোর আমীর মামুন জান্নুন ফার্ডিনাণ্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করে সুবিধা করতে না পেরে তাকে নিয়মিত খাজনা দেয়ার শর্তে সিংহাসন রক্ষা করে। দেখাদেখি সারাগোসার আমীরও ফার্ডিনাণ্ডের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এবার আসে সেভিলের পালা।

সেভিলের জনগণের ধারনা ছিল, মুতাজাদ ফার্ডিনাণ্ডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবে।

কিন্তু জনগণের আশার গুড়ে বালি দিয়ে মুতাজাদও তাকে খাজনা দিতে সম্মত হয়ে যায়। মুতাজাদের এ দুর্বলতায় জনসাধারণ খুবই নিরাশ হয়। তারা মুতাজাদের সকল জুলুম শুধু এই আশায় বরদাশত করে আসছিল যে, সে মুসলমানদের পরমশত্রু ফার্ডিনাণ্ডের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু মুতাজাদ খৃষ্টানদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়ায় সকলে একই ভাবনায় অস্থির হলো, 'এখন আমাদের কি হবে?'

৪৫৮ হিজরীতে ফার্ডিনাণ্ড মারা যায়। প্রথম ফার্ডিনাণ্ডের মৃত্যুর পর ষষ্ঠ আলফানসু ক্ষমতারোহণ করে। এদিকে মুতাজাদের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুতামিদ বিল্লাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসে।

ষষ্ঠ আলফানসু ক্ষমতারোহণ করেই খৃষ্টানদের বিজয় পতাকা জিব্রাল্টার পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার শপথ গ্রহণ করল। এ জন্য সে উত্তর স্পেনে অবস্থিত খৃষ্টানদের ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে এক পতাকাতলে সমবেত করল।

কর্ডোভার সাথে লিউন, জালাকা ও আন-নাওয়ারের অন্তর্ভুক্তির ফলে আলফানসুর ক্ষমতা বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। সে এবার ইসলামী স্পেনের দিকে মনযোগী হয় এবং ফার্ডিনাণ্ডের নীতি অনুসরণ করে একের পর এক খণ্ড রাজ্য গ্রাসে মেতে ওঠে। আলফানসুর রাজ্যের পরিধি যত বাড়তে থাকে, ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যগুলোর সীমানা ততই ছোট হয়ে আসতে থাকে।

একদিকে আলফানসু তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী মুসলিম শাসকদের পিঠে হাত বুলাতো আর দুর্বল শাসকদের ধমক দিয়ে দখল করে নিত তার রাজ্য। এরপর অন্য এক জনের সাথে বন্ধুত্ব করে আরেকজনকে বাধ্য করতো তার দাবী মেনে নিতে। এ সব দেখেশুনে কারো আর সন্দেহ রইল না যে, আলফানসু স্পেনে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য চরম আঘাত হানার জন্য তৈরী হচ্ছে।

আলফানসুর ক্রমবর্ধমান খাজনার চাহিদা মিটানোর জন্য গরীব মুসলমানদের ওপর করের বোঝা বাড়িয়ে দিল শাসকরা। অসহায় জনগণ তাদের আয়ের বৃহত্তর অংশ অযোগ্য শাসকদের হাতে তুলে দিতো উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে। উৎকট এক পেরেশানীর মধ্য দিয়ে কাটছিল তাদের সময়। মোটা অংকের শুল্ক পরিশোধের ফলে স্পেনের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল। অসহনীয় এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য জনগণ খুঁজে বেড়াচ্ছিল এমন একজন ত্রাণকর্তা, যিনি এ অশুভ শক্তির মোকাবিলা করে তাদের নাজাতের পথ দেখাতে পারবেন।

৩

সেভিলের আমীর মুতামিদ বিল্লাহ ছিল নামকরা কবি। কিন্তু দুর্ভাগা জাতি তাঁকেই ধরে শাসকের গদিতে বসিয়ে দেয়। মুতামিদের উজির-নাজির, সেনাপতি কোতোয়াল,

বেগম-বাদী, চাকর-নফর সবাই কবি হিসাবে কম-বেশী খ্যাতিমান ছিল।

এ ক্ষেত্রে ইবনে আম্মারের কথাও স্মরণ করতে হয়। কবি হলেও সে ছিল খুবই গরীব। কয়েক বছর আগে মুতাজাদ শালব জয় করার জন্য এক সেনাবাহিনী পাঠায়। এ বাহিনীর সেনাপতি ছিল মুতাজাদের তরুণ পুত্র মুতামিদ। শালব অবরোধ করার সময় ইবনে আম্মারের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। মুতামিদের প্রশংসা করে লেখা ইবনে আম্মারের কবিতা শুনে মুতামিদ খুবই খুশি হয়। শালব জয় করার পর মুতামিদ সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ইবনে আম্মারকে তার উপদেষ্টা নিয়োগ করে। মুতামিদ একজন স্বভাব কবি হলেও সৈনিক সুলভ গুণেরও অধিকারী ছিল সে। যৌবনের শুরুতেই যদি বন্ধু হিসাবে কিছু ভাল লোকের সংগ পেতো তাহলে তাঁর হাতেই স্পেনের ভাগ্য ফিরে যেতে পারতো। কিন্তু ইবনে আম্মারের সংগীরা তাঁকে চরম ভোগ বিলাসী বানিয়ে দেয়।

মুতামিদ শালবে যে বিলাসবহুল জীবন যাপন করেছিল তার কিছুটা উল্লেখ পাওয়া যায় ইবনে আম্মারের কবিতায়।

মুতাজাদের মৃত্যুর পর মুতামিদ রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করে। বাদশাহ হওয়ার পর মুতামিদ ইবনে আম্মারের আবেদনক্রমে তাকে শালবের গভর্নর নিয়োগ করে। এ শহরেই একদিন ইবনে আম্মার দিন মজুরী করতো। কবিতা চর্চার জন্য শহরের লোকেরা তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। আজ এ শহরেই সে শাহী ফরমান নিয়ে গভর্নর হয়ে বসল।

একসময় ইবনে আম্মার শালবের বড় বড় ব্যবসায়ীদের প্রশংসা করে কবিতা লিখে পয়সা উপার্জন করতো। গভর্নর হয়ে ইবনে আম্মার একজন ব্যবসায়ীকে এক থলে রৌপ্য মুদ্রা উপহার পাঠিয়ে বলল, "কয়েক বছর আগে একটি কবিতার জন্য তুমি আমাকে এক বস্তা যব দিয়েছিলে, যবের পরিবর্তে সেদিন যদি গমের বস্তা দিতে তাহলে আজ রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তোমাকে স্বর্ণ মুদ্রা উপহার পাঠাতাম।"

ইবনে আম্মার ছিল আরেক ভোগবাদী এক লোক। নাচ-গান, শরাব-কাবাব ও খানাপিনাতেই বিপুল সরকারী অর্থ অপচয় করতো সে।

মুতামিদের মনোরঞ্জনের জন্য সেভিলে কবির অভাব ছিল না। কিন্তু মুতামিদ ইবনে আম্মারের বিচ্ছেদ সইতে পারছিল না। তাই কিছুদিন পর সে ইবনে আম্মারকে সেভিলে ডেকে এনে রাজ্যের উজির পদে নিয়োগ করল।

মুতামিদের দরবারে ঢুকার প্রথম ও শেষ শর্ত ছিল শিল্প চর্চা। তাই রাজ্যের সকল উচ্চ সরকারী পদ কবি ও শিল্পীদের দখলে ছিল। কর্ডোভায় যে সময় ইসলামের দুশমনরা তরবারিতে শান দিচ্ছিল, সে সময় সেভিলের বাদশাহ ও আমীর ওমরারা ঘন্টার পর ঘন্টা নাচ, গান ও কাব্য চর্চা করে কাটিয়ে দিচ্ছিল। যখন লিউন ও আন-নাওয়ারের গীর্জাগুলোতে ক্রুশের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা হচ্ছিল, সে সময় সেভিলের শাহী মহলে পূর্ণ উদ্যমে চলছিল নাচ-গান ও শরাবের জমজমাট মজলিশ।

শাহ্রবের গভর্নর থাকাকালে মুতামিদ ইবনে আম্মারকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য সেভিলে এসেছিল। এক সন্ধ্যায় তারা ছদ্মবেশে নদী তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের গায়ে পরশ বুলাচ্ছে মৃদুমন্দ হাওয়া। নদীতে ছোট ছোট ঢেউ নাচানাচি করছে। সেদিকে তাকিয়ে মুতামিদ বলে উঠল,

'উপচে পড়া ঢেউগুলো সব করছে কানাকানি

সোহাগ ভরে প্রেমের খেলা খেলছে নদীর পানি।

উদাস রাজা ঘুরে বেড়ায় কোথায় যে তার রাণী...'

এর পরের চরণটি কি হবে তা নিয়ে দুই কবি যখন আলোচনায় মত্ত সে সময় পেছন থেকে ভেসে এলো নারী কণ্ঠের উচ্ছল হাসি। এক চঞ্চলা সুন্দরী হংসীর গতিতে এগিয়ে এসে চোখের তারা নাচিয়ে মন মাতানো সুরে বলে উঠল, 'কেউ না জানুক সেই কথাটি এই অভাগী জানি।'

মুতামিদ যুবতীর কবিত্ব শক্তির কথা ভুলে তার অনিন্দ্য সুন্দর চেহারার দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যুবতী উভয়কে নয়ন বাণে বিদ্ধ করে হাসতে হাসতে চলে গেল সেখান থেকে। মুতামিদ অনেকক্ষণ বাক্যহারা হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ইবনে আম্মার চোখের ইশারায় একজন ভৃত্যকে এ নারীর সন্ধান নিতে পাঠিয়ে দিল।

পর দিন। শাহজাদার ইচ্ছায় একজন খোজা ভৃত্য সে সুন্দরীকে শাহী মহলে পৌঁছে দিল। মুতামিদ জিজ্ঞেস করল, 'সুন্দরী, তোমার পরিচয় কি?'

'আলীজাহ, আমি রামিকার দাসী।'

'তোমার নাম?'

'ইতিমাদ। তবে রামিকার দাসী হওয়ায় লোকে রেমিকা বলে ডাকে।'

মুতামিদ মনে মনে কয়েকবার ইতিমাদ ও রেমিকা শব্দ দু'টি আবৃত্তি করে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি বিবাহিতা?'

'আমি একজন দাসী মাত্র, আলীজাহ।' করুণ কণ্ঠে জবাব দিল সে।

'না, না, তুমি তো রাজরাণী। যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে সেভিলের শাহজাদা তোমাকে আপন করে পেতে চায়।'

রেমিকা নিজের আবেগ দমন করে বলল, 'আলীজাহ, আপনি কি ঠাট্টা করছেন!'

মুতামিদ বলল, 'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও রেমিকা, তুমি কি আমার জীবন সঙ্গিনী হতে রাজী?'

রেমিকা চোখের আনন্দাশ্রু সামলে নিয়ে কোন রকমে বলল, 'আমি আপনার দাসী হতে পারলেও নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করবো। কিন্তু আমি তো রামিকের দাসী! কি করে আমি শাহী মহলে প্রবেশ করবো?'

'সে ব্যবস্থা আমি করবো, তাহলে তো তোমার কোন আপত্তি নেই?'

রেমিকা মিষ্টি করে হাসল। বলল, 'শাহজাদার হৃদয় দুয়ার যদি খোলা থাকে তাহলে আশা করি তিনি তার সব প্রশ্নেরই জবাব পেয়ে গেছেন।'

রেমিকার সাথে বিয়ে হয়ে যাবার পর মুতামিদের প্রতিটি সকাল ও সন্ধ্যা হয়ে উঠল আনন্দময়। রেমিকা কেবল অনিন্দ্য সুন্দরীই নয়, তার সুরেলা কণ্ঠ, বুদ্ধির দীপ্তি, অন্তরের উষ্ণতা, স্পর্শের কোমলতা সব কিছুই মুতামিদকে আচ্ছন্ন করে নিল। রেমিকার প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করাই এখন মুতামিদের প্রধান কাজ। মুতামিদ সিংহাসনে আরোহণ করার পর রেমিকার প্রতিটি ইঙ্গিতই শাহী ফরমান বলে গণ্য হতো।

একদিকে মুতামিদের কবি স্বভাব, তার ওপর ইবনে আম্মারের মত দুশ্চরিত্র বন্ধু এবং রেমিকার মত বিলাসী নারীর সান্নিধ্য মুতামিদের জীবনকে আর কখনো সঠিক পথে চলতে দেয়নি।

কর্ডোভা, টলেডো ও সেভিল

কর্ডোভার বিশাল সাম্রাজ্য একসময় ভূমধ্যসাগর থেকে পিরেনিজ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখছি তখন এ রাজ্যের আয়তন ছিল স্পেনের একটি জেলার সমান। কিন্তু এ পতনোন্মুখ যুগেও উমাইয়া বংশের এ রাজধানীকেই সৌন্দর্যের রাণী বলা হতো। খণ্ড রাজ্যের শাসকদের প্রত্যেকেরই লোলুপ দৃষ্টি ছিল মুসলিম শাসিত খণ্ড রাজ্য কর্ডোভার দিকে।

সেভিলের বাদশাহ মুতামিদ ও টলেডোর বাদশাহ মামুন জান্নুন অন্যান্য খণ্ড রাজাদের তুলনায় শক্তিশালী ছিল। তারা উভয়েই নিজেদেরকে স্পেনের সম্রাটতুল্য মনে করতো এবং ভাবতো কর্ডোভা দখল করার অধিকার একমাত্র তারই আছে। এর ফলে, মুসলিম শাসিত কর্ডোভার এক পাশে মুতামিদ ও অন্য পাশে মামুন জান্নুন সৈন্য সমাবেশ করল। অবরোধ করার পর প্রথম যে প্রশ্নটি তাদের বিব্রত করল, তাহল, কে প্রথম আক্রমণ করবে?

মুতামিদ ভাবল, সে যদি প্রথম আক্রমণ করে তাহলে মামুন জান্নুন কর্ডোভাবাসীর পক্ষ নিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়তে পারে। একই চিন্তা করছিল মামুন জান্নুনও।

এদিকে সিংহাসনের নিত্যনতুন দাবীদারদের ঝগড়া-বিবাদে বিরক্ত হয়ে কর্ডোভার অধিকাংশ উলামা ও জনসাধারণ একমত হয়ে বয়োবৃদ্ধ রাজনীতিক ইবনে জহুরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিল। ইবনে জহুর ওলামাদের নিয়ে গঠিত মজলিশে শুরার মাধ্যমে রাজ্যের শাসন কাজ চালাতে লাগল। কিন্তু ইবনে জহুরের পুত্র আবদুল মালিক পিতাকে উৎখাত করে দেশের শাসনভার গ্রহণ করলে রাজ্যের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য খতম হয়ে গেল এবং মজলিশে শুরা একটি 'জি-হুজুর' প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল।

ইতাবসরে মামুন জানুন কর্ডোভার খৃষ্টান শাসনকর্তা আলফানসুর সাথে এই শর্তে এক চুক্তি সম্পাদন করল যে, কর্ডোভা আক্রমণের সময় যদি মুতামিদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয় তাহলে আলফানসু তাকে সাহায্য করবে।

ইবনে জহুরের সরকার জনগণের সমর্থনপুষ্ট থাকায় আলফানসুর নিশ্চয়তা সত্ত্বেও মামুন কর্ডোভা আক্রমণ করার সাহস করে উঠতে পারল না। কিন্তু যখন সে জানতে পারল, শাসন ক্ষমতা আবদুল মালিক দখল করে নিয়েছে এবং জনসাধারণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছে, তখন কাল বিলম্ব না করে সে কর্ডোভা আক্রমণ করে বসল। মুতামিদের কাছে এ পদক্ষেপ অসহনীয় মনে হলেও কোন সামরিক অভিযান না চালিয়ে সে পরিস্থিতি কোন দিকে যায় দেখতে লাগল।

কর্ডোভাবাসী খৃষ্টান আলফানসুর অনুগত টলেডোর শাসনকর্তার গোলামী কবুল করে নিতে কিছুতেই রাজী ছিল না। তাই যে সব লোক আবদুল মালিকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল তারাও তার পতাকাতলে সমবেত হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

জীবনে এই প্রথম কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করার সুযোগ পেল আবদুল মুনীম। কর্ডোভার জনসাধারণের খুবই প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব ছিল আবদুল মুনীম। কর্ডোভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে সে বাদশাহ আবদুল মালিকের সাথে দেখা করল। সাক্ষাতের পর শাহী মহলের সদর দরজায় সমবেত জনতাকে আবদুল মুনীম এ সুখবর জানাল, যুদ্ধে জনগণের সহযোগিতা পাওয়ার আশায় আবদুল মালিক প্রতিনিধি দলের দাবী মেনে নিয়েছেন। যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত মজলিশে শুরার পরামর্শ ক্রমে যোগ্য ও নির্ভরশীল ব্যক্তির হাতে সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পন, অযোগ্য ও দায়িত্বহীন সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত এবং যুদ্ধ শেষে কর্ডোভার ওলামা ও মুরুব্বীদের নিয়ে গঠিত মজলিশে শুরার বৈঠক আহবান করবেন তিনি। মজলিশে শুরার সিদ্ধান্ত মোতাবেকই আবদুল মালিক ভবিষ্যতে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

কর্ডোভার অলিতে-গলিতে, মাদ্রাসায়, মসজিদে সর্বত্র এ খবর ছড়িয়ে পড়ল। ফলে জনগণ চারদিক থেকে 'কর্ডোভা আমাদের' আওয়াজ তুলে রাস্তায় বেরিয়ে এল। জনতার স্বতঃস্ফুর্ত মিছিলে মিছিলে সারা শহর সরগরম হয়ে উঠল।

কর্ডোভা সীমান্তে মামুনের আক্রমণের খবর ছড়িয়ে পড়লে কর্ডোভার জামে মসজিদে সমবেত হল জনগণ। আবদুল মুনীম সমবেত বিপুল জনতাকে লক্ষ্য করে জ্বালাময়ী এক ভাষণ দিল।

'আমার মুসলমান ভাইয়েরা!

এই সেই মসজিদ, যেখানে আমাদের পূর্ব পুরুষরা একদিন সমবেত হতেন আব্দুর রহমান আল হাকাম ও আল মনসুরের মত বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে জিহাদের আহবান শুনার জন্য। এই মসজিদে আল্লাহর সেই সব নেক বান্দাদের সিজদার চিহ্ন রয়েছে, যাদের পায়ের তলায় দাম্ভিক খৃষ্টান রাজাদের মাথার মুকুট গড়াগড়ি যেতো। অথচ

আজ ধ্বংসের তুফান আমাদের দরজায় এসে আঘাত হানছে। এ তুফান রুখতে হবে।

আজ আমরা কোন কাফেরের আস্তানায় হামলা করতে যাচ্ছি না, বরং দুশমনদের ছোবল থেকে আমাদের আজাদী ও অস্তিত্ব টিকেয়ে রাখার জন্যই আজ আমাদেরকে অস্ত্র হাতে নিতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, টলেডোর মামুন জান্নুন কর্ডোভার দিকে সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছে। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন, মামুন ও অন্যান্য খণ্ড রাজ্যের রাজাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মামুন কর্ডোভা দখল করলে সিংহাসন হারাবে আবদুল মালিক, তাতে জনগণের কি আসে যায়?

কর্ডোভার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা আমার! আমার কথাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আবদুল মালিকের মত শাসকের জন্ম হয়েছে আপনাদের উদাসীনতা ও নেতাদের স্বার্থপরতার কারণে। কিন্তু মামুন আসছে ইসলামের ঘোরতর দুশমনদের ক্রীড়নক হয়ে। তার আগমনের পর টলেডো ও কর্ডোভার মধ্যে যে সড়ক তৈরী হবে, সেই সড়ক ধরে ছুটে আসবে আমাদের দ্বীন ও ঈমানের দুশমন খৃষ্টানরা। ওরা আসবে আপনাদের গলা টিপে হত্যা করতে। মামুন আমাদের জন্য আলফানসুর গোলামীর জিঞ্জির নিয়ে আসছে। মামুনকে কর্ডোভায় ঝাণ্ডা উড়ানোর সুযোগ দিলে সে এই মসজিদের চূড়ায়ও পকেট থেকে ক্রুশের ঝাণ্ডা বের করে উড়িয়ে দিতে দ্বিধা করবে না। আজ জোহরা প্রাসাদে ক্ষমতার যে সব আসন শূন্য হবে তা মামুন ও তার স্বার্থপর আমীরদের পরিবর্তে আলফানসু ও তার সৈন্যদের দখলে যাবে। মামুনের সামনে যে সব গর্দান নত হবে সে সব গর্দানের ওপর ঝিলিক মারবে আলফানসুর তরবারি।

আমাদের যে সব জনবসতি ও শহর মামুনের দখলে যাবে, অচিরেই তা পরিণত হবে আলফানসুর রাজ্যে। যে সব হাত মামুনের গোলামীর শিকল পরতে রাজী হবে, তারা কিছু বুঝে উঠার আগেই আলফানসুর তরবারির ধার পরীক্ষা করা হবে তাদেরই ওপর। মামুনের হাতে বায়াত গ্রহণের জন্য যারা এ মসজিদে সমবেত হবে, দুদিন পর এ মিম্বর থেকেই আলফানসুর শাহী ফরমান শুনতে পাবে তারা।

মুসলমান ভাইয়েরা আমার!

আমি মামুনের অগ্রযাত্রা রুখতে চাই আবদুল মালিকের শাসনে সন্তুষ্ট হয়ে নয়, বরং এ ছাড়া আমাদের জান, মাল, ইজ্জত, আবরু হেফাজতের আর কোন পথ নেই দেখে। যদি এ যুদ্ধ কেবল দুই রাজার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা থাকতো না আমার। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মামুন আমাদের জন্য এক ভয়ংকর ভবিষ্যত নিয়ে আসছে। সে আমাদেরকে এমন এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছে, যেখান থেকে আর কোন দিন উঠে আসা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে।

শত অনাচারের পরও যে শহরে আযান দিয়ে নামাজ পড়ার সুযোগ পেয়েছি আমরা, যে শহরকে ইসলামের শেষ রক্ষাকেন্দ্র হিসাবে টিকিয়ে রাখতে চাই, সে শহর খৃষ্টানদের সাম্রাজ্য পাহারা দেয়ার ঘাটিতে পরিণত হবে, এটা কিছুতেই আমি বরদাশত করতে পারি

না। আবদুল মালিকের সিংহাসন টিকিয়ে রাখার জন্য নয়– বরং নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে চাই আমি।

আমার ভাই ও বন্ধুরা!

এতদিন তোমরা দেখেছো স্পেনের কলঙ্ক, খণ্ড রাজ্যের শাসকদের তলোয়ারের মামুলি ঝিলিক, কিন্তু আজ তোমরা দেখতে পাবে মামুনের হাতে সেই শাণিত তরবারি যার বাঁট রয়েছে আলফানসুর হাতে। দ্বীন ও ঈমান নিয়ে যারা বেঁচে থাকতে চায়, আজো যারা মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করার স্বপ্ন দেখে, তেমন প্রতিটি মানুষ হবে তাদের এ তরবারির শিকার।

মামুন তার নিজের রাজ্যের অংশবিশেষ ভেট দিয়ে আলফানসুর বন্ধুত্ব অর্জন করেছে। যে মানুষ নিজের রাজ্য আলফানসুর হাতে তুলে দিতে পারে, মুসলমানদের সেই জাতশত্রুর হাতে কর্ডোভা তুলে দিতে তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। আপনারা কি জানেন ওসব এলাকার মুসলমানদের এখন কি অবস্থা? খৃষ্টানরা তাদেরকে ছাগল-ভেড়ার মতই খেদিয়ে বেড়াচ্ছে। আপনাদেরকেও যে মামুন একই ভাবে খৃষ্টানদের হাতে বিক্রী করে দেবে না তার নিশ্চয়তা কি? তার এ অসৎ উদ্দেশ্য সফল হলে, সেটা হবে আলফানসুরই সাফল্য। আর আমার বিশ্বাস, আলফানসুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনাদের মনে কোন ভুল ধারণা নেই। মনে রাখবেন, আমরা যদি শত্রুকে কর্ডোভার সীমান্তের বাইরে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হই, তাহলে সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন স্পেনের মুসলমানদেরকে ধরে ধরে ভূমধ্যসাগরে নিক্ষেপ করা হবে। আমাদের পেছনে তাড়া করবে একদল নেকড়ে আর সামনে থাকবে অথৈ সমুদ্রের অগণিত ঢেউ। আপনারা যদি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত না নেন, তাহলে আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমরা এই মহা বিপদকে অবশ্যই প্রতিরোধ করতে পারবো। আল্লাহর অসীম দয়ায় আজও কর্ডোভায় এমন সব মুজাহিদ রয়েছে, যাদের সাহস ও বীরত্ব যে কোন ভয়ংকর তুফানের গতিরোধ করার হিম্মত রাখে।

মামুন ও তার খৃষ্টান বন্ধুদের প্রতিহত করার জন্য মাত্র পঞ্চাশ হাজার মুজাহিদই যথেষ্ট। কর্ডোভার জনগণ একবার ময়দানে নেমে এলে গোটা স্পেনের মুজাহিদরা তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। আর আমরা যদি একবার রুখে দাঁড়াতে পারি, তাহলে আমরা যে শুধু কর্ডোভাকেই রক্ষা করতে পারব তাই নয় বরং গোটা স্পেনের মুসলমানদেরকে ঐ সব খণ্ড রাজ্যের শাসকদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারব, যাদের অস্তিত্ব স্পেনের মুসলমানদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারের পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। স্পেনকে খণ্ড খণ্ড করার অর্থ হল মুসলিম মিল্লাতকে টুকরো টুকরো করা। যারা মুসলমান হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চান এবং কর্ডোভায় ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখতে চান অস্তিত্বের এ লড়াইয়ে তারা ঝাপিয়ে পড়বেন এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কেউ যদি এ লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন বা এর বিরোধিতা করেন তাহলে তাদেরকে আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই, যুগে যুগে গাদ্দারদের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে সে

ধরনের আচরণ করতে আমরা মোটেই দ্বিধা করবো না।

মর্দে মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার!

এটা বক্তৃতার সময় নয়, এখন সময় হচ্ছে পরিখা খনন করার, সময় হচ্ছে মর্চে পড়া অস্ত্রগুলোতে আবার ধার দেয়ার, সময় হচ্ছে জায়গায় জায়গায় সামরিক ঘাঁটি তৈরী করার। আপনারা জানেন, দুশমন কর্ডোভা থেকে খুব একটা দূরে নয়। এ অবস্থায় আমি শুধু আপনাদের কাছ থেকে একটি কথাই জানতে চাই– অস্তিত্বের এ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে আপনারা প্রস্তুত আছেন কি না?'

সমবেত শ্রোতারা আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে শ্লোগান দিল, 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার; আমরা সবাই খোদার সেনা, মিটিয়ে দেবো সকল হেনা; মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী, আমরা সবাই লড়তে রাজী।'

২

মুজাহিদ বাহিনীকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দিয়ে আবদুল মালিক তার নিয়মিত বাহিনী নিয়ে কর্ডোভার বাইরে গিয়ে মামুন জান্নুনকে চ্যালেঞ্জ করল। কয়েক দিন উভয় পক্ষের মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ হওয়ার পর মামুন বড় ধরনের হামলার প্রস্তুতি নিল। কয়েক বছর ধরে এ অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েই ময়দানে এসেছে সে। সংগে এনেছে বিপুল পরিমান অস্ত্রপাতি ও শক্তিশালী বাহিনী। এছাড়া আলফানসু ও তার প্রভাবাধীন উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টান শাসকদের সমর্থনও তার পক্ষে।

অবশেষে চুড়ান্ত আঘাত হেনে আবদুল মালিকের সৈন্যদের হটিয়ে মামুন কর্ডোভা শহরের পাঁচিলের কাছে এসে পৌঁছল। ততক্ষণে কর্ডোভার মুজাহিদ বাহিনীও প্রস্তুতি শেষ করে এনেছে। ওলামাদের চেষ্টায় বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক যুবক মুজাহিদ বাহিনীতে নাম লেখাল।

গোয়াদেল কুইভার নদীর এক পাশে মদীনাতুজ জোহরা, অন্য পাশে শহর। স্পেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সেভিলও এ নদীর তীরেই অবস্থিত। এ নদীর দরুণ কর্ডোভার পেছন দিক ছিল নিরাপদ এবং মদীনাতুজ জোহরা নদীর অপর পাড়ে থাকায় তা আরো অধিক সুরক্ষিত।

মামুনের সৈন্যবাহিনী তিন দিক থেকে শহর অবরোধ করল। কয়েক বারই তারা আক্রমণ চালিয়ে কর্ডোভার প্রবেশ পথের কাছাকাছি এসে মুজাহিদদের কঠোর প্রতিরোধের মুখে পেছনে হটে যেতে বাধ্য হল। দীর্ঘ অবরোধ ও মুজাহিদদের জবাবী হামলায় মামুন বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হলেও সে কর্ডোভার অবরোধ অব্যাহত রাখল এবং প্রতি মুহূর্তে আলফানসুর সাহায্যের আশা করল। কিন্তু তার এ আশা, আশা হয়েই রইল।

মামুনের বিজয় বা কর্ডোভার পরাজয়, কোন ব্যাপারেই আলফানসুর কোন আকর্ষণ ছিল না। তার শুধু আগ্রহ ভ্রাতিঘাতি যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়ায়। তাহলে কর্ডোভা ও টলেডো

পরস্পর লড়াই করে দুর্বল হয়ে পড়বে আর আলফানসু উভয় রাজ্যই বিনা বাধায় দখল করতে পারবে। তাই কর্ডোভা আক্রমণের জন্য মামুনকে উৎসাহ দিলেও মামুন যখন সেনাবাহিনী নিয়ে কর্ডোভার সদর ফটকে পৌছল, তখন আলফানসু চুক্তি মোতাবেক সৈন্য পাঠানোর কোনই গরজ অনুভব করল না। সে বরং দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে লাগল।

এদিকে সেভিলের দূরদর্শী শাসনকর্তা মুতামিদ বুঝতে পারল, আলফানসু মামুনের বন্ধু নয় বরং সে এই সুযোগে টলেডো দখল করতে চায়। সে মামুনের সামরিক শক্তি দুর্বল করার জন্যই তাকে কর্ডোভা আক্রমণের উষ্কানী দিয়েছে।

কর্ডোভার অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল, আলফানসুর পক্ষ থেকে মামুন কোন সাহায্যই পেল না। এক সময় মামুন উপলব্ধি করল, আলফানসু আসলে মামুনের পরাজয় দেখতে চায়– বিজয় নয়। এদিকে মুতামিদ পদে পদে মামুনের পরাজয় কামনা করছিল। গোয়েন্দা মারফত সে কর্ডোভার অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত খবরাদি পাচ্ছিল। বুঝতে পারল, মামুন আর বেশী দিন অবরোধ টিকিয়ে রাখতে পারবে না।

কিন্তু কর্ডোভার আভ্যন্তরীণ খবরে মুতামিদের উদ্বেগ বাড়ছিল। গোয়েন্দা মারফত সে জানতে পারল, কর্ডোভা ধীরে ধীরে স্পেনের সকল ওলামাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। ওলামাদের চেষ্টায় বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে যুবকরা এসে মুজাহিদ দলে নাম লেখাচ্ছে। বিশিষ্ট আলেমরা কর্ডোভাকে কেন্দ্র করে সমগ্র স্পেনে ইসলামী শাসন প্রবর্তনের আন্দোলন শুরু করেছে এবং তা ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। আলেমরা জনসাধারণকে খণ্ড রাজ্যের শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করছে। তারা সাধারণ মুসলমানকে বুঝাচ্ছে, এ সব শাসকরাই তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে মুসলমানদের ইজ্জত ও আজাদী বরবাদ করে দিচ্ছে। ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ইসলামী হুকুমত নেই বলেই খৃষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথা তোলার সুযোগ পাচ্ছে।

মুতামিদ গোয়েন্দা মারফত আরো খবর পেলো, বাসলিউসের আমীর উমরুল মুতাওয়াক্কিল কর্ডোভার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। আলেমদের আন্দোলনের প্রতিও তার সমর্থন রয়েছে। মুতামিদ বুঝতে পারল, অচিরেই মামুন পরাজিত হতে যাচ্ছে এবং তার পরাজয়ের পর আলেমদের শক্তি আরো বেড়ে যাবে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও উৎসাহে এরপর তারা খণ্ড রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে ছুটে আসবে। মানুষের মধ্যে যে ঈমানী চেতনা ও জযবা সৃষ্টি হয়েছে তাতে তাদের প্রতিরোধ করার সাধ্য অনেক খণ্ড রাজ্যেরই থাকবে না। এমনকি যুদ্ধের পর আবদুল মালিকও আলেমদের ইঙ্গিতেই উঠা বসা করবে। কারণ, তাদের কথা মত না চললে মজলিশে শুরা তাঁকে কান ধরে গদী থেকে নামিয়ে দেবে।

মুতামিদ বুঝতে পারল, কর্ডোভা বিজয়ের যে স্বপ্ন সে এতদিন দেখেছে তা সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, বরং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন সেভিলেও আঘাত হানবে এবং তা মুতামিদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মুতামিদ নিজে, তার সভাসদ কবিবৃন্দ, উজীর, ওমরা এবং বেগম, বাদী কেউ চাইতো না, ইসলামের সমর্থকরা তাদের সুখের প্রাসাদে প্রবেশ করুক। কারণ তাদের ভয় ছিল, ইসলামী আন্দোলনের এ সব মুজাহিদরা তাদের বিলাস-ব্যসন ও নাচ-গানের সকল আসর বন্ধ করে দেবে। তারা কর্ডোভা ও মদিনাতুজ জোহরাকে প্রমোদ ভবন বানানোর যে স্বপ্ন দেখছিল সে স্বপ্নের জগত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাই কর্ডোভায় যে নতুন বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে সেদিক থেকে তারা চোখ ফিরিয়ে রইল।

৩.

ফজরের নামাজ শেষে আল্লাহর দরবারে মুজাহিদ স্বামীর জন্য দোয়া করছিল সকিনা বেগম। এমন সময় আঙ্গিনায় কারো পায়ের আওয়াজ শুনে তার অন্তর কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি মোনাজাত শেষ করে কামরার বাইরে আসে সকিনা বেগম।

আবদুল মুনীম বারান্দায় উঠে মাথা থেকে লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রাণ নামিয়ে রাখল। স্ত্রীর চেহারায় হাসির আভা দেখে প্রফুল্ল হয়ে উঠল হৃদয়-মন। সে চেয়ারে বসলে স্ত্রী নত হয়ে তাঁর পা থেকে মোজা খুলতে গেল, আবদুল মুনীম বলল, 'না, বেগম! আমি মাত্র ঘন্টাখানিকের জন্য এসেছি। তুমি বসো।'

সকিনা পাশের চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, 'যুদ্ধের অবস্থা ভাল তো?'

'হ্যাঁ, রাতে দুশমন প্রচণ্ড হামলা চালিয়েছিল, কিন্তু আমরা তাদের নাস্তানাবুদ করে দিয়েছি। এবার শহরের বাইরে গিয়ে দুশমনের ওপর চূড়ান্ত হামলার জন্য তৈরী হচ্ছি। বাচ্চারা কোথায়?'

'সাদ নামাজ পড়ে ঘোড়া নিয়ে মদিনাতুজ-জোহরা গেছে। আহমদ ও হাসান খেলা করছে। গতকাল আপনি সাদকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, নইলে আমি তো তাকে এই হাঙ্গামা থেকে ফিরিয়ে রাখতাম।'

আবদুল মুনীম বলল, 'গতরাতের লড়াইয়ের সময় আবদুল জব্বার আমার সাথে ছিল। তাকে সাদের ব্যাপারে খুবই সন্তুষ্ট মনে হল।'

'আবদুল জব্বার কে, ইদ্রিসের বাপ?'

'হ্যাঁ, সে বলল, সাদ খুবই ভাল তীরন্দাজ। ইদ্রিস এবং তার সমবয়স্ক আরো কয়েকটি ছেলেকে সে তীরন্দাজীতে ভালই প্রশিক্ষণ দিয়েছে।'

'মামুনের সৈন্যরা নাকি কর্ডোভার সীমান্তবর্তী কয়েকটি মহল্লা জ্বালিয়ে দিয়েছে? সাদ বলেছে, সে ছেলেদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করছে। বড় হয়ে সে এ বাহিনী নিয়ে টলেডো আক্রমণ করবে এবং মামুনের এই নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নেবে।'

আহমদ ও হাসান বারান্দায় এসে আবদুল মুনীমকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে

তাকে জড়িয়ে ধরল। আহমদ প্রশ্ন করল, 'আব্বাজান! সেভিলের সৈন্যরা কবে আসবে?'

'আব্বু, সেভিলের সেনাবাহিনী আজই এসে যেতে পারে।'

সকিনা বলল, 'শহরের লোকজন এ জন্য খুবই আনন্দিত।'

আবদুল মুনীম গম্ভীর স্বরে বলল, 'মামুনকে পরাজিত করতে এখন আর মুজাহিদদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন ছিল না আমাদের।'

সকিনা বলল, 'সেভিলের সেনাবাহিনী একটু দেরীতে আসছে ঠিকই, কিন্তু ওরা যে আসছে এটাও একটা ভাল দিক। আমার তো মনে হয়, সেভিলের ফৌজ দেখলেই মামুন লেজ গুটিয়ে পালাবার দিশা পাবে না।'

আবদুল মুনীম বলল, 'মামুনের সাহস তো তারা আসার আগেই খতম হয়ে গেছে। ভাবছি, সেভিলের সৈন্য আমাদের জন্য আবার নতুন কোন বিপদ নিয়ে না আসে! তারা সত্যি কর্ডোভাকে সাহায্য করতে চাইলে আরো আগেই আসতে পারতো।

ওরা এক সপ্তাহ ধরে মাইল বিশেক দূরে শিবির স্থাপন করে সেখানেই বসে কাব্য চর্চা করছে। গতকাল খবর আসে, তারা ওখান থেকে রওয়ানা হয়েছে এবং সন্ধ্যা নাগাদ এখানে পৌঁছে যাবে। তাদের অভ্যর্থনার জন্য আমরা অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি, কিন্তু এশার নামাজেরও অনেক পরে খবর এল, সেভিলের সৈনারা শহর থেকে আট মাইল দূরে বিশ্রাম করছে, কাল সকালে এখানে পৌঁছবে।

দুশমন সম্ভবত এ খবর জানতে পেরেই রাতে শহরের ওপর এমন তীব্র আক্রমণ করেছিল। যদি মুজাহিদরা বীরদর্পে তাদের মোকাবেলা না করতো, তাহলে এতক্ষণে এ শহর মামুনের দখলেই চলে যেত। শেষ রাতে দুশমনরা পিছু হটলে আমি তাদের ওপর চূড়ান্ত হামলা করার চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুজাহিদরা এতই ক্লান্ত ছিল যে, আর পিছু ধাওয়া করা সম্ভব হলো না।'

পরিচারিকা এসে জানাল, 'খানা তৈরী।'

আবদুল মুনীম উঠে বিবি বাচ্চাদের নিয়ে খাবার টেবিলে বসল।

৪.

ইদ্রিস বাড়ির সামনে বাগানে তীর ধনুক নিয়ে ঘুরাঘুরি করছিল। একটি কবুতরকে উড়ে আসতে দেখে নিশানা করে তীর ছুঁড়ল, কিন্তু কবুতরটি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পেছন থেকে ভেসে এল খিলখিল হাসির শব্দ। ইদ্রিস গাল ফুলিয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখল, ছোট বোন মায়মুনা পুতুল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি এসলে কি জন্য?' ইদ্রিস রাগের সাথে জিজ্ঞেস করল।

মায়মুনা এ কথার জবাব না দিয়ে দৌড়ে গিয়ে তীরটি তুলে এনে দুষ্টুমী ভরা চোখে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাও তোমার তীর।'

ইদ্রিস তীরটি না নিয়ে মায়মুনার হাত থেকে পুতুলটি ছিনিয়ে নিল এবং তা পাশের এক গাছে ছুড়ে মারল। পুতুলটি গাছে আটকে গেল। মায়মুনা মুখ কালো করে পুতুলটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি ওটা নামিয়ে আনব।'

'কি ভাবে আনবে?'

মায়মুনা তীর ফেলে মাটি থেকে ঢিল কুড়িয়ে পুতুলটার গায়ে ছুড়তে শুরু করল।

'বুঝেছি, তোমাকে দিয়ে হবে না। দেখ, আমি তীর ছুড়ে এখনই ওটাকে নীচে ফেলে দিচ্ছি।'

ইদ্রিস তীর নিয়ে নিশানা করতে শুরু করল। মায়মুনা তার হাত চেপে ধরে বলল, 'না,না, তুমি পুতুলের গায়ে তীর ছুঁড়ো না।'

ইদ্রিস বলল, 'ঠিক আছে, হাত ছাড়। আমি ঢিল মেরে ওটা নামিয়ে আনছি।'

মায়মুনা ইদ্রিসের হাত ছেড়ে দিল। ইদ্রিস ঢিল উঠাচ্ছে যাচ্ছে, এ সময় ফটকে সাদকে দেখতে পেয়ে ঢিল ফেলে সাদের দিকে এগিয়ে গেল।

'আজ অন্যান্য ছেলেরা আসেনি?' সাদ ঘোড়া থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল।

'না, তারা সবাই সেভিল সৈন্যদের মিছিল দেখতে গেছে।'

'কিন্তু সেভিলের সৈন্য তো এখনো আসেনি?'

'কিন্তু তারা যে বলল, সেভিলের সেনাবাহিনী শহরের খুব কাছে এসে গেছে। মুতামিদের উজীরও আছে তাদের সাথে!'

'আলমাস চাচা বলছিল, উজির ইবনে আম্মার নাকি কবিতা আবৃত্তি আর পাশা খেলা ছাড়া কিছুই জানে না।'

'আব্বাও বলল, সে নাকি এক সপ্তাহ ধরে কর্ডোভা থেকে বিশ মাইল দূরে শিবির স্থাপন করে বসে বসে পাশা খেলছে।'

ইদ্রিস সাদের ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। মায়মুনা আবার গাছের গায়ে ঢিল ছুড়তে লাগল।

সাদ জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে মায়মুনা, ঢিল ছুড়ছো কেন?'

মায়মুনা অভিযোগের সুরে বলল, 'ইদ্রিস ভাইয়া আমার পুতুল ওখানে আটকে দিয়েছে।'

'দাঁড়াও, আমি নামিয়ে দিচ্ছি,' বলে সাদ ধনুকে তীর জুড়ল।

মায়মুনা বাধা দিয়ে বলল, 'না, না, আমার পুতুল...'

'তুমি কোন চিন্তা করো না। আমার তীর তোমার পুতুলের গায়ে লাগবে না।' বলতে বলতে সাদ তীর ছুঁড়ে দিল।

তীর গাছের ডালে লাগতেই পুতুলটি নীচে পড়ে গেল। মায়মুনা পুতুলটি উঠিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ইদ্রিস ভাই তীর ছুঁড়লে তা আমার পুতুলের গায়ে লাগতোই।'

'না, ইদ্রিসের নিশানা এত খারাপ না।'

'হু, খারাপ না। সামনে দিয়ে কবুতর উড়ে গেল, অথচ তীর ছুঁড়ে তার গায়ে আচড়টিও লাগাতে পারল না।'

সাদ হেসে বলল, 'আমার তীরও তো তোমার পুতুলের গায়ে লাগেনি।'

মায়মুনা বলল, 'তুমি আমার পুতুলের নাম জান?'

'না, পুতুলের আবার নাম থাকে নাকি?'

'কেন থাকবে না?'

'আচ্ছা! তাহলে তোমার পুতুলের নাম কি?'

'এর নাম সুলতানা রেমিকা। তুমি জান, সুলতানা রেমিকা কে?'

'বাহ, তুমিই তো বললে, এটা তোমার পুতুলের নাম?'

'না না, আম্মা বলেছেন, সুলতানা রেমিকা সেভিলের রানী।'

সাদ হেসে বলল, 'তাহলে তোমার পুতুল সেভিলের রানী?'

মায়মুনা খিল খিল করে হেসে উঠল।

সাদ বলল, 'রেমিকা ভাল নাম নয়। তুমি এর জন্য একটা ভাল নাম বাছাই কর?'

মায়মুনা বলল, 'তাহলে তুমিই বলো কি নাম রাখা যায়?'

'তুমি ওকে মায়মুনা বলে ডাক। ওটা ভাল নাম।'

মায়মুনা হেসে বলল; 'আরে, ওটা তো আমার নাম।'

ততক্ষণে ইদ্রিস ঘোড়া বেঁধে ফিরে এল। সাদ ও ইদ্রিস দুজনেই তীর মারা অনুশীলন করার জন্য মাঠের দিকে হাঁটা দিল। মায়মুনাও চলল তাদের পিছনে পিছনে।

৫.

সেভিলের সৈন্য বাহিনী কর্ডোভা ও জোহরার মধ্যস্থলে নদী তীরে শিবির স্থাপন করল। মুতামিদের পুত্র আব্বাদ ও উজীর ইবনে আম্মার সেনাবাহিনীর সাথে এসেছিল। কর্ডোভাবাসী এদের প্রাণঢালা সম্বর্ধনা দিল।

জনসাধারণ এখন শুধু তাদের বিজয় সম্পর্কেই সুনিশ্চিত নয় বরং তারা মনে করছিল, দুশমনকে পরাজিত করে টলেডো পর্যন্ত তাড়িয়ে নেয়া যাবে। কিন্তু উমরুল মুতাওয়াক্কিল নামে এক খণ্ডরাজ্য শাসক এতে খুশী হতে পারেননি। তিনি এক হাজার সৈন্য নিয়ে কর্ডোভাবাসীর সাহায্য করতে এসেছিলেন, আবদুল মালিককে তিনি বুঝালেন, সেভিলের সেনাবাহিনীর ওপর ভরসা করে তোমরা ভুল করছো। কিন্তু আবদুল মালিকের উপদেষ্টারা এতে কোন কান দিল না।

আবদুল মুনীম ও তাঁর কয়েকজন সমর্থক ছাড়া কেউ সেভিলের সৈন্যদের সন্দেহ করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অগত্যা উমরুল মুতাওয়াক্কিল তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে

ফিরতি পথ ধরলেন। সেভিলের বিশাল বাহিনীর আগমনে জনগণ ছিল উৎফুল্ল। তারা এক হাজার অশ্বারোহীর প্রত্যাবর্তনকে তেমন গুরুত্ব দিল না।

আবদুল মালিক, ইবনে আম্মার ও কর্ডোভার গন্যমান্য নেতাদের নিয়ে ঠিক করল, মামুনকে পরাজিত করে তারা অনেক দূর পর্যন্ত তাকে তাড়া করবে।

তিন সপ্তাহ পর। আচানক একদিন ভোরে শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয়া হল। কর্ডোভা ও সেভিলের সেনাবাহিনী এবং মুজাহিদরা শহর থেকে বের হয়ে মামুনের ওপর হামলা করল। দুপুরের দিকে মামুন পরাজিত হয়ে সৈন্যদের নিয়ে পালাতে শুরু করল।

সম্মিলিত বাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করল। সন্ধ্যার দিকে যখন কর্ডোভার সৈন্য ও আবদুল মালিকের মুজাহিদ বাহিনী কর্ডোভা থেকে কয়েক মাইল দূরে তখন দেখা গেল সেভিলের সেনাবাহিনী তাদের সংগে নেই। তারা আম্মার এবং [illegible]দকে তালাশ করল, কিন্তু তাদেরও কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

তারা ছোট্ট এক শহরে রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল। রাতে আবদুল মালিক কর্ডোভার নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। কেউ কেউ বলল, সেভিলের সেনারা অকর্মন্য, তাই তারা পেছনে রয়ে গেছে। কিন্তু আবদুল মুনীম ও অন্য কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সেভিল বাহিনীর পেছনে পড়ে থাকাকে বিপজ্জনক বলে আখ্যায়িত করল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল, আবদুল মালিক পাঁচ'শ অশ্বারোহী নিয়ে এখুনি কর্ডোভা ফিরে যাবে আর বাকি সৈন্য সেভিল বাহিনীর আগমন আশায় এখানেই অপেক্ষা করবে।

আবদুল মালিক যখন এসব পরামর্শ করছে, কর্ডোভার রঙ্গমঞ্চে তখন এক নতুন নাটক শুরু হয়ে গেছে।

ইবনে আম্মার তিন সপ্তাহ যাবত মামুনের ওপর চরম আঘাত হানার ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে সে অন্য রকম প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে আসার সময় অনেক সোনা-রূপা সাথে নিয়ে এসেছিল এবং এগুলো মজলিশে শুরার সুবিধাবাদী নেতাদের মধ্যে বিতরণ করে তাদের মাথা কিনে নিচ্ছিল। বিলাসী আমীররা এমনিতেই আলেমদের প্রভাবকে সুনজরে দেখছিল না, তারা গোপনে ইবনে আম্মারের সাথে ভিড়ে যেতে শুরু করল। কর্ডোভায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হলে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে তারাও ইবনে আম্মারের সাথে যোগ দিল। ইবনে আম্মার এদের বুঝাল, মুতামিদই তোমাদের ত্রাণকর্তা। এসব সুবিধাভোগীরা কর্ডোভার বাজারে ও অলিতে গলিতে মুতামিদ ও ইবনে আম্মারের নামে কবিতা আবৃত্তি করতো আর এ দু'জনের দানশীলতা ও উদারতার গল্প শুনিয়ে জনগণকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করতো। ক্রমে জনগণের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হতে শুরু করল যে, তৃতীয় আবদুর রহমানের পর স্পেনের মুসলমানরা যাকে নিয়ে গর্ব করতে পারে সে হচ্ছে সুলতান মুতামিদ।

লোভাতুর ওমরাদের জন্য ইবনে আম্মার সোনা-রূপার ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিল। আমীর ওমরাদেরকে রাজ দরবারের বড় বড় পদের লোভ দেখাচ্ছিল। বিশেষ করে

মদিনাতুজ-জোহরার প্রহরী ও রক্ষীদের উপহারের পরিমান ছিল খুবই বেশী।

কর্ডোভাবাসী মুতামিদের উজীরের দারাজ হাতের দান ও উপহারই শুধু দেখতে পেল, কিন্তু এ দানের সাথে যে অদৃশ্য বিষ-মাখানো ছুরি লুকানো ছিল তা কারোরই নজরে পড়েনি। লোকজন তার মুখের হাসিটুকুই শুধু দেখতে পেল, কিন্তু তার অন্তরে যে পিশাচ লুকিয়ে আছে তার সন্ধান কেউ নিল না। কেউ ভাবল না, যে হাত আজ অকৃপণ ভাবে উপহার বিলাচ্ছে, সে হাত কোনদিন তাদের টুটি চেপে ধরতে পারে।

ইবনে আম্মার বার বার ঘোষণা করছিল, মামুনের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে। দরকার হলে টলেডো পর্যন্ত ছুটে যেতে হবে তাকে ধাওয়া করে। তার এসব ভাষণ-বিবৃতির কারণে কর্ডোভার কেউ তাকে কোন রকম সন্দেহ করার অবকাশই পায়নি।

চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিন ইবনে আম্মার মদিনাতুজ-জোহরার কাছাকাছি নদী তীরে দু'হাজার সৈন্য নিয়ে চুপচাপ বসেছিল। বাকী পাঁচ হাজার সৈন্যকে পাঠিয়ে দিয়েছিল কর্ডোভার মুজাহিদ ও সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে। ওরা মামুনের পরাজয়ের পর কয়েক মাইল তার পেছনে ধাওয়া করে আস্তে আস্তে ধাওয়াকারী বাহিনীর পিছনে সরে আসতে থাকে। যখন বুঝল তাদের সরে পড়া কেউ টের পায়নি, তখন তারা অন্য পথে কর্ডোভা ফিরে আসে। জনসাধারণ ছিল বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল। সৈন্য বাহিনীর কে আসছে বা যাচ্ছে এ নিয়ে তাদের কোন চিন্তা ছিল না।

মুতামিদের পুত্র এবাদ সেনাবাহিনীর সাথে না গিয়ে শহরেই থেকে গিয়েছিল। বিজয়ের আনন্দে জনতা মিছিল বের করলে সেও সেই মিছিলে শরীক হয়ে গেল। মিছিল কর্ডোভা জামে মসজিদের সামনে এলে সে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল জনতার দিকে সোনা ও রূপার মুদ্রা ছুঁড়ে দিতে লাগল। জনতাও এর বদলে তাকে লক্ষ্য করে ফুল ছুঁড়তে লাগল। শহরের প্রতিটি চৌরাস্তায় কর্ডোভা ও সেভিলের বড় বড় কবিরা বিজয়ী বীরদের বীরত্ব গাথা আবৃত্তি করতে লাগল। রাতে আলোকমালায় সজ্জিত কর্ডোভা দিনের চাইতে আলোকিত, উজ্জ্বল ও ঝলমল করতে লাগল।

আবদুল মালিক পাঁচশ অশ্বারোহী নিয়ে গভীর রাতে শহরে এসে পৌছল। তখনও শহরে পুরোদমে আনন্দোৎসব চলছে। উৎফুল্ল জনতাকে দেখে আবদুল মালিকের আশঙ্কা দূর হয়ে গেল এবং সেভিলের বাহিনীকে অযথা সন্দেহ করায় সে মনে মনে লজ্জিতও হল। আবদুল মালিক আনন্দিত হয়ে উৎফুল্ল জনতাকে পাশ কাটিয়ে জোহরা প্রাসাদের দিকে রওনা হল। কিন্তু নদী পেরোনোর জন্য পুলের কাছে এসে পৌঁছতেই সেভিলের সৈন্যরা তাদের গতি রোধ করল। এক অফিসার এগিয়ে এসে বলল, 'দাঁড়ান, আপনারা আর সামনে যেতে পারবেন না।'

আবদুল মালিকের এক সাথী বলল, 'তোমরা আমাদের পথ আটকাবার কে?'

উজীর থেকে হুকুম এসেছে, শহরের কোন লোককেই যেন আজ জোহরায় যেতে না দেই।'

'ভাল কথা, কিন্তু ইনি তো সুলতান আবদুল মালিক, তোমরা সুলতানের পথও আটকে দেবে?'

'ইনিই যে সুলতান আবদুল মালিক তার প্রমাণ কি? আমরা তো জানি, সুলতান শত্রুর পেছনে ধাওয়া করে তাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।'

আবদুল মালিকের এক অফিসার এগিয়ে এসে সুলতানের কানে কানে বলল, 'নিশ্চয়ই এটা কোন ষড়যন্ত্র। চলুন শহরেই ফিরে যাই।'

আবদুল মালিক খানিক চিন্তা করল। তারপর কি ভেবে চিৎকার করে বলল, 'শহরে ফিরে চলো সবাই। আমরা ওখানেই রাত কাটাবো।'

কিন্তু তারা শহরের দিকে রোখ করতেই অন্ধকার থেকে ভেসে এলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। সেভিলের যে সব সৈন্য এতক্ষণ রাস্তার উভয় দিকে লুকিয়েছিল তারা আবদুল মালিক ও তার সাথীদেরকে ঘিরে ফেলল। আবদুল মালিকের সংগী কিছু অশ্বারোহী বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেও বাদবাকী সকলেই কিছুক্ষণ লড়াই করে আত্মসমর্পন করল।

পরদিন ভোর। আবদুল মালিক তার শাহী প্রাসাদের কাছেই এক কয়েদখানায় বন্দী। তার পিতা ইবনে জহুর, বংশের অন্যান্য লোক ও জোহরার প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে আগেই ধরে এনে সেখানে বন্দী করা হয়েছিল। পিতার কাছ থেকে আবদুল মালিক জানতে পারল, কিছু সংখ্যক বিশ্বাসঘাতক আমীর ও জোহরার প্রাসাদ রক্ষীদের সহায়তায় ইবনে আম্মার এশার নামাজের পরপরই মদীনাতুজ-জোহরা দখল করে নেয়।

কর্ডোভার যে সম্মিলিত বাহিনী দুশমনের পেছনে ধাওয়া করছিল, তারাও এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। বাহিনীতে সেভিলের যে মুষ্টিমেয় সৈন্য ও অফিসাররা তখনও শরীক ছিল তারা আর পিছু ধাওয়া না করে কর্ডোভা ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হলো। আবদুল মুনীম সেভিলের সালারকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করলে সে বলল, 'আমরা কর্ডোভায় ফিরে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখতে চাই।'

আবদুল মুনীম তাকে বলল, 'এ জন্য তো পাঁচশো ঘোড় সওয়ারকে পাঠানোই হয়েছে।'

সেভিলের সালার বলল, 'আমাদের কি করতে হবে তা আমরা ভালই জানি।'

সেভিল বাহিনীর আচরণ ও ব্যবহারে কর্ডোভার সেনাবাহিনী ও মুজাহিদদের মনে এ সন্দেহ দৃঢ় হলো যে, কর্ডোভায় নিশ্চয়ই কোন জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে।

কর্ডোভার সেনা প্রধান রাতে মুজাহিদ বাহিনীর অধিনায়ক আবদুল মুনীমের সাথে এ নিয়ে পরামর্শে বসল। মাঝ রাতের দিকে তারা এই সিদ্ধান্তে আসল যে, শত্রুর পিছু ধাওয়া করার পরিবর্তে অবিলম্বে সবাই কর্ডোভা ফিরে যাবে।

দুপুরের দিন। আবদুল মুনীমরা যখন কর্ডোভা পৌঁছল তখন দেখা গেল, শাহী প্রাসাদের চূড়ায় পতপত করে উড়ছে সুলতান মুতামিদের বিজয় পতাকা।

৬.

আবদুল মুনীম শহরে প্রবেশ করেই সোজা বাড়ির দিকে রওনা হল। ওখানে শহরের নতুন কোতোয়াল সেভিলের দু'জন সামরিক অফিসার ও কয়েকজন সৈন্য নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিছুদিন আগে মজলিশে শুরার পরামর্শে সরকারী চাকুরী থেকে এই লোককে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

আবদুল মুনীমের ঘোড়া তার বাড়ির ফটকে পৌঁছতেই কোতোয়াল এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি এখনই আমাদের সাথে চলুন, জোহরায় আপনার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।'

আবদুল মুনীম শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি কারো আদেশ?'

সেভিলের অফিসার দু'পা সামনে এগিয়ে বলল, 'নির্দেশ মেনে চলার অভ্যাস না থাকলে তাই মনে করো।'

'কার আদেশ?'

'কর্ডোভার গভর্নর এবাদ ইবনে মুতামিদের।'

'তাহলে ধূর্ত শিয়াল তার ষড়যন্ত্রের জাল এতদূর পর্যন্ত বিছিয়ে ফেলেছে!'

অফিসারের চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল। কিন্তু কোতোয়াল তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলল, 'আমরা আপনার সাথে কোন তর্ক করতে চাই না। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনাকে সসম্মানে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য। সেচ্ছায় যেতে না চাইলে গ্রেফতার করার হুকুম আছে। আপনি পালাতে চেষ্টা না করলে, কিছু সময়ের জন্য আপনাকে বাড়িতে যাবার অনুমতি দিতে পারি।'

আবদুল মুনীম একজন চাকরকে কাছে ডেকে ঘোড়াটি তার হাতে তুলে দিল। তারপর কোতোয়ালের দিকে ফিরে বলল, 'ঘরে চোর ঢুকলে বাড়ির মালিক পালিয়ে যায় না। আমি এখনি আসছি।' আবদুল মুনীম বাড়িতে প্রবেশ করল।

খানিক পর। আবদুল মুনীম বাড়ির আঙ্গিনায় তাঁর বিবি ও সন্তানদের সাথে দেখা করল। সকিনা উদগত কান্না সামলে নিয়ে বলল, 'আপনি বোধ হয় ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন, কর্ডোভা দখল করে নিয়েছে মুতামিদ।'

আবদুল মুনীম নিচু মাখা স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আপনার বন্ধুদের অনেকেই গ্রেফতার হয়ে গেছেন।'

'আমি জানি।'

আবদুল মুনীম সাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাদ, ভাইদের নিয়ে একটু বাইরে যাওতো বাবা। একটু পরেই ডাকবো তোমাদের।'

সাদ আহমদ ও হাসানকে নিয়ে সরে গেল সেখান থেকে। আবদুল মুনীম বিবিকে বলল, 'তারা আমাকে ধরে নেয়ার জন্য সিপাই পাঠিয়েছে।'

বিবি বললেন, 'আমি জানি। ওরা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।'

আবদুল মুনীম বলল, 'শোন, আমার ফিরতে দেরী দেখলে ওদের নিয়ে গ্রানাডা চলে যেও।'

সকিনা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'না, না, এ কথা বলবেন না।'

'সকিনা, তুমি বুঝতে পারছ না কর্ডোভার পরিবেশ কতটা খারাপ হতে পারে। এখানে থাকলে ওদের লেখাপড়া হবে না। পরাজয়ের গ্লানিতে ছেয়ে যাবে কচি হৃদয়। অন্তর থেকে মুছে যাবে প্রতিশোধের আগুন। মুতামিদ অভদ্রতা, নীচতা ও অশ্লীলতার সয়লাবে ভরে ফেলবে কর্ডোভা। আমার কথা শোন, একদিন এ ছেলেরাই বড় হয়ে আমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে। আমি বলছি না, গ্রানাডা খুব ভাল জায়গা। তবে ওখানে ওদের খালু আছে, ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে তিনি লক্ষ্য রাখতে পারবেন।'

সকিনা বলল, 'এই যদি হয় আপনার হুকুম, তাহলে তা অমান্য করার সাধ্য আমার নেই। আপনিও কি আমাদের সাথে যেতে পারেন না?'

'না, এখন তা সম্ভব নয়। ডুবন্ত নৌকার যাত্রীদের ফেলে আমি একা কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারি না। এক মহান আদর্শের জন্য আমরা লড়ছি। আল্লাহ আমাদের নেগাহবান। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি তোমাদেরও এখানে থাকা দরকার হতো, তাহলে কিছুতেই তোমাদের গ্রানাডা যাওয়ার পরামর্শ দিতাম না। হতে পারে আজই আমি ফিরে আসতে পারি, হতে পারে এটাই আমাদের জিন্দেগীর শেষ মোলাকাত। তোমার কাছে আমার একটি মাত্র জিনিস চাইবার আছে। আর তা হল, আমার বাচ্চাদের তুমি এমন ভাবে বড় করবে, যেন তারা যতদিন বেঁচে থাকে মুসলমান হিসাবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার শিক্ষা পায়। আমি বিশ্বাস করি, মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য তার জীবনের চাইতেও অনেক বেশী মূল্যবান।'

বিবি চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, 'আমার নিজেরও এ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল।'

আবদুল মুনীম বলল, 'রাতে আবদুল জব্বার দুশমনের পেছনে ধাওয়া করার সময় আহত হয়েছিল। তার অবস্থা খারাপ। আলমাস তাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ এখানে আসবে। এ বাড়ির দেখাশোনার দায়িত্ব আপাততঃ আলমাসের হাতেই বুঝিয়ে দিও। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘোড়াগুলো ওকে বিক্রি করে ফেলতে বলো।'

'গতকাল আপনারা দুশমনের পিছু নেয়ার পর আবদুল জব্বারের বিবি ছেলেপুলে নিয়ে আমাকে বিজয়ের সুসংবাদ দিতে এসেছিল। ওরা এবার একত্রে হজ্জে যাওয়ার নিয়ত করেছিল। ওর আঘাত খুব খারপ নয়তো?'

'ডাক্তারকে তার আঘাতের ব্যাপারে খুবই পেরেশান দেখলাম। কর্ডোভা থেকে কিছু দূর গিয়েই সে আহত হয়। কিন্তু সে বেহুঁশ হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা তা জানতে পারিনি।'

আবদুল মুনীম ছেলেদের কাছে ডাকল। তারা দৌড়ে এলে আবদুল মুনীম একে একে সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। তারপর সাদকে বলল, 'বাবা, আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ এক কাজে বাইরে যাচ্ছি। আমি না ফেরা পর্যন্ত ছোট ভাইদের দিকে খেয়াল রেখো আর মায়ের কথা মত চলো। মায়ের মনে কষ্ট লাগতে পারে এমন কিছু করো না।'

হাসান তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আব্বাজান, আপনি ওয়াদা করেছিলেন, লড়াই শেষ হলে আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন।'

'এখনও যুদ্ধ শেষ হয়নি বেটা।'

হাসানকে বুকের সাথে চেপে ধরে আবারও চুমু খেল আবদুল মুনীম। তারপর আরো একবার সবার দিকে তাকিয়ে 'খোদা হাফেজ' বলে দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

ছেলেরা তাদের মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সাদের অশ্রুসিক্ত চোখ সাক্ষ্য দিচ্ছিল, সে অন্য ভাইদের চাইতে অবস্থাটা বেশী জানে।

৭.

জোহরা প্রাসাদের দারুল ওমরা কক্ষে এবাদ ও ইবনে আম্মারের সামনে হাজির করা হলো আবদুল মুনীমকে। গর্ভনর হিসাবে মসনদে বসে আছে এবাদ। ডানে ইবনে আম্মার ও বামে সেভিলের কাজী। পিছনের কাতারে সেভিলের সামরিক অফিসাররা বসা।

মসনদের নীচে কর্ডোভার সেইসব ওমরারা বসেছিল, যারা মুতামিদের বাদশাহী মেনে নিয়েছে। এসব আসনের পেছনে প্রহরী ও সিপাইরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। মসনদের পাশে কয়েকটি আসন এখনো খালি। এগুলো বিশেষ উদ্দেশ্যে খালি রাখা হয়েছে।

আবদুল মুনীম একজন সাহসী সেনাপতির মত মাথা উঁচু করে দৃঢ় পদক্ষেপে কামরায় প্রবেশ করল। যেসব ওমরারা কর্ডোভার স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে দরবারে আসন লাভ করেছে তাদের দিকে তাচ্ছিল্যের সাথে এক নজর তাকিয়ে সামনে বাড়ল। ওমরারা কেউ আবদুল মুনীমের চোখের দিকে তাকাতে সাহস করল না। ইবনে আম্মারের ইঙ্গিতে সেভিলের একজন সেনা অফিসার উঠে মসনদের পাশে একটি শূন্য আসনে আবদুল মুনীমকে বসতে অনুরোধ করল। কিন্তু আবদুল মুনীম সেদিকে মোটেই কান দিল না।

ইবনে আম্মার বলল, 'আপনাকে একজন বন্ধু হিসাবে এখানে আসার জন্য কষ্ট দিয়েছি, বসুন।'

আবদুল মুনীম বলল, 'জি না, এ আসনের বিনিময়ে আপনাদের বন্ধুত্ব কবুল করতে আমি রাজী নই। এরচে দাঁড়িয়ে থাকাই উত্তম।'

ইবনে আম্মার বলল, 'আপনি জানেন কর্ডোভার বেশীর ভাগ অধিবাসীই সেভিলের শাহানশাহ মুতামিদের শাসন মেনে নিয়েছে?'

'আমি এর চেয়েও বেশী জানি।'

'কি জানেন?'

'সে এক দীর্ঘ কাহিনী। শুনতে আপনাদের ভাল লাগবে না।'

'কাহিনী যত দীর্ঘই হোক, আমরা তা শুনতে চাই। নির্ভয়ে বলার অনুমতি দিচ্ছি আপনাকে।'

'বলার জন্য কারো অনুমতির দরকার নেই আমার। যতক্ষণ জিহ্বা সচল থাকবে ততক্ষণ সত্য উচ্চারণে কার্পণ্য করবো না আমি। শুনুন, কর্ডোভার সম্ভ্রম ও আজাদী হরণ করার জন্য টলেডো থেকে একদল ডাকাত এসেছিল। কর্ডোভাবাসী এ ডাকাতদের বিরুদ্ধে লড়ছিল। এসময় সেভিল থেকে একদল চোর বন্ধুর মুখোশ পরে এখানে প্রবেশ করে। কর্ডোভাবাসী এ চোরের দলকে তাদের সম্ভ্রম ও স্বাধীনতার রক্ষক মনে করে নিজেদের ঘরে স্থান দেয় এবং ডাকাতদের সাথে চূড়ান্ত লড়াই করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যায়। ডাকাতদলকে তাড়িয়ে ঘরে ফিরে তারা দেখতে পায় তাদের ঘর চোররা দখল করে বসে আছে।

তোমরা সেই বর্ণচোরা শত্রু, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে যারা আমাদের পিঠে বিষাক্ত ছোরা বসিয়ে দিয়েছ। আমি স্বীকার করি, কর্ডোভায়ও এমন লোক তোমরা পেয়েছ, যারা তোমাদের আধিপত্য মেনে নিয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, তারা স্বেচ্ছায় তোমাদের গোলামী কবুল করে নিয়েছে। চারদিকে তোমাদের তরবারি উদ্যত দেখে তারা শুধু তাদের অসহায়ত্ব স্বীকার করেছে।

যদি তোমরা মনে করো, কর্ডোভাবাসী খুশী চিত্তে তোমাদের গোলামী করতে রাজী, তাহলে একবার তোমাদের সৈন্য কর্ডোভা শহরের বাইরে নিয়ে দেখো, কর্ডোভাবাসী তোমাদের জন্য জোহরার ফটক খুলে দেয়, না সেভিলের ফটক পর্যন্ত তোমাদের তাড়িয়ে দিয়ে আসে। সেভিল থেকে এখানে আসতে তোমাদের সময় লেগেছে এক মাস, কিন্তু আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, কর্ডোভাবাসী একদিনেই তোমাদের সকলকে সেভিলে পৌঁছে দেবে।'

ইবনে আম্মার টেবিলের ওপর থেকে কতগুলো কাগজ আবদুল মুনীমের দিকে বাড়িয়ে ধরল। বলল, 'আমি আপনার সৎসাহসের প্রশংসা করছি। কিন্তু এ তালিকায় একবার নজর বুলিয়ে দেখুন, কি পরিমাণ আলেম, সামরিক অফিসার, আমীর ও ওমরারা সুলতান মুতামিদের আনুগত্য কবুল করে নিয়েছেন।'

'আমি এসব কাগজ না দেখেই বলতে পারি কারা ওতে স্বাক্ষর করেছে। এসব কাগজে স্বাক্ষর করার জন্য যে কালিটুকু ব্যবহার করা হয়েছে তার দামের চাইতেও এসব গোলামদের ঈমানের দাম কম। যে বনে সিংহ থাকে, সেখানে শেয়ালও থাকে। বরং

শেয়ালের সংখ্যাই সিংহের চাইতে বেশী হয়। যারা এ কাগজে স্বাক্ষর করেছে তারা মনে করেছে, কর্ডোভার শবদেহের মাংস ছিঁড়ে খাবার সময় তোমরা তাদেরও কিছু ভাগ দেবে। কিন্তু আমি এমন আমীর ও আলেমদের নাম জানি যারা তোমাদের দেয়া আরাম আয়েশ ও গদির চেয়ে কয়েদখানার অন্ধ প্রকোষ্ঠ অনেক বেশী পছন্দ করবে।'

সেভিলের কাজী বলল, 'আমি আশা করেছিলাম, স্পেনের অনৈক্য ও বিভেদ দূর করার ব্যাপারে আপনি আমাদের সাহায্য করবেন। মুতামিদ ছাড়া অন্য কোন শাসক স্পেনের মুসলমানদের খণ্ড রাজ্যগুলো এক করতে পারবে বলে কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

আবদুল মুনীম বলল, 'আপনি কেন এ কথা বলছেন না যে, এটা স্বার্থপর, ধূর্ত, শঠ, প্রবঞ্চক ও ভোগবাদীদের যুগ। তাই স্পেনের মুসলমানরা বাঁচতে চাইলে খণ্ডরাজ্য শাসকদের মধ্যে সবচে যে বেশী বিলাসপ্রিয়, বেশী স্বার্থপর, বেশী শঠ, সেরা প্রবঞ্চক তার দাসত্ব কবুল করে নিতে হবে। ঈমান ও যোগ্যতা নয়, চাটুকারিতাই হবে এর ভিত্তি?

আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই, তোমরা কি খলিফা মুতামিদের বাইয়াতের দাওয়াত দিচ্ছো, নাকি আলফানসুর? খৃষ্টানদের হাতে পরাজিত হয়েছে বলেই কি মুতামিদ তোমাদের ত্রাণকর্তা বনে গেল? আফসোস! তোমরা এমন ব্যক্তিকে স্পেনের মুসলমানদের ত্রাণকর্তা আখ্যা দিচ্ছো, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপনের কাজে যে ব্যক্তি সবচে বেশী উৎসাহী?'

উপস্থিত কেউ আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছিল না। রাগে ঠোঁট কাঁপছিল নতুন গভর্ণর প্রাসাদের। সামরিক অফিসারদের চেহারাগুলো রাগে, ক্ষোভে বিকট ও ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। ইবনে আম্মার গর্জন করে উঠল, 'খামোশ নরাধম, তুমি নিজেকে নিকৃষ্ট শাস্তির যোগ্য করে তুলেছো।'

কর্ডোভার বিশ্বাসঘাতক ওমরাহরা তার শাস্তির দাবীতে হট্টগোল বাঁধিয়ে দিল। কিন্তু আবদুল মুনীম তাঁর বক্তৃতা বন্ধ করল না। সবার কণ্ঠ ছাপিয়ে তার গলার স্বর সারা ঘরে গমগম করছিল। ইবনে আম্মার চীৎকার করে বলল, 'এ বদমাশকে এখান থেকে নিয়ে যাও।'

মুহূর্তে পনর বিশজন প্রহরী আবদুল মুনীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। কর্ডোভার একজন প্রভাবশালী আমীর একটু আগেই মুতামিদের আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইবনে আম্মার! আবদুল মুনীম যা বলেছে আমি তা সমর্থন করি।'

এ কথা বলে কোন জবাবের অপেক্ষা না করেই সেও আবদুল মুনীমের পিছু নিয়ে দরবার থেকে বের হয়ে গেল।

প্রতিদিনের মত রাতে ঘুমানোর আগে হাসান মায়ের গলা জড়িয়ে আবদার করল, 'মা, একটা গল্প বলো না।'

মা বললেন, 'আজকে সাদ গল্প শোনাবে।'

সকিনা সাদকে গল্প বলতে বলে নিজের কামরায় চলে এল। একটা মোড়া টেনে স্থানুর মত বসে রইল চুপচাপ। এক সময় উঠে সেলফ থেকে একটা বই নিয়ে পড়তে বসল। বইটা ছিল আবদুর রহমান আদ-দাখিলের জীবন-চরিত। কিন্তু পড়তেও তার মন বসল না। কয়েক পাতা পড়ার পর বিরক্ত হয়ে বই বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সাদ আলতো পদে মায়ের কামরায় এসে ডাকল, 'আম্মাজান!'

মা উঠে বসতে বসতে বললেন, 'কি ব্যাপার সাদ, তুমি এখনো ঘুমাওনি?'

সাদ বলল, 'আম্মাজান, আমার মনে হয়, আব্বাজান গ্রেফতার হয়ে গেছেন।'

সকিনা তার হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, 'কেন এমন মনে হলো তোমার?'

'আমি মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেকেই এ নিয়ে আলাপ করছিল।'

'তুমি তোমার ভাইদেরকে বলেছো এ কথা?'

'আম্মাজান, আহমদও নামাজ পড়তে গিয়েছিল। সেও সব শুনেছে। তবে হাসানকে কিছু বলিনি আমরা। আম্মা, আমি বড় হয়ে আব্বাকে মুক্ত করে নিয়ে আসব।'

সকিনা পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সাদ, তোমার আব্বুর নির্দেশ, আমরা যেন সত্বর গ্রানাডা চলে যাই।'

সাদ পেরেশান হয়ে বলল, 'কিন্তু আব্বুকে কারাগারে রেখে আমরা কি করে যাব, আম্মা?'

আম্মা বললেন, 'বেটা, কারাগারের লৌহকপাট ভাঙার জন্য শক্তি দরকার। তোমার আব্বার ইচ্ছা, তুমি গ্রানাডায় গিয়ে একজন প্রকৃত মুজাহিদ হিসাবে গড়ে তুলবে নিজেকে। তোমার খালুজান ও তাঁর বন্ধুরা তোমাদেরকে মুজাহিদ হওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন।'

সাদ কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় চাকরাণী কামরায় ঢুকে বলল, 'আলমাস ফিরে এসেছে, সে জানতে চাচ্ছে এখন কি করবে?'

সকিনা বলল, 'তাকে ডাকো, আমিই তার সাথে কথা বলছি।'

দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল আলমাস। সকিনা দরজার আড়ালে দাঁড়ালেন। সাদ বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল, আলমাস চাচা! ইদ্রিসের আব্বা কেমন আছে?'

আলমাস বলল, 'আমি তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই চলে এসেছি। তবে তার অবস্থা ভাল নয়।'

সকিনা বলল, 'তাঁকে ভাল কোন হেকিমের কাছে নিয়ে গেলে না কেন?'

আলমাস বলল, 'আবুল ফাতাহর চেয়ে ভাল হেকিম কর্ডোভায় নেই। তিনি রোগী সম্পর্কে খুব আশাবাদী নন। আমি ওনাকে রেখে পথে নামতেই মনিবের গ্রেফতারীর খবর পাই। খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমি জোহরায় গিয়েছিলাম। নিশ্চিত হয়ে কি করবো বুঝতে না পেরে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরামর্শ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যাদের কাছ থেকে ভাল পরামর্শের আশা ছিল, তারা হয় পালিয়ে গেছেন, নয়তো বন্দী হয়েছেন। এই অবস্থায় কি করনীয় তাই জানতে চাচ্ছি। মুনিব কি কিছু বলে গেছেন আমাদের জন্য?'

সকিনা বলল, 'এ সময় এ নিয়ে চেষ্টা-তদবির বা দৌড় ঝাঁপ করা ঠিক হবে না। তিনি তোমার জন্য যেসব হুকুম দিয়ে গেছেন, তা তোমার পরে জানলেও চলবে। এখন গিয়ে আরাম কর। ভোরে উঠে ইদ্রিসের আব্বার খবর নিয়ে আসবে। আর শোন, সাদের আব্বা তোমাকে ভাইয়ের মত দেখতো। আমিও তোমাকে নিজের ভাই-ই মনে করি। কিন্তু সেভিলের শাসকদের যদি সন্দেহ হয়, তুমি সাদের আব্বার মুক্তির জন্য চেষ্টা-তদবির করছ, তাহলে তারা তোমাকেও গ্রেফতার করতে পারে। এ জন্য এ নিয়ে নিজে থেকে কিছু করতে যেয়ো না।'

'হায়! হায়! একি বললেন আপনি? আপনাদের সাহায্য করছি দেখে ওরা যদি আমার শরীরের মাংস ছিঁড়ে নেয়, তাও আমি পরোয়া করি না।'

'আমি জানি আলমাস। কিন্তু তাঁর খাতিরেই তোমার কয়েদখানায় না গিয়ে বাইরে থাকতে হবে। মাথা গরম করে উল্টাপাল্টা কিছু করে বসো না। যাও, গিয়ে আরাম কর।'

আলমাস চলে গেলে সাদ ভেতরে এসে বলল, 'আম্মাজান, সকালে আমিও আলমাস চাচার সাথে ইদ্রিসের আব্বাকে দেখতে যাবো।'

'আচ্ছা, যেও।'

কিছুক্ষণ পর। সাদ বিছানায় শুয়ে ছিল, কিন্তু ঘুম আসছিল না তার। মনের ভেতর নানা কথা তোলপাড় করতে লাগল। কল্পনায় কখনো সে কারাগার আক্রমণ করছিল, কখনো সেভিলের সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল প্রাণপণে। আবার ইদ্রিসদের বাড়ি পৌঁছে ইদ্রিস ও মারিয়াকে এই বলে শান্তনা দিচ্ছিল, আল্লাহর কাছে দোয়া করো, দেখবে তোমাদের আব্বা ঠিক ভাল হয়ে যাবেন।

অনেক রাতে এ সব ভাবতে ভাবতেই এক সময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে সাদ। সকালবেলা আম্মার ডাকে ঘুম ভাঙে তার, 'সাদ, ওঠ বাবা! নামাজের সময় যে চলে যায়।'

সাদ আড়মোড় ভেঙে উঠেই জিজ্ঞেস করল, 'আলমাস চাচা চলে গেছে আম্মা?'

'হ্যাঁ, সে তোমাকে ডাকতে এসেছিল। কিন্তু তুমি ঘুমুচ্ছিলে দেখে জাগাতে দেইনি। তুমি উঠে নামাজ পড়ে আসো। ততক্ষণে সে চলে আসবে।

নামাজ পড়ে সে আলমাসের আসার পথ চেয়ে বসে রইল। নাস্তার সময় হয়ে এল তবু এলো না। সাদ নাস্তা করে মায়ের অনুমতি নিয়ে ঘোড়া নিয়ে জোহরার পথ ধরল।

ইদ্রিসের বাড়ি পৌঁছে সাদ জানতে পারল, আবদুল জব্বার মারা গেছেন এবং তাঁর লাশ কবরস্থানে নিয়ে গেছে।

সাদ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটি গাছের সাথে ঘোড়া বেঁধে কবরস্থানে চলল। আবদুল জব্বারকে মাটি দিয়ে লোকজন তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া কালাম পড়ছিল। আলমাস এবং ইদ্রিসকেও সে ওখানে দেখতে পেল। ওদের চোখে অশ্রু। সাদ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করল এবং ধীরে ধীরে হেঁটে ইদ্রিসের পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে বন্ধুকে কোন সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেল না। ইদ্রিস কবরস্থান থেকে বেরুতে লাগলে সাদ তার কাঁধে হাত রেখে ডাকল, 'ইদ্রিস!'

ইদ্রিস মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। সাদ বন্ধুর নামটি ছাড়া আর কিছুই বলতে পারল না। ওর চোখের অশ্রুই ওর হয়ে কথা বলছিল। ইদ্রিস সাদের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

পর দিন। সাদ তার মা ও ভাইদের নিয়ে ইদ্রিসদের বাড়ি এলো। এক সময় বলল, 'আগামী কাল আমরা গ্রানাডা চলে যাচ্ছি।'

ইদ্রিস জিজ্ঞেস করল, 'ফিরবে কবে?'

সাদ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'জানি না। আম্মা বলেছেন, আমরা এখন থেকে গ্রানাডায়ই থাকবো।'

মায়মুনা শুনছিল ওদের কথা। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমরাও এখানে থাকতে চাই না।'

সাদ তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল, কিন্তু মায়মুনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলল। সাদের আম্মা মায়মুনাকে কোলে টেনে নিলেন। তারপর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। তারপর প্রতিদিন এসে তোমাদের দেখে যাবো।'

সাদের আম্মা বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠার আগে মায়মুনাকে আবার আদর করল আর ইদ্রিসের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'বাবা, ছোট হলেও তুমি পুরুষ মানুষ, নিজের মা ও বোনকে সান্ত্বনা দিও।'

গাড়ি রওনা হয়ে গেল। ইদ্রিস ও মায়মুনা বাইরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তাদের গমন পথের দিকে। দু'দিন পর। সেই একই গাড়িতে করে গ্রানাডা রওনা দিল ওরা। আলমাস দাঁড়িয়ে বিদায় দিচ্ছিল তাদের। জানালা দিয়ে মাথা বের করে সাদ বলল, 'আলমাস চাচা! তুমি নিয়মিত ইদ্রিসদের খবরাখবর নিও।'

পরিস্থিতির আরো অবনতি

সকিনা গ্রানাডায় এসে বসবাসের জন্য একটি বাড়ি কিনলেন। তাদের চলার জন্য কর্ডোভার সম্পত্তির আয়ই যথেষ্টই ছিল। আবদুল মুনীম নিয়মিত কিছু এতিম ও বিধবাকে সাহায্য দিতো। আবদুল মুনীম না থাকায় সংসারের আয় কিছু কমে যাওয়ার পরও সকিনা তা বন্ধ করল না। নিয়মিত তাদের সাহায্য অব্যাহত রাখল।

কর্ডোভাতে শাসনের নতুন যুগ শুরু হয়েছিল। মুতামিদের কর্মচারীরা শাসকদের বিলাসিতার খাই মেটাতে এবং আলফানসুর খাজনা পরিশোধ করতে গিয়ে জনগণের ওপর করের বোঝা বাড়িয়েই চলছিল। প্রতিবছর বর্ধিত হারে কর আদায় করার সাথে সাথে কর্মচারীরা নানা রকম ভয় ভীতি দেখিয়ে নিজেদের জন্য নিয়মিত ঘুষ আদায় করতে লাগল। আলমাস এসব কর্মচারীদের নামের একটি তালিকা তৈরী করল।

আলমাস প্রতিবারেই গ্রানাডা এসে ফসল ও বাগ-বাগিচার বাবদ আয় সকিনার কাছে দিয়ে হিসাবপত্র দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করতো। সকিনা বলতো, 'না, আলমাস! ওটা তুমিই দেখো, আমার দেখার কোন প্রয়োজন নেই।'

আলমাস রেগে গিয়ে সাদকে বলতো, 'দেখ সাদ, তুমি এখন বেশ বড় হয়েছ। এখন থেকে তোমারই উচিত হিসাবপত্র যাচাই করে দেখা।'

সাদ জবাবে বলতো, 'না চাচা, আব্বাজানই তোমার কাছ থেকে কোনদিন হিসাব নেননি, আমি কেন নিতে যাবো?'

আলমাস বলতো, 'বাবা, সে যুগ আর নেই। এখন কর্ডোভায় এমন সব ঘটনা ঘটছে, জানা না থাকলে পরে সংসারের হাল ধরতে এসে বেকায়দায় পড়বে। আমার কাছ থেকে এসব তোমাদের জেনে রাখা দরকার। আহমদ, হাসান, তোমরাও বসো।'

তারা বাধ্য হয়ে তার সামনে বসতো। সকিনা ও তার বোন পর্দার আড়ালে থাকলেও তাদের সব কথাই শুনতে পেতো। মাঝে মধ্যে শেখ আবু সালেহও এসব আলোচনায় যোগ দিতো।

আলমাস আয়-ব্যয়ের হিসাব দিয়ে বলতো, 'সাদ, গত বছর মুতামিদ কর্ডোভায় চারটি মহাসম্মেলন করেছে, চল্লিশটি ভোজসভা আর পঞ্চাশটি কবিগানের আসর করেছে। এসব অনুষ্ঠানের সব খরচ যোগাতে হয়েছে জনগণকে। এ ছাড়া কর্ডোভার গভর্ণর তার মেহমানখানার খরচের অজুহাতে বিশেষ কর ধার্য করেছে। ফ্রান্স থেকে শরাব আমদানী করার জন্য এ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর জন্য আমার কাছ থেকেও বহু টাকা আদায় করেছে। গত বছর রাণী রেমিকা এক মাস কর্ডোভায় ছিল। এবার থাকবে তিন মাস। এ জন্যও আমাদেরকে অতিরিক্ত কর দিতে হয়েছে। গুজব শুনা যাচ্ছে, রাণী স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কর্ডোভা চলে আসবে। তাহলে যে কর দিতে হবে সেই ভয়ে অনেকেই বাড়ি ঘর বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।'

খরচের হিসাব দেয়ার পর আলমাস পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে সাদের হাতে দিয়ে বলল, 'এ কাগজখানা সামলে রেখো। যেসব কর্মচারী অন্যায়ভাবে আমার কাছ থেকে অর্থ আত্মসাত করেছে, এখানে তাদের তালিকা আছে। এসব ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজদের সময় ফুরিয়ে আসছে। আমি যদি তার আগেই মারা যাই, তবে তাদের কাছ থেকে প্রতিটি পাই উসুল করে নেয়ার দায়িত্ব তোমাদের।'

২.

আবদুল মুনীম কর্ডোভার কারাগারে বন্দী। কিন্তু তার সাথে কারো দেখা করার অনুমতি ছিল না। ফলে তার ব্যাপারে লোকজন নানারকম ধারণা করতে লাগল। কেউ মনে করতো, তাঁকে কোন দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়েছে। কারো ধারণা, আবদুল মুনীম ও তাঁর সঙ্গীদের গোপনে হত্যা করা হয়েছে।

বছর দুয়েক পর এক রাতে তার সঙ্গী এক কয়েদী কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সে গ্রানাডা গিয়ে শেখ আবু সালেহকে জানালো, আবদুল মুনীম এখনো বেঁচে আছে এবং কর্ডোভার কারাগারে বন্দী জীবন কাটাচ্ছে।

সাদ, আহমদ ও হাসানের জীবনে পিতার গ্রেফতার হয়ে যাওয়া ও কর্ডোভা থেকে হিজরত করার ঘটনা গভীর রেখাপাত করেছিল। মা তাদেরকে শৈশব থেকেই জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করতে অভ্যস্ত করে গড়ে তুলেছিল। গ্রানাডা আসার পর তাদেরকে ফৌজি স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হলো।

এই ফৌজি স্কুলে অতীতে বহু নামকরা মুজাহিদ ও মুসলিম বীর শিক্ষা লাভ করেছে। এক সময় এটি একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছিল। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। পরে অযোগ্য শাসকরা সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেলে গ্রানাডার কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির সহায়তায় এটি আবার চালু হয়। এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁর সম্পত্তির বেশীর ভাগই এ প্রতিষ্ঠানে দান করে দেন। একদল আলেম দেন-দরবার ও চাপ প্রয়োগ করে এর জন্য সরকারী মঞ্জুরীরও ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। কিন্তু তারপরও এর শিক্ষার মান আগের মত অত উন্নত হলো না।

ফলে, সকিনা তার সন্তানদের যেভাবে তৈরী করতে চাচ্ছিল, সে উদ্দেশ্য এর দ্বারা পুরোপুরি সফল হচ্ছিল না। এ জন্য স্কুলের শিক্ষার পাশাপশি গ্রানাডার এক অবসরপ্রাপ্ত ঝানু সামরিক অফিসারকে তাদের ফৌজি তালিম দেয়ার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি কেবল সামরিক অফিসারই ছিলেন না, গ্রানাডার একজন শীর্ষস্থানীয় আলেমও ছিলেন। তাঁর কাছে তারা ফৌজি তালিমের পাশাপশি কোরআন, হাদিস, ফিকাহ, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ও অংক শাস্ত্রও অধ্যয়ন করতে থাকে।

স্কুলের ওস্তাদরাও আবদুল মুনীমের ছেলেদের মেধা, মনোযোগ ও আন্তরিকতায়

চমৎকৃত হন। তারাও ওদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ নজর দিলেন। ফলে, আবদুল মুনীমের ছেলেরা অল্পদিনেই গ্রানাডার যুবক মহলে নিপুন তীরন্দাজ ও ঘোড় সওয়ার হিসাবে মশহুর হয়ে যায়।

তবে তিন ভাইয়ের মধ্যে আহমদের ঝোঁক ছিল বইয়ের দিকে, আর সাদ ও হাসানের ঝোঁক ছিল সৈনিক হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দিকে।

শেখ আবু সালেহের ব্যক্তিগত পাঠাগারে ছিল শত শত মূল্যবান বই। ঐ সব বই পাঠের প্রতি ছিল আহমদের দারুণ লোভ। স্কুলের পড়া শেখা হয়ে গেলে সে ঐসব বই নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তো। তাই দু'তিন দিন পরপরই সে শেখ আবু সালেহের কাছ থেকে বই নিয়ে আসতো এবং পড়া হয়ে গেলে আবার তা ফেরত দিত। সাদ ও হাসান অবসর সময় ব্যয় করতো সৈনিক সুলভ খেলাধুলায়।

মাত্র সতের বছর বয়সে সাদ যখন তার সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করল ততদিনে সে গ্রানাডার হাজার হাজার যুবকের নয়নমনি হয়ে উঠেছিল। তার চমৎকার দেহ-কাঠামো আর প্রখর জ্ঞান-বুদ্ধি যেমন তাদেরকে আকর্ষণ করতো, তেমনি যুদ্ধ বিদ্যায় তার নিপুন পারদর্শিতা, আন্তরিক আচরণ ও নেতা সুলভ মহত্ব ও দূরদর্শিতাগুণে সে হয়ে উঠেছিল গ্রানাডার যুব সমাজের আদর্শ পুরুষ।

৩.

সেভিলের নতুন শাসকদের জুলুম নির্যাতন কর্ডোভাবাসীর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইবনে আম্মারের ষড়যন্ত্রের কাছে তারা ছিল অসহায়। তারা এ সীমাহীন জুলুম নির্যাতন প্রতিকারের কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। যারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারতো তারা সবাই গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিল। তাদের প্রভাব নষ্ট করার জন্য নানা রকম বিষোদগার ছড়াচ্ছিল নতুন প্রশাসন। বাদবাকী অনেককে ধন-সম্পদ ও উচ্চ সরকারী চাকরী দিয়ে বশীভূত করে ফেলেছিল। মসজিদে মসজিদে মুতামিদের ন্যায়নিষ্ঠা, সুবিচার ও উদারতার কাহিনী বয়ান করে খুতবা দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

টলেডোর সাথে দীর্ঘ লড়াইয়ের কারণে জনগণ ছিল ক্লান্ত, বিরক্ত। নতুন করে বিদ্রোহ করার মত সাহস হারিয়ে ফেলেছিল জনগণ। তাদেরকে মুতামিদের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে উজ্জীবিত করে তুলবে এমন কোন নেতৃত্বও ময়দানে ছিল না। ফলে, আক্ষেপ করে কেউ কেউ বলল, 'যাই হোক, মুতামিদ একজন মুসলমান বৈ তো নয়।' যারা মুতামিদের নুন খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল, তারা বলল, 'মুতামিদ আবদুল মালিকের চাইতে নিঃসন্দেহে ভাল।'

কিন্তু যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল তারা পরিস্থিতির নাজুকতায় ছিল অস্থির, পেরেশান। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারছিল না। সেভিলের মুক্ত তরবারি তাদের জবানকে স্তব্ধ করে

রেখেছিল। প্রকাশ্যে যুদ্ধ শুরু করার কোন পরিস্থিতি না থাকায় তারা উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় চুপ করে রইল।

মুতামিদ শাহানশার বেশে কর্ডোভা প্রবেশ করল। অবাক হয়ে জনগণ তার জাঁকজমক দেখল। তার শানশওকত সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারলেও বিচক্ষণ লোকজন এসব বাহ্যিক চাকচিক্যে বিভ্রান্ত হল না। চোখ ধাঁধানো জাঁকজমক নিয়ে রাণী রেমিকা মদিনাতুজ-জোহরায় প্রবেশ করল। এ ছিল তার অনেক দিনের স্বপ্ন-সাধ। মদিনাতুজ-জোহরায় এসেই সে তার স্বভাবসুলভ আমোদ-ফূর্তি ও খানাপিনায় মেতে উঠল। রাণী রেমিকাকে খুশি করতে পেরে মুতামিদেরও আনন্দের অন্ত রইল না।

মুতামিদ ও রেমিকা প্রতি বছরই কিছু সময় জোহরা প্রাসাদে এসে কাটাতো, বাকী সময় সেভিলে রাজকার্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তা ছাড়া বিভিন্ন শাহী রাজকীয় সম্বর্ধনায়ও তাদেরকে হাজির থাকতে হতো।

কর্ডোভার গভর্ণর এবাদ মা-বাপের বিলাসী জীবন দেখে এবং চরম ভোগবাদী ইবনে আম্মারের সংস্পর্শে থাকার ফলে অল্প বয়সেই নিকৃষ্ট ধরনের ইন্দ্রিয় পূজারী হয়ে উঠেছিল। জোহরা প্রাসাদে তার আমোদ-ফূর্তির খরচ যোগানোর জন্য কর্ডোভাবাসীকে মোটা অংকের কর তো দিতেই হতো, তার ওপর দ্বিতীয়তঃ হতো সরকারী কর্মচারীদের ঘুষের বায়না। তাই, যারা প্রথমে মুতামিদের উদারতার কাহিনী শুনে খুশী হয়েছিল তারা অচিরেই অনুভব করল, তথাকথিত উদারতার এ ভারী বোঝা তাদেরকেই বহন করতে হবে।

ধীরে ধীরে কর্ডোভাবাসীর মনে চরম অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করল। আস্তে আস্তে এ অসন্তোষ ধুমায়িত হতে লাগল। কানাঘুষার মধ্য দিয়ে এ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ শুরু হলেও ক্রমেই তা আরো উত্তপ্ত হতে থাকে। একদিন কর্ডোভা জামে মসজিদের ফটকে দেখা গেল একটি পোস্টার ঝুলছে। তাতে লেখাঃ

'ওলামায়ে দ্বীন!

মুসলিম প্রজাদের রক্ত শোষণ করে যে প্রশাসন নিত্য নতুন বিলাস সামগ্রী ক্রয় করে আর বিধর্মীদের কাছ থেকে প্রতিদিন মদ কিনে আনে তাদের ব্যাপারে আপনাদের ফয়সালা কি? ইসলামের ঘোষিত দুশমন খৃষ্টানদের যারা নিয়মিত খাজনা দেয় তাদের ব্যাপারে আপনাদের ফতোয়া কি? যার বিবি ইসলামের সকল অনুশাসনকে বিদ্রুপ করে আর কাইসার ও কিসরার বেগমদের চেয়েও যে আরামপ্রিয় ও বেহায়া তার শাসনে আপনারা কি সন্তুষ্ট?'

হে কর্ডোভাবাসী!

তোমাদের শাসনকর্তা আলফানসুর তল্পীবাহক। তোমাদের ভবিষ্যৎ এমন এক নারীর খাম-খেয়ালীপনার কাছে বন্দী, যে জোহরা প্রাসাদকে বিলাসিতা ও অশ্লীলতার আস্তাখানায় পরিণত করেছে। জেগে ওঠো মুসলিম ভাইয়েরা! সিংহের মতো গর্জে ওঠো! আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানদের ক্ষমতার মসনদ উলটিয়ে দাও, ভেঙ্গে চুরমার

করে দাও শয়তানের সিংহাসন।'

গোপনে শহরের বাজার ও অলিগলিতে মুতামিদের স্বেচ্ছাচারিতা ও রাণী রেমিকার বেহায়াপনার বিরুদ্ধে মুফতীদের ফতোয়া প্রচার হতে থাকল। এতদিন যে আগুন কর্ডোভাবাসীর মনের ভেতর ধিকিধিকি জ্বলছিল তাই চার বছর পর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। জনগণ সেভিলের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল, কিন্তু তারা যোগ্য নেতৃত্ব পেল না। ইবনে আক্কাশা এক কালে এক বিখ্যাত ডাকাত ছিল। সে সুযোগ বুঝে বিদ্রোহীদের নেতা বনে গেল।

এক রাতে এবাদ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা জোহরার প্রাসাদে নাচ-গানে মত্ত, ইবনে আক্কাশা বিদ্রোহীদের নিয়ে হঠাৎ শাহী মহল আক্রমণ করল। আচানক এ আক্রমণে হতচকিত হয়ে গেল এবাদ। সে কিছু বুঝে উঠার আগেই আক্কাশা তাকে হত্যা করল। পরদিন কর্ডোভাবাসী দেখল, কর্ডোভার শাহী মসনদ ও জোহরার প্রাসাদ ইবনে আক্কাশার দখলে।

৪.

একদিন আহমদ ও হাসান স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে, এ সময় বাড়ির ফটকের কড়া নড়ে উঠল। সাদ গিয়ে ফটক খুলে দেখল তাদের ওস্তাদ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওস্তাদ সাদকে দেখেই বলে উঠলেন, 'সাদ, কর্ডোভা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ এক খবর পেলাম। একদল বিপ্লবী ওখানকার ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। কর্ডোভার গভর্ণর মুতামিদ-পুত্র এবাদ নিহত হয়েছে। বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ইবনে আক্কাশা নামে এক লোক।'

খবর শোনার পর কিছুক্ষণ সাদের মুখ থেকে কোন কথাই বের হল না। বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে সে প্রশ্ন করল, 'আপনি কার কাছ থেকে এ খবর পেলেন?'

'একটু আগে আমার সাথে শহর কোতোয়ালের দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, রাতেই কর্ডোভা থেকে কিছু লোক এসে পাহারাদারদের এ খবর জানায়। সকালে কোতোয়াল খবরটির সত্যতা যাচাই করে নিশ্চিত হয়েছেন। কর্ডোভা থেকে যারা এসেছে তাদের আত্মীয়দের ঠিকানা আমি নিয়ে এসেছি। তুমি ইচ্ছা করলে ওদের সাথে দেখা করেও খবরের সত্যতা যাচাই করতে পারো।'

সাদ বলল, 'না, আমি তাহলে সোজা কর্ডোভা যেতে চাই।'

কিছুক্ষণ পর। সাদ মা ও ভাইদের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ার সওয়ার হলো। যাবার সময় সে আহমদকে বলল, 'আহমদ, তুমি এখন বড় হয়েছ। বাড়িতে আমি যে দায়িত্ব পালন করতাম, সে দায়িত্ব আমি তোমার ওপর দিয়ে গেলাম। আম্মা ও হাসানের দিকে খেয়াল রেখো।'

৫.

কর্ডোভার প্রবেশ পথগুলো ইবনে আক্কাশার সিপাইরা পাহারা দিচ্ছিল। কেউ শহরে ঢুকতে চাইলে তাকে বাইরের ফাঁড়িতে আটকে দেয়া হতো। বেরুতে চাইলেও তাকে সরকারী অনুমতি নিয়ে বের হতে হতো। মুতামিদের যে সব সৈন্য বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদেরকে সেভিলে ফিরে যাওবার অনুমতি দেয়া হলো। যে সব সৈন্য যুদ্ধে নিহত হয়েছিল বা ধরা পড়েছিল, তাদেরকেও স্বপরিবারে কর্ডোভা ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হল।

তবে এদের সাথে মিশে কর্ডোভার কোন প্রভাবশালী স্থায়ী বাসিন্দা যেন শহর ত্যাগ করতে না পারে এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য প্রতিটি ফাঁড়িতে কড়া নির্দেশ দেয়া হলো। কারণ, ইবনে আক্কাশার আক্রমণের সময় কর্ডোভার কিছু নেতৃস্থানীয় লোক শহর থেকে পালিয়ে আশপাশের বাসিন্দাদেরকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিল। এ জন্য স্ত্রীলোক ও শিশু ছাড়া যারাই শহর ত্যাগ করতে চাইতো তাদেরকে লিখিত অনুমতি নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।

সাদ দক্ষিণ ও পূর্বের ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। তারপর সে গেল পশ্চিম ফটকে। ওখানে ফটকের বাইরে পাঁচ শতাধিক লোককে খোলা ময়দানে আশ্রয় শিবিরে অপেক্ষমান দেখতে পেল। এদের অধিকাংশই আক্রমণের আগে নানাবিধ কাজে শহরের বাইরে গিয়েছিল। কেউ কেউ এসেছিল অন্যান্য শহর থেকে আত্মীয়-স্বজনের খবর নিতে। ইবনে আক্কাশা হুকুম দিল, এদেরকে অন্তত দশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এ হুকুম শোনার পর যারা শিবিরে আশ্রয় পেলো না তারা আশপাশের গ্রামে চাষী ও জেলেদের বস্তিতে আশ্রয় নিল।

সাদ ফটক থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। সে দেখতে পেল, ছোট ছোট কাফেলা অনুমতিপত্র দেখিয়ে শহর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। অনেক্ষণ পর সাদ সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কর্তব্যরত অফিসারকে বলল, 'আমি গ্রানাডা থেকে এসেছি। কর্ডোভায় আমার নিকটাত্মীয়রা থাকে। আমি ওদের একটু খোঁজ নিয়েই চলে যাবো। দয়া করে আমাকে একটু শহরে প্রবেশের অনুমতি দিন।'

অফিসার বাইরে অপেক্ষমান লোকজনকে দেখিয়ে বলল, 'ওদের সবারই আপনজন শহরে। ওদের সাথে অপেক্ষা করো, নইলে দশদিন পরে আসো।'

সাদ অনুনয় করে বলল, 'আমার ওপর যদি আপনার সন্দেহ হয় তাহলে আমার সাথে একজন সিপাই দিন, আমি অল্প সময়ের মধ্যেই ওর সাথে ফিরে আসব।'

অফিসার কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল, 'যুবক, তুমি অযথা আমার সময় নষ্ট করছো।'

সাদ একবার ভাবল, যদি আব্বাজানের নাম বলি, তাহলে হয়তো অনুমতি মিলতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই এ বিপ্লব সম্পর্কে লোকমুখে যা শুনেছে তাতে পিতার পরিচয় দেয়া ঠিক মনে হলো না।

এ সময় আরেক লোক এগিয়ে এসে বলল, 'দেখুন, আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। আপনি কর্ডোভার যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, আমি একজন গালিচা-কারিগর, রাজনীতির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

অফিসার তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'দূর হও এখান থেকে, দশ দিনের আগে কারো অনুমতি মিলবে না।'

সাদ তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। অফিসার তার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছো?'

সাদ অফিসারে আরো কাছে সরে এসে বলল, 'আমার জানা ছিল না, বনি এবাদের মত শিয়ালের কবল থেকে মুক্তির বদলে কর্ডোভাবাসী নেকড়ের হাতে পড়েছে। জানলে তোমাদের বিরক্ত করতাম না।'

রাগের চোটে অফিসারটি বেত উচিয়ে আঘাত করল তাকে। প্রথম আঘাতটি সে হাত দিয়ে ঠেকিয়ে দিল, দ্বিতীয়টি পড়ল ঘোড়ার মুখে। ঘোড়া চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল। তাকে সামলাতে গিয়ে একটু সরে এল সাদ। অফিসারটি সামনে যাকে পেল তার ওপরই বেত চালাতে শুরু করল।

ঘোড়ার দাপাদাপিতে বেশ কিছু দূর সরে আসতে হলো সাদকে। ঘোড়াটি শান্ত হলে সাদ খাপ থেকে তলোয়ার বের করে পুনরায় ফটকের দিকে রওনা হল। আচানক এক যুবক এসে ধরে ফেলল ওর ঘোড়ার বাগ। বলল, 'বেকুব নাকি তুমি, এ সময় তরবারি কোষবদ্ধ রাখাই বাহাদুরী। তুমি মাত্র একটি নেকড়ে দেখেছো, কিন্তু কর্ডোভায় এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন হাজার হাজার নেকড়ে।'

সাদ যুবকের দিকে তাকাল। রাখালের বেশে দাঁড়িয়ে ছিল যুবক। কিন্তু যুবকের দিকে তাকিয়েই সাদের মনে হলো, একে আমি নিশ্চয় আগে কোথাও দেখেছি।

যুবক মৃদু হাসল। সে হাসিতে একটি পরিচিত চেহারা ভেসে উঠল সাদের মনের পর্দায়। সাদের চারপাশে ভীড় জমে উঠছিল, তাই দেখে যুবক বলল, 'যদি তুমি গ্রানাডা থেকে এসে থাকো এবং তোমার নাম সাদ বিন আবদুল মুনীম হয়, তাহলে নদীর তীরে তোমার এক বন্ধু তোমার সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি তোমার তার কাছে যাওয়া দরকার।'

যুবক তার ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে নদীর দিকে হাঁটা দিল।

সাদের চারপাশে যেসব লোক জমা হয়েছিল তারা অফিসারের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল। সাদ সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে ঘোড়া নিয়ে নদীর দিকে রওনা হয়ে গেল।

ছদ্মবেশ থাকলেও যুবককে চিনতে পারল সাদ। সাথে সাথে সাদের অন্তরে আনন্দের এক শিহরণ বয়ে গেল। নদী তীরে পৌঁছার আগেই সে যুবককে ধরে ফেলল। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে সে যুবকের হাত ধরল। বলল, 'যদি তোমার পোশাকের মত

মুখের রংটিও কৃত্রিম হয়ে থাকে তাহলে এখানেই আমি আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করতে চাই।'

যুবক তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'চিনতে পেরেছো তাহলে?'

সাদ ইদ্রিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি করে ভাবলে চেহারায় কালি মেখে রাখালের পোশাক পরলেই তুমি বন্ধুকে ধোঁকা দিতে পারবে'? কিন্তু তুমি এখানে কী করছ?'

ইদ্রিস বলল, 'বাহ, তুমি দেখছি আমার ছদ্মবেশের স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছ না। কিন্তু দোস্ত, আমি না ডাকা পর্যন্ত তুমি তো আমাকে সন্দেহও করতে পারনি?'

৬.

নদীর তীরে একটি গাছের সাথে ঘোড়া বেঁধে দু বন্ধু ঘাসের ওপর বসল। সাদ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আম্মা ও বোন কেমন আছে?'

ইদ্রিস বলল, 'কর্ডোভা থেকে পালিয়ে আসার সময় ভালই দেখে এসেছি। তোমার আম্মা ও ভাইয়েরা কেমন?'

'ভাল। আল্লাহর শোকর, গ্রানাডায় এখনও এ জাতীয় হাঙ্গামা বাঁধেনি। তুমি পালালে কিভাবে?'

'দু'সপ্তাহ আগেই আমি এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছিলাম। মুতামিদের মসনদ উল্টে দেয়ার জন্য যারা আন্দোলন করছিল তাদের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। কিন্তু মুনাফিক ও ক্ষমতা লোভীদের একটি দল গোপনে এদের সাথে ভিড়ে যায়। সেদিন আমার এক বন্ধুর ভাইয়ের বিয়ের দাওয়াত খেতে গিয়েছিলাম। খাওয়া দাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হয়ে যায়। বন্ধু আমাকে ওখানে থেকে যেতে বলে। কিন্তু বাসার বাইরে রাত কাটানো পছন্দ নয় বলে মধ্যরাতে আমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। গোয়াদেল কুইভারের কাছে আসতেই অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সাথে সাথে আমি নিজের ঘোড়া নিয়ে রাস্তা থেকে নেমে এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। একটি দ্রুতগামী ঘোড়া সওয়ার নিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল। তার পেছন পেছন আরও কয়েকটি ঘোড়া একই গতিতে ছুটে গেল শহরের দিকে। সেভিলের সৈন্যদের এমন বেপরোয়া গতিতে আগেও ছুটতে দেখেছি, তাই আমি এটাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই ধরে নিলাম। মোটেই ভাবতে পারিনি, সামনের ঘোড়াটিকে কেউ ধাওয়া করছে।

মাইলখানেক যাওয়ার পর দেখলাম কয়েকজন অশ্বারোহী ফিরে আসছে। এবারও আমি ঘোড়া নিয়ে রাস্তার পাশের গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। আমাকে পাশ কাটানোর সময় একজন অশ্বারোহীকে বলতে শোনলাম, 'এখন আমাদের রাস্তা ছেড়ে এদিক সেদিক সরে পড়া উচিত।'

তারা চলে গেলে আমি সড়কে উঠে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চললাম। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখতে পেলাম একটা গাড়ি সড়কের কাছে এক গর্তে উল্টে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে মাটিতে দু'টি লাশ দেখতে পেলাম। হঠাৎ গাড়ির ভেতরে কেউ কাতরে উঠল। বহু কষ্টে উল্টে পড়া গাড়ির ভেতর থেকে একজন আহত ব্যক্তিকে বের করে আনলাম। লোকটি মারাত্মক আহত ছিল। জ্ঞান ফিরতেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

আমি বললাম, আমি একজন পথচারী, আপনাকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ আমাকে এখানে টেনে এনেছে।'

লোকটি বলল, 'এখন আমার কোন সাহায্যের দরকার নেই। কিন্তু যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহলে কর্ডোভাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারো। আমি কয়েকজন লোকের নাম বলছি, তুমি অতিসত্বর সরকারের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির সাথে দেখা করে এদের ব্যাপারে সতর্ক কর। গভর্ণরের সাথে দেখা করতে পারলে আরো ভাল হতো। যদিও সে গর্দভ, তবুও নিজের প্রাণ বাঁচানোর গরজে হয়তো কর্ডোভাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে।'

লোকটি ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বললেও গলার স্বরে তাকে আমি চিনে ফেললাম। বললাম, 'আপনি নিশ্চয় আবদুর রহমান। চলুন, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

'না, না, আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। আমাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া না করে মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোন।'

একটি ছোরা তখনো তার বুকে আমূল বিঁধে ছিল। আমি বললাম, 'যদি এতেই আপনি শান্তি পান, তাহলে ওয়াদা করছি, আমি আপনার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করব।'

এরপর তিনি আমাকে সব ঘটনা খুলে বললেন। ইবনে আম্মার ও গভর্ণর এবাদের সে একজন ঘোরতর দুশমন। আমার বিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় সংগঠক। রাতে এক গুপ্ত বৈঠকে সে জানতে পারে, তার সঙ্গীরা ইবনে আক্কাশার মাধ্যমে মামুন জুন্নুনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করছে। ইবনে আক্কাশা এক সওদাগরের ছদ্মবেশে বৈঠকে যোগদান করেছিল এবং বৈঠকের আগেই এর অধিকাংশ সদস্য তাকে দলের নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিল।

উপস্থিত সকলেই যখন আক্কাশার আনুগত্যের শপথ নিলে আবদুর রহমান তাদের ধিক্কার দিয়ে বলল, 'তোমরা একজন ডাকাতকে নেতা বানাতে চাও? ইবনে আম্মার একটা শেয়াল হলে ইবনে আক্কাশা একটি নেকড়ে। যে বিপ্লব নিরীহ জনগণকে শিয়ালের হাত থেকে মুক্ত করে নেকড়ের মুখে নিক্ষেপ করতে চায় তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

আরো দু'জন প্রভাবশালী নেতা তাকে সমর্থন করল। বৈঠকে এ তিনজনকে বিশ্বাসঘাতক অভিহিত করে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হল। তারা বিপ্লবের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে সভাস্থল থেকে বের হয়ে এলো। ইবনে আক্কাশার এক দল ডাকাত তার

হুকুমের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। ইশারা পেয়েই তারা এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাথের দু'জন খাপ থেকে তরবারি বের করে লড়াই শুরু করে দিল। আবদুর রহমান লড়াই নিরর্থক ভেবে গাড়ি নিয়ে ওখান থেকে সরে পড়ল। ইবনে আক্কাশার বাহিনী তার পিছু ধাওয়া করল। আব্দুর রহমান অনেক দূর এগিয়ে এসে জোহরা প্রাসাদের সামান্য দূরে তাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেল। তার কোচমান ও চাকর নিহত হলো। ওরা আবদুর রহমানকেও মৃত মনে করে ফিরে চলে গেল।

এসব বিবরণ শুনে আমি তাকে বললাম, 'আপনি চাইলে এ বিষয়ে সরকারকে আমি অবশ্যই অবহিত করবো। কিন্তু সবার আগে আপনার চিকিৎসা দরকার।'

তিনি বললেন, 'আগে সে সব লোকদের নাম শুনে নাও যারা কর্ডোভাকে ইবনে আক্কাশা ও মামুনের কাছে বিক্রি করে দিতে চায়। আল্লাহ না করুন, তারা সফল হলে কর্ডোভা নেকড়েদের শিকার ভূমিতে পরিণত হবে। আমি ইবনে এবাদের একজন ঘোরতর দুশমন। কিন্তু এই নেকড়েদের হাত থেকে কর্ডোভাকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে ইবনে এবাদের ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে লড়াই করাকেও সৌভাগ্যের মনে করবো।'

এরপর তিনি আমাকে কর্ডোভার প্রায় বিশজন লোকের নাম বললেন, যাদের বেশীর ভাগই ছিল কর্ডোভার প্রভাবশালী আমির-উমরা। সরকারী উচ্চপদে সমাসীন অনেক কর্মকর্তাও এদের মধ্যে শামিল ছিল।

আবদুর রহমানকে আমি আমার ঘোড়ায় তুলে নিলাম। তার বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে বেশী দূরে ছিল না। পথে কয়েকবার তিনি বেহুশ হয়ে যান, কিন্তু হুশ ফিরে এলেই আবার কথা বলতে শুরু করতেন।

আমি যখন তাকে তার বাড়ি নিয়ে গেলাম তখন তিনি বেহুশ। মনে হচ্ছিল মারাই গেছেন। আমি নামগুলো ভুলে যাবার আশংকায় তাড়াতাড়ি একটা কাগজে তা টুকে নিলাম। তারপর সংক্ষেপে বাড়ির লোকদের প্রশ্নের জবাবে ঘটনা খুলে বললাম।

কয়েকটা নাম নিয়ে আমি বেশ সন্দেহে পড়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর আবার হুশ ফিরে পেয়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন 'সাবধান! তোমার ওয়াদা অবশ্যই পুর্ণ করবে। নামগুলো লিখে নাও।'

তালিকার নামগুলো তাকে আমি পড়ে শুনালাম। তিনি তিনটি নাম সংশোধন করলেন আর আটটি নাম যোগ করলেন। তারপর বললেন, 'তুমি কোথায় থাকো?'

'কাছেই আমাদের বাড়ি, আমি আবদুল জব্বারের ছেলে।'

তিনি বললেন, 'তুমি এক বাহাদুর বাপের বেটা। এবার আমার চিন্তা দূর হলো।'

যখন মসজিদের মিনার থেকে ফজরের আযান ভেসে এলো তখন আবদুর রহমান আর এ দুনিয়ায় নেই।

বাড়ি গিয়ে গভর্ণরের নামে আমি একটা চিঠি লিখলাম। তাতে আবদুর রহমান যা

বলেছিল তার সবকিছুই ছিল। দুপুরে গভর্ণর হাউজে গেলাম তার সাক্ষাতের আশায়। কিন্তু দেখা করার কোন উপায় বের করতে পারলাম না। বিকেলে জোহরা প্রাসাদের নায়েমকে বললাম গভর্ণরের সাথে দেখা করিয়ে দেয়ার জন্য। নায়েম বলল, 'তোমার বক্তব্য লিখে আমার কাছে জমা দিয়ে যাও, আমি তা গভর্ণরের কাছে পৌঁছে দেবো।'

আমি চিঠিটা নায়েমকে দিয়ে বললাম, 'আজই যদি এটা গভর্ণরের কাছে পাঠাতে পারেন তাহলে হয়তো কর্ডোভা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাবে।'

সন্ধ্যায় আমার বাল্যবন্ধু কোতোয়াল-পুত্র আমাদের বাড়ি এসে বলল, 'ইদ্রিস, তাড়াতাড়ি আমাদের বাসায় চলো। আব্বা তোমাকে এখনি আমার সাথে যেতে বলেছেন।'

আমি তার সাথে কোতোয়ালের বাড়ি পৌছলাম। তিনি আমাকে দেখেই পেরেশান হয়ে বললেন, 'ইদ্রিস, তুমি কি করেছো বলতো! কিছুক্ষণ আগে গভর্ণরের কাছ থেকে তোমাকে গ্রেফতার করার হুকুম এসেছে। বলা হয়েছে, পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কারাগারের কোন অন্ধ প্রকোষ্ঠে যেন তোমাকে আটকে রাখি। এ আদেশের অর্থ তুমি বুঝ?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি ঠাট্টা করছেন!'

তিনি বললেন, 'না ইদ্রিস, আমি ঠাট্টা করছি না। এ আদেশের অর্থ হচ্ছে, তোমাকে কখনো আদালতে তোলা হবে না। বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলখানায় পঁচে মরবে তুমি। তোমার কোন ফরিয়াদ কারো কানে পৌছবে না। হয়তো আর কোনদিন মুক্ত আলো বাতাসে বেরিয়ে আসতে পারবে না তুমি। এখন বলো, তুমি এমন কি অপরাধ করেছো যার জন্য এ কঠিন অবস্থায় পড়েছো তুমি?'

আমি তাকে সব কিছু খুলে বললাম। কোতোয়াল হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে তিনি বললেন, 'লোকগুলোর নাম বলতো!'

আমি পকেট থেকে তালিকাটি বের করে সবগুলো নাম তাকে পড়ে শোনালাম।

কোতোয়াল একটি নাম শুনে চমকে উঠে বললেন, 'আহম্মক! তুমি তো দেখছি স্বেচ্ছায় কুমীরের গর্তে ঝাঁপ দিয়েছ! যাদের বিরুদ্ধে তুমি অভিযোগ আনছো তাদের মধ্যে জোহরার নায়েমের ভাতিজাও যে রয়েছে!

বুঝেছি, নায়েম তোমার চিঠি পড়েছে এবং সে-ই গভর্ণরকে দিয়ে তোমার গ্রেফতারীর আদেশ জারি করিয়েছে। তোমার এ গ্রেফতারী মৃত্যুর চাইতেও ভয়ংকর হবে। তালিকায় আরো যাদের নাম আছে তারাও বেশ প্রভাবশালী। গভর্ণর তাদেরই হাতের ক্রীড়নক।'

আমি বললাম, 'আমাকে একবার গভর্ণরের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিন। আমার বিশ্বাস, আমি তাকে বিষয়টি বুঝাতে পারবো।'

তিনি বললেন, 'বোকা ছেলে! তুমি কি মনে কর ওরা তোমাকে গভর্ণরের কাছে

পৌছতে দেবে? আর যদি কোন ভাবে সেখানে পৌছেই যাও তাহলে কি তাদের কথা না শুনে গভর্ণর তোমার কথা শুনবেন? তোমার বাঁচার এখন একটিই পথ খোলা আছে, আর তা হচ্ছে, পালিয়ে যাওয়া। তুমি যদি কর্ডোভাকে রক্ষা করতেই চাও তাহলে সোজা সেভিল যাও এবং মুতামিদকে সব কিছু জানাও। তাঁর কাছে পৌছতে না পারলে তাঁর অফিসারদের সাথে দেখা করো। তাও না পারলে মসজিদের খতিবের সাথে দেখা করো অথবা চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে সকলের কাছে বলো তুমি যা জেনেছো। কেউ না কেউ তোমার কথা অবশ্যই শুনবে। আর কেউ যদি নাও শুনে তবু নিজের বিবেককে এই বলে প্রবোধ দিতে পারবে যে, তোমার পক্ষে সম্ভব সব কিছুই তুমি করেছো।'

তিনি আরো বললেন, 'আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমি তোমাকে গ্রেফতার না করলে আমাকে বরখাস্ত করে অন্য কোতোয়ালকে দিয়ে এ কাজ করানো হবে। জোহরার নায়েম বলেছে, তোমাকে গ্রেফতার করার সাথে সাথেই যেন তাকে জানানো হয়। সে নিশ্চয় উদ্বেগের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। হতে পারে, তার চর এতক্ষণে তোমার বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। এখন কথা বলার সময় নেই। শহর থেকে তিন মাইল দূরে সেভিলগামী সড়কে একটা সরাইখানা আছে। তুমি ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করো। এশার নামাজের পর আমি তোমার জন্য ঘোড়া এবং খরচপত্র ছাড়াও মুতামিদের নামে একটা চিঠি পাঠিয়ে দেব। তুমি তার সাথে দেখা করতে পারলে অবশ্যই বলবে, তোমার সেভিল যাওয়ার পেছনে আমার সহায়তা ছিল। তুমি আর বাড়ি যাবে না, এখান থেকে এখনই রওনা দাও। তোমার আম্মাকে আমি সবকিছু বুঝিয়ে বলবো।'

কোতোয়ালের ছেলে আমাকে সরাইখানায় রেখে চলে গেল। এশার নামাজের পর কোতোয়ালের একজন চাকর আমার জন্য ঘোড়া, কিছু অর্থ এবং কোতোয়ালের চিঠি নিয়ে এল। আমি সাথে সাথে সেভিল রওনা হয়ে গেলাম।

সেভিলের শাহী প্রাসাদে তখন উৎসব চলছিল। কবিগান, জুয়া ও পাশা খেলায় মত্ত সবাই। নর্তকী আর মদ নিয়ে মেতে আছে আমীর ওমরারা। দশদিনের দীর্ঘ চেষ্টায় মসজিদের এক খতিব সাহেবের বদৌলতে অবশেষে মুতামিদের সাথে দেখা করার সুযোগ হলো। কিন্তু যখন আমি মুতামিদকে আমার সেভিল যাওয়ার কারণ বর্ণনা করে শোনাচ্ছিলাম ঠিক সে সময় কর্ডোভা থেকে দূত এসে জানাল, মুতামিদের পুত্র এবাদ নিহত হয়েছে, কর্ডোভা দখল করে নিয়েছে ইবনে আক্কাশা।

মুতামিদ এ খবর শুনেই হুকুম জারী করলেন, 'যে সব প্রহরী ও অফিসার এতদিন এ যুবককে আমার কাছে পৌছতে দেয়নি তাদের গ্রেফতার করো।' তারপর তিনিই সেভিলে আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

আমি আমার মা ও বোনের খোঁজ নিতে কর্ডোভা এসেছি। এসে শোনলাম, ইবনে আক্কাশার লোকেরা তন্ন তন্ন করে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমি খুব ভোরে এখানে পৌছি। প্রথমে গেলাম মদিনাতুজ-জোহরার গেটে।

সেখানকার পাহারাদারদের পাহারা খুব কড়া। ওই পথে প্রবেশ করা বিপজ্জনক। তা ছাড়া, ওই এলাকার অনেকেই আমাকে চেনে। তাই এদিকে চলে আসি।

খবর নিয়ে জানলাম, গ্রাম থেকে ফল-মূল, শাকসবজি, তরকারী, জ্বালানী ও পশুপালিত পশুর মাংস যারা বিক্রি করতে আসে তাদেরকে কর্ডোভার পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। তাই জ্বালানী কাঠের বোঝা নিয়ে আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এখানে অপেক্ষা করছি।

এখান থেকে একটু দূরে এক বস্তিতে আমি আমার ঘোড়া রেখে এসেছি। সে বস্তির এক চাষী কিছুদিন আমাদের বাগানে মালির কাজ করেছে। সে-ই আমাকে এ পোশাক দিয়েছি। শহর থেকে যারা বেরুচ্ছে তাদের মধ্যে পরিচিত কাউকে পেলেও আম্মা ও বোনের খবরটা নিতে পারতাম। এখন তুমি বল, কিভাবে এখানে এলে?'

সাদ বলল, 'আব্বাজানের খবর নিতে এসেছি আমি। শুনেছিলাম, বিপ্লবীরা সবার আগে কয়েদখানার দরজা খুলে দেবে। কিন্তু অবস্থা যা দেখছি তাতো আরো ভয়াবহ। আব্বা ইবনে আক্কাশার আনুগত্য কবুল করে মুক্ত হওয়ার চাইতে কারাবাসই অধিক পছন্দ করবেন। আর তুমি এতক্ষণ যা বললে তাতে আমার মনে হয়, শহরে প্রবেশ করা তোমার কিছুতেই ঠিক হবে না। তুমি যে জন্য এ ঝুঁকি নিতে চাচ্ছ, সে কাজ আমি সহজেই করে আসতে পারবো। তুমি তোমার আম্মা ও বোনকে সেভিল নিয়ে যেতে চাইলে আমি তাদেরকে তোমার কাছে পৌঁছে দেবো।

ইদ্রিস, আমার সমস্যা কেবল শহরে প্রবেশ করা। একবার ভেতরে যেতে পারলে সেখানে ঘুরে বেড়াতে আমার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তোমার জন্য কর্ডোভার কোন জায়গাই নিরাপদ নয়। ওরা তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। মর্দানাতুজ-জোহরায় তোমাদের বাড়িতে এমনকি কর্ডোভায় তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতেও নিশ্চয় পাহারা দেওয়া হচ্ছে। এমন না হয়, পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে উল্টো তাদেরকে আরো বিপদে জড়িয়ে ফেললে।'

ইদ্রিস কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'যদি আল্লাহ তোমাকে আমার সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে আমি অযথা নিজেকে বিপদে ফেলতে চাই না।'

সন্ধ্যা হয়ে আসলে ইদ্রিস ও সাদ নদী তীরে নামাজ আদায় করে বস্তির দিকে রওনা হয়ে গেল। চাষীর ঘরেই রাত কাটাল ওরা। খুব ভোরে সাদ একটি গাধার পিঠে জ্বালানী কাঠ বোঝাই করে শহরের দিকে রওনা হল।

একে বিদায় দেয়ার সময় ইদ্রিস বলল, 'সাদ, এমন সুদর্শন কাঠুরিয়া আমি জীবনে দেখিনি। তোমাকে তো মনে হয় সৈনিক। আমার ভয় হচ্ছে, তুমি হয়তো পাহারাদারদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না।'

'নিশ্চিন্ত থাকো বন্ধু, পাহারাদাররা তোমার চোখ দিয়ে আমাকে দেখবে না।' হাসতে হাসতে বলল সাদ।

৭

আস্তাবলের সামনে একটি কাঠের তক্তায় বসে গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল আলমাস। হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন উচ্চস্বরে হাঁক দিল, 'লাকড়ি লাগবে, লাকড়ি।'

আলমাস চমকে পেছন ফিরে রাগের সাথে বলে উঠল, 'ভাগো এখান থেকে, আমার কোন জ্বালানীর দরকার নেই।'

হঠাৎ কাঠ বোঝাই গাধার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হল তার। গাধাটি ততক্ষণে আস্তাবলের সামনে এসে ঘাস খেতে শুরু করেছে। আলমাস রেগে আগুন হয়ে গেল। লাঠি নিয়ে গাধার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। গাধাটি মার খেয়ে বাগানের দিকে সরে গেল। কাঠ নিয়ে আসা যুবক এগিয়ে আলমাসের হাত ধরে ফেলল।

আলমাস নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। রেগে লাকড়িওয়ালার দিকে ভাল করে তাকাতেই তার ক্রোধ খুশীতে পরিণত হল। সাদকে বুকে চেপে ধরে বলল, 'সাদ, তুমি!'

'আগে বলুন, আব্বাজানের খবর কি?'

আলমাস দুঃখের সাথে বলল, 'এখনো জানি না। তার কোন সঙ্গীই এখনো মুক্তি পায়নি।'

আলমাস সাদকে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিল, কিন্তু চাকর-বাকররা সামনে থাকায় সে তাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ির ভেতর গেল। ঘরে ঢুকেই আলমাস মুখ খুলল, 'কর্ডোভায় তোমার উপস্থিতি নিরাপদ নয়। তুমি এ সময় কোত্থেকে কিভাবে এলে? কেউ দেখে ফেলেনি তো? দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো, আমি আসছি।'

আলমাস চাকরদেরকে সতর্ক করার জন্য বাইরে পা বাড়াবার উদ্যোগ করতেই সাদ বলল, 'চাচা, এত ঘাবড়াচ্ছো কেন? দেখছো না আমি ছদ্মবেশে আছি। কেউ আমাকে চিনবে না। জরুরী কাজ আছে, তুমি আমার জন্য ছাত্রদের এক সেট পোশাক জোগাড় করে দাও। আমি এখনি বাইরে বের হবো।'

আলমাস বলল, 'আমি মনিবের সব বন্ধুদের সাথেই আলাপ করেছি। তারা বলেছেন, ইবনে আব্বাসা কয়েদীদের মুক্তি দেয়ার আগে টলেডোর শাসক মামুনের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করাবে। মামুন হয়তো দু'একদিনের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবে।'

'কিন্তু তোমার কি মনে হয় কর্ডোভাবাসী মামুনের আনুগত্য কবুল করবে?'

আলমাস উত্তর দিল, 'কর্ডোভাবাসী এখন ভেড়ার পালে পরিণত হয়েছে। যার হাতে লাঠি, সে-ই তাদের হাঁকিয়ে বেড়াতে পারবে। একদল তাদেরকে সেভিলের শাসকের কাছে বিক্রি করেছে, আরেক দল টলেডোর শাসকের কাছে নিয়ে যাচ্ছে বিক্রির জন্য।

ইবনে আক্কাশা যে রাতে গভর্ণরের মহল দখল করল সে রাতে অন্যান্য অনেকের মত আমিও খুশী হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সেভিলের গোলামী থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য আল্লাহই তাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু পরের দিনই জানতে পারলাম, সে কর্ডোভার নাগরিকদের কাছ থেকে মামুনের জন্য আনুগত্যের শপথ আদায় করছে। আর যারা আপত্তি জানাচ্ছে তাদেরকে সাথে সাথে ফাঁসীতে লটকে দিচ্ছে।

বিপ্লবের এক সপ্তাহ আগে থেকেই আক্কাশার লোকজন শহরে এসে উঠে নিচ্ছিল। কর্ডোভার আজাদী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবে মনে করে জনগণ এদেরকে নিজেদের ঘরে আত্মগোপন করার সুযোগ দেয়। কিন্তু আক্কাশার সাথে আসা এ সব লোক ছিল মামুনের সৈন্য। আগে জানলে এ সব লোকদেরকে আমি কিছুতেই এ বাড়িতে ঠাঁই দিতাম না। দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষার মত চারদিন ধরে পনের জন লোককে কি জামাই আদরই না করেছি।'

সাদ জিজ্ঞেস করল, 'ইদ্রিসদের খবর কি?'

'আমিও সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। বিপ্লবের কয়েকদিন আগেই ইদ্রিস গায়েব হয়ে যায়। পুলিশ হন্যে হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শহরের অলিগলি, বাজার এমন কি প্রতিটি বাড়িতে তাকে খোঁজা হয়েছে। আক্কাশার লোকেরা এবাদের সিপাইদের চাইতেও ইদ্রিসের জন্য বেশী পেরেশান ছিল।

আমি খুব অবাক হয়েছি, সে একই সাথে সেভিল ও কর্ডোভা উভয় শাসকের দুশমন হয়ে গেল কি অপরাধে! শহরে তার প্রতিটি আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে তল্লাশী করা হয়েছে। সে তীরন্দাজী শেখার জন্য কখনো কখনো আমার কাছে আসতো, এজন্য এ বাড়িতেও তল্লাশী চালানো হয়। তার মামা, তার মা ও বোনকে মদীনাতুজ-জোহরা থেকে শহরে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদেরকে গৃহত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

কাল তার মামার সাথে মসজিদে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, ইদ্রিসদের বাড়িতে পুলিশী পাহারা আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে। ইদ্রিসের বার বছর বয়সী মামাতো ভাই ইদ্রিসের মা ও বোনকে দেখতে গিয়েছিল। ও ইদ্রিসের খবর জানে সন্দেহে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার কাছ থেকে ইদ্রিসের সন্ধান বের করার জন্য তাকে নিষ্ঠুরভাবে মারপিট করেছে। অথচ সে বেচারা তো দূরের কথা, তাদের পরিবারের কেউই ইদ্রিসের হদিস জানে না।'

সাদ জিজ্ঞেস করল, 'তার মা ও বোনের সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করা হয়নি তো?'

'সেভিলের শাসকরা পুলিশকে কখনো মহিলাদের ওপর হাত উঠাতে অনুমতি দেয়নি। কিন্তু এখন এক হায়েনার হাতে শাসন ক্ষমতা। ওদের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।'

সাদ বলল, 'আমি তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি ইদ্রিসের কাছে পৌছে দিতে চাই।

সে শহরের বাইরে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'তার সাথে তোমার দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কবে?'

'গতকাল।'

'তুমি কি জানো সে কি অপরাধ করেছে?'

'সে ইবনে আক্কাশার ষড়যন্ত্র সেভিলের শাসকদের কাছে ফাঁস করে দেয়ার চেষ্টা করেছিল।'

'তাহলে সেভিল প্রশাসনও তাকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছে কেন?'

এ প্রশ্নের জবাবে সাদ সংক্ষেপে ইদ্রিসের কাহিনী বর্ণনা করল।

৮.

মোমবাতির আলোয় ইদ্রিসের বোন মায়মুনা একমনে বই পড়ছিল। পাশের কামরায় তার মা এশার নামাজ শেষে প্রতিদিনের মত অজিফা পড়ছিল। এমন সময় কে যেন দরজায় মৃদু করাঘাত করল।

মায়মুনা প্রথমে চমকে উঠল। তারপর বালিশের নীচ থেকে লুকানো খঞ্জর টেনে নিয়ে নিঃশব্দে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজার খিল ভেতর থেকে বন্ধ। মায়মুনা দরজার সাথে কান লাগিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল কে এসেছে। দরজায় আবার করাঘাত হল, মায়মুনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

বাইরে থেকে আস্তে জবাব এল, 'ভয় পেয়ো না, আমি সাদ। ইদ্রিসের খবর নিয়ে এসেছি।'

ততক্ষণে মায়মুনার মা পাশের কামরা থেকে মায়মুনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখে মুখে তার ভীতির ছাপ। আস্তে করে বললেন, 'কি হয়েছে, মায়মুনা?'

মায়মুনার পরিবর্তে বাইরে থেকে জবাব দিল সাদ, 'আমি সাদ বিন আবদুল মুনীম। ইদ্রিস আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে।'

মায়মুনার আম্মা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। লাফিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল সাদ। সৈনিকের পোশাক পরা ছিল তার। মায়মুনা ও তার আম্মা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় তার দিকে তাকিয়েছিল। সাদ পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে ইদ্রিসের মায়ের হাতে দিয়ে বলল, 'আমার আশংকা ছিল, আপনারা হয়তো আমাকে চিনতে পারবেন না। এ জন্য আমি ইদ্রিসের হাতের লেখা চিঠি নিয়ে এসেছি।'

ইদ্রিসের মা দরজা বন্ধ করে বাতির কাছে বসে সবেমাত্র চিঠি পড়া শুরু করেছে, হঠাৎ পেছনের কামরার দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল এবং নারী কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে

এলো, 'মায়মুনা! মায়মুনা!'

মায়মুনা ভয় পেয়ে মায়ের দিকে তাকাল। করিডোর থেকে ভেসে এল কারো পায়ের আওয়াজ। মায়মুনার মা পেরেশান হয়ে বললেন, 'বাবা, তুমি একটু পেছনের কামরায় লুকাও। ও আমাদের নতুন চাকরাণী, জোহরার নায়েমের নিয়োগ করা গুপ্তচর।'

সাদ তাড়াতাড়ি পেছন দিকের এক কামরায় গিয়ে আত্মগোপন করল। মায়মুনা মা দ্রুত ইদ্রিসের চিঠি লুকিয়ে ফেলল।

চাকরাণী দরজার কাছে এসে বলল, 'কেউ কি বাইরে থেকে এসেছে?'

'এত রাতে আবার কে আসবে?'

'দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম যে।'

'মায়মুনা দরজা খুলেছিল, আমি বন্ধ করে দিয়েছি।'

'তাহলে কথা বলল কে?'

'আমিই তো মায়মুনার সাথে কথা বলছিলাম।'

'না, মনে হলো পুরুষের গলা।'

ইদ্রিসের মা দরজা খুলে বারান্দার দিকে উঁকি দিয়ে বলল, 'তাহলে হয়তো চাকররা কথাবার্তা বলেছে।'

চাকরাণী ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'মায়মুনা, তুমিও কি কোন আওয়াজ শোননি?'

মায়মুনা বিরক্তির সুরে বলল, 'তোমার কান দু'টোকে ডাক্তার দেখাও।'

মায়মুনার আত্মপ্রত্যয় দেখে চাকরাণীর সন্দেহ দূর হলো। সে আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

ইদ্রিসের মা পুনরায় দরজা বন্ধ করলেন। ক্রমে চাকরাণীর ফিরে যাবার পদশব্দ মিলিয়ে গেল। অবশেষে যখন চাকরাণীর রুমের দরজা খোলা ও বন্ধের আওয়াজ পেলেন, তখন তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

এরপর মায়মুনার দিকে ফিরে বললেন, 'ওর সাথে এমন কঠিন ব্যবহার করা ঠিক হয়নি তোমার। ক্ষেপে গিয়ে ও যদি তল্লাশী চালাতো তাহলে কি অবস্থা হত বলোতো?'

মায়মুনা বলল, 'তাহলে আমি ওর বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিতাম।'

সাদ বেরিয়ে এলো লুকানো জায়গা থেকে। বলল, 'আমার বিশ্বাস মায়মুনা অন্যরকম আচরণ করলে চাকরাণীর সন্দেহ আরো বাড়তো।'

'বাবা, তুমি ওকে চেন না। শোয়ার আগে ও নিশ্চয়ই চাকরদের সতর্ক করবে। আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, এমন কড়া পাহারা ভেদ করে তুমি বাড়িতে ঢুকলে কি করে?'

'আমি পেছনের দেয়াল টপকে এসেছি।'

ওরা ভেতরের রুমে এসে বসল। সাদ সংক্ষেপে ইদ্রিসের সাথে তার সাক্ষাতের

কাহিনী বর্ণনা করল। শেষে বলল, 'দেরী না করে সব কিছু গোছগাছ করে নিন। যত দ্রুত সম্ভব এ বাড়ি ছেড়ে রওনা হতে হবে আপনাদের।'

মায়মুনার মা বললেন, 'বাবা! তোমার বোধ হয় জানা নেই, আমাদের সব পুরোনো চাকরদের বিদেয় করে দেয়া হয়েছে। বাইরের ঘরে যে দু'জন আছে তারাও পুলিশের লোক। আর চাকরাণীকে তো তুমি দেখলেই।

পরশু আমার নাবালক ভাইপো আমাদের দেখতে এসেছিল, পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তার সাথে কি ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহ মালুম।'

সাদ বলল, 'তার ওপর খুবই জুলুম করা হয়েছে। ভীষণ মারপিট করা হয়েছে ওকে। ওরা ভেবেছিল, ও ইদ্রিসের খবর নিয়ে এসেছে, তাই ওরা ওর কাছ থেকে ইদ্রিসের সন্ধান পাবার চেষ্টা করছিল। এখন সে বাড়িতেই আছে।'

'এ অবস্থায় তুমিই বলো, আমরা কেমন করে বের হবো?'

'এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করেই এসেছি।'

মায়মুনার আম্মা বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের নিতে এসে ইদ্রিস না আবার নিজেই গ্রেফতার হয়ে যায়! সাদ, ওকে তুমি সেভিল ফিরে যেতে বল, অবস্থা স্বাভাবিক হলে আমরা নিজেরাই এখান থেকে রওনা হয়ে যাবো।'

সাদ বলল, 'খালাম্মা, সে কর্ডোভার বাইরে নিরাপদ জায়গাতেই আছে। আপনি তার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, আপনারা ততক্ষণে তৈরী হয়ে নিন।'

মায়মুনা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'খবরদার! আপনি পাহারাদারদের সাথে কোন টক্কর দিতে যাবেন না। এখানে তারা দু'জন হলেও টহলদার সিপাইরাও তাদেরই লোক।'

'না, মায়মুনা, আমি আজ লড়াই করতে আসিনি। তবে যদি লড়াই বেঁধেই যায় তাহলে আমি একা নই, তোমাদেরও লড়তে হবে।'

সাদ আস্তে করে দরজা খুলে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে গেল। মা-মেয়ে নিস্পলক পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

৯.

অল্প সময়ের মধ্যেই মায়মুনা ও তার মা তৈরী হয়ে নিল। অলংকারাদি ছাড়াও একটি পুঁটলিতে কাপড়-চোপর বেঁধে নিল মায়মুনা। ইদ্রিসের চিঠিটা দেখিয়ে বলল, 'আম্মা, এটা কি করবো?'

'পুড়ে ফেলো।'

মায়মুনা চিঠিটা পুড়ে ফেলল। মা বললেন, 'আল্লাহর শোকর, তুমি এটা খেয়াল করেছ। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। এটা এখানে ফেলে গেলে ভীষণ ক্ষতি হয়ে

যেতে পারতো।'

হঠাৎ দেউড়ির কাছ থেকে গোলমালের আওয়াজ ভেসে এল। মায়মুনা খঞ্জর হাতে নিয়ে বলল, 'আম্মা, ও বোধ হয় পাহারাদারদের সাথে লড়াই শুরু করে দিয়েছে।'

মায়মুনা খঞ্জর হাতে বের হওয়ার উদ্যোগ করতেই মা এগিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরল। বলল, 'দাঁড়াও, এ অবস্থায় আমাদের সামান্য ভুল মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

মায়মুনাকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই দরজার কাছে দাঁড়ালেন। কিন্তু দেউড়ির দিকের গোলমাল থেমে গেল, সেদিক থেকে এখন আর কোন আওয়াজ আসছে না।

হঠাৎ চাকরাণী 'মায়মুনা, মায়মুনা' বলে ডাকতে ডাকতে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। মায়মুনা বলল, 'আম্মা, ওকে ভেতরে আসতে দিন, নইলে ও গোলমাল করবে।'

কামরার কাছে এসে চাকরাণী আবার বলল, 'মায়মুনা, গোলমাল কিসের? কথা বলছ না কেন মায়মুনা? দরজা খোল!'

'দরজা খোলাই আছে। কিন্তু তোমার এতো উৎকণ্ঠা কিসের?'

চাকরাণী ভেতরে এসে বলল, 'তুমি আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না। ইদ্রিস একটু আগে এখানে এসেছে এবং তোমরা তাকে লুকিয়ে রেখেছ।'

হঠাৎ মায়মুনা খঞ্জরটি চাকরাণীর বুকে চেপে ধরল। চাকরাণী ভয়ে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করলে মায়মুনা বলল, 'চীৎকার করো না, কথা না শুনলে খঞ্জর সোজা তোমার পেটে ঢুকিয়ে দেবো।'

'না, না, আমি তো তোমাদের সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করিনি। দেখো, খঞ্জরটি খুব ধারাল। এ ধরনের ঠাট্টা ভাল নয়। আলকিন, আপনি ওকে নিষেধ করুন।'

মায়মুনা আবারো হিসহিসিয়ে বলল, 'দেখো, আমি আবারো বলছি, গোলমাল করো না। প্রাণের মায়া থাকলে সোজা ওই কামরায় চলে যাও। নইলে...' মায়মুনা খঞ্জরটি আরেকটু সামনের দিকে ঠেলে দিল।

চাকরাণী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার কথা মতো পাশের কামরায় চলে গেল। মায়মুনা শিকল টেনে বাইরে থেকে কপাট বন্ধ করতে করতে বলল, 'মুনাফিকরা সব সময় ভীতু হয়। খবরদার! ভেতর থেকে চীৎকার বা গোলমাল করলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমরা সরে পড়বো।'

এ সময় উঠানে সাদের গলা শোনা গেল। মা ও মেয়ে বের হয়ে এলো কামরা থেকে। মুখোশ পরে আছে সাদ। সাথে তারই মত মুখোশ পরা আরেকজন। সাদ ওদের কাছে এসে বলল, 'মায়মুনা, চাকরাণী কোন কামরায় থাকে?'

'আমি তাকে ওই ঘরে বন্দী করে রেখেছি।'

'খুব ভাল করেছো। এখন তোমাদের চাকরদের জন্যও একটি কামরা দরকার।'

'ওদের জন্য আমাদের গোসলখানাই যথেষ্ট।'

'বেশ, কোথায় তোমাদের গোসলখানা?'

মোমের আলোয় সাদকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল মায়মুনা। চাকরটির মুখের ভেতরে কাপড় গুঁজে দেয়া। সাদ তাকে এক ধাক্কায় গোসলখানায় ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

সাদ সঙ্গীকে বলল, 'এবার অন্যজনকেও নিয়ে এসো।'

মুখোশধারী দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় চাকরটিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এনে গোসলখানায় ঢুকিয়ে দিল।

চাকরের এ দুরবস্থা দেখে মায়মুনার খুব হাসি পাচ্ছিল। গোসলখানার দরজা বন্ধ করে সাদ চাকরাণীকে রাখা কামরায় ফিরে এলো। বলল, 'মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তোলা পছন্দ করি না আমি। কিন্তু চীৎকার করার চেষ্টা করলে তোমার গলা টিপে দিতে মোটেও দ্বিধা করবো না।'

মায়মুনা বলল, 'ওকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। গোলমাল করলে আমি ওর ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো।'

সাদ কামরার দরজা বন্ধ করে চাকরাণীকে ভয় দেখানোর জন্য তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলল, 'সবাই ঘুমিয়ে পড়ুন। ভয়ের কিছু নেই। আমরা সারা রাত এ কামরা পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করছি।'

১০.

সাদের সাথে মুখোশ পরা লোকটি ছিল আলমাস। মধ্য রাতে সে মায়মুনা ও তার মাকে সঙ্গে নিয়ে নিঃশব্দে আঙ্গিনায় নেমে এলো। সাদ বাড়ির ফটক খুলে এদিক ওদিক দেখে নিল। রাস্তায় কয়েকজন মানুষের পদশব্দ এদিকেই এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে সে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে এলো। আলমাস বলল, 'বাড়ির পেছন দিক দিয়ে দেয়াল টপকে গেলেই ভাল হয়।'

'দাঁড়াও।' বলে সাদ দরজার ফাঁক দিয়ে আবার বাইরের দিকে তাকাল। পায়ের শব্দ কাছে চলে এসেছিল। আলমাস আস্তে করে বলল, 'দরজা বন্ধ করে দাও, মনে হচ্ছে টহল পুলিশ।'

সাদ ফটক বন্ধ করে দিল। টহলদাররা চলে গেলে সে দরজা খুলে বাইরের অবস্থা ভাল করে দেখে বলল, 'এখন রাস্তায় কেউ নেই, সবাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসুন।'

বড় রাস্তা দিয়ে সামান্য একটু এগিয়েই ওরা এক বাগানে প্রবেশ করল। অন্ধকারের কারণে পায়ে চলা সরু পথ দেখা যাচ্ছিল না। সাদ বলল, 'চাচা, তুমি আগে যাও, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল আমাদের।'

আলমাস সবার আগে আগে চলতে শুরু করল।

মুদিনাতুজ-জোহরার শাহী প্রাসাদ ও তার কর্মচারীদের বাস ভবনের চারদিকেই বহুদূর পর্যন্ত সবুজ শ্যামল বাগিচা বিস্তৃত ছিল। ফুলের বাগান ছাড়াও পাইন, নাশপাতি, আপেল, ডালিম ও নানা রকম ফলের গাছে ভরা ছিল বিস্তর এলাকা। কৃত্রিম নালা কেটে ওতে পানি দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। বর্ষার ঢল নেমে এলে এসব নালাই হয়ে উঠতো পাহাড়ী নদীর মত স্রোতোস্বিনী।

গত কয়েক মাসের অনাবৃষ্টির দরুণ এসব নালাগুলো ছিল শুকনো। এ বাগানের ভেতর দিয়েই দীর্ঘ দু'তিন মাইল হেঁটে ওরা গোয়াদেল কুইভারের তীরে এসে পৌছল।

আলমাস বলল, 'আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন! আমি আসছি।' একথা বলেই আলমাস তার হাতের পুঁটুলিটি মাটিতে রেখে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্লান্ত মায়মুনা ও তার মা সেখানেই মাটির ওপর বসে পড়ল।

সাদ বলল, 'আপনার খুব কষ্ট হলো। আমি একবার ঘোড়ার ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু তাতে উপকারের চেয়ে অপকারের সম্ভাবনাই বেশী ছিল।'

'বাবা, ইদ্রিসকে একবার দেখতে পারলে আমার আর কোন ক্লান্তি থাকবে না। ও আর কত দূরে?'

নদী পার হওয়ার পর আমাদের খুব বেশী হলে মাত্র আধা মাইল হাঁটতে হবে। দোয়া করুন যাতে নৌকাটা ঠিক মত আসে।'

'আর যদি নৌকা না আসে?'

'তাহলে আশপাশের বস্তি থেকে অন্য কোন নৌকা জোগাড় করতে হবে। আর যদি তাও না পাই তাহলে আমি সাঁতরে ওপারে চলে যাবো এবং ইদ্রিসকে ডেকে নিয়ে আসবো। আমাদের দুজনেরই ঘোড়া আছে। এখান থেকে কয়েক মাইল এগুলে একটি পুল পাওয়া যাবে। ওটা পার হলেই সেভিলগামী সড়কে পৌছে যাবো আমরা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, নৌকা নিশ্চয় এসে যাবে। কারণ আলমাস যাকে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছে সে খুবই হুশিয়ার।'

১১.

নদীর তীরে পৌছে ওরা অপেক্ষার প্রহর গুণছিল। মায়মুনা ছোট ছোট পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারছিল নদীতে। হঠাৎ তার মা সাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাদ! আমাকে মাফ কর বাবা! সীমাহীন দুশ্চিন্তায় আমি তোমার মা ও ভাইদের খবর জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গিয়েছিলাম। তারা কেমন আছে?'

'তারা ভালই আছে। আম্মাজান আমাকে কর্ডোভা পৌছেই আপনাদের খোঁজ নিতে বলেছিল।'

'তোমার আব্বাজানের কি কোন খোঁজ পেলে?'

'তিনি এখনো জেলেই আছেন।'

মায়মুনা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আপনিও কি আমাদের সাথে সেভিল যাবেন?'

'না, তোমাদেরকে ইদ্রিসের হাতে তুলে দিয়েই আমাকে কর্ডোভা ফিরে আসতে হবে। এখনো আব্বাজানের সাথে আমি কোন যোগাযোগ করতে পারিনি।'

মায়মুনার মা বললেন, 'বাবা, তাঁর সন্ধান পেলে আমাদের অবশ্যই জানাবে। খোদা না করুন, তিনি মুক্তি না পেলেও বেশি দিন তোমার কর্ডোভা থাকা উচিত হবে না। কারণ, ইবনে আক্কাশা প্রতিটি ভাল লোককেই তার শত্রু মনে করে।'

সাদ জওয়াব দিল, 'ঠিকই বলেছেন আপনি। স্পেনের বিশাল ভূখণ্ড আল্লাহর নাম নেয়া লোকদের জন্য ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে।'

'আল্লাহই জানেন, এর পরিণাম কি হবে।'

দূর থেকেই আলমাস তাদের চেঁচিয়ে ডাকল, 'সাদ, তোমরা এসে গেছো?'

ডাক শুনে সাদ, মায়মুনা ও তার মা নদীর উজানে তাকিয়েই আলমাসকে দেখতে পেল। সাদ জিজ্ঞেস করল, 'নৌকা কোথায়?'

'একটু দাঁড়াও, এখনি এসে পড়বে।'

একটু পর তাদের পাশে নৌকা ভিড়তেই ওরা সবাই নৌকায় উঠে বসল। মাঝি বলল, 'কেউ কথা বলবেন না। যদি কোন সিপাই এত রাতে নৌকা চালাতে দেখে তাহলে আমার রেহাই নেই। রাতের বেলা নৌকা চালানো নিষেধ। ওপারে পৌঁছেও কাউকে আপনারা এ পারাপারের কথা বলবেন না।'

ভয় ও আশঙ্কা সত্ত্বেও অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা নদী পার হয়ে গেল। সবাই নৌকা থেকে নামলে সাদ মাঝির হাতে একটি থলে তুলে দিয়ে বলল, 'এতে দশটি দীনার আছে। আটি দীনারের চুক্তি ছিল, দুই দীনার বকশিশ দিলাম।'

পরদিন ভোর। মায়মুনা ও তার মা বস্তির এক কুঁড়ে ঘরের সামনে ইদ্রিসের সাথে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মুখে ছিল হাসি, চোখ ছিল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরা।

ঘোড়া তৈরী করে সাদ বলল, 'ইদ্রিস! এখন কথা বলার সময় নয়। জলদি রওনা হও।'

ঘোড়ায় সওয়ার হলো ওরা। ইদ্রিস ও মায়মুনা বসল এক ঘোড়ায়, অন্যটায় ওদের মা। সাদ পকেট থেকে একটি থলে বের করে বলল, 'ইদ্রিস, এটা নাও। পথে তোমার দরকার হতে পারে।'

ইদ্রিস কৃতজ্ঞ চিত্তে আবেগ-ভরা কণ্ঠে বলল, 'সাদ! পথ খরচ আমার কাছে আছে। অভাব থাকলে তো আমি নিজেই চেয়ে নিতাম।'

সাদ বলল, 'পথে যেখানেই পাও একটা ঘোড়া কিনে নিও। তাহলে মায়মুনার আর কষ্ট হবে না।'

'ঘোড়া কেনারও দরকার হবে না। কর্ডোভা সীমান্তে মুতামিদের যে ফাঁড়ি আছে তার অফিসারের নামে উজীরের চিঠি আছে আমার হাতে। আমার সব প্রয়োজন পূরণ করার নির্দেশ আছে সে চিঠিতে।'

ইদ্রিসের মা বললেন, 'বাবা! আমিও খালি হাতে আসিনি। ঘরে নগদ অর্থ ও অলংকার যা ছিল সবই নিয়ে এসেছি।'

সাদ বলল, 'ঠিক আছে, আমি আপনাদের জোর করবো না। ইদ্রিস! তুমি ওদের সেভিল পৌঁছে দিয়ে একবার গ্রানাডা গিয়ে আমাদের বাড়ির খোঁজ-খবর নিও। আমিও তাড়াতাড়িই ফেরার চেষ্টা করবো।'

'এখানকার কাজ শেষ হলে তুমি কি সেভিলে আসবে?'

সাদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'এখন কিছুই বলতে পারছি না। তবে আমার মন বলছে, একদিন সেভিলই হবে আমার স্বপ্নের মঞ্জিল। আল্লাহই ভাল জানেন আবার কবে, কোথায়, কোন বেশে আমাদের দেখা হবে। তবে আমার বিশ্বাস, যখন যে বেশেই দেখা হোক, পরস্পরকে চিনে নিতে আমাদের মোটেই কষ্ট হবে না।'

মায়মুনা একাগ্র চিত্তে তাকিয়েছিল সাদের দিকে। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দিকে ছুটছিল ওর বয়স। এ বয়স কাউকে গভীর ভাব ও ভাবনায় আচ্ছন্ন করে ফেলে না। বিগত কয়েক ঘন্টা ধরে সাদের কাজকর্ম দেখছিল সে। এতদিন সাদকে ভাইয়ের একজন বন্ধু ছাড়া আর কিছু ভাবেনি ও। সাদকে তার মনে হল মমতাময়, দয়ালু এক বীর যুবক, যে তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছে। অতীতের কথা স্মরণ হলো তার, একবার তীর চালিয়ে সাদ গাছের ডাল থেকে তার পুতুল নামিয়ে দিয়েছিল। সে তার বান্ধবীদের কাছে গর্ব করে বলতো, তার ভাইয়ের বন্ধু কর্ডোভার সেরা তীরন্দাজ। আর আজ পাঁচ বছর পর সাদকে এক সৈনিকের পোশাকে দেখার পর মায়মুনা ভাবছিল, এবার সে এই বীরের দুঃসাহসিক অভিযান ও বীরত্বের কাহিনী বলবে তার নতুন বান্ধবীদের।

সাদের প্রশ্নে ধ্যান ভাঙল মায়মুনার। সাদ ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি মায়মুনা! আবার দেখা হলে আমাকে চিনতে পারবে তো?'

মুচকি হাসির আভা ছড়িয়ে চোখ নীচু করল মায়মুনা, মুখে কিছুই বলল না। শুধু রওনা হয়ে যাওয়ার পর অনেক দূর পর্যন্ত বার বার পেছন ফিরে সাদের দিকে তাকাচ্ছিল। সাদের কথাগুলো তখনো তার কানে গুনগুন করে বাজছিল। তার মনে হচ্ছিল, সে যেন এক কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করছে। ভবিষ্যতের এক মনোমুগ্ধকর চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ যেন তাকে বলছে, 'মায়মুনা! আমাকে চিনতে পারছ তো?'

সে মনে মনে প্রার্থনা করছিল, ভবিষ্যতের এ প্রশ্নকারী যেন সাদ ছাড়া আর কেউ না হয়।

ওরা রওনা হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর সাদ ও আলমাস গ্রাম্য চাষীর বেশে শহরের দিকে হাঁটা দিল। সাদের মাথায় ছিল আপেল, আলমাসের মাথায় মুরগীর টুকরী।

পিতাকে মুক্ত করার আশা নিয়ে সাদ তিন সপ্তাহ কর্ডোভায় কাটিয়ে দিল। এ সময়ই মামুন বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করেছিল। যাদের আশা ছিল, মামুনকে শহরে প্রবেশ করতে দেখলে জনগণের আত্মসম্মানবোধ জেগে উঠবে, নিরাশ হল তারা। মামুনকে অভ্যর্থনার জন্য ইবনে আক্কাশা শহরের বাইরে এসে দাঁড়ালে কর্ডোভার প্রভাবশালী আমীর ওমরারা সবাই তাকে সঙ্গ দিল।

ব্যবসায়ীরা নয়া শাসকের কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় বাজারগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়েছিল। ইবনে আক্কাশার নির্দেশে জনগণ রাস্তার দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে করতালি ও শ্লোগান দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। মামুনের রাজকীয় কাফেলা শহরে প্রবেশ করার পর শহরের সব ফটক খুলে দেয়া হলো। কোথাও কোন প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ হলো না। যারা মনে মনে কর্ডোভার স্বাধীনতা কামনা করছিল তারাও নিতান্ত অসহায় হয়ে নিরবে সবকিছু সহ্য করতে বাধ্য হল।

এক রাতে শহরের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে দু'জন তর্ক করছিল। একজন বলছিল, মামুনের মিছিল বেশী জমকালো হয়েছে। অন্যজন বলছিল, মুতামিদের মিছিলের শানশওকত আরো বেশী ছিল। এক বৃদ্ধ এদের আলোচনা শুনে বলল, 'স্বয়ং শয়তানও আর এ দেশে এসে থাকতে চাইবে না। কারণ, যে ক্ষমতায় বসে সে-ই ইবলিশের বাপ হয়ে যায়। কেবল কোন অলৌকিক ঘটনাই এদেরকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।'

দেশপ্রেমিক যে সব নেতৃবৃন্দকে পাঁচ বছর আগে সেভিল প্রশাসন কয়েদ করেছিল, ইবনে আক্কাশা তাদের কাছে প্রস্তাব দিল, মামুন জান্নুনের আনুগত্য স্বীকার করলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। কিন্তু মাত্র একজন ছাড়া কেউ এ প্রস্তাবে রাজি হলো না।

আবদুল মুনীমকে ইবনে আক্কাশা ও মামুনের সামনে হাজির করা হলে তিনি বাহাদুরের মত বুক ফুলিয়ে বললেন, 'পাঁচ বছর আগে আমি ডাকাতের হাতে আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। এখন অন্য এক ডাকাত আমাকে তার আনুগত্যের শপথ নিয়ে কারাগার থেকে মুক্ত হতে বলছে। কিন্তু আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, কোন ডাকাতের আনুগত্য কবুল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমাদের আনুগত্য কবুল করার পরিবর্তে কারাগারে ফিরে যাওয়াকেই বেশী পছন্দ করি।'

'তোমার এ বাসনা পূর্ণ করা হবে। তবে আমার ধারণা, কর্ডোভার কারাগার তোমার জন্য উপযুক্ত নয়।' সরোষে জবাব দিল মামুন জান্নুন।

এ ঘটনার কয়েকদিন পর এক রাতে আবদুল মুনীম ও তার বিশ জন সঙ্গীকে কর্ডোভার কারাগার থেকে বের করে টলেডো পাঠিয়ে দেয়া হল। কিন্তু তা করা হল খুবই

গোপনে। কর্ডোভার জনসাধারণ এর কিছুই জানতে পারল না। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইবনে আক্কাশা প্রচার করল, শহর তার দখলে আসার আগেই আবদুল মুনীম ও তার সাথীরা কারাগার থেকে পালিয়ে গেছে। এ বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে বলেও জানানো হলো।

এ খবর প্রচারের দু'দিন পর এক লোক কর্ডোভার মসজিদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'আমি আবদুল মুনীমের সাথে বন্দী ছিলাম। ইবনে আক্কাশা ক্ষমতা দখল করার আগেই এক রাতে আবদুল মুনীম ও তার কয়েকজন সঙ্গী পালাতে গিয়ে প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ে। সংঘর্ষের সময় দুজন কয়েদী মারা যায়, তাদের একজন ছিল আবদুল মুনীম।' সে আরও জানায়, সে নিজেও আবদুল মুনীমদের সাথে ছিল এবং সংঘর্ষের সময় সে আহতও হয়েছিল।

আবদুল মুনীমের সঙ্গী কয়েদীদের মধ্যে যে ব্যক্তি মামুনের আনুগত্য কবুল করে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিল এ ছিল সেই ব্যক্তি। ইবনে আক্কাশার নির্দেশেই সে এ ধরনের প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করে।

এ ঘটনার পরদিন ইবনে আক্কাশা ঘোষণা করল, 'আমিদের কাছ থেকে আবদুল মুনীম ও তার সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরা শান্ত হবে না।' তারও কয়েকদিন পর একদিন স্বয়ং মামুন ঘোষণা করল, 'কর্ডোভার এ বীর সন্তানদের হত্যার ঘটনায় আমি খুবই মর্মাহত ও দুঃখিত। কর্ডোভার জনসাধারণকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি, নিহতদের পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ সরকারী তহবিল থেকে করা হবে। আর হত্যাকারীদের সন্ধান পাওয়া গেলে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে।'

১৩.

সাদ কামরায় বসে বই পড়ছিল, এমন সময় আলমাস ভেতরে প্রবেশ করল। সাদ বই বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, 'কোতওয়াল কি বলল?'

'সে বলল, গ্রানাডা থেকে তোমার মনিবের স্ত্রী-পুত্ররা যদি আসতে না পারে তাহলে পরশু তোমাকেই বাদশাহর সামনে হাজিরা দিতে হবে।'

'তুমি তাকে বলোনি, আমাদের সরকারী সাহায্য দরকার নেই?'

'বলেছিলাম, কিন্তু সে বলল, নির্বোধ, মামুনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। জলদি সাদকে আমার কাছে নিয়ে আসো।'

সাদ একটু চিন্তা করে বলল, 'আলমাস চাচা! আমি কাল চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আব্বাজান নিহত হননি। ইবনে আক্কাশা তাঁকে কর্ডোভা থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়েছে। নইলে তাঁর হত্যার খবর আরও আগেই প্রকাশ করা হতো। মামুনের আগমনের পর এ খবর প্রচার করায় আমার মন বলছে, আব্বাজান ও তাঁর সাথীরা

মামুনের আনুগত্য স্বীকার করতে রাজী হননি। আর সে জন্যই তাদের অন্য কোন কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে বা হত্যা করা হয়েছে। তারা যা প্রচার করছে তা সত্যি নয়, যদি তাঁরা নিহতও হয়ে থাকে, তাহলেও ইবনে আক্কাশা এবং মামুন ছাড়া অন্য কেউ তাদের হত্যাকারী হতে পারে না। আমরা তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নই। যে নাপাক হাত দিয়ে তারা জাতির ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত পান করেছে, সে হাত দিয়ে সোনা, রূপা বিতরণ করে তারা আমাদের আনুগত্য খরিদ করবে, এমনটি মনে করলে তারা ভুল করবে।'

কোতোয়াল বলছিল, 'সাদ যদি বাদশার দরবারে হাজির না হয়, তাহলে তোমাকেই মামুনের দরবারে হাজির হয়ে এতদিন ধরে তারা কেন বিদেশে এর কারণ বলতে হবে।'

সাদ বলল, 'তুমি বলে দেবে, আবদুল মুনীমের ছেলেরা বর্তমান সরকারের বিরোধী।'

'এর পরিণাম কি হবে সে কথা ভেবে বলছো তো?'

'এর পরিণামে আমাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে, তোমাকে কর্ডোভা ছাড়তে হবে। কিন্তু আমি এ সবের পরোয়া করি না। আমি পেটে পাথর বেঁধে এ জাতির মুক্তি ও আজাদীর জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত। কর্ডোভায় বাস করা কঠিন হয়ে এলে তুমি গ্রানাডায় চলে এসো।'

আলমাস বিষণ্ণ হয়ে বলল, 'কিন্তু গ্রানাডা গেলে যে আমি বেকার হয়ে যাবো?'

'না চাচা, এমন ভাবার কোন কারণ নেই তোমার। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সবখানেই তোমার প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া গ্রানাডার সেই সব যুবককে তুমি তীরন্দাজী শেখাবে, যারা স্পেনের আজাদী ও মুক্তির সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে লড়াই করতে চায়।'

'এটা কি তোমার হুকুম?'

'না, এটা আমার হুকুম নয়। স্বাধীনভাবে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তোমার অবশ্যই আছে। কিন্তু আমি জানি, তোমার বিবেক কর্ডোভার বিষাক্ত পরিবেশ দেখে বিদ্রোহ করবেই। তখন তোমার আর আমার কষ্ট ও স্বপ্ন এক ও অভিন্ন হতে বাধ্য।'

'কিন্তু আমি রো শপথ করে বসে আছি, তোমাদের এ ভূ-সম্পত্তি যে কোন মূল্যে রক্ষা করার জন্য আমি জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে চেষ্টা করবো।'

সাদ উদাস কণ্ঠে বলল, 'সারা দেশ চোর ডাকাতের হাতে বন্ধক দিয়ে কি করে তুমি আশা করো এ বাড়িঘর তুমি রক্ষা করতে পারবে? তারা কি তোমাকে রেহাই দেবে? রাজত্বটাই যখন ওদের হয়ে গেলে ঘরের ভেতর খিল দিয়ে তুমি কতক্ষণ তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে!

আলমাস! আমরা কেবল নিজের স্বার্থটাই বড় করে দেখি, কিন্তু দশের স্বার্থ নষ্ট হওয়ার সময় চুপ করে থাকলে এক সময় নিজের স্বার্থটাও আর ধরে রাখা যায় না। জাতির দুশমন ও গাদ্দারদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে না পারলে ঘরের চার দেয়ালের

অধিকার তারা যে কোন সময় ছিনিয়ে নিতে পারে। আমার ঘরকেই যদি তুমি রক্ষা করতে চাও তাহলে আমার দেশকে আগে বাঁচাও। আলমাস! জাতির তরী এখন দুলছে. যদি ডুবে যায় সবাই মারা যাবো। যদি এ তরী সামাল দিতে পারো তবে জাতিও বাঁচবে তুমিও বাঁচবে। নইলে আমও যাবে, ছালাও যাবে।'

'তুমি তাহলে কি করতে চাও?'

সাদ দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বলল, 'আমি জানি না, আমাকে কি করতে হবে। সামনের দিকে অন্ধকার ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একমাত্র ইসলামকে অবলম্বন করেই আমাদের পক্ষে উঠে দাঁড়ানো সম্ভব। কিন্তু আমাদের সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ইসলামী ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনের ঘোর বিরোধী। যদি ওমরাহদের স্বার্থপরতা ও জনসাধারণের অনুভূতিহীনতা বর্তমানের মতই অপরিবর্তিত থেকে যায়, তাহলে সেদিন দূরে নয়, যেদিন খৃষ্টানরা আমাদের ভেড়া বকরীর মত তাড়িয়ে নিয়ে ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে মারবে।

দেশ-দরদী এমন কাউকে দেখছি না, যার পিছনে আমরা কাতারবন্দী হতে পারি। কিন্তু যে ঘরে আগুন লেগেছে সে ঘরের ভেতর চুপ করেই বা বসে থাকি কি করে! আলমাস! অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকে না। আমি শুধু জানি, আমাকে একটা কিছু করতে হবে। প্রয়োজনে লড়তে হবে। লড়তে গিয়ে দরকার হলে মরতে হবে। একটা পশুও মরার সময় ছটফট করে বাঁচার চেষ্টা করে। প্রয়োজনে আমিও না হয় একটু ছটফট করলাম, চেষ্টা করে দেখলাম শেষ পর্যন্ত বাঁচা যায় কি না? আর আমার এ চেষ্টা দেখে যদি আল্লাহর দয়া হয়, আমার মত আরো কিছু যুবকের মনে কি তিনি বাঁচার আশা পয়দা করতে পারবেন না? সবাই মিলে চেষ্টা করলে কেবল নিজেই নই, এ দেশ এবং জাতিও বেঁচে যেতে পারে।'

রাতের শেষ প্রহর। সাদ ইবনে আবদুল মুনীম কর্ডোভার জামে মসজিদে সিজদায় পড়ে কাতর স্বরে আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয় করছিল, 'হে আল্লাহ! আমার কওমকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাও! আমাকে দীনের খাঁটি খাদেম ও মুজাহিদ বানাও! ইসলামের পতাকা উর্ধে তুলে ধরার হিম্মত দাও! আমার দীলে একজন গাজীর জীবন ও শহীদী মউতের তামান্না দাও! আমার দীলে ঈমান ও একীনের এমন মশাল জ্বালিয়ে দাও, গোমরাহী ও জুলমাতের প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া যাকে নিভিয়ে দিতে অক্ষম হয়। জাতির নেক বান্দাদের এক কাতারে শামিল করে দাও! আর তাদের এমন শক্তি ও হিম্মত দাও যাতে বাতিলের প্লাবনের সকল ঝঞ্ঝা ওরা রুখে দাঁড়াতে পারে!'

ফজরের নামাজের একটু পর। দ্রুতগামী এক ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গ্রানাডার দিকে চলল সাদ ইবনে আবদুল মুনীম।

মুজাহিদ বাহিনী

গ্রানাডা ফিরে আসার কয়েক দিন পরেই সাদ বিন আবদুল মুনীম সর্বোচ্চ ফৌজি তালিম শেষ করে সনদ নিয়ে বেরিয়ে এলো। এ সনদপ্রাপ্ত ছাত্ররা সাধারণত সামরিক বাহিনীতেই যোগদান করতো। কিন্তু সাদ 'নাম-কা-ওয়াস্তে' সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করায় আগ্রহী হলো না।

গ্রানাডার একটি প্রভাবশালী মহল সাদকে সামরিক কলেজের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করল। সাদ এতেও রাজি হলো না। কিন্তু তার খালু ও গ্রানাডার বিশিষ্ট আলিম কাজী আবু জাফর তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলে শেষ পর্যন্ত সে এ দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হলো।

কাজী আবু জাফর স্পেনে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছিলেন। গ্রানাডা ছাড়া অন্যান্য শহরেও বহু যুবক তাঁর এ চেষ্টায় সাথে শরীক হয়েছিল। তিনি দীর্ঘদিন থেকেই চাচ্ছিলেন সঠিক ইসলামী চেতনার লোক সামরিক কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করুক। এ জন্যই তিনি এ কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য সাদকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করছিলেন। তিনি সাদকে বললেন, 'ইসলামী বিপ্লবের জন্য যে ধরনের যোগ্য লোক প্রয়োজন, এ কলেজের দায়িত্ব নিলে তুমি সেই মহান বিপ্লবের জন্য উপযুক্ত মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে। গ্রানাডায় ইসলামী বিপ্লবের জন্য ইসলামী লেখকদের পাশাপাশি তরবারি ধরার মত উপযুক্ত মুজাহিদেরই প্রয়োজন বেশী। এ পর্যন্ত এ কলেজ থেকে যারা শিক্ষা লাভ করেছে, তারা গ্রানাডার শাহী খান্দানের নিরাপত্তা বিধানকেই তাদের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। তোমার মত একজন শিক্ষকের হাতে পড়লে তাদের জীবনের উদ্দেশ্যই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তারা নিজেদেরকে দ্বীনের খাদেম ও মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।'

সাদ বলল, 'দ্বীনকে বিজয়ী করাই আমার মাকসাদ। এ দায়িত্ব যদি সে উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হয়, তাহলে আমি এ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি।'

কাজী আবু জাফর বললেন, 'কিন্তু আমার পরামর্শে তুমি এ দায়িত্ব নিচ্ছো, কলেজের কোন অধ্যাপকের কাছেও এ কথা প্রকাশ করো না। তাহলে তারা তোমাকে সহ্য করবে না।'

পরদিন। উৎফুল্ল ছাত্ররা একে অন্যকে সুসংবাদ জানাচ্ছিল, তাদের ফৌজি তালিম দেয়ার জন্য সাদ বিন আবদুল মুনীম কলেজের দায়িত্ব নিয়েছেন।

ছাত্রদের ফৌজি তালিম দেয়া, লাইব্রেরীতে গিয়ে মূল্যবান পুস্তকাদি অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন মাহফিলে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় অংশ গ্রহণের পর যেটুকু সময় পাওয়া যেতো সে

সময়টুকু সাদ একা একা স্পেনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে কাটাতো।

তার বাড়ির এক কামরায় স্পেন ও অন্যান্য ইসলামী দেশগুলোর নকশা টাঙানো ছিল। এসব নকশায় রেখাচিত্রের মাধ্যমে আঁকা ছিল মুসলমানদের উত্থান ও পতনের চিহ্ন। সাদ সে সব নকশার পাশে বসে কল্পনার চোখে দেখতে পেতো সেই সব মরুচারীদের, যাদের অগ্রযাত্রার সামনে একদিন বিশাল দুনিয়া মাথা নত করে দিয়েছিল। সাদ বসে বসে চিন্তার অথৈ সমুদ্রে ডুবে যেতো আর ভাবতো, কেন মুসলমানদের দুর্বার শক্তি আজ অতীতের কাহিনী হয়ে গেল?

কখনও সে আহমদ ও হাসানকে নিজের কাছে বসিয়ে স্পেনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করতো। গ্রানাডার কিছু যুবকও স্পেনকে নিয়ে তার মতোই ভাবতো। মুসলমানদের শোচনীয় পরিণতিতে তারা অস্থির, পেরেশান। কিছু একটা করার জন্য মন ছটফট করতো তাদের। কিন্তু সুস্পষ্ট কর্মসূচী ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে কোন পদক্ষেপই তারা নিতে পারছিল না। তাই তারা অধীর আগ্রহে একজন নকীবের প্রতীক্ষা করছিল। এমন একজন পথপ্রদর্শক খুঁজে বেড়াচ্ছিল, যিনি তাদেরকে সোনালী ঐতিহ্যের মত সোনালী এক ভবিষ্যতেও নিয়ে যেতে পারবেন।

সাদের এক বছর পর আহমদেরও শিক্ষা সমাপ্ত হল। এরপর গ্রানাডার বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলোই হয়ে উঠল তাদের সময় কাটানোর জায়গা।

২

কর্ডোভা দখলের ছয় মাস পর মামুন জান্নুন মারা যায়। অনেকে মনে করে মামুনের মৃত্যুতে ইবনে আক্কাশার হাত ছিল। তাঁর জীবদ্দশাতেই সকল ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে নিয়েছিল ইবনে আক্কাশা। টলেডোর শাসনভার গ্রহণ করল মামুনের পুত্র ইয়াহিয়া। বাপের সব বদগুণে গুণান্বিত ছিল তাঁর এই গুণধর পুত্রটি।

কর্ডোভায় ইবনে আক্কাশার জুলুম নির্যাতন ক্রমেই বাড়তে থাকে। তার সে নির্যাতনে অতীষ্ট হয়ে এক বছর পর আলমাস কর্ডোভা ত্যাগ করে গ্রানাডায় চলে আসে। সাদকে জানায়, ইবনে আক্কাশার কর্মচারীরা তার কাছে এমন কর দাবী করছে, যে দাবী মেটানো তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। শুধু আলমাস নয়, কর্ডোভার জনগণের ধৈর্য্যও শেষ সীমায় পৌঁছে গেল। আলমাসের ধারনা, যে কোন সময় কর্ডোভার জনগণ প্রকাশে বিদ্রোহ করতে পারে।

পরের বছর হাসানও ফৌজি ট্রেনিং সমাপ্ত করল। নিজের খালুর ব্যবসায়ে সাহায্য করার পর অবসর সময়ে ঘোড়সওয়ারী ও তীরন্দাজীতে সে খুবই আনন্দ পেতো। কখনো সে আহমদের সাথে পাঠাগারে যেতো, তবে বেশীক্ষণ অধ্যয়ন করা তার মোটেই ভাল

লাগতো না।

৪৭১ হিজরীতে কর্ডোভায় আবার ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। বার কয়েক ব্যর্থ চেষ্টার পর মুতামিদ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পুনরায় কর্ডোভা আক্রমণ করে। জনগণ প্রতিরোধ করার পরিবর্তে তাকে বরং অভ্যর্থনা জানায়। ফলে ইবনে আক্কাশা পরাজিত ও নিহত হয় এবং সেভিলের সৈন্যরা কর্ডোভার কর্তৃত্ব হাতে নেয়।

কর্ডোভাবাসী ইবনে আক্কাশার জুলুম নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেয়ে নিঃশ্বাস নেয়ারও সময় পেলো না, মুতামিদের দরবারী জৌলুস ও শানশওকত রক্ষার জন্য নতুন করে করের বিশাল বোঝা তাদের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো। রাণী রেমিকুয়র বিলাস যাপনের উপকরণ যোগাতে গিয়ে করদাতারা অনুভব করল, তারা এক অশিক্ষিত বর্বর দস্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে শিক্ষিত ও চতুর ডাকাতের পাল্লায় এসে পড়েছে।

সাদ আলমাসকে সাথে নিয়ে কর্ডোভা এলো, কিন্তু পিতার কোন সন্ধান পেলো না। তবে কর্ডোভার নতুন গর্ভণর ইবনে আক্কাশার বাজেয়াপ্ত করা সকল সম্পত্তি ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিলে সেই নির্দেশের আওতায় সাদও তার সম্পত্তি ফিরে পায়। সাদ বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনার ভার তাদের একজন পুরোনো চাকরের হাতে দিয়ে আলমাসকে নিয়ে গ্রানাডা ফিরে এলো।

কর্ডোভা দখলের পর মুতামিদ মর্সিয়া দখল করার পায়তারা শুরু করল। উজীর ইবনে আম্মার মর্সিয়া জয় করার দায়িত্ব নিয়ে মর্সিয়ার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর প্রধান ইবনে রশিক ও মর্সিয়ার কতিপয় প্রভাবশালী আমীর ওমরাহকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে দলে ভিড়াতে সক্ষম হল। মর্সিয়ার জনগণ তাদের আরামপ্রিয় শাসনকর্তার ওপর এমনিতেই অসন্তুষ্ট ছিল, তাই ইবনে আম্মার এগিয়ে গেলে বিনা বাধায়ই মর্সিয়া দখল করে নিল। তারপর মুতামিদ টলেডোর শাসক ইয়াহিয়ার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গোয়াদেল কুইভার থেকে গোয়াদেল আনারের মধ্যবর্তী বিশাল এলাকা ছিনিয়ে নিল।

স্পেনকে ছোট ছোট খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত করায় যারা অসন্তুষ্ট ছিল তারা মুতামিদের তৎপরতায় খুশী হল। কিন্তু মুতামিদকে এসব খণ্ডরাজ্য একত্রিত করতে দেখে আলফানসু শংকিত হলো। সে মুতামিদকে লিখল, 'তোমার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির কারণে তোমার খাজনা এখন থেকে দ্বিগুণ করা হল।'

মুতামিদ আলফানসুর ধার্য করা দ্বিগুণ খাজনা দিতে টালবাহানা শুরু করলে আলফানসু তাকে দমন করতে সেনাবাহিনী পাঠাল। যেসব মুসলমান মুতামিদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল তারাও খৃষ্টান শাসক আলফানসুর এ অভিযানকে সমর্থন করতে পারলো না। স্পেনের আলেম ও ফকীহরা সকলেই একবাক্যে সেভিলকে রক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ বলে ফতোয়া দিল। ভেগোর বিখ্যাত আলেম কাজী আবুল ওয়ালীদ ওলামাদের সংগঠিত করে তাদের নিয়ে বিভিন্ন শহর সফর করতে শুরু করলেন। তারা প্রতিটি শহরে গিয়ে জনগণের সামনে জেহাদের মর্ম ও গুরুত্ব তুলে ধরলেন।

তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তরুণ ও যুবকরা দলে দলে মুজাহিদ বাহিনীতে নাম লেখাতে শুরু করল।

কাজী আবুল ওয়ালীদের এ আন্দোলনে শামিল হলেন গ্রানাডার কাজী আবু জাফর। তিনি গ্রানাডার শাসককে খৃষ্টান শক্তি আলফানসুর বিরুদ্ধে তার অবস্থান প্রমাণ করার জন্য সেভিলের প্রতি সমর্থন ঘোষণার জন্য চাপ দেন। কিন্তু গ্রানাডার শাসক সেভিলের প্রতি তার সমর্থন জানাতে রাজী হলো না। ফলে কাজী আবু জাফর জেহাদের বাণী নিয়ে আবার জনসাধারণের কাছে ফিরে গেলেন।

কাজী আবু জাফর একদিন গ্রানাডার জামে মসজিদে দাঁড়িয়ে সেভিলের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানালেন। তাঁর ভাষণ শেষ হতেই তিন যুবক উঠে দাঁড়াল। এদের একজন সাদ, অন্য দু'জন তাঁরই দুই সহোদর ভাই আহমদ ও হাসান। এদের দেখাদেখি আরও পনর বিশ জন যুবক উঠে দাঁড়াল।

কয়েক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কাজী আবু জাফর আড়াইশো মুজাহিদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। গ্রানাডার কোন লোক মুতামিদের সহায়তায় এগিয়ে যাক এটা চাচ্ছিল না গ্রানাডার বর্তমান শাসক। তাই তারা মুজাহিদদেরকে নানা রকম ভয়-ভীতি দেখিয়ে বাঁধা দিতে চাইল। কিন্তু মুজাহিদরা এসব ভয়-ভীতিকে পরোয়া না করে জেহাদের প্রস্তুতি নিতে লাগল।

জেহাদে শামিল হওয়ার জন্য সাদ বিন আবদুল মুনীম কলেজ থেকে ছুটি চাইল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে আবেদন নামঞ্জুর করল। সাদ চাকুরীতে ইস্তেফা দিয়ে জেহাদে শরীক হয়ে গেল।

মুজাহিদরা রওনা দেয়ার সময় কাকে সালার বানানো যায় এ প্রশ্ন দেখা দিলে সবাই একবাক্যে সাদকেই নেতা নির্বাচন করল। সাদ সবাইকে নিয়ে রওনা দিতে প্রস্তুত, আলমাস বলল, সেও যাবে তাদের সাথে। সাদ বলল, 'সবাই চলে গেলে বাড়িঘর কে দেখবে, চাচা? তুমি এখানেই থাকো আর আমাদের জন্য দোয়া করো যেন আমরা জয়ী হয়ে ফিরতে পারি।'

৩.

পরদিন ভোর। আবদুল মুনীমের তিন ছেলেই সামরিক পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে মায়ের সামনে। মা অপলক চোখে তাকিয়েছিলেন ছেলেদের দিকে। তিনি ছেলেদের চেহারায় দেখছিলেন স্বামীর প্রতিচ্ছবি।

সাদের চেহারায় দেখছিলেন আবদুল মুনীমের পৌরুষ, আহমদ চেহারায় পিতার গাম্ভীর্য আর হাসানের শান্ত ও সৌম্য চেহারায় ভাসছিল আবদুল মুনীমের সংকল্প ও দৃঢ়তার প্রতিবিম্ব।

বাড়ির বাইরে মুজাহিদদের কলরব শোনা যাচ্ছিল। সাদের খালা জানালার কপাট ফাঁক করে দেখছিলেন মুজাহিদদের ব্যস্ততা। সাদ হাসি মুখে বলল, 'আম্মা, ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

সাদের আম্মা যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সম্বিত ফিরে পেয়ে বললেন, 'যাও বাবা, আল্লাহ তোমাদের বিজয় দান করুন।'

মা তাদের সাথে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। তারা যখন মা ও খালাকে 'খোদা হাফেজ' বলে বের হয়ে যাচ্ছিল সে সময় মা এগিয়ে এসে হাসানকে ডাকলেন। হাসান ফিরে তাকিয়ে বলল, 'জি, আম্মা?'

মা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমার কাছে এসো।'

হাসান মায়ের কাছে এসে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার আম্মা?'

'কিছু না, বাবা!' বলে মা ছেলের মাথায়, মুখে হাত বুলাতে লাগলেন।

বাইরে থেকে আহমদের ডাক ভেসে এলো, 'হাসান, আসো।'

হাসান 'আসছি ভাইজান' বলে মায়ের দিকে ফিরে বলল, 'আম্মা, হাসি মুখে বিদায় দিন!'

মা তার কপালে চুমো খেয়ে বললেন, 'যাও বাবা, আল্লাহ হাফেজ।'

মা ও খালাকে সালাম জানিয়ে বের হয়ে গেল হাসান। দুই বোন বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনিমেষ নয়নে। আলমাস ও আরেক জন চাকর তিনটি ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়েছিল। পাশেই সাদের খালুজান ও কাজী আবু জাফর মুজাহিদদের বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সাদ খালুজান, কাজী আবু জাফর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে মোসাফেহা করল। তারপর আলমাসের কাছ থেকে নিজের ঘোড়ার বাগ নিয়ে সওয়ার হয়ে বসল ঘোড়ার ওপর।

আহমদ এবং হাসানও নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে গেল। সাদ মুজাহিদদের চারদিকে একবার ঘুরে এসে মার্চ করার হুকুম দিল। সেভিলের দিকে ছুটে চলল মুজাহিদদের এ ছোট্ট কাফেলা।

যতক্ষণ ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল সাদের আম্মা ও খালা দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরে। শব্দ অস্পষ্ট হতে হতে যখন সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেল তখন বড় বোন বললেন, 'সকিনা! তোমার তো আজ খুশির দিন, বিজয়ের দিন। আবদুল মুনীম যদি এ দৃশ্য দেখতে পেতো তাহলে মনে করতো সে সারা দুনিয়ার বাদশাহী পেয়ে গেছে। চলো, ভেতরে চলো।'

বোন তাঁকে হাত ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। সাকিনার মনে হলো, ঘরগুলোতে এখনও সাদ, আহমদ ও হাসানের মিষ্টি হাসি ও কলকাকলির আওয়াজ ভেসে বেড়াচ্ছে। মা কয়েকবার স্বগতোক্তি করে সাদ, আহমদ ও হাসানের নাম উচ্চারণ

করলেন। তারপর সিজদায় লুটিয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে বলতে লাগলেন, 'আমার খোদা! আমার মনিব! আমাকে হিম্মত দাও, সাহস দাও, আমাকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করো।'

৪.

সেভিলের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য অভিজ্ঞ সেনানায়কের অভাব ছিল না। কিন্তু মুতামিদ ও রেমিকা ইবনে আম্মার ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতো না। তাই প্রভাবশালী আমীরদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবনে আম্মারকেই প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হল।

ইবনে আম্মার সীমান্তে তাঁবু গেড়ে বিলাসিতায় মগ্ন হল। স্পেনের অন্যান্য অঞ্চল থেকে মুজাহিদদের ছোট ছোট দল এসে তার কাছে জমা হতে শুরু করল। বিশাল তাঁবুর মাঝে ইবনে আম্মারের বাস। দেখে মনে হত, কোন শাহানশাহের তাঁবু।

তাঁবুর ভেতরেই ছিল শোবার, বসার ও খাবার জায়গা। তাতে কারুকার্যময় রেশমী গালিচা। এমনকি তাঁবুও ছিল মূল্যবান ও মোটা রেশমী কাপড়ের। সুসজ্জিত সে তাঁবুতে আলো জ্বালানোর জন্য ছিল কর্পূর। পরিবেশকে সৌরভময় করে তোলার জন্য ছিল মেশক ও আম্বর। শত শত প্রহরী পাহারা দিচ্ছিল সে তাঁবু। গায়ক, বাদক, তোশামোদকারী, কবি ও ভাঁড় ছাড়া কারো সে তাঁবুতে যাওয়ার অনুমতি ছিল না।

সেভিলের সৈন্যরা এসব দেখে মোটেই অবাক হয়নি। তারাও পরিখা খনন ও ঘাঁটি তৈরী করার চাইতে পাশা খেলায় মত্ত হয়ে গেল। কিন্তু সেভিলের শাসক খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে মনে করে যেসব মুজাহিদ এসেছিল জিহাদের তামান্না নিয়ে, তারা এ অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়ে গেল। তারা সেভিলের সৈন্যদের জিজ্ঞেস করতো, 'কি ব্যাপার, কতদিন আমরা এখানে বেকার বসে থাকবো? সেনাপতি কি যুদ্ধ করতে এসেছেন, না প্রমোদভ্রমণে বেরিয়েছেন?'

সৈন্যরা হেসে উত্তর দিতো, 'সবুর করো, অচিরেই সব জানতে পারবে।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি হচ্ছে, তা তারা নিজেরাও জানতো না।

একদিন খুব ভোরে সাদ বিন আবদুল মুনীম পাদ্রীর বেশে শিবিরে প্রবেশ করল। নিজের তাঁবুতে ঢুকতেই তার সঙ্গীরা তার চারপাশে এসে জড়ো হলো। একজন বলল, 'আপনি ফিরতে এত দেরী করলেন কেন? আমরা খুবই উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম। বলুন, কি খবর নিয়ে এলেন?'

সাদ বলল, 'সব কিছু দেখে আসতে গিয়ে সময় একটু বেশীই লেগে গেল। আলফান্সোর সেনাবাহিনী এখান থেকে চার মাইল দূরে শিবির স্থাপন করেছে। সেভিলের এক সামরিক অফিসারকে আমি দুশমনদের শিবিরে ঢুকতে দেখেছি এবং অনেকক্ষণ পর

তাকে ফিরেও আসতে দেখেছি। এক পাদ্রী বলল, সে আলফানসুর সাথে দেখা করেছে।'

আহমদ বলল, 'পরশু যে দুশমন-প্রতিনিধি দল সেনাপতির সাথে দেখা করতে এসেছিল তাদের সম্পর্কে জানা গেছে, ওরা অনেকেই বড় বড় নাইট এবং দু'জন ছিল আলফানসুর নিকটাত্মীয়।'

সাদ বলল, 'আমি স্বচক্ষে ওদের সামরিক প্রস্তুতি দেখে এসেছি। তাদের সাথে আপোষের কোন সম্ভাবনা নেই। এমনটি ভাবা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

আহমদ বলল, 'মুতামিদ সেভিলকে ধ্বংস করার জন্য যে কবিকে নিয়োগ করেছে, সে যদি আত্মপ্রবঞ্চনায় মগ্ন থাকে তাহলে তাকে কে বাধা দিবে? যখনই সেভিলের অফিসারদের জিজ্ঞেস করি, কি হচ্ছে, ওরা বলে, 'পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। কিছু একটা হচ্ছে।'

কর্ডোভার এক মুজাহিদ বলল, 'ওসব নাইটরা যখন প্রথমে আম্মারের তাঁবুতে ঢুকেছিল তখনও আমি তাদের দেখেছি, বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও দেখেছি। বেরোনোর সময় তাদের সবার গলায়ই মূল্যবান হীরের হার ছিল আর তাদের হাতে ছিল থলে ভরা মোহর। আমার মনে হয় ইবনে আম্মার লড়াই না করে ঘুষ দিয়েই যুদ্ধ জয় করতে চাচ্ছে।'

সাদ বলল, 'তারা ঘুষ নিয়েও লড়াই করবে।'

হাসান এতক্ষণ নীরবে আলোচনা শুনছিল, এবার ভাইকে লক্ষ্য করে বলল, 'ভাইজান! আমি তো এখানে আসার পর থেকেই অনুভব করছি, সেভিল বাহিনী খৃষ্টানদের সাথে ভোজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইবনে আম্মার আলফানসুর কাছে হয়তো এই খবরই পাঠিয়েছে– এসো, ভোজসভা, নাচ-গানের আসর ও পাশা খেলায় আমাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একবার দেখো। হায়! আজ যদি কাজী আবু জাফর এখানে থাকতেন!'

এক যুবক দূর থেকে ছুটে আসতে আসতে বলল, 'ইবনে আম্মার কোথাও যাচ্ছে। আমি তাকে সোনার পাল্কীতে চড়তে দেখেছি। কয়েকজন সামরিক অফিসারও তার সাথে যাচ্ছে। দেখ, ওরা ওই দিকে যাচ্ছে।'

অধিকাংশ মুজাহিদই কখনো ইবনে আম্মারকে এক নজর দেখারও সুযোগ পায়নি। ইবনে আম্মার সব সময় কড়া পাহারার ভেতর নাচ-গান নিয়েই মত্ত থাকতো। আজ শিবির হতে তার বের হওয়াটা সত্যিই এক অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। হাসান এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'ভাইজান, এ পরদানশীন সেনাপতিকে এক নজর দেখে আসি।'

কয়েকজন মুজাহিদ হাসতে হাসতে তার পেছনে চলল। সাদ, আহমদ এবং গ্রানাডার আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুজাহিদ সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সাদই তাদেরকে বলল, 'চল ভাই, আমরাও এ দৃশ্য একটু উপভোগ করি। এমন মজার দৃশ্য দেখার সুযোগ জীবনে বার বার আসে না।'

আট বেহারার বিশাল এক পাল্কীতে চড়ে বেরিয়েছেন ইবনে আম্মার। বেহারারা সব তাগড়া জোয়ান হাবশী, পেটা শরীর। ইবনে আম্মারের মাথায় হীরা ও মনি মুক্তা বসানো বিশাল মুকুট। সেভিলের কয়েকজন ফৌজি অফিসার এবং চারজন নাইট পাল্কীর ডানে-বায়ে ঘোড়ার পিঠে। সোনার লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে আগে আগে যাচ্ছে ফেজ টুপি পরা গার্ড বাহিনী।

কোথায়ও পাল্কী থামলে নকীব হেকে উঠে, 'মুসলমান ভাইয়েরা! আজ তোমাদের মহা পরীক্ষার দিন। সিপাহসালারের জন্য দোয়া করো, যেন তিনি সফল হন।'

হাসান বিন আবদুল মুনীম তার সমবয়সী এক মুজাহিদের কানে কানে বলল, 'বেকুফ কোথাকার! ওকি সিপাহসালার না দুলহান! হায়! যদি আমি সেভিলে গিয়ে মুতামিদকে তার সেনাপতি নির্বাচনের জন্য একবার ধিক্কার দিয়ে আসতে পারতাম!'

ইবনে আম্মার উত্তর দিকে যাচ্ছিল। যে মহা পরীক্ষার জন্য সে যাচ্ছিল তা যে কি বস্তু তা বুঝতে আর কারও বাকী রইল না।

ইবনে আম্মার মনে করেছিল, লড়াই না করেই ছলবাহানা করে দুশমনকে সে সরিয়ে দিতে পারবে। তাই সে আলফানসুর প্রভাবশালী সামরিক অফিসারদের মূল্যবান উপহার ও ঘুষ দিয়ে তাদের সাথে ভাব জমালো। সে আরও ওয়াদা করল, যদি তারা আলফানসুকে যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে রাজী করাতে পারে তাহলে আরও অনেক কিছু উপহার দেবে। খৃষ্টান অফিসাররা তার দরাজ হাত দেখে নরম হয়ে গেলেও আলফানসুকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার কোন উপায় খুঁজে পেল না।

ইবনে আম্মার তাদেরকে নিজের তাবুতে ডেকে এনে একটি মূল্যবান দাবা খেলার ছক দেখাল। এর প্রত্যেকটি ঘুঁটি মূল্যবান ইয়াকুত ও মারজান পাথরে তৈরী। ইবনে আম্মার তাদের বলল, 'এ দাবার ছকটি পৃথিবীর আশ্চর্যতম বস্তুগুলোর মধ্যে অন্যতম। তোমরা আলফানসুর কাছে গিয়ে এর এমন প্রশংসা করবে যেন সে এটা দেখার জন্য অস্থির হয়ে যায়। যদি সে আমার সাথে একবার দাবা খেলতে সম্মত হয় তাহলে এ ছকটি দেখার সুযোগ সে পাবে। আর যদি সে আমাকে পরাজিত করতে পারে, তবে দাবার এ ছক হবে তার। কিন্তু যদি সে পরাজিত হয় তবে তাকে সেভিল আক্রমণ না করে এবারের মত ফিরে যেতে হবে।'

আলফানসুর অফিসাররা ফিরে গিয়ে দাবা খেলার ছকটির এত প্রশংসা করল যে, আলফানসু ওটা পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেল। তবু সে ইবনে আম্মারের শর্ত কবুল করতে ইতস্তত করছিল।

অফিসাররা তাকে বলল, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? যদি ইবনে আম্মার হেরে যায় তাহলে আমরা তার কাছ থেকে সেভিলের কয়েকটি এলাকা বিনা যুদ্ধেই দখল করে

নেব। আর সে জয়ী হয়ে যদি কোন অন্যায় আবদার করে বসে, তাহলে আমরা তা না মানলেই তো হলো।'

অবশেষে দাবা খেলায় সম্মত হল আলফানসু। খেলায় ইবনে আম্মার জয়ী হলে আলফানসু জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলো, তুমি কি চাও?'

ইবনে আম্মার বলল, 'আমি চাই আপনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে ফিরে যান।'

আলফানসু বলে উঠল, 'না, কখনো তা হতে পারে না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, সেভিল জয় না করে আমি ফিরে যাবো না।'

'কিন্তু আপনি বাজি রেখে পরাজিত হয়েছেন। শর্ত লংঘন করা বাদশাহর মর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়।'

আলফানসু তার উপদেষ্টাদের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে পরামর্শ করল। তারা বলল, দাবা খেলায় পরাজিত হওয়া শুভ লক্ষণ নয়। সেভিলের সাহায্যে অন্যান্য রাজ্য থেকে অসংখ্য মুজাহিদ আসছে। এ অবস্থায় এ বছর যুদ্ধ না করে আগামী বছর আরও বেশী প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণ করাই আমাদের উচিত হবে। আপনি ইবনে আম্মারের কাছে মোটা অংকের খেরাজ দাবী করুন।

পাদ্রীরাও উপদেষ্টাদের মতের সমর্থন করে বলল, দাবা খেলায় পরাজিত হওয়া অশুভ লক্ষণ। আপনি ইবনে আম্মারের সাথে সামরিক চুক্তিতে আসলেই ভাল করবেন।

আলফানসু ইবনে আম্মারের সাথে আবার কথা বলল। ইবনে আম্মার আগের চাইতে কয়েক গুণ বেশী খেরাজ দিতে রাজি হলে আলফানসু ইবনে আম্মারের দাবী মেনে নিল।

ইবনে আম্মার দাবা খেলায় বিজয়ী হয়ে নিজের শিবিরে ফিরে এলে সৈন্যরা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আনন্দধ্বনি দিয়ে তাকে সংবর্ধনা জানাল। রাতের বেলা গোটা ছাউনিতে চলল বিজয়োৎসব। সারা শিবির আলোকমালায় সজ্জিত করা হল। শাহী খানাপিনা, নাচ-গানের আসর, আর দুশমনদের বিরুদ্ধে কবিতার ঝড় বইয়ে দিয়ে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল, স্পেনে আব্দুর রহমান আজমের পর যদি কোন বিজয়ী বীরের জন্ম হয়ে থাকে, তবে সে হচ্ছে ইবনে আম্মার। আর শরাবের নেশায় বিভোর হয়ে ইবনে আম্মারও অনুভব করছিল, সে সত্যি সত্যিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের সারিতে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু জিহাদের প্রেরণা নিয়ে যেসব বীর মুজাহিদ দূর-দুরান্ত থেকে এসেছিল তারা চরম হতাশা, অসহায়ত্ব ও অনুশোচনার সাথে এ আজব তামাশা দেখছিল।

রাতের শেষ প্রহর। নাচ-গানের আওয়াজ কমে এসেছে। এ সময় দেখা গেল মুজাহিদ শিবিরের এক কোণে এক যুবক নিজের মাথা সিজদায় লুটিয়ে দিয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে, 'রাব্বুল আলামীন! আমার এ জাতিকে তুমি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর। দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুষ্টিমেয় লোকদের অপকর্মের সাজা তুমি

আমাদের সবাইকে দিও না। রাব্বুল আলামীন! জাতির অবুঝ শাসকরা নিজের হাতে ধ্বংসের যে গভীর খাদ খনন করেছে, তা ডিঙ্গিয়ে যাবার সাহস ও শক্তি আমাদের দাও। মাওলা! নবযুগের এ ফেরাউনদের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য কথা প্রকাশ করার মনোবল আমাকে দান করো তুমি।'

এ যুবক ছিল সাদ বিন আবদুল মুনীম।

পরদিন যখন গ্রানাডার মুজাহিদরা ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন সাদ তার ভাইদের বলল, 'তোমরা ওদের সাথে ফিরে যাও, আমি কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবো।'

আহমদ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানে কি করবেন?'

সাদ বলল, 'আমার শেষ কর্তব্য পালন করার জন্য আমি সেভিল যাবো।'

'আপনি মুতামিদের কাছে যাবেন?'

'আমি জানি, কোন লাভ হবে না। তবুও আমি যাওয়ার সংকল্প করেছি।'

'আমিও আপনার সাথে যাবো।'

হাসান বলল, 'আমিও।'

গ্রানাডার এক মুজাহিদ, নাম ইলিয়াস, বলল, 'আমিই বা বাদ থাকবো কেন? আমাকেও আপনাদের সাথে নিন। গ্রানাডা ফিরে গিয়েই বা কি করবো। মানুষকে মুখ দেখাবো কেমন করে? এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে মুতামিদের সামনে গিয়ে তার মুখের ওপর একথা বলা যে, তিনি পরাজিত হয়েছেন। এতে হয়তো বা তার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠতেও পারে।'

গ্রানাডার আরো তিনজন মুজাহিদ সাদের সাথে যাওয়ার জন্য তৈরী হলো। সাদ মায়ের নামে একখানা চিঠি লিখে এক মুজাহিদের হাতে দিয়ে বলল, 'এ চিঠিটা আমাদের বাড়ি পৌছে দিও। ইনশাল্লাহ, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমরা গ্রানাডা পৌছে যাবো।'

নারী ঘেঁষা সৈনিক

রাণী রেমিকা একদিন মুতামিদের সাথে নৌবিহারে বেরিয়ে নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করছিল। নদীর তীরে কিছু নারী শ্রমিক ইট বানানোর জন্য মাটির সাথে পানি মিশিয়ে কাদার দলা বানাচ্ছিল। রেমিকা মাল্লাদেরকে ওদের কাছে নৌকা ভিড়াতে বলল।

নৌকা ভিড়লে রাণী ওদের কাছে গেল এবং একমনে ওদের কাজ দেখতে থাকল। নারী-শ্রমিকরা এতে কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। রাণীর ঠোঁটে ফুটে উঠল দুষ্টুমীভরা হাসি।

সে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কাদার স্তূপে এক মুঠ স্বর্ণমুদ্রা ছুঁড়ে মারল। নারী শ্রমিকরা রাণীর এ কাজ দেখে বিস্মিত হল। রাণীর দেখাদেখি মুতামিদও এক মুঠ স্বর্ণমুদ্রা তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলে তারা আনন্দে হৈ চৈ করে মুদ্রা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করল। স্বর্ণমুদ্রা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলিতে ওদের সারা শরীর কাদায় লেপ্টে গেল। এ দৃশ্য দেখে রেমিকা হাসিতে লুটিয়ে পড়ল। রাণীর আনন্দ দেখে মুতামিদ খুবই আফসোস করে বলতে লাগল, 'আহা! আরো বেশী করে স্বর্ণমুদ্রা কেন সাথে আনলাম না!'

মহলে ফিরে রেমিকা অভিযোগের সুরে বলল, 'দাসী-বাদীদের মত তুমি আমাকে মহলের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রেখেছো। বাইরের দুনিয়ায় হাজারো রকমের আনন্দের উপকরণ ছড়িয়ে আছে, অথচ আমি সে সব কিছুই উপভোগ করতে পারি না।'

মুতামিদ রেমিকার একটি হাসির জন্য রাজকোষ নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তাই এ ধরণের অভিযোগে সে খুব দুঃখ পেল। বলল, 'রেমিকা, আমি তোমার কোন্ সাধ অপূর্ণ রেখেছি বলো তো?'

রেমিকা বলল, 'আমার মনে এখন এমন একটি আকাংখা জেগেছে, যা তুমি পূরণ করতে পারবে না।'

মুতামিদ বলল, 'একবার পরীক্ষা করেই দেখ!'

'ঐ নারী শ্রমিকদের প্রতি আমার ঈর্ষা হচ্ছে। আমি ওদের মত কাদা নিয়ে খেলা করার স্বাধীনতা চাই।'

মুতামিদ কয়েক দিনের মধ্যেই শাহী মহলে মিশক আম্বর ও কর্পূরের স্তূপ সাজিয়ে ফেলল। তারপর এসব চূর্ণ করে গোলাপ-পানি ছিটিয়ে তা ভিজানো হলো। এরপর রেমিকাকে ডেকে আনা হলো সেখানে।

রেমিকা তার সখী বাঁদীদের নিয়ে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে তৈরী মেশ্ক, আম্বর ও কর্পূরের কাদায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাণীর সাথে সখ্যতা বজায় রাখার জন্য কয়েকজন অভিজাত মহিলাকেও বাধ্য হয়ে এ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হলো।

মুতামিদ, তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু এবং শাহী পরিবারের যুবকরা এক পাশে দাঁড়িয়ে এ তামাশা দেখছিল। অভিজাত কোন কোন মহিলা এ জাতীয় খেলায় অংশ নিতে লজ্জাবোধ করছিল, কিন্তু রেমিকা ও তার সখীরা তাদের জবরদস্তি টানাহেঁচড়া করে খেলতে বাধ্য করল।

মুতামিদের পাশে এক বাঁদী সোনার মোহর ভরা একটি তস্তরী নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুতামিদ তস্তরী থেকে এক মুঠো সোনা উঠিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারল। মূল্যবান মোহরের লোভে মহিলারা ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা কাদা মাখামাখি করে কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করল। খুশিতে মেয়েরা একে অন্যের গায়ে-মুখে কাদা মাখাতে শুরু করল।

মায়মুনা কয়েকজন বান্ধবীর অনুরোধে সেদিন প্রথম বারের মত শাহী মহলে

এসেছিল। তাকে শুধু বলা হয়েছিল, রেমিকা শহরের প্রভাবশালী লোকদের স্ত্রী ও মেয়েদেরকে ভোজসভায় দাওয়াত করেছে। কিন্তু এ তামাশা ও বেলেল্লাপনা দেখে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

ভরা যৌবন নিয়ে একদল যুবক ও পুরুষের সামনে মেয়েদের এরকম ঢলাঢলি দেখে তার গা রি রি করে উঠল। এমনকি পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে এ তামাশা দেখাও তার জন্য ধৈর্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। খেলা শুরু হতেই সে সেখান থেকে সরে গিয়ে পাশের বারান্দায় এক থামের আড়ালে লুকাল। আচমকা সে দেখতে পেলো এক যুবক ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত বারবার তার দিকে তাকাচ্ছে।

সে মুখের উপর নেকাব টেনে দিল এবং তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে আবার মহিলা দর্শকদের পাশে এসে দাঁড়াল। রেমিকা ও তার সখীরা এসব দাঁড়ানো মহিলাদেরও খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য টানাটানি শুরু করলে মায়মুনা উল্টো দিকের বারান্দার এক থামের আড়ালে লুকাতে চেষ্টা করল। কিন্তু একটু পরই আগের যুবকটি তার কাছে এসে বলল, 'আপনার যদি এ খেলা পছন্দ না হয়, তা হলে চলুন আপনাকে বাগান দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

মায়মুনা ঘুরে যুবককে দেখল। রাগে তার ঠোঁট কাঁপতে শুরু করল। সে আবার মহিলাদের কাছে ফিরে গেল। এক যুবতী এগিয়ে এসে টান মেরে তার মুখের নেকাব ছিঁড়ে ফেলল। আরেক মেয়ে তার হাত ধরে টেনে নামাতে চাইল কাদায়। মায়মুনা ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল। তার এক বান্ধবী 'মায়মুনা, মায়মুনা' বলে এগিয়ে এসে তাকে ধরতে চেষ্টা করলে সে এমন জোরে ধাক্কা দিল, মেয়েটি চিৎ হয়ে কাদার মধ্যে পড়ে গেল। এক মেয়ে এসে তার মুখে কাদা মাখিয়ে দিল।

উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মুতামিদ এক পাশে দাঁড়িয়ে অবিরাম মোহর ছুঁড়ে চলেছে। আনন্দে মেয়েরা হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দিল। মায়মুনা ছুটল সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। বিশাল মহলে সে দিক হারাল। এক বারান্দা থেকে আরেক বারান্দায় ছুটাছুটি করতে লাগল সে। কিন্তু মহল থেকে বেরোনোর কোন রাস্তা খুঁজে পেল না।

বারান্দার কোণে খোজা প্রহরী দাঁড়িয়েছিল। দেখতে পেয়ে মায়মুনা তাকে মহল থেকে বের হয়ে যাওয়ার রাস্তা জিজ্ঞেস করল। ইতিমধ্যে সেই যুবকটি এসে হাজির হলো সেখানে। মায়মুনার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'আমার সাথে আসুন, আমিই আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

রাগে মায়মুনার চেহারা লাল হয়ে গেল। সে কোন উত্তর না দিয়েই এক দিকে হাঁটা দিল। দ্রুত চলতে গিয়ে মর্মর পাথরের পিচ্ছিল বারান্দায় তার পা পিছলে গেল। নিজেকে সামলাতে গিয়েও পারল না, পড়ে গেল সে। যুবকটি এগিয়ে এসে মায়মুনার হাত ধরে তাকে উঠানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত। আপনার কোন আঘাত

লাগেনি তো?'

মায়মুনা উঠে দাঁড়িয়েই এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আমি জানতাম না যে, কর্ডোভার শাহী মহলও তোমার মত বেহায়াদের দৌরাত্ম্য থেকে নিরাপদ নয়।'

খোজা প্রহরী এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি শাহজাদা রশীদের সাথে বেয়াদবী করছেন।'

যুবক খোজাকে ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি চুপ করো।'

মায়মুনা উঠে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করল। কিছুদুর যাওয়ার পরই নীচে নামার সিঁড়ি দেখতে পেয়ে মায়মুনা সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল। অর্ধেক সিঁড়ি নামার আগেই শাহজাদা রশীদ দ্রুত এসে তার আগে চলে গেল এবং সামনে গিয়ে রাস্তা আগলে দাঁড়াল।

মায়মুনা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু রশীদও সরে এসে তার পথ বন্ধ করে দিল। মায়মুনা রাগে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি চাও?'

'আমি জানতে চাই আপনি কে? অর্থাৎ আপনার নাম কি? আপনি কোথা থেকে এসেছেন? প্রথম দৃষ্টিতে মানুষ ঘায়েল করার কৌশল আপনি কোথায় শিখেছেন? আর আমার কোন্ অপরাধের দরুণ আপনার চোখ আগুনের মত লাল হয়ে উঠেছে?'

মায়মুনা বলল, 'তোমার সব প্রশ্নের জবাবে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমি একজন মুসলিম যুবতী।'

'এটা কোন জবাব হলো?'

মায়মুনা পূর্ণ শক্তিতে তার গালে একটি থাপ্পড় মেরে বলল, 'পেলে তো জবাব।'

শাহজাদা রশীদ ক্রুদ্ধ, অপমানিত ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের গালে হাত বুলাতে লাগল। মায়মুনা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে দরজা পেয়ে বের হয়ে গেল মহল থেকে।

মহল থেকে বের হতেই মায়মুনার মনে হল কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। ফিরে দেখতে পেল খোজা প্রহরীটি তার পেছনে পেছনে আসছে। পথচারীদের মনোযোগ এড়ানোর জন্য মায়মুনা তার হাঁটার গতি স্বাভাবিক করল।

খোজা কাছে এসে বলল, 'সেভিলে তোমার মত নির্বোধ মেয়ে আর আছে কি না আমার জানা নেই। তুমি কি জানতে না, ইনিই শাহজাদা রশীদ? এই শহরে তুমিই একমাত্র যুবতী যে শাহজাদাকে থাপ্পড় মেরে এখনও অক্ষত আছো। দাঁড়াও! আমার কথা শোন। বোকামী করো না। তার ওপর রেগে না গিয়ে বরং তোমার খুশী হওয়া উচিত। যে যুবক তোমাকে পছন্দ করেছে তার জন্য সেভিলে হাজার হাজার যুবতী জীবন দিতেও প্রস্তুত। এমন যুবককে তুমি দুশমন বানানোর মত ভুল করোনা। তার নেকনজর তোমাকে স্পেনের রাণী বানিয়ে দিতে পারে। আর তাঁকে দুশমন বানানোর অর্থ হলো নিজের এবং পরিবারের সবার জন্য মহা অনিষ্ট ডেকে আনা।'

মায়মুনার মনে হচ্ছিল কেউ তার মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দিচ্ছে। তবু সে নিজেকে

লক্ষ্য করে রাখল। খোজা তার কথা বলা বন্ধ করল না। ওদিকে মনের অজান্তেই মায়মুনার চলার গতি দ্রুত হয়ে গেল। বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে খোজা তার সাথে হেঁটে যেতে পারছিল না। ক্রমে সে হাঁপাতে শুরু করল এবং আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়ল।

মায়মুনা যখন বাড়িতে ঢুকে খোজা তখন প্রায় পঞ্চাশ কদম পিছনে। বাড়িতে ঢুকেই সে তীর ধনুক নিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গেল।

খোজা বাড়ির ফটক থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে এক ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কার বাড়ি?'

'ইদ্রিসের বাড়ি।'

'সে কে?'

'তিনি সরকারী টাকশালের প্রধান।'

হঠাৎ মায়মুনার ধনুক থেকে একটি তীর ছুটে এলো এবং খোজা প্রহরীর মাথার টুপীতে বিদ্ধ হয়ে তা উড়িয়ে নিয়ে গেল। ভয় পেয়ে খোজা কয়েক পা পেছনে হটে গেল। আরও একটি তীর এসে তার পায়ের কাছে মাটিতে বিঁধল। এর পরের তীরটি চলে গেল তার উরু ঘেঁষে।

খোজা পেছনের দিকে হটছিল আর তার ডাইনে বাঁয়ে ও সামনে তীরের পর তীর এসে পড়ছিল। সে চীৎকার করে বলল, 'দেখ, এ ধরনের খেলা ভাল নয়।'

রাস্তার বালকরা তার অবস্থা দেখে হাসছিল। মায়মুনাদের বাড়ির দু'জন চাকরও রাস্তায় এসে খোজার লাফালাফি ও পালানো দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এক বুড়ো চাকর ছুটে মায়মুনার কাছে গিয়ে বলল, 'আম্মাজি! ও শাহী মহলের খোজা। সাবধানে তীর চালাও, ও আহত হলে বিপদ হতে পারে।'

মায়মুনা তীর ছোড়া একটু থামাতেই খোজা পেছন ফিরে পড়িমরি দৌড় লাগাল আর বার বার রাস্তার ওপর পড়ে গিয়ে ধড়ফরে পাছড়ে উঠেই আবার ছুটতে লাগল।

শাহী মহলে ফিরে শাহজাদা রশীদকে বলল, 'হুজুর, ঐ মেয়ের সাথে প্রেম করতে হলে সারা জীবন আপনাকে লৌহবর্ম পরে থাকতে হবে। আল্লাহর মেহেরবানী যে ওর নিশানা তেমন ভাল না, নইলে আমার শরীর সে ঝাঝরা করে ফেলতো।'

২

পড়ন্ত বিকেল। মায়মুনা দোতালার এক কামরায় জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়েছিল। একটু পর সন্ধ্যা হবে। নদীর ঢেউয়ে আছড়ে পড়ছে মেহদী রঙ সূর্যের কোমল আলো। বসন্তের চমৎকার বিকেলে প্রকৃতির মোহন শোভা দেখছিল মায়মুনা। নদীর তীরে ভ্রমণবিলাসী নরনারীর ভিড় মেলায় পরিণত হয়েছে। অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা ভাসছে নদীর ওপর। ছায়া ছায়া মায়াময় পরিবেশে কোন কোন নৌকা থেকে ভেসে

আসছে সুমিষ্ট গানের সুর।

নদীর তীর জুড়ে সাজানো গোছানো ফুলের বাগান অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বাগানের এখানে সেখানে সবুজ ঘাসের ওপর দল বেঁধে আড্ডা মারছে অনেকে। কেউ কেউ বসিয়েছে কবিতার মাহফিল। শহুরে মানুষকে নানা রকম খেলা দেখিয়ে আয়-রোজগার করছে সাপুড়ে, ভাঁড় ও বাজীকররা। কোথাও বসেছে গানের আসর। নানা রকম খেলনা বিক্রি করছে ফেরিওয়ালারা। শান্ত সমাহিত আনন্দময় এই সব দৃশ্য দেখে মায়মুনার মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতায় ছেয়ে গেল মন।

দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে গেল। মায়মুনা পাশের কামরায় এসে নামাজ পড়ল। নামাজের পর সে মুনাজাত করছিল, এ সময় নীচ থেকে ভেসে এল নারী কণ্ঠের কলকাকলি ও একাধিক মানুষের পদশব্দ। দোয়া শেষ করে মায়মুনা বারান্দায় গিয়ে নীচের দিকে তাকাল। মায়মুনাকে দেখতে পেয়ে গলা ছেড়ে ডেকে উঠল এক বালিকা, 'মায়মুনা, এসো! দেরী হয়ে যাচ্ছে। তুমি তো এখনো কাপড়ই বদলাওনি দেখছি।'

পাশের মেয়েটি বলল, 'না,না, মায়মুনার পোশাক বদলাবার কোন দরকার নেই। দেখছো না, এ সাদাসিদা পোশাকেই মায়মুনাকে রাণীর মত মনে হচ্ছে!'

তরুনীরা সবাই মায়মুনার দিকে তাকিয়ে রইল। এক তরুনী বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি আগেই চলে গেছো। যাক, এখন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।'

মায়মুনা নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'মরে যাই তোমার নিরাসক্ত ভালবাসা দেখে! রাণী রেমিকা কি স্বয়ং আসবেন তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য?' বলল আরেক তরুনী।

'আমি কখন বললাম যে আমাকে নেয়ার জন্য রাণী রেমিকাকে আসতে হবে?'

কয়েকজন এরই মধ্যে উঠে এসেছে দোতালায়। তাদেরই একজন বলল, 'আচ্ছা, হয়েছে বাবা হয়েছে! এখন তৈরী হয়ে নাও! এসো আমি তোমার চুল বেঁধে দিচ্ছি।' এক লম্বা মত ফর্সা মেয়ে তার হাত ধরল।

মায়মুনা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আমি যাবো না।'

কয়েকজন এক সাথে প্রশ্ন করল, 'তুমি যাবে না?'

'না।'

'কেন?'

'আমার ইচ্ছা।'

এক তরুনী বলল, 'তুমি রাণী রেমিকার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে?'

মায়মুনা শান্ত স্বরে বলল, 'রাণী রেমিকার দাওয়াতে যোগদান কি আমাদের ঈমানের অঙ্গ হয়ে গেছে?'

লম্বা মেয়েটি বলল, 'দেখ, মায়মুনা! আমরা তোমার ইচ্ছার ওপর হস্তক্ষেপ করতে চাই না। কিন্তু অনর্থক সুলতানা রেমিকার সাথে ঝগড়া বাঁধানো উচিত হবে না। যদি তিনি

বুঝতে পারেন, তুমি ইচ্ছা করেই তার দাওয়াতে শরীক হওনি, তবে তিনি এটাকে বেয়াদবী মনে করবেন। এতে তোমার ভাইয়েরও ক্ষতি হতে পারে। তুমি হয়তো জানো না, গত সপ্তায় সেভিলের মসজিদের এক খতিবকে রাণী রেমিকার বিরুদ্ধে খুতবা দেয়ার অপরাধে শহীদ করে দেয়া হয়েছে।'

মায়মুনা কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমার ভাইয়ের জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তিনি রাণী রেমিকার পরিবর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকেই প্রাধান্য দেবেন।'

মায়মুনার আরেক বান্ধবী বলল, 'ঠিক আছে মায়মুনা, যেতে না চাইলে আমরা তোমাকে বাধ্য করবো না। কিন্তু সুলতানা রেমিকা যদি তোমার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করে তাহলে কি অজুহাত দেবো তাই বলো।'

'এ ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমরা কিছু জাননা বলে দিও।'

তরুনীরা বেরিয়ে গেল। রাস্তায় তাদের টাঙ্গা দাঁড়িয়ে ছিল। তারা টাঙ্গায় চড়লে এক তরুনী বলল, 'জানতাম মায়মুনা যাবে না।'

'কিন্তু এর কারণ কি?'

'তোমরা কিছুই জানো না দেখছি, শাহজাদা রশীদ মায়মুনাকে বিয়ে করতে চায়।'

'এ তো মায়মুনার সৌভাগ্য। মায়মুনা কি এ বিয়েতে রাজি নয়?'

'না।'

'তাহলে বলতে হয় তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'না, না, মাথা খারাপ হয়নি। মায়মুনা তার রূপ সম্পর্কে খুবই সজাগ। সে জানে, যতই সে শাহজাদাকে উপেক্ষা করবে, ততই শাহজাদা তার জন্য অস্থির হবে।'

অন্য এক তরুনী বলল, 'তোমরা তিলকে তাল করছ। আমি মায়মুনাকে ভাল করেই জানি। রেমিকার পুত্র যদি সারা জাহানের বাদশাহও হয়ে যায় তবুও মায়মুনা তাকে কোনদিন পছন্দ করবে না। তার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সে কখনো কোন মাহফিলে যোগদান করেনি। একবার সে সুলতানা রেমিকার দওয়াতে শাহী মহলে গিয়েছিল, সেখানে ও যা দেখেছে তাতে সে খুবই আহত হয়েছে। রাণী ও তার সখীদের বেলেল্লাপনা দেখে সে রীতিমত ক্ষুব্ধ। বিশেষ করে শাহাজাদা রশীদের কামুক দৃষ্টি ও অশোভন ব্যবহারে সে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে।'

লম্বা মেয়েটি মায়মুনার ওপর ক্ষেপে ছিল। সে বলল, 'তলে তলে রশীদ ও মায়মুনার সম্পর্ক কতদুর গড়িয়েছে, তা তোমরা কেউ জানো না। অচিরেই শুনবে, মায়মুনা শাহী মহলে পৌছে গেছে। আমার ভাই.......'

এটুকু বলে হঠাৎ সে থেমে গেল। অন্যান্য তরুনীরা বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল। থেমে গেলে কেন?'

'কিছু না। তোমরা তো জানো, শাহজাদা রশীদ আমার ভাইয়ের বন্ধু। তিনি ভাইয়ের কাছে কোন কথাই গোপন করেন না।'

'মায়মুনা সম্পর্কে শাহজাদা রশীদ কি দুরভিসন্ধি এঁটেছে তা নিশ্চয় তোমার ভাই তোমাকে বলেছে?'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে ও বলল, 'না, ভাইজান আমাকে কিছুই বলেন নি। তবে তার কথাবার্তা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি, শাহাজাদা রশীদ মায়মুনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

'এ আর নতুন কথা কি? কে জানে না, শাহজাদা রশীদ মেয়েদের ব্যাপারে তার দাদার স্বভাব পেয়েছে?'

'ছি! ছি! এ কি রকম কথা? যে পাত্রে খায় সে পাত্রে কেউ নাপাক কিছু রাখে না। অথচ তোমরা শাহী মহলে দাওয়াত খেতে যাচ্ছো আর শাহী খান্দানেরই সমালোচনা করছো?'

এ প্রশ্নের জবাবেও একটি মেয়েটি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার পাশে বসা অন্য একটি মেয়ে তার হাত টিপে দিলে সে চুপ করে যায়। সবাই বুঝতে পারে, এখন এ নিয়ে আলাপ করতে গেলে কেবল উত্তপ্ততাই বাড়বে।

৩.

মেয়েরা চলে যাওয়ার পর মায়মুনা আলমারী থেকে একটা বই নিয়ে পড়তে বসল। ও তন্ময় হয়ে বই পড়ছিল, চাকরাণী এসে বলল, 'আপা, এখন খাবেন? টেবিল সাজাবো?'

'না, ভাইজান এলে খাবো।'

চাকরাণী চলে গেল। একটু পর বই রেখে মায়মুনা উঠে দাঁড়াল এবং ওজু করে এশার নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। নামাজ শেষে আবার বই নিয়ে বসল।

ইদ্রিস বাড়িতে ঢুকেই পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করল, 'মায়মুনা কোথায়?'

'আমি এখানে ভাইজান।' ভাইয়ের আসার আওয়াজ পেয়েই মায়মুনা তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলো।

ইদ্রিস ক্লান্ত পায়ে ঘরে ঢুকেই সোফায় বসে পড়ল। চেহারায় রাজ্যের ক্লান্তি ও অস্থিরতার ছাপ।

'ভাইজান, কি হয়েছে আপনার, শরীর খারাপ?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মায়মুনা।

ইদ্রিস বিষণ্ণ হেসে বলল, 'না, আমি ভালই আছি। তুমি এখনো খাওনি?'

'আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'আমি না তোমাকে বলেছি, খাওয়ার সময় হলে খেয়ে নিও। আমার জন্য অপেক্ষা করে অযথা কষ্ট করো না।'

'আজকে তো আপনি দেরী করেননি। এই তো আমি মাত্র এশার নামাজ শেষ করলাম।'

ইদ্রিস অনুভব করল, মানসিক চাঞ্চল্যের দরুণ সে সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেলেছিল।

একটু পরে দু'ভাইবোন খেতে বসল। খেতে খেতে ইদ্রিস শাহী মহলের উৎসব সম্পর্কে কথা তুলল। মায়মুনাকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাকে কেউ ডাকতে আসেনি বুঝি?'

মায়মুনা বলল, 'জেয়াদের বোন ও তার বান্ধবীরা এসেছিল, কিন্তু আমি যেতে রাজি হইনি।'

ইদ্রিস চুপ করে গেল। ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করছে সে। খাওয়া বন্ধ করে সে তাকিয়ে রইল বোনের দিকে। দেখল মায়মুনা কিছুই মুখে দিচ্ছে না।

'তুমি খাচ্ছো না যে?'

'ভাইজান, আমার ক্ষিধে নেই।'

ইদ্রিসও খাচ্ছিল না। বলল, 'মায়মুনা! আজ দুপুরে শাহজাদা রশীদ আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। তার পর থেকে সারা দিন আমিও খুব অস্থিরতায় কাটিয়েছি। এক ভাইয়ের জন্য এর চাইতে বড় সমস্যা আর কি হতে পারে যে.........' এটুকু বলতেই তার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

এখন খাওয়ার দিকে কারোরই আর নজর নেই। উভয়েই নির্বাক হয়ে তাকিয়েছিল পরস্পরের মুখের দিকে। এক সময় মায়মুনাই মুখ খুলল, 'ভাইজান! আপনি ও আমি একই মায়ের দুধ পান করেছি। আর বাপের আত্মমার্যাদাবোধও আমরা দুজনেই পেয়েছি। আপনার বোন জানতে চায়, সে আপনাকে কি বলেছে এবং আপনিই বা তাকে কি জবাব দিয়েছেন?'

'জবাব তো শুধু তুমিই দিতে পার মায়মুনা। সে তোমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। সুলতানা রেশিকারও নাকি এতে সম্মতি আছে। রাণী সুলতানের অনুমতি নেয়ারও দায়িত্ব নিয়েছে। এখন তুমিই বলো, আমি এর কি জবাব দেবো?'

মায়মুনার চেহারা রাগে বিবর্ণ হয়ে গেল। মুহূর্তকাল ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দ্রুত উঠে পাশের কামরায় চলে গেল। ইদ্রিসও হাত ধুয়ে মায়মুনাকে ডাকতে ডাকতে ওর কামরায় প্রবেশ করল। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল মায়মুনা। ইদ্রিস তার কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'মায়মুনা, আমি শুধু জানতে চাই, তোমার দিকে কিভাবে এবং কখন সে আকৃষ্ট হলো? ওর আগ্রহের খবর কি তুমি জানতে? তা হলে তা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?'

মায়মুনা মুখ ফিরিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকাল। চোখে অশ্রু। বলল, 'ভাইজান! আমার অপরাধ, বান্ধবীদের অনুরোধে একদিন সুলতানা রেমিকার দাওয়াতে গিয়েছিলাম। রশীদ বেহায়ার মত আমার দিকে এগিয়ে এলে আমি প্রতিবাদ করে চলে আসি। চলে আসার সময় সিঁড়িতে সে আমার পথ আগলে দাঁড়ায়। তাকে পথ থেকে সরানোর জন্য

এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে আমাকে তার গালে চড় দিতে হয়। তারপর সে আমাকে প্রেমপত্র লিখতে শুরু করলে ওগুলো না পড়ে আমি জ্বালিয়ে দেই। প্রতিশোধ গ্রহণের চাইতে ভাইয়ের জীবন আমার কাছে অধিক প্রিয় বলেই এসব কথা এতদিন ভাইকে জানাইনি। আমার ধারণা ছিল, আমার নীরবতায় এক সময় সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং মন থেকে আমাকে পাওয়ার আশা তাড়িয়ে দেবে। জেয়াদের বোন আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল, এ সব কথা রাষ্ট্র হলে আমার ভাইয়ের বিপদ হতে পারে।'

'আর তোমার ভাইয়ের অপরাধ হলো, তোমার মত সে তার গালে চড় দিতে পারেনি। সে জন্য ভাই তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। মায়মুনা! তোমার মত বোনের জন্য আমি গর্ববোধ করি।'

ইদ্রিস মায়মুনার চোখের অশ্রু মুছে দিল। তারপর তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজেও একটি চেয়ারে বসে বলল, 'মায়মুনা! জেয়াদের বোন তোমার কাছে রশীদের চিঠিপত্র নিয়ে আসে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ভাই ও বোন একই উদ্দেশ্যে কাজ করছে।' আমি আসার পথে জেয়াদ আমার পথরোধ করে বলল, 'তোমার সাথে একটু কথা ছিল।' সারা পথ রশীদের ওকালতি করতে করতে সে বাড়ির ফটক পর্যন্ত এসেছে। জেয়াদ বড়ই নীচ ও জঘন্য প্রকৃতির লোক।'

মায়মুনা বলল, 'ভাইজান, আপনি আমাকে এমন কোথাও পাঠিয়ে দিন যেখানে দুর্বৃত্তদের রাজত্ব নেই।'

ইদ্রিস উদাস দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে তাকিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বলল, 'স্পেনে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে আজ দুর্বৃত্তদের রাজত্ব চলছে না। সবখানেই আজ মানবতা পদদলিত। তুলনামূলকভাবে গ্রানাডার অবস্থা কিছুটা ভাল। সাদ সম্ভবত এখনও ওখানেই আছে। আমি তার খোঁজ নিচ্ছি। হয়তো তার চেষ্টায় সেখানে আমার কোন চাকুরীও জুটে যেতে পারে।'

সাদ ও গ্রানাডার নাম শুনে মায়মুনার হৃদয় যমুনায় খুশীর ঢেউ বয়ে গেল। মনের আয়নায় ভেসে উঠল এক বীরের চেহারা। সাদ! দীর্ঘকাল যাবত মায়মুনার কল্পনায় যার ছবি কোনদিন অস্পষ্ট হয়নি। সব সময় যার কথা স্মরণ হলেই সে অনুভব করতো, সে তাকে বলছে, 'মায়মুনা, চিন্তা করো না। তোমার ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমি এক দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাচীর গড়ে তুলছি।'

ইদ্রিস বলল, 'মায়মুনা! রেমিকা ও তার পুত্র তোমার পেছনে লেগেছে কেন জানো? তারা বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকেই জীবনের ব্রত করে নিয়েছে। ভদ্রতা ও শালীনতার সাথে কাউকে চলতে দেখলে তাতে তারা অপমান বোধ করে। রেমিকা মনে করে, সেভিলের প্রতিটি পূত পবিত্র ভদ্র মহিলা তাকে পরোক্ষভাবে অপমানিত করছে। তাই সে সকলের

কেন্নাবা থেকে লজ্জা ও সম্ভ্রমের পর্দা ছিড়ে ফেলতে চায়। তার পুত্রও মায়ের মতই খবিস। মুতামিদের দরবারে যারা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় বেশী অগ্রসর তারাই তত বেশী সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। আমাদের মত নীতিবান ও ভদ্রদের জায়গা এখানে নেই। ইজ্জত ও সম্মান নিয়ে বাঁচতে চাইলে অচিরেই এখান থেকে আমাদের সরে পড়তে হবে।'

মায়মুনা বলল, 'ভাইজান, আমার বিশ্বাস, গ্রানাডার অবস্থা সেভিলের চাইতে ভাল। নইলে আমারা কর্ডোভায় চলে যেতে পারি, সেখানে আমরা অপরিচিত নই।'

ইদ্রিস বলল, 'কিন্তু শিয়ালের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে বাঘের থাবায় ঢুকতে চাই না আমি। কিছুদিনের মধ্যে কর্ডোভার অবস্থা সেভিলের চাইতে বেশী খারাপ হয়ে যাবে। কারণ, রশীদ সেখানকার নতুন গভর্ণর নিযুক্ত হতে যাচ্ছে।'

৪.

চাকরাণী ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে বলল, 'উঠোনে এক নওকর দাঁড়িয়ে আছে। ও বলছে, বাইরে আপনার সাথে দেখা করার জন্য কে যেন এসেছে।'

ইদ্রিস চাকরকে ডাকল। চাকর দরজার কাছে এসে বলল, 'গ্রানাডা থেকে আপনার এক বন্ধু এসেছেন। আমি তাকে বৈঠকখানায় বসতে বলেছি।'

ইদ্রিস দ্রুত বের হয়ে বলল, 'তার নাম জিজ্ঞেস করেছ?'

'জি, কিন্তু তিনি বললেন, গ্রানাডা থেকে মেহমান এসেছে বললেই হবে।'

'গ্রানাডা' শব্দটি শুনেই মায়মুনা চমকে সচকিত হয়ে উঠল। এক অজানা শিহরণে কেঁপে উঠল হৃদয়। দ্রুত পায়ে আঙিনায় নেমে এল সে। কে এসেছে গ্রানাডা থেকে? তবে কি সে-ই! তার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। কে যেনো তার কানে কানে বলল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এ সে-ই।' তার হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। সে আনন্দ আবিষ্ট করল তার দেহ-মন সমগ্র সত্ত্বা।

নিশ্চল হয়ে সে আঙিনায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল তারকাদের খেলা। মনে মনে বলল, 'সাদ! সাদ! আমার সাদ! এও কি সম্ভব যে তুমি........' স্মৃতির পর্দা ভেদ করে তার চোখের সামনে এসে নাচতে শুরু করল সাদের পৌরুষদীপ্ত নিষ্পাপ মুখের ছবি। হৃদয় কাননে সে শুনতে পেল কোকিলের কুহু তান। বাতাসে যেন ভেসে এল মহুয়ার ঘ্রাণ। প্রাণের গভীরে বেজে উঠল প্রেমের সুর লহরী। সে সুর তাকে নিয়ে গেল ভালবাসার অচিনপুরে।

মায়মুনা আঙ্গিনা পার হয়ে বৈঠকখানার আধখোলা জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। দেখল তার ভাই ও আগন্তুক পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ। আগন্তুকের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। পরস্পরকে গভীরভাবে বুকে জড়িয়ে রেখেই একে অন্যকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে। হঠাৎ ওরা আলিঙ্গন মুক্ত হলে আগন্তুককে দেখতে পেল মায়মুনা। হ্যাঁ, ওই

তো সাদ! আমার সাদ! আমার শৈশবের স্বপ্ন, আমার যৌবনের কল্পনার পুরুষ!

শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে সাদ এখন পরিপূর্ণ যুবক। তার সুঠাম দেহে খেলা করছে যৌবনের দীপ্তি। মন্ত্রমুগ্ধের মত এক মনে, এক ধ্যানে সে তাকিয়ে রইল সেই পৌরুষদীপ্ত সৌন্দর্যের আকর, তার স্বপ্ন ও কল্পনার পুরুষ সাদের দিকে। মায়মুনার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন তার কানে কানে বলছিল, 'তুমি আমার! তুমি আমার! আমার জন্যই তুমি আজ এখানে এসেছো।'

আনন্দের আতিশয্যে মায়মুনা বৈঠকখানার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। আবেগের তুফান তাকে কামরার ভেতরে ঠেলে দিচ্ছিল, সে ভেতরে তার এক পা প্রায় ঢুকিয়েই দিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ সম্বিত ফিরে এলো তার। শিউরে উঠল সে। দ্রুত পেছনে সরে দরজার আড়ালে দাঁড়াল। মনে মনে বলল, 'সাদ! সাদ! আমি জানতাম তুমি আসবে।'

সে বার বার সাদের নাম উচ্চারণ করছিল আর তার চোখ বেয়ে নামছিল আনন্দের অশ্রু বন্যা।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় সম্পূর্ণ খুলে গেল দরজা। মায়মুনা ত্রস্ত পায়ে খোলা দরজা থেকে সরে যেতে চাইল, কিন্তু ইদ্রিস দেখে ফেলল। সে ডেকে বলল, 'মায়মুনা! সাদ এসেছে, সাদ।'

মায়মুনা সে কথায় কান না দিয়ে নেকাবে মুখ ঢেকে ছুটে পালাল সেখান থেকে। নিজের কামরায় ঢুকে বসে পড়ল সোফায়। হঠাৎ কি মনে করে আবার উঠল এবং আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আয়নায় এক পলক তাকিয়ে দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে বলে উঠল, 'পাগলী কোথাকার!' তারপর চকিতে সরে এল আয়নার কাছ থেকে। এক অদ্ভুত চাঞ্চল্যের যন্ত্রণায় কোথাও সে স্থির হয়ে বসতে পারছে না। অকারণেই কামরার ভিতর ঘুরপাক খেল কয়েকবার। তারপর ছাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাদে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল তারাগুলো পরস্পরের সাথে কানাকানি করছে। নদীর দিক থেকে ভেসে আসছে সুমধুর গানের সুর। এ গান মায়মুনা বহুবার শুনেছে, কিন্তু আজই প্রথম অনুভব করল, এ রকম হাজারো গানের সুর, হাজারো সুখ তার বুকের ভিতর দাপাদাপি করছে। বুকের খাঁচা ভেদ করে তারা যেন সব বেরিয়ে আসতে চাইছে এই সুন্দর পৃথিবীতে।

চাকরাণী এসে বলল, 'মেহমানের জন্য রান্না চড়াবো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাও কি জিজ্ঞেস করতে হয়! কিন্তু..... দাঁড়াও, আমি নিজেই আসছি। আজ আমিই রান্না করবো।'

বৈঠকখানায় ইদ্রিস ও সাদ একে অন্যের কুশল খবর নিচ্ছে। ইদ্রিসের প্রশ্ন শেষ হলে সাদ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আম্মাজান কেমন আছেন? আগে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিয়ে এসো, তারপর আলাপ করা যাবে।'

'আম্মাজান গত বছর ইন্তেকাল করেছেন।' ইদ্রিসের শোকার্ত কণ্ঠ।

সাদ সমবেদনা প্রকাশ করার ভাষা খুঁজছিল, ইদ্রিস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বসো, আমি খাবারের ব্যবস্থা করি।'

'আমি সরাইখানা থেকে খেয়ে এসেছি।'

'তুমি কখন এখানে পৌছলে?'

'সন্ধ্যার একটু আগে। আমি ভাবতেই পারিনি, তোমাকে এখানে পাব। মনে করেছিলাম, হয়তো তুমি গ্রানাডা চলে গেছ। সরাইখানার পাশের মসজিদের খতিব সাহেব তোমাকে চেনেন, তিনিই সাথে লোক দিয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আহমদ ও হাসান সরাইখানায় আছে।'

ইদ্রিস কামরা থেকে বের হয়ে চাকরকে ডেকে বলল, 'তাড়াতাড়ি আমার টাঙ্গা তৈরী কর।'

তারপর কামরায় ফিরে এসে বলল, 'আমি আহমদ ও হাসানকে আনতে যাচ্ছি। তুমি আরাম করো, আমি তোমার বিছানা ঠিক করে দিচ্ছি।'

সাদ উঠে ওর হাত ধরে বলল, 'ইদ্রিস, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি, তুমি শান্ত হয়ে বসো। আমাদের সাথে আরো লোকজন আছে। আমাকেও ওখানেই রাত কাটাতে হবে।'

ইদ্রিস বলল, 'কি বলছো সাদ! আমরা এখানে থাকতে তুমি সরাইখানায় রাত কাটাবে? তোমার সাথে পঞ্চাশজন থাকলেও তাদের সরাইখানায় রাত কাটাতে হবে না। আমার সারা বাড়ি তো খালিই পড়ে আছে।'

সাদ বলল, 'এখন কিছুতেই আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়। আমি এক বিশেষ জরুরী কাজে সেভিল এসেছি। আগে আমার কথা মন দিয়ে শোন, তারপর যা হয় করবে।'

ইদ্রিস রণে ভঙ্গ দিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'আমি জানি তুমি বড় জেদী। আচ্ছা বলো, কি বলতে চাও?'

সাদ বলল, 'তুমি জানো না, ইবনে আম্মার শুধু মুতামিদকেই ধোঁকা দেয়নি বরং স্পেনের সমস্ত মুসলমানদের সে ধোঁকা দিচ্ছে। যে পাঁচ হাজার মুজাহিদ ইসলাম ও কুফরের জিহাদে জান বাজী রেখে লড়াই করার জন্য প্রচণ্ড আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে এখানে এসেছিল, স্পেনের মুসলমানদের ধ্বংস আর বেশী দূরে নয় এ তিক্ত অনুভূতি নিয়ে ফিরে গেছে তারা। যদি আলফানসুর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়ে যেতো, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কয়েক দিনের মধ্যে মুজাহিদদের সংখ্যা দশ গুণ বৃদ্ধি পেতো। এমনকি স্পেনের সাধারণ মুসলমানরা নিজ নিজ শাসকবর্গকে মুতামিদের সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য করতো। আমি মুতামিদের সাথে দেখা করতে চাই। তাঁকে বলতে চাই, ইবনে আম্মারের কাছ থেকে মোটা পরিমান ঘুষ নিয়ে যে দুশমন ফিরে গেছে, অচিরেই সে আবার ফিরে

আসবে, আর ফিরে আসবে আরও বেশী প্রস্তুতি নিয়ে। ঘুষ দিয়ে খৃষ্টানদেরকে বার বার ফিরিয়ে দেয়া যাবে না।

সেভিলের শাসকবর্গ যদি আবারো এ পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে দুশমন আরও কয়েক গুণ বেশী খাজনা ও ঘুষ দাবী করবে। এভাবে মুতামিদকে রাজকোষ শূন্য করে সেভিলের স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের দাম শোধ করতে হবে এবং এমন সময় আসবে যখন সিংহাসন ছাড়া তার আর দেয়ার কিছু থাকবে না।

ইবনে আম্মার এবার পাঁচশ ঘোড়া দিয়ে দুশমনকে বিদায় করেছে। তারপর এক সময় সে সৈনিকদেরকেও দুশমনের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে। সেভিলে যখন আর কিছুই থাকবে না, তখন আলফানসু বিনা বাধায় এ রাজ্য দখল করে নেবে। তখন সেভিলের লোকদের পক্ষে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করা তো দূরের কথা, নিজেদের পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও অবশিষ্ট থাকবে না। আর অন্যান্য রাজ্যের মুসলমানরাও সাহায্য করতে আসা নিরর্থক মনে করবে।

ইবনে আম্মার চতুর রাজনীতিবিদ। সুলতানের পতন দশা দেখলে আলফানসুর প্রশংসা করে কবিতা লিখতে তার কষ্ট হবে না। সেভিলে সুলতানের পরিবর্তে আলফানসুর সাথে নিজের ভবিষ্যত জুড়ে দেবে ইবনে আম্মার। এ পরিণতি সম্পর্কে সুলতান মুতামিদকে সতর্ক করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। অন্যথায় সেভিলের ধ্বংস সমগ্র স্পেনের মুসলমানদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করবে।'

ইদ্রিস বলল, 'সাদ! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? এক নীতি-জ্ঞানহীন বাদশাহকে জ্ঞান দান করবে তুমি? তোমার মত শ[illegible]তি সাদের কথায় সে কান দেবে এমনটি তুমি ভাবলে কি করে! তুমি বোধ হয় জান না, মুতামিদ ইবনে আম্মারের এ সাফল্যকে তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় বিজয় বিবেচনা করে। আলফানসুর ফিরে যাবার খবর শোনা মাত্রই সে বিজয় উৎসব পালনের নির্দেশ দেয়।

পরশু ইবনে আম্মার শহরে আসবে। মুতামিদ সমস্ত আমীর ওমরাকে নিয়ে শহরের বাইরে গিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারপর শুরু হবে বিজয়োৎসব এবং তা কতদিন চলবে তার কোন ঠিক নেই। প্রথম কথা হচ্ছে, তোমার পক্ষে মুতামিদের কাছে পৌছারই কোন উপায় নেই। যদি কোন উপায়ে তুমি সেখানে পৌছতে পার, তাহলে মুতামিদ ইবনে আম্মারের বিরুদ্ধে তোমার কথা শোনার পরিবর্তে তোমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। তিনি হয়ত এ ছাড়া তোমাকে আর কোন সাজা দেবে না কিন্তু তার দরবার থেকে বের হয়ে আসার পর তুমি দেখতে পাবে, সেভিলের প্রতিটি দেয়ালের আড়ালে তোমাকে হত্যা করার জন্য এক একজন দুশমন প্রতীক্ষা করছে। মুতামিদের সাথে দেখা করলে তোমার পক্ষে এ শহর থেকে জীবিত ফিরে যাওয়া একটি অলৌকিক ও বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।'

সাদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ইদ্রিস, আমি জানি, যে কাজে আমি নেমেছি

তা করতে গেলে আমাকে হয়তো বা নিজের প্রাণ হারাতে হবে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, সত্যের আওয়াজ শুনে মুতামিদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে এবং সমগ্র জাতি এক অনিবার্য ধ্বংস থেকে বেঁচে যাবে!'

ইদ্রিস বলল, 'আমি জানি, মুতামিদের সাথে দেখা না করে জীবন থাকতে ফিরে যাবে না। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছো তখন দুনিয়ার কোন শক্তিই তোমাকে ফিরাতে পারবে না।'

সাদ বলল, 'তুমি আমার সাফল্যের জন্য দোয়া করো। মুতামিদের সাথে সাক্ষাতের ফল যদি আশানুরূপ হয়, তাহলে আমি আহমদ ও হাসানকে নিয়ে সোজা তোমার বাড়ি এসে উঠবো। এবং যতদিন তুমি বিরক্তিবোধ না করবে, ততদিন থাকবো। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমাদের বন্ধুত্বের খবর জানাজানি না হওয়াই ভাল।'

ইদ্রিস বলল, 'তুমি মনে করছো, তুমি আমার মেহমান হলে আমার চাকরী চলে যাবে। আমার ওপর বিপদ নেমে আসবে। হায়! তুমি যদি জানতে, এখানে আমি কি দুঃসহ অবস্থায় সময় কাটাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তে এখান থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়, শুধু মায়মুনার কথা চিন্তা করে এখনো সেভিল ছাড়তে পারিনি।'

'ইদ্রিস! আমাদের বন্ধুত্ব সামান্য লৌকিকতার ব্যাপার নয়। তোমার সাথে আমি গাছতলায়ও থাকতে পারি। যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন আবার আমরা মিলিত হবোই।'

ইদ্রিস বলল, 'কিন্তু মুতামিদের সাথে সাক্ষাৎ করাই তো তোমার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এ মুহূর্তে তার সাথে দেখা করার অনুমতি জোগাড় করবে কিভাবে? শাহী মহলের নায়েম আমার পরিচিত ছিল, কিন্তু সে বিজয়োৎসবের কাজে এতই ব্যস্ত যে তাকে দিয়ে কোন ফায়দা হবে বলে মনে হয় না।'

সাদ বলল, 'সে জন্য তুমি চিন্তা করো না। আমি কোন না কোন উপায় বের করে নেবো। এখন আমাকে বিদায় দাও।'

ইদ্রিস বলল, 'না, সরাইখানা পর্যন্ত আমি তোমার সাথে যাবো। তুমি বসো, আমি এখনি আসছি।'

'মায়মুনা! মায়মুনা!' ইদ্রিস বাড়ির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বোনকে ডাকল।

মায়মুনা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বলল, 'আমি এখানে ভাইজান।'

'তুমি ওখানে কি করছ?'

'রান্না করছি ভাইজান!'

'তুমি খামাখাই কষ্ট করছো মায়মুনা! সাদ খাবে না, চলে যাচ্ছে।'

মায়মুনার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। হতবাক হয়ে সে তাকিয়ে রইল ভাইয়ের দিকে। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। কোন মতে উচ্চারণ করল, 'তিনি.... তিনি চলে যাচ্ছেন!'

'হ্যাঁ।' বলে ইদ্রিস এগিয়ে গেল। রান্নাঘরের আলোয় ইদ্রিসের হাসিমাখা মুখ দেখে মায়মুনা আবার প্রাণ ফিরে পেল। ভাবল, ভাই তার সাথে ঠাট্টা করছে। এগিয়ে এসে বলল, 'আমি মনে করেছিলাম, তিনি বুঝি সত্যি সত্যি যাচ্ছেন।'

'আমি ঠাট্টা করছি না। সরাইখানায় তার কয়েকজন সাথী আছে। তাদের সাথেই সে থাকতে চায়। সাদের ছোট ভাইয়েরাও এসেছে।'

'আপনি তাকে...' আর বলতে পারল না। তার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। মায়মুনা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ইদ্রিস বলল, 'পাগলী, তুমি মনে করছো আমি সাদকে এখানে থাকার জন্য চাপ দেইনি। সে এক জরুরী কাজে এসেছে। কাজ শেষ করেই আমাদের বাড়ি আসবে। আমি তাকে সরাইখানায় পৌছে দিতে যাচ্ছি।'

মায়মুনা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'আপনি তাঁর বাড়ির খোঁজ নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তারা সবাই ভাল আছে।'

৫.

আজিমুশ্বান মিছিল নিয়ে ইবনে আম্মার শহরে প্রবেশ করল। স্বতঃস্ফূর্ত জনতা ও সরকারী কর্মকর্তারা পথের দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে করতালি ও শ্লোগান দিয়ে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। সরকার অবিরাম প্রচার করছিল, ইবনে আম্মার জাতির ত্রাণকর্তা। তার সাম্প্রতিক কৃতিত্বের বিনিময়ে জাতির কাছ থেকে সে সর্বোচ্চ সম্মান ও পুরস্কারের হকদার।

শাহী মহলের সদর দরজায় এসে মিছিল থামল। সুলতান মুতামিদ, সুলতানা রেমিকা এবং শাহী খান্দানের অন্যান্য সদস্যরা বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখছিল এ বিজয় মিছিল। মহলের প্রবেশ পথে লাল গালিচা পাতা। দুপাশে ফুলের টব।

ঘোড়া থেকে নামল ইবনে আম্মার। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে মুতামিদ ও রাণীকে কুর্নিশ করল। তারা এগিয়ে এসে তার গলায় মূল্যবান রত্ন-হার পরিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল।

এরপর মুতামিদ ও রেমিকাকে অনুসরণ করে ইবনে আম্মার আমীর ওমরাদের সাথে মহলের ভেতরে প্রবেশ করল। সাদ ও তার সঙ্গীরা ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। ইদ্রিস সাদের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'সাদ, আমি বুঝতে পারছিনা, তুমি এদের কি বুঝাবে? মত বিনিময় তো দূরের কথা, আমার তো মনে হয় তুমি মুতামিদের সাক্ষাতই পাবে না।'

সাদ বলল, 'আমি অবশ্যই তাঁর সাথে দেখা করবো। এ আমার শপথ। আজকের এ ঘটনা দেখার পর মোলাকাত না করে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না।'

মাগরিবের নামাজের পর সঙ্গীদের সরাইখানায় রেখে সাদ, আহমদ ও হাসান ইদ্রিসের বাড়িতে এল। ইদ্রিস বাড়ি নেই দেখে সাদ ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু ইদ্রিসের বুড়ো চাকর এগিয়ে এসে বলল, 'তিনি এখনি চলে আসবেন। আপনারা আসলে বসতে বলে গেছেন।'

সাদ ভাইদের নিয়ে বৈঠকখানায় বসল। একটু পরই ইদ্রিস এসে গেল। খাওয়া দাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত তারা গল্প করে কাটাল। অবশেষে সাদ বলল, 'অনেক রাত হয়েছে, এবার উঠতে হয়।'

ইদ্রিস বলল, 'এখন আর ওখানে গিয়ে কি করবে? এখানেই থেকে যাও।'

'না, সঙ্গীরা তাহলে চিন্তা করবে।'

এ সময় ঘরের দরজার কড়া নড়ে উঠল। ইদ্রিস বাইরে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এসে বলল, 'সাদ, মায়মুনা খুবই রেগে গেছে। বলছে, তুমি যদি আমাদের মেহমান হতে না চাও অন্তত ছোট ভাইদের রেখে যাও।'

'আমরা এখান থেকে যাওয়ার আগে তোমাদের ইচ্ছে মত মেহমানদারী করার সুযোগ দেবো। আপাতত কাজ শেষ করি। কাজ শেষ হলেই এখানে চলে আসবো। এখন দয়া করে আমাদের যাওয়ার অনুমতি দাও।'

ইদ্রিস বলল, 'অর্থমন্ত্রী পরশু খাজনা নিয়ে আলফানসুর কাছে যাবেন। টাকশালে দিন-রাত কাজ চলছে। এ জন্য আমি খুবই ব্যস্ত। তোমার সাথীদের সাথে দেখাও করতে পারলাম না। রাজকোষের সকল সোনা ও রূপাকে মুদ্রায় পরিণত করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। এখনো অনেক কাজ বাকী। আজ সারা রাতই আমাকে টাকশালে কাটাতে হবে। কালও সম্ভবত আমি মোটেই ফুরসত পাবো না। তারপর অবশ্য ঝামেলা কমে যাবে। তখন মুতামিদের সাথে তোমার সাক্ষাতের কোন ব্যবস্থা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। উৎসব শেষে ইবনে আম্মারও মর্সিয়া চলে যাচ্ছে। আমি মনে করি, তার অনুপস্থিতিতে তুমি মন খুলে কথা বলতে পারবে।'

'আমি যা বলতে চাই তা ইবনে আম্মারের সামনেই বলতে চাই। আশা করি দুয়েকদিনের মধ্যেই আমি দরবারে হাজির হবার সুযোগ পাবো।'

'তুমি খুবই জেদী সাদ! আচ্ছা, চল।'

সবাই টাঙ্গায় এসে সওয়ার হল। ইদ্রিস গেল টাকশালে আর ওরা সরাইখানায়।

৬

পর দিন। সাদ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শাহী মহলের চারদিকে ঘুর ঘুর করল, কিন্তু দরবারে প্রবেশের অনুমতি আদায় করতে পারল না। শাহী মহলের নায়েমের সাথে দেখা করল, তার সামনে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

নায়েম জবাব দিল, 'সুলতান বর্তমানে উৎসব নিয়ে ব্যস্ত। এ সময় গ্রানাডার শাসনকর্তা এলেও সাক্ষাতের সুযোগ পাবে না। তুমি সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করো, তখন দেখবো তোমার আবেদন পেশ করা যায় কি না। তিনি অনুমতি দিলেই কেবল তোমাকে মহলে প্রবেশের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। আর বেশী তাড়াহুড়া থাকলে সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধানের সাথে কথা বলে দেখতে পারো। তাঁর সুপারিশ থাকলে হয়তো তোমাকে বিজয় উৎসবে যোগদানের অনুমতি দিতেও পারেন।'

সাদ সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধানের সাথে কথা বলল। সে বলল, 'আমি শুধু বিদেশী কবি ও গায়কদের জন্য সুপারিশ করতে পারি। উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কারো জন্য সুপারিশ করা সম্ভব নয়।'

সেদিনই সাদ সাহস করে কবিদের এক দলের সাথে শাহী মহলে ঢুকে পড়ল। প্রধান ফটক পার হয়ে মহলের প্রাসাদ প্রাঙ্গণে পৌঁছলে এক পাহারাদার তার অনুমতিপত্র দেখতে চাইল। সাদ তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে এক অফিসার তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার অনুমতি পত্র?'

'আমি গ্রানাডা থেকে সুলতানুল মুয়াজ্জমের জন্য এক জরুরী খবর নিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু এ মুহূর্তে উৎসবের অনুমতিপত্র ছাড়া কেউ ভেতরে যেতে পারবে না।'

'সুলতানুল মুয়াজ্জমের সাথে আমার সাক্ষাত হওয়া খুবই জরুরী। আমার ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ হলে আমাকে গ্রেফতার করে সুলতানের সামনে পেশ করুন।'

'আপনার পরামর্শ মত কাজ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে, দয়া করে আপনি চলে যান। দ্বিতীয়বার এ ধরনের চেষ্টা আর করবেন না।'

সাদ পুলিশের সাথে তর্ক জুড়ে দিল। নগর কোতোয়াল জটলা দেখে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'এখানে কি হচ্ছে?'

'এ যুবক অনুমতি ছাড়া প্রাসাদে ঢুকতে চাচ্ছে। বলছে, দরকার হলে গ্রেফতার করে সুলতানুল মুয়াজ্জমের সামনে হাজির করতে।'

কোতোয়াল বলল, 'ইদানিং দেখছি পাগলের সংখ্যা খুবই বেড়ে গেছে। তোমরা ফটকের বাইরে থেকে অনুমতিপত্র চেক করার ব্যবস্থা করো।'

অফিসার বলল, 'সেভিলের পাগলরা তবু শাহী মহলের আদব কায়দা জানে। কিন্তু এ এসেছে গ্রানাডা থেকে।'

'তাহলে দু'জন সিপাইকে বলো, ওকে শহরের বাইরে রেখে আসুক।'

সাদ কোতোয়ালের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মোটা তাজা দেহে যেন অতীতের একটি অস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠছিল। সাদ মনে মনে বলল, 'কোথায় যেন তাকে দেখেছি।' কোতোয়ালও বার কয়েক তার দিকে তাকাল। তারও মনে হচ্ছিল, এ যুবককে সে কোথাও দেখেছে।

সাদ ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। কোতোয়াল হঠাৎ গর্জে

উঠল, 'দাঁড়াও।'

সাদ দাঁড়িয়ে পুনরায় তার দিকে তাকাল। কোতোয়াল দু'কদম এগিয়ে এসে সাদকে বলল, 'সম্ভবত এর আগেও তোমাকে আমি কোথাও দেখেছি।'

সাদ শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কখনো গ্রানাডা গিয়েছিলেন?'

'না, তবে তোমাকে যে দেখেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'দুদিন ধরে আমি শাহী মহলে ঢুকার জন্য ঘুর ঘুর করছি।'

'দু'দিন ঘুরার পরও কি তুমি বুঝতে পারোনি, এটা সরাইখানা নয়। ভবঘুরে লোকের জন্য এর ফটক খোলা থাকে না। তুমি কি চাও?'

'আমি সুলতানুল মুয়াজ্জমের সাথে দেখা করতে চাই।'

'কেন দেখা করতে চাও?'

'আমি গ্রানাডা থেকে মুজাহিদ দলে শামিল হয়ে সেভিলের পক্ষে লড়তে এসেছিলাম। ফিরে যাবার আগে...'

কোতওয়াল তার কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'আমি সুলতানের পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন তুমি ফিরে যাও। অনর্থক গলা ধাক্কা খাওয়ার চেয়ে এই ভাল।'

সাদ ধীরে ধীরে হেঁটে বাইরে চলে গেল।

কোতোয়াল পুলিশ অফিসারকে বলল, 'এদের ধারণা, সেভিলের প্রতিটি গাছের পাতায় সোনা-রূপা লেগে রয়েছে। সে যদি আবার এসে ঝামেলা করে, তাহলে সোজা কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেবে।'

৭

সেদিন রাতে সাদ সরাইখানার কামরায় বসে নিজের ভাই ও সঙ্গীদের কাছে সারাদিনের কাজের ফিরিস্তি দিচ্ছিল। কথা শেষ হলে আহমদকে বলল, 'আহমদ! তোমার কি মনে আছে, ছোটবেলায় মদীনাতুজ-জোহরায় এক ছেলের সাথে আমি কুস্তি লড়েছিলাম এবং তাকে বেদম মত পিটিয়েছিলাম?'

আহমদ বলল, 'হ্যাঁ, ভাইজান! তার নাম ছিল জিয়াদ। সে এখন এখানেই আছে। আমি নিজে তাকে দেখেছি।'

সাদ বলল, 'আজ সে সেভিলের কোতোয়াল। ভাগ্যিস সে আমাকে চিনতে পারেনি।'

ইলিয়াস বলল, 'আমার মনে হয় এখন আমাদের গ্রানাডা ফিরে যাওয়া উচিত। অনর্থক বাঘের লেজ দিয়ে কান চুলকিয়ে লাভ কি?'

চিন্তার সাগরে ডুবে গেল সাদ। আহমদ ও হাসান প্রথমবারের মত ভাইয়ের

চেহারায় নিরাশার ছবি দেখতে পেল। আহমদ বলল, 'ভাইজান, যদি আপনি মনে করেন, মুতামিদের সাথে দেখা হলে সুফলের আশা আছে তাহলে আজ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

সাদ বলল, 'আমার এখন কোন কিছুতেই আস্থা নেই। আমি হয়তো অলীক স্বপ্নের জগতে বসবাস করছি। সম্ভবত স্পেন দরদী প্রতিটি যুবক এ ধরনের কল্পনার সাগরেই ভেসে বেড়াচ্ছে।'

আহমদ বলল, 'কিন্তু আপনি সত্যিই দেখা করতে চাইলে সে বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।'

সাদ এবার আহমদের মুখের দিকে তাকাল। আহমদের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা। সাদ এ হাসির অর্থ বুঝতে না পেরে একটু কর্কশ স্বরেই বলল, 'কিভাবে করবে?'

আহমদ বলল, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। বুদ্ধিমত কিছু কাজও করেছি। আপনি জানেন, আজকাল শাহী মহলের দরজা শুধু কবি ও গায়কদের জন্যই খোলা থাকে। গায়ক তো আপনি হতে পারবেন না, তবে কবির অভিনয় করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে না।'

সাদ আরও কর্কশ স্বরে বলল, 'তার মানে?'

আহমদ পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বলল, 'দেখুন, এটিই মুতামিদের মহলে প্রবেশ করার চাবি।'

সাদ রেগে গিয়ে বলল, 'এটা কি তামাশা করার সময়?'

'তামাশা নয় ভাইজান! সবটা শুনলে এর জন্য আপনি আমাকে পুরস্কার দেবেন। এটা রাণী রেমিকার শানে রচিত একটা কবিতা। আমার চেষ্টা বিফলে না গেলে এতক্ষণে এ কবিতার একটি কপি রাণীর পড়া হয়ে গেছে এবং সে মুতামিদকে হুকুম দিচ্ছে, আমার নামে যে এত সুন্দর কবিতা লিখেছে সেই কবিকে তালাশ করে জলদি দরবারে হাজির করো। কবিতাটা একটু শুনেই দেখুনঃ

'হে সেভিলের প্রেমময়ী রাণী!
তোমার নজর কাড়া রূপ আর সৌন্দর্য
মুতামিদের রঙ্গীন স্বপ্নেরই প্রতিচ্ছবি।
যদি মুতামিদের কবিতা থেকে
পক্ষীকুল সুর শিখে থাকে, তাহলে
বাগানের পুষ্পরাজি এত আকর্ষণীয় হয়েছে
তোমারই মিষ্টি হাসি চুরি করে।'

সাদ বলল, 'থামো, ভারী দুষ্ট তো তুমি! এ কবিতা তুমি কোথায় পেলে?'

'আমি নিজেই লিখেছি। ভাইজান, আপনি রাগ করবেন না, আমি কবি নই। প্রয়োজনের তাগিদে একটু লিখেছি মাত্র। অনুমতি দিলে সবটাই শুনিয়ে দিতে পারি।'

'কবিতা পরে শুনবো। আগে বল, এ দুর্বুদ্ধি তোমার এল কোত্থেকে?'

'ভাইজান, জানি এটা বাজে কাজ। কিন্তু মুতামিদের দরবারে পৌঁছার সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবেই এ বাজে কাজটুকু আমি করেছি। আমি এ কবিতা নিয়ে শাহী মহলের দারোগার কাছে গিয়েছিলাম। সে প্রথমে আমার সাথে কথাই বলতে চায়নি। কিন্তু এ কবিতা পড়া শেষ হতেই সে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'কোথায় সে কবি? সে এখনো আমার কাছে আসেনি কেন? তাকে আমার সালাম বলবে। আমি আজই এ কবিতা বাদীমার খিদমতে পেশ করব। আমার বিশ্বাস, অচিরেই তিনি এ কবিকে ডেকে পাঠাবেন।'

'তাহলে তুমি সত্যি সত্যি এ কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছ?'

'ভাইজান, আমি কি কখনো আপনার সাথে ঠাট্টা করেছি? আমার বিশ্বাস, অচিরেই আপনাকে দরবারে ডাকা হবে।'

'আমাকে? এ কবিতা তুমি আমার নামে পাঠিয়েছ? দেখিতো তোমার কবিতা?'

সাদ কাগজখানা আহমদের হাত থেকে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ল। তারপর বলল, 'বোকা কোথাকার। বুড়ী পেত্নী এ কবিতায় খুশি হবে ভাবছো?'

আহমদ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলল, 'এ নিয়ে আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। এ সরাইখানাতেই কর্ডোভার একজন কবি আছেন। কাল তিনি আমাকে তাঁর কবিতা দেখিয়েছিলেন। আজ দরবারে তা শুনিয়ে পাঁচশ দীনার এনাম পেয়েছেন। তাঁর কবিতার প্রথম চরণ ছিলঃ

'কালের করাল গ্রাসে সকল চেহারাই বিকৃত হয়ে যায়,
কিন্তু হে রেমিকা! শুধু তুমি
ত্রিশ বছর আগে যা ছিলে আজও তাই আছো।'

'রেমিকার ওপর লানৎ হোক।' সাদ হাসি মুখে বলল। সবাই তার বলার ভঙ্গীতে হেসে উঠল।

'আমি আপনার জন্য কবির পোশাকও জোগাড় করে রেখেছি।'

'তাহলে তোমার মতলব, আমি সত্যি সত্যিই একজন কবি সেজে শাহী দরবারে যাই?'

'আমি জানি, আপনি কবি সাজতে রাজি হবেন, তবু সংকল্প ত্যাগ করবেন না।'

'তুমি তো ভারী দুষ্ট হয়েছ!'

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ভাইজান।' আহমদ মৃদু হেসে বলল।

রাতে দুই ভাই নিজ নিজ বিছানায় শুয়েছিল, সাদ আস্তে ডাকল, 'আহমদ!'

'জি ভাইজান?'

'তুমি কবিতা লেখা শিখলে কোথায়?'

'আপনার কাছে।'

'কি বললে, আমার কাছে?'

'ভাইজান, স্পেনের কবিদের আপনি ঘৃণা করতেন। আপনার ঘৃণার কারণ জানতে তাদের প্রতি আমি আগ্রহী হই। কবিদের ব্যাপারে ইসলামের ধারনা জানতে গিয়ে আমি জানতে পারি, ইসলামের স্বর্ণ যুগেও কবি ও কাব্য চর্চা ছিল। আমি অনেক সাহাবী কবির জীবনী পড়েছি। তাদের জীবনী পড়ে আমার মনে হয়েছে, তারাই ছিল যুগের নকীব। ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলেছে তাদের কবিতা। আফসোস! তাদেরই উত্তরসূরীরা আজ মরণ ঘুমে বিভোর। কবিতার রাজ্য থেকে যেমন সুরুচি বিদায় নিয়েছে, জীবন থেকেও তেমনি বিদায় নিয়েছে সততা ও সত্যবাদিতা।'

সাদ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আরও কবিতা লিখেছ নাকি?'

আহমদকে আমতা আমতা করতে দেখে হাসান বলল, 'জি, ভাইজান! আজ আমাকে আরও একটি কবিতা শুনিয়েছেন। সেভিলের লোকদের সম্পর্কে খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।'

আহমদ সাফাই পেশ করার কোন দরকার বোধ করল না। কিন্তু বালিশ থেকে মাথা উঠিয়ে ভাইয়ের চেহারা দেখার চেষ্টা করল। সাদের চেহারায় মৃদু হাসির রেখা দেখে সব ভয় দূর হয়ে গেল তার।

একটু পর সাদই আবার মুখ খুলল, 'আহমদ, আমি জানতাম, তুমি কবি হবে।'

'না, না, ভাইজান! আমি কখনও তামাশা করেও কবিতা লিখি না।'

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি সে সব কবিদের অপছন্দ করি না, যারা ঘুমন্ত জাতির কানে বিপ্লবের গান শোনায়। পরিবেশের শিকার না হয়ে তারা যদি এ মহান দায়িত্ব পালন করতো তবে তারাই হতো যুগের নকীব। তাহলে স্পেনের জনগণকে আর আজকের এ কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হতো না। তুমি সেভিলের লোকদের সম্পর্কে কি লিখেছ শোনাও তো আমাকে।'

আহমদ বলল, 'ভাইজান, ওটা আপনাকে শোনানোর উপযোগী নয়।'

পাশের কামরা থেকে ইলিয়াস ওদের সব আলোচনাই শুনছিল। এবার সে সাদের কামরায় এসে বলল, 'আমিও কবিতা শুনবো ভাই।'

'শোনাও আহমদ।' সাদ পুনরায় বলল।

ইলিয়াস অন্যান্য কামরা থেকেও সঙ্গীদের ডেকে আনল। আহমদ কবিতা পড়তে শুরু করলঃ

'বদলে দিয়েছে সেভিল-কবিরা শব্দের অর্থ তাই,
বর্তমানে কাপুরুষরাই সিংহ, শুনতে পাই।
মুতামিদের বাহিনীর আর নাইরে পরাজয়
পরাজয়কেই মনের সুখে, বলে, হলো জয়।
শত্রু বলে মুতামিদকে যুদ্ধ করতে এসো.

মুতামিদের সৈন্য বলে রাজ ভোগে আজ বসো।
সেভিল বাসীর তরবারির আর নাইরে প্রয়োজন,
ইবনে আম্মার করেছে দাবায় দক্ষতা অর্জন।
সেভিল নারীর বেইজ্জতীর নাইরে কোন ভয়
নারী সুলভ লজ্জা রাণী নিজেই করছে জয়।
ইসলামে আর পারবে না কেউ করতে খতম ভাই
মুসলমানের হাতেই এখন ইসলাম যে আর নাই।
নাই যাহা তা করবে খতম এমন বাহাদুর
আকাশ পাতাল পাবে না কেউ খুঁজে অন্তপুর।

৮.

সেই রাতেরই ঘটনা। শাহী মহলের এক কামরায় শাহজাদা রশীদ ধীরে ধীরে পায়চারী করছিল। চেহারায় কখনও রাগ, কখনও অস্থিরতা ফুটে উঠছিল। এক চাকরাণী ভেতরে এসে বলল, 'জিয়াদ দেখা করার অনুমতি চায়।'

গর্জে উঠল রশীদ, 'আমার কাছে তার আসতে আবার অনুমতি কি?'

চাকরাণীর বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরই জিয়াদ এসে কামরায় ঢুকল।

'মাফ করবেন, আমার আসতে দেরী হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা দেখার জন্য চাকরাণীকে পাঠিয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে, বল কি খবর নিয়ে এসেছ?'

'কোন সন্তোষজনক খবর আনতে পারিনি।'

'আমি জানতাম, ও বড় জেদী। বসো।'

জিয়াদ একটি চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'জেদীর তুলনায় আহাম্মক বেশী। কত করে বুঝালাম, কিন্তু কিছুতেই রাজী হলো না। কুকুরের লেজ কি ঘি মাখলে সোজা হয়!'

'তুমি কি বলেছো, আমি কর্ডোভার গভর্ণর হয়ে যাচ্ছি?'

'জ্বি, কিন্তু বেকুব বলে কি, আপনি সমগ্র স্পেনের সম্রাট হলেও তার মতের নড়চড় হবে না।'

'কিন্তু কেন?'

'সে বলে, সে এখানে চাকরী করতে এসেছে, বোনের ইজ্জত বিক্রি করতে নয়।'

'অর্থাৎ সে মনে করে, আমার সাথে বিয়ে হলে তার বোনের বেইজ্জতি হবে? তুমি কি তাকে বলোনি, স্পেনের অভিজাত ঘরের শত শত কুমারী এ সম্মান লাভের জন্য লালায়িত?'

জিয়াদ বলল, 'শাহজাদা! সে সবকিছুই জানে। কিন্তু আহাম্মকীর তো কোন

চিকিৎসা নেই। আমি বুঝতে পারছিনা, আপনিই বা তার বোনের মধ্যে কি দেখলেন? আপনি চাইলে স্পেনের বাইরেরও অনেক বাদশাহ আপনার সাথে আত্মীয়তা করে নিজেদের ধন্য মনে করবে। তা ছাড়া এ মেয়ের ব্যাপারে ইদ্রিস রাজি হলেও সুলতানুল মুয়াজ্জম পছন্দ করবেন কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'আম্মাজানের বিশ্বাস, ইদ্রিস রাজী হলে আব্বাজান দু'চার দিন ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত সম্মতি দেবেন। আর কর্ডোভার গভর্ণর হলে তো আমি আব্বাজানকে সম্মতি দেয়ার জন্য নিজেই চাপ দিতে পারবো। কিন্তু ইদ্রিস রাজি না হলে আব্বা বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করার একটা অজুহাত পেয়ে যাবেন।'

জিয়াদ বলল, 'শাহজাদা! বেয়াদবী না নিলে আমি জানতে চাই, এ মেয়েটির মধ্যে আপনি এমন কি গুণ দেখলেন, যে কারণে আপনি এত উদগ্রীব? আমার তো মনে হয়, এটি আপনার জীবনের মস্ত বড় ভুল। সুলতান এতে রাজী হলেও এ মর্মপীড়া তার যাবে না যে, শত শত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের উপেক্ষা করে আপনি একটি সাধারণ ঘরের মেয়েকে পছন্দ করেছেন।'

রশীদ কাতর কণ্ঠে বলল, 'জিয়াদ! তুমি জানো না, মায়মুনা কোন সাধারণ মেয়ে নয়। ওর রাগে লাল লাজরাঙা আকর্ষণীয় রূপের যে মাধুরী আমি দেখেছি, এ জীবনে কোনদিন তা ভুলতে পারবো না। সেদিন তার চোখে বিজলীর যে চমক আমি দেখেছি, তুমি তা দেখোনি। মেয়েরা যখন টেনে তার মুখের নেকাব ছিঁড়ে ফেলেছিল, সে লজ্জার আকুলি বিকুলিও তুমি দেখোনি। আমি তো মনে করেছিলাম, সে কেঁদেই ফেলবে। কিন্তু যখন মহলের সিঁড়িতে তার পথ আগলে দাঁড়ালাম, তখন আল্লা মালুম কোত্থেকে তার দেহে বাঘিনীর শক্তি এসেছিল। আমি ওকে ভুলতে পারবো না। কখনও না। তাহলে এটাই হবে আমার জীবনের শোচনীয় এবং জঘন্য পরাজয়। আমারই এক সাধারণ কর্মচারীর বোনের কাছে আমি ভেজা বেড়ালে পরিণত হবো? না না, এ অসম্ভব। আমি এর শেষ দেখতে চাই।

জিয়াদ! তুমি আমার বন্ধু! আমি তোমার সাহায্য চাই। তুমি আমাকে একটি সাধারণ মেয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেয়ার পরামর্শ দিও না। আমি যে কোন মূল্যে ওকে পেতে চাই।'

জিয়াদ বলল, 'আমি জানতাম না, ওর জন্য আপনি এতটা বেকারার, এতই দিওয়ানা। জানলে.....'

রশীদ আশা ভরা চোখ মেলে প্রশ্ন করল, 'জানলে কি?'

'জানলে এর একটা বিহিত অবশ্যই করতাম। এটা এমন কোন কঠিন কাজ নয়।'

'খোদার দিকে চেয়ে তুমি একটা কিছু করো। এ আমার জীবন-মরণের প্রশ্ন।'

জিয়াদ হেসে বলল, 'আমি জানি, এটা মোটেই আপনার জীবন-মরণ প্রশ্ন নয়। আপনাকে সেদিন ও যে আঘাত করেছে, আপনি তারই প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছেন।'

'তুমি যা মনে করো, করো। তবুও আমাকে বলো, আমার জন্য তুমি এখন কি করতে পারবে।'

জিয়াদ বলল, 'ঠিক আছে, বিষয়টি যেন এখন সুলতানের কানে না যায়। আপনি সুলতানকে বলবেন, আমি কর্ডোভা যাচ্ছি। আমিও ওকে কর্ডোভা পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। কর্ডোভায় আপনার করুণার ওপর নির্ভর করা ছাড়া মায়মুনার কোন গত্যন্তর নেই। এদিকে ইদ্রিসকেও রাজী করাতে চেষ্টা করবো। আর রাজি না হলে ওর কপালে জুটবে লাল দালানের ভাত।'

'ইদ্রিসের উপস্থিতিতে তাকে কি করে অপহরণ করবে?'

জিয়াদ বলল, 'সে বিষয়েও আমি চিন্তা করেছি। আগামী কাল আমাদের অর্থমন্ত্রী আলফানসুর খাজনা নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি তাকে বলবেন, ইদ্রিসকে সে যেন সাথে করে নিয়ে যায়। আপনি বললে সে কখনো না করবে না। আপনি এক্ষুণি গিয়ে অর্থমন্ত্রীর সাথে কথা বলুন। ইদ্রিস কয়েক দিনের জন্য বাইরে চলে গেলে আমি তার ফিরে আসার আগেই মায়মুনাকে কর্ডোভা পৌছানোর কাজ শেষ করে ফেলবো।'

রশীদ বলল, 'জিয়াদ, খোদার কসম করে বলছি, তোমার-ঋণ কোন পুরস্কার দিয়ে শোধ করা যাবে না। আমার ক্ষমতা থাকলে এখনি তোমাকে মর্সিয়ার গভর্ণর নিযুক্ত করে দিতাম।'

'যেদিন মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা আপনার হাতে আসবে আমি সেই শুভদিনের অপেক্ষায় থাকবো।' বলল জিয়াদ।

৯.

পরদিন দুপুর। সাদের কাছে ছুটে এলো সরকারী পেয়াদা। বলল, 'সুলতানুল মুয়াজ্জম আপনাকে আজ রাতে কবিদের মজলিশে যোগদানের জন্যে দাওয়াত দিয়েছেন। শাহী মেহমানখানার অধ্যক্ষ আশা করছেন, আজ থেকে আপনি শাহী মেহমানখানায়ই থাকবেন। সেখান থেকেই রাতে আপনাকে শাহী মহলে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে। আপনার সম্মানে আমি ঘোড়া নিয়ে এসেছি।'

সাদ সঙ্গীদের দিকে একবার তাকিয়ে পেয়াদাকে বলল, 'কিন্তু আমি যে আমার বন্ধুদের নিয়ে সরাইখানাতেই থাকতে চাচ্ছিলাম।'

পেয়াদা বলল, 'আপনি শাহী মেহমানখানায় না থেকে সরাইখানায় থাকছেন জানলে সুলতানুল মুয়াজ্জম মেহমানখানার অধ্যক্ষের ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন। উজীর ইবনে আম্মার হুকুম দিয়েছেন, আপনার সেবা যত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয়।'

সাদ বলল, 'ঠিক আছে! মেহমানখানার অধ্যক্ষকে আমি বেকায়দায় ফেলতে চাই না। সন্ধ্যা নাগাদ আমি নিজেই মেহমানখানায় পৌছে যাবো।'

পেয়াদা বলল, 'আপনি হুকুম করলে আমি সন্ধ্যায় আবার টাঙ্গা নিয়ে হাজির হবো।'

'না, টাঙ্গার কোন দরকার নেই, আমি নিজেই পৌছে যাবো।'

পেয়াদা সালাম দিয়ে টাঙ্গা নিয়ে ফিরে গেল। সাদ কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করল, তারপর সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমাদের কাছে আমার ছোট্ট একটি মিনতি ছিল। আমি চাই, তোমরা সকলেই এখান থেকে সরে পড়ো। যে কাজের জন্য একজনই যথেষ্ট সে কাজে সকলে জড়িয়ে বিপদের সম্মুখীন হও, এ আমি চাই না।'

ইলিয়াস প্রতিবাদ করে বলল, 'সাদ, তুমি আমাদের এত কাপুরুষ ভাবলে কি করে।'

সাদ একটু নরম সুরে বলল, 'আমাকে ভুল বুঝো না। এখানে আসার আগে আমার ধারনা ছিল, আমরা সবাই এক সাথে মুতামিদের সাথে দেখা করতে পারবো। কিন্তু এখন আমি একা যাচ্ছি। মুতামিদ আমাকে তার দোস্ত মনে না করে দুশমন মনে করারই আশংকা প্রবল। আমি সারা জীবন তার কারাগারে থাকতে চাই না। যেভাবেই হোক আমি পালাবো। কিন্তু তখন পুলিশ এসে এই সরাইখানাটি ঘেরাও করবে এবং তোমাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। আর তোমাদের উদ্ধার করার জন্য আমাকে তখন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে হবে।'

ইলিয়াস বলল, 'কিন্তু তুমি গ্রেফতার হয়ে গেলে আমরা গ্রানাডা ফিরে গিয়ে কি করে মুখ দেখাবো?'

'ইবনে আম্মার যদি এ অপমানজনক পথ গ্রহণ না করে আলফানসুর সাথে যুদ্ধ করতো আর আমি সে লড়াইয়ে শহীদ হয়ে যেতাম, তাহলে তোমরা কি করতে?'

ইলিয়াস বলল, 'সরাইখানা ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি অন্য কোথাও তোমার জন্য অপেক্ষা করি?'

এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, আহমদ ও হাসান চলে যাবে ইদ্রিসের বাড়িতে। বাকীরা সেভিল থেকে পাঁচ মাইল দূরে অন্য এক সরাইখানায় গিয়ে সাদের জন্য অপেক্ষা করবে। মুতামিদের সাথে সাক্ষাতের ফল ভাল হলে পরের দিন সকলেই ইদ্রিসের বাড়িতে এসে সমবেত হবে। আর যদি সকালে সাদ ইদ্রিসের বাড়িতে না ফিরে তাহলে আহমদ ও হাসান সেই সরাইখানায় গিয়ে সাথীদের সাথে মিলিত হবে।

এ সিদ্ধান্তের পর সাদ ভাইদের বলল, 'আমাদের কারণে ইদ্রিসের কোন ক্ষতি হোক এটাও আমি চাই না। তোমরা ওখানে গিয়ে খুব সতর্ক থাকবে। তোমরা ওখানে যাবে রাতের অন্ধকারে। আমি কাজ শেষ হলেই ওখানে আসব। ওখানে ফিরতে আমার দেরী হলে এর অর্থ হবে, তোমাদের সেভিলে থাকা কিছুতেই নিরাপদ নয়। এমনটি হলে তোমাদের কর্তব্য হবে ইলিয়াসকে খবর পৌছানো এবং তাদের সাথে নিয়ে গ্রানাডা চলে যাওয়া। আমার সাথে মুতামিদ কি ব্যবহার করে তা ইদ্রিসের কাছ থেকেই জানতে পারবে।

মুতামিদের দরবারে

এশার নামাজের পর। সাদকে শাহী দরবার পর্যন্ত পৌঁছে দিল মেহমানখানার এক পেয়াদা। চকচকে শ্বেত পাথরের পথ মাড়িয়ে শাহী প্রাসাদে প্রবেশ করল সাদ। পেয়াদা আদবের সাথে তাকে দরবার কক্ষের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। রাতের শাহী মহল উৎসব উপলক্ষে বিশেষভাবে আলোকসজ্জিত। ভেতরে ফুরফুরে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে মেশ্‌ক ও আম্বরের মৌ মৌ সুঘ্রাণ। সিঁড়ির নীচে রাস্তায় বিছানো সবুজ রঙের গালিচা। মহলের সিঁড়ি বারান্দা থেকে শুরু করে সুলতানের সিংহাসন পর্যন্ত বিছানো গালিচার রঙ লাল।

দরজায় পৌঁছেই ভেতরের দিকে নজর ছুটে গেল সাদের। মুতামিদের সভাসদ ও কবিদের ধুপদুরস্ত পোশাক ও সেই পোশাকের ওপর হীরা-মানিক্যের চমক দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সবার মাথায় মর্যাদা অনুযায়ী বাহারী মুকুট, গলায় মালা আর চেহারায় চর্চিত প্রসাধন দেখে নিজের পোশাক নিয়ে বেশ বিব্রতবোধ করল সাদ। কর্ডোভার এক কবির কাছ থেকে সে একটি মুকুট ধার করে এনেছে। তার সে মুকুটটি যেমন ছোট তেমনি জামাটিও বেশ খাটো। সাদের মনে হলো, তাকে দেখেই দরবারের লোকেরা উচ্চস্বরে হেসে উঠবে।

এ পোষাকে সাজিয়ে দেয়ার দরুণ মনে মনে সে বন্ধুদের তিরস্কার করছিল। কিন্তু আসরে পৌঁছেই তার ধারনা পাল্টে গেল। তারা পোষাকের দিকে মোটেই তাকাল না, বরং আরামপ্রিয় নাদুস নুদুস চেহারার কবি ও আমলারা এক মোজাহিদের পৌরুষদীপ্ত চেহারা দেখে অপলক চোখে সে দিকে তাকিয়ে রইল। আয়োজকদের একজন সামনে এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা করল। সাদর করমর্দনের পর পরিচয় নিয়ে কবিদের সারিতে তার আসন দেখিয়ে দিল।

সুলতান ও রাণী তখনো পৌঁছেননি। উপস্থিত সকলেই খোশগল্প করে সময় কাটাচ্ছে। কেউ বা তন্ময় হয়ে শুনছে পর্দার আড়াল থেকে ভেসে আসা সংগীতের সুর মূর্ছনা।

ইবনে আম্মার দরবারে প্রবেশ করল। সকলে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানাল। ইবনে আম্মার শাহী মসনদের বাঁ পাশে রাখা তার নিজ আসনে গিয়ে বসল। আসরের লোকজনও আবার আসন গ্রহণ করল। হঠাৎ মসনদের পেছন থেকে ভেসে এল নকীবের আওয়াজ, 'হুশিয়ার! মহামান্য সুলতান ও রাণী মাতা দরবারে আগমন করছেন।'

মাহফিলের সবাই আবার উঠে দাঁড়াল। মুতামিদ ও রাণী রেমিকা মূল্যবান মনিমুক্তা খচিত ঝলমলে পোষাকে সজ্জিত হয়ে দরবারে পৌঁছলেন এবং মসনদে আসন গ্রহণ করলেন। তাদের ডানে বাঁয়ে ও পেছনে শাহী খান্দানের অন্যান্য সদস্য ও আমন্ত্রিত অভিজাত মহিলারা আসন গ্রহণ করল।

রাণী রেমিকার পোষাকে শত শত হীরা-জহরত ঝকমক করছিল। প্রসাধনীর ভারী প্রলেপ দিয়ে সে বার্ধক্যের ছাপ মুছতে চাচ্ছিল। চোখের চাহনি দিয়ে বলতে চাচ্ছিল, 'তোমরা আমাকে দেখো। আমার প্রশংসা করো। আমার উপস্থিতিতে অন্য কোন দিকে তাকানো আমি মোটেই পছন্দ করি না। এ আসর শুধু আমার আনন্দের জন্যই ডাকা হয়েছে।'

মুতামিদের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁর চেহারায় খেলা করছে জীবন খাতার ছিন্ন পাতা, যেখানে লেখা আছে যৌবনের পতন কাহিনী। তাঁর প্রশস্ত ললাট ও বিশাল বুকের উদারতা হারিয়ে গেছে অতিরিক্ত মদ পানের ফলে ঢুলুঢুলু চোখের কালি ও ঝুলে পড়া মাংশের আড়ালে।

সেভিলে এসে সাদ লোক মুখে শুনেছিল, মুতামিদ এক মহান ব্যক্তি। ইবনে আম্মারের মত লোকের খপ্পরে না পড়লে সে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হতে পারতো।

সুলতান ও রাণী আসন গ্রহণ করার সাথে সাথে থেমে গেল অদৃশ্য যন্ত্র সংগীতের সুর। শুরু হলো কবিতা পাঠের আসর। দরবারী কবিরা মুতামিদের শৌর্য-বীর্য, রেমিকার রূপ-যৌবন ও ইবনে আম্মারের দুরদর্শিতার প্রশংসা করে কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। প্রশংসার তোড়ে আসমান জমিন একাকার করে দিচ্ছে প্রত্যেক কবি। কবিতা আবৃত্তির পর খুশি হয়ে সুলতান কবিদের হাতে তুলে দিচ্ছে এনাম। কোন ভাগ্যবান কবির আবৃত্তি রাণীর প্রশংসা অর্জন করতে পারলে তাকে দেয়া হতো মোটা অংকের পুরস্কার।

ঘোষক ইবনে জায়দুন একের পর এক কবিদের নাম ঘোষণা করছিল। এভাবে দশজন কবির কবিতা আবৃত্তি শেষ হলে ইবনে জায়দুন এবার ঘোষণা করল, 'এখন সুলতানুল মুয়াজ্জমের অনুমতি ক্রমে আপনাদের সামনে কবিতা আবৃত্তি করতে আসছেন গ্রানাডার এক তরুণ কবি। আমি গ্রানাডা থেকে আগত তরুণ কবি সাদ ইবনে আবদুল মুনীমকে তার কবিতা পেশ করার আহবান জানাচ্ছি।'

নাম ঘোষণা হলে প্রত্যেক কবি মসনদের কাছে গিয়ে সুলতান মুতামিদ ও রাণী রেমিকার সামনে নত হয়ে কুর্ণিশ করতো। তারপর পাশের ডায়াসে এসে কবিতা আবৃত্তি শুরু করত। কিন্তু সাদ বাহাদুর বীরের মত এগিয়ে গিয়ে সোজা ডায়াসের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। দরবারীরা সাদের এই দুঃসাহস দেখে হতবাক হয়ে গেল।

কবিতা আবৃত্তি বাদ দিয়ে সাদ বক্তৃতা শুরু করল। বলল, 'সুলতান মুতামিদ, রাণী রেমিকা ও মাহফিলে হাজির আমীর-ওমরা ও রাজ কবিগণ। জানি, আমি কবি নই এ কথা শুনলে আপনারা হতাশ হবেন। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমি একজন সৈনিক এবং একজন সৈনিককে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে দেশ রক্ষার যে মহান দায়িত্ব পালন করতে হয়, সেই দায়িত্বানুভূতিই আমাকে এ মাহফিলে আসতে বাধ্য করেছে। আমি জানি, যে কথা আমি বলতে চাই সে কথা বলার উপযুক্ত জায়গা এ মাহফিল নয়। কিন্তু একান্ত অপারগ হয়েই আমি এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি এখন যে মুকুট ও আচকান পরে আছি, এমন

পোশাক পরা সেই জাতির লোকদের শোভা পায় না যাদের শাসনকর্তা ভিন্ন জাতির অনুকম্পার ভিখারী।

সেভিলের কবি ও শাসকরা! আপনাদের সাক্ষী রেখে আমি বলতে চাই! এই দেশ ও জাতি যখন প্রলয়ংকরী ঝড়ের কবলে পড়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, আপনারা যখন এ ব্যাপারে উদাসীন ও গভীর নিদ্রামগ্ন, তখন এই দরবারে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি আপনাদের জাগানোর চেষ্টা করেছিল।'

রাণী রেমিকা অবাক হয়ে মুতামিদের দিকে এবং মুতামিদ পেরেশান ও হতবিহবল হয়ে মাহফিলের দিকে তাকাতে লাগল। ইবনে আম্মার নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল। সাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সে হাতের ইশারায় কয়েকজন প্রহরীকে কাছে ডাকল। কিন্তু মুতামিদ হাত উঠিয়ে তাদের থামিয়ে দিয়ে বলল, 'সব বোকামিই শাস্তি যোগ্য নয়। আমি এ নওজোয়ানকে তার বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিচ্ছি।'

সাদ নির্ভীকভাবে দরবারের লোকদের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে মুতামিদকে ধন্যবাদ জানিয়ে পুনরায় তার বক্তৃতা শুরু করল।

'মাননীয় সুলতান! ব্যক্তিগত লাভের আশায় আমি এ দরবারে আসিনি। আর আমি আমার এ নগন্য জীবনেরও কোন পরোয়া করি না। এমন অনেক সময় আসে যখন সত্য প্রকাশ করলে জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। যদি আজ সত্য কথা বলার দরুণ আমার জীবনে কোন কঠিন শাস্তি নেমে আসে, আমি তা হাসি মুখেই বরণ করে নেবো। আপনার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, শুধু একবার আমাকে মন খুলে আপনার সামনে কথা বলার সুযোগ দিন।

মাননীয় সুলতান! সেভিলের দুশমনকে জাতির দুশমন মনে করে যে শত শত যুবক আপনার পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য সারা দেশ থেকে ছুটে এসেছিল, আমি তাদেরই একজন। আমার বিশ্বাস, মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে তলোয়ারের ঝংকার শুরু হলে স্পেনের লাখো মুসলিম এ লড়াইকে ইসলাম ও কুফরের লড়াই গণ্য করে দলে দলে এসে আপনার পতাকাতলে সমবেত হয়ে যেতো। জনসাধারণের এ জাগ্রত চেতনা অন্যান্য খণ্ড রাজ্যের শাসকদেরকেও আপনার সাথে হাত মিলাতে বাধ্য করতো। আর সমগ্র জাতি এভাবে একতাবদ্ধ হয়ে গেলে বিজয় এসে আমাদের পদচুম্বন করতো।

কিন্তু হায়! এখন আমরা বুঝতে পারছি, এক অলীক স্বপ্নের জগতে বাস করছিলাম আমরা। মিল্লাতের ঐক্য ও সংহতির স্বপ্ন ছিল এক মায়ামরীচিকা। আমরা জানতাম না, এমন নড়বড়ে এক দেয়ালের আড়ালে বসে আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি, যে দেয়াল যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে আমাদেরই ঘাড়ের ওপর। যে বীর মুজাহিদরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দেহের তাজা রক্ত ঢেলে আজাদীর হেফাজত করতে এসেছিল, সীমাহীন আফসোস ও অনুশোচনা নিয়ে ধিক্কার দিতে দিতে ফিরে গেছে তারা।

উত্তর থেকে ধেয়ে আসা সয়লাব তারা রুখতে চেয়েছিল লাশের প্রাচীর খাড়া করে,

কিন্তু তাদের আশার গুড়ে বালি দিয়েছে এক মতলববাজ সেনাপতি। যে সম্পদ রক্ষার জন্য ছুটে এসেছিল এই সব নওজোয়ান, সে সম্পদেরই এক অংশ বিনা যুদ্ধে ঘুষ আর উপহার দিয়ে যুদ্ধ জয় করলেন তিনি। শত্রুর সামনে সৈন্য দাঁড় না করিয়ে তিনি এই সর্বগ্রাসী বন্যার সামনে দাবার গুটি খাড়া করে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে ইবনে আম্মার উঠে দাঁড়াল এবং বক্তৃতা বন্ধের নির্দেশের আশায় সুলতানের দিকে তাকাল। মাহফিল জুড়ে প্রতিবাদের গুঞ্জন ধ্বনি উচ্চকিত হলো।

মুতামিদ হাতের ইশারায় সবাইকে শান্ত হতে বলে সাদের দিকে ফিরে বলল, 'যুবক, আমি তোমাকে এ মহান দরবারে কথা বলার অনুমতি দিয়েছি। তার মানে এ নয় যে, তুমি যা ইচ্ছে তা-ই বলবে। তুমি দরবারের আদব নষ্ট করছো। তোমার ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবানের জন্য চিরতরে তোমার মুখ বন্ধ করে দিতে আমাকে তুমি বাধ্য করো না। তোমার যা বলার সংযত জবানে বলো।'

সাদ মুতামিদের কথার খেই ধরে বলতে শুরু করল, 'আপনি এই দরবারে আমার মুখ বন্ধ করে দিতে পারবেন, কিন্তু দরবারের বাইরে জাতির তামাম লোক যখন চিৎকার করে আমার কথার প্রতিধ্বনি করতে থাকবে তখন সে আওয়াজ বন্ধ করার সাধ্য আপনার হবে না। এ প্রমোদভবনের দেয়ালের বাইরে এমন হাজার হাজার যুবক রয়েছে যারা আমারই মত ভাবে, আমারই মত চিন্তা করে। পার্থক্য শুধু এই, আমি তাদের পক্ষ থেকে এ আর্তনাদ নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হওয়ার দুঃসাহস করেছি। আমার এ আওয়াজ আজকে আপনাদের কাছে এক পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে, মনে হতে পারে এ আওয়াজ খুবই ক্ষীণ, কিন্তু সেদিন বেশী দুরে নয়, যেদিন গোটা জাতির বজ্র চিৎকার এ লৌহপ্রাচীর ভেদ করে আপনার কানে এসে আঘাত হানবে। যে শহীদদের কবরের ওপর এ প্রমোদভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, সেই হুংকারে এ ভবন সেদিন থরথর করে কেঁপে উঠবে।

সুলতানুল মুয়াজ্জম! আপনি এবং আপনার কওমের মধ্যে যে অদৃশ্য দেয়াল তৈরী হয়ে আছে তা দুর করার জন্যই আমি জীবন বাজি রেখে এখানে এসেছি। কারণ আলীশান এ মহলে আপনার কাছে আপনার প্রজাদের আর্তনাদ পৌছার কোন সুযোগ নেই। আপনার আমীর-ওমরারা সেইসব সাধারণ মানুষের আওয়াজকে নাচ-গান, পান-ভোজন ও রঙ্গ রসের দেয়াল তুলে আটকে রেখেছে, আপনার সালতানাতের হেফাজতের জন্য যারা বুকের শেষ রক্ত বিন্দু ঢেলে দিতে প্রস্তুত। এ আহবান আমার একার কথা নয়, আমার এ আহবান সমগ্র জাতির।

মহামান্য সুলতান! দুশমনের তরবারি যে জাতির গর্দান স্পর্শ করে আছে আপনি সে জাতির বাদশাহ। গাফলতির ঘুম আপনাকে মানায় না। আপনার দুর্ভাগ্য, যেসব চিন্তাবিদ, কবি ও সাহিত্যিককে আপনি এনাম দিয়ে ধন্য করেন, ঘুমন্ত বাদশাহকে জাগিয়ে তোলার পরিবর্তে তাঁর পিঠ চাপড়ে তাঁকে আরও গভীর ঘুমে ডুবিয়ে দিতে তারা বেকারার।

কওমের সৈনিকদের মনে তারা এ ধারনা দিতে তৎপর, জাতির ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তলোয়ারের দরকার নেই, দাবা খেলার গুটি চালতে পারাই যথেষ্ট।'

রাগে লাল হয়ে উঠল মুতামিদের চেহারা। রাণীর চেহারার মিষ্ট হাসি ক্ষোভে, দুঃখে বিবর্ণ হয়ে গেল। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলে রেমিকা চিৎকার করে উঠল, 'আত্মহত্যা করার জন্য তোমার এখানে আসার কোন দরকার ছিল না। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাকলে গোয়াদেল কুইভারের পানিতে ডুবে মরলেই পারতে।'

রাণীর তিরস্কারে সাদেরও মেজাজ বিগড়ে গেল। সেও সমান তেজে বলে উঠল, 'জাতির জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে আমার ব্যক্তিগত জীবনের মূল্য আমি বড় করে দেখি না। আর দেখি না বলেই আমি এখানে এসেছি। আমার জাতির ভাগ্য তরী শরাবের নদীতে ডুবে যাবে আর আমি তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো, এতটা সাদান এখনো হইনি। তোমাদের আহাম্মকী বরদাশত করতে পারিনি বলেই ছুটে এসেছি এ শাহী দরবারে। তোমরা যাকে বিজয় বলছো এ তোমাদের শোচনীয় পরাজয় ছাড়া আর কিছু নয়। দাবার গুটি দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না। ঘুষ আর ভেট দিয়ে শত্রুর লোভ বাড়ানো ছাড়া তোমরা কমাতে পারবে না। এই ঘুষ আর ভেট দিতে দিতে যেদিন তোমরা নিঃস্ব হয়ে যাবে সেদিন তোমাদের বুকের রক্ত পান করা ছাড়া সেভিলে দুশমন আর কিছুই খুঁজে পাবে না।

আমি তোমাদের হুশিয়ার করে দিতে চাই, তোমাদের দেয়া অর্থে আলফানসো এখন তার তরবারিতে ধার দিচ্ছে। প্রথমে সেভিল এবং তারপর সমগ্র স্পেনের মুসলমানদের ওপর মরণ আঘাত হানার জন্য তৈরী হচ্ছে সে। এখন আর আত্মপ্রবঞ্চনার সময় নেই। তোমরা যদি মনে করে থাকো আগামীতে এবারের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী খাজনা দিয়ে তোমরা তার বন্ধুত্ব কিনতে পারবে, তাহলে ভুল করবে। দুশমন দুশমনই, আগামী বছর সে আরও বেশী খাজনা দাবী করবে এবং তার পরের প্রতিটি বছরে তার দাবী ক্রমে বাড়তেই থাকবে। সে দাবী পূরণ করতে গিয়ে তোমরা সেভিলের রাজকোষে শূন্য করবে, জনসাধারণের ওপর অবৈধ করের বোঝা চাপাবে। নিজেরা ফতুর হওয়ার পর জনগণকে ফকির বানাবে। এক টুকরো রুটির অভাবে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে মরবে তারা। তখন আলফানসো বলবে, শূন্য ভাণ্ড বয়ে নিয়ে কষ্ট করবে কেন, সেভিলের সিংহাসন আমাদের হাতে তুলে দিয়ে এবার তোমরা আরাম করো।

তার এ দাবী মানতে অস্বীকার করলে আক্রান্ত হবে তোমরা। তোমাদের দেয়া খাজনার অর্থে কেনা ঘোড়া আর তরবারি নিয়ে তারা চড়াও হবে সেভিলবাসীর ওপর। দাবা খেলায় নিপুন সেনাপতি সেদিন ওদের প্রতিরোধ করতে যাবে না। তোমাদের লাশে ভরে যাবে গোয়াদেল কুইভারের বিশাল বুক। লাশ ছাড়া সেদিন নদীতে একফোটা পানিও দেখা যাবে না।'

'খামোশ! চুপ করো বেতমিজ! নিকৃষ্ট শাস্তির জন্য তৈরী হও।' মুতামিদ অসহিষ্ণু কণ্ঠে গর্জে উঠল। রাগে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল সুলতান ও রেমিকা।

মাহফিলের লোকেরা চিৎকার করে তার শাস্তি দাবী করতে থাকল। সাদ হুংকার দিয়ে বলল, 'সুলতান মুতামিদ! আমি খামোশ হতে আসিনি। স্পেনের এ মনোরম বাগিচা বানিয়েছেন আমাদেরই পূর্ব-পুরুষ। তারাই রক্ত ঢেলে উর্বর করে গেছেন এ জমিন। এ জাতির ইজ্জত ও আজাদী মানেই আমার ইজ্জত ও আজাদী। এ জাতির পরাজয় মানেই আমার পরাজয়। এ জাতির গোলামী আমারই গোলামী ডেকে আনবে। এ জাতির অতীত আমারই অতীত। এ জাতির বর্তমান আমারই বর্তমান এবং এ জাতির ভবিষ্যতও আমার নিজেরই ভবিষ্যত।'

ইবনে আম্মারের ইশারায় ছয় সাত জন প্রাসাদরক্ষী ছুটে এসে তাকে ধাক্কা মেরে দরবারের বাইরে নিয়ে গেল। সাদকে যখন ওরা টানাহেঁচড়া করে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখনও সে সমানে চিৎকার করে বলছিল, 'তোমরা সবাই সাক্ষী থেকো, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। মুতামিদের কানে জাতির আওয়াজ পৌঁছে দিয়েছি আমি। তাকে জানিয়ে দিয়েছি, তোমাদের স্বাধীনতা আজ হুমকির সম্মুখীন। জাতির রক্ত শোষণ করে তুমি আজ বিজয়োৎসব পালন করছ, কালকে এভাবেই আলফানসু তোমাদের হাড়-হাড্ডির ওপর তার রঙমহল কায়েম করবে। মুতামিদ! চোখ বন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকে না, নিজের চোখ বন্ধ করে যুগের প্রলয়ংকরী তুফান থেকে কিছুতেই তুমি রেহাই পাবে না।'

২

প্রাসাদ রক্ষীরা সাদকে দরজার বাইরে নিয়ে এল। দুজন ধরে রেখেছিল তার হাত, বাকীরা ঠেলছিল পেছন থেকে। বর্শা উঁচিয়ে সামনে ছিল একদল, আরেক দল তরবারি হাতে পাশে পাশে হাঁটছিল। কথা বলা নিরর্থক মনে করে থেমে গেল সাদ। সব উৎসাহ উদ্দীপনা শেষ হয়ে গেছে তার। প্রহরীদের সাথে লড়াই না করে সে নীরবে তাদের সাথে চলতে লাগল। রক্ষীরা তাকে নিয়ে এগিয়ে চলল কয়েদখানার দিকে।

ফটকের কাছে এসে হঠাৎ ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সাদ। রক্ষী দুজনকে কনুই ও হাত চালিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনা। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই নিমিষে কয়েক লাফে প্রহরীদের ডিঙ্গিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল সাদ।

চিৎকার করে পেছনে ধাওয়া করল সিপাইরা। ফটকের পাহারায় ছিল দুই বর্শাধারী, পেছন থেকে তরবারি ও বর্শা হাতে ছুটে আসছে পনর বিশ জন। দুদিক থেকেই চরম আঘাত ঘনিয়ে আসতে দেখল সাদ, কিন্তু মনোবল হারালো না।

চকিতে চোখে পড়ল বাম দিকে একটি সিঁড়ি। সময় নষ্ট না করে সাদ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল এবং পলকে মহলের প্রাচীরের ওপর উঠে গেল। প্রাচীরটি ছিল প্রাসাদ থেকে বেশ খানিকটা দূরে, ফলে মহলের আলো এ পর্যন্ত আসতে পারছিল না। শত্রুর আক্রমণ মোকাবেলা করার সুবিধার্থে এসব প্রাচীর যথেষ্ট প্রশস্ত করে নির্মাণ করা

হয়। সাদ প্রাচীরের ওপর পৌঁছেই অন্ধকারের মাঝেও দ্রুত ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু নিরাপদে পালাতে পারবে কি না তা তখনও তার জানা ছিল না। সে শুধু অনুমান করছিল, যে দিকে দৌড়াচ্ছে সে, ওদিকে নদী রয়েছে। ধাওয়াকারীরা হৈ চৈ করে সিঁড়ি পথে উপরে উঠতে লাগল। প্রায় পঞ্চাশ গজ যাবার পর সাদ তার ডানে, বামে, পিছনে সব দিকে পাহারাদারদের ডাক-চিৎকার শুনতে পেল, 'ধর, ধর। পাকড়াও কর, ঐ দিকে যাও, প্রাচীরে .....'

সাদ ভারী জামা খুলে ফেলে নিজেকে হালকা করতে চাইল। জামা খুলতে খুলতে দেখতে পেল এক প্রহরী খুব কাছে চলে এসেছে। প্রহরীর ডান হাতে তরবারি ও বাম হাতে মশাল। সাদ প্রহরীর ওপর তার আচকানটি ছুঁড়ে মারল, থমকে দাঁড়াল প্রহরী, চোখ-মুখ ঢেকে গেল আচকানে, সাদ ধাক্কা মেরে তাকে নীচে ফেলে দিল।

প্রহরী প্রথমে এক গাছের ডালে পড়ল, ডালটি শব্দ করে ভেঙ্গে গেল এবং তাকে নিয়ে নীচে নেমে গেল। ডাল ভাঙার আওয়াজ শুনে পেছনের ধাওয়াকারীরা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'হুশিয়ার, দুশমন বাগানে লাফিয়ে পড়েছে।' পাঁচিল ছেড়ে ওরা বাগানের দিকে ছুটল।

এই সুযোগে সাদ বেশ কিছুদুর এগিয়ে গেল। হঠাৎ দেখতে পেল, প্রাচীরের ওপর দিয়ে সামনে থেকে ছুটে আসছে একদল মশালধারী। সে কাছেই প্রাচীরে উঠার আরেকটি সিঁড়ি দেখতে পেয়ে দ্রুত নীচে নেমে বাগানে ঢুকে পড়ল। সিপাইরা গালাগালি করতে সামনে এগিয়ে গেল।

বাগানে ঢুকেই সাদ চটজলদি এক গাছে চড়ে বসল এবং পাতার আড়ালে অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। এবার সে বুঝতে চেষ্টা করল অবস্থার নাজুকতা। দেখল, যেখানে গাছের ডাল ভাঙ্গার শব্দ হয়েছিল সিপাইরা প্রাচীরের গা ঘেঁসে ওইদিকে যাচ্ছে।

আরো একদল সিপাই পাঁচিল থেকে নেমে এসে বাগানে প্রবেশ করল। সাদ চিন্তা করে দেখল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আহত প্রহরীকে দেখতে পাবে এবং সাথে সাথে সারা বাগান ঘেরাও করে তাকে খুঁজতে শুরু করবে। সাদ দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ার জন্য গাছ থেকে নেমে দৌড়াতে শুরু করল।

সাদ কোন দিকে যাচ্ছে কিছুই জানে না। তার একমাত্র চিন্তা কি করে প্রহরীদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া যায়। হঠাৎ নতুন করে প্রহরীদের হৈ চৈ শুনে সাদ বুঝতে পারল, আহত প্রহরীকে তারা দেখতে পেয়েছে। ততক্ষণে সাদ বাগানের আরেক প্রান্তের পাঁচিলের কাছে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে বাইরে যাওয়ার সব ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এ কথা বুঝতে তার অসুবিধা হল না।

সাদ পালানোর উপায় চিন্তা করতে লাগল। ভাবল, প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রাচীর পেরিয়ে নদীতে পৌছতে পারলে এ যাত্রা হয়তো রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ধারে কাছে প্রাচীরে উঠার কোন সিঁড়ি দেখা গেল না। সে প্রাচীরের গা ঘেঁসে চলতে লাগল।

প্রহরীদের দেখতে পেলেই গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়তো, তারা চলে গেলে আবার দৌড়াতে শুরু করতো।

হঠাৎ আট দশ জন মশালধারীকে পিছন থেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সে প্রাচীরের কাছে একটি গাছের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করল কিন্তু সামনের দিক থেকেও দুজন মশালধারীকে এদিকেই আসতে দেখল। সাদ তাড়াতাড়ি আবার গাছে চড়ে বসল। সিপাইরা চলে গেলেও সাদ কিছুক্ষণ গাছের উপরই বসে রইল। তারপর কি চিন্তা করে গাছের উঁচু শাখায় উঠে যেতে লাগল।

হঠাৎ প্রাচীরের ওপর সে এক টহলদার সিপাইকে দেখতে পেল। তার হাতে জ্বলন্ত মশাল। সে দেখল, যে গাছে সে চড়েছে তার একটি শাখা প্রাচীরের গায় গা ছুঁয়ে রয়েছে, আরেকটি শাখা প্রাচীর পেরিয়ে ওপাশে চলে গেছে।

মশালধারী টহল দিতে দিতে দূরে চলে গেল। সাদ আস্তে আস্তে শাখা বেয়ে এগিয়ে চলল। কালো মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ক্ষীণ এক ফালি চাঁদ। সাদ দেখল, চাঁদের কিরণ নদীর পানিতে পড়ে চিকচিক করছে।

সাদ একটু একটু করে ডালের আগার দিকে সরে যেতে লাগল। প্রাচীর পেরিয়ে নদীর উপরে এসে পড়ল সাদ, এ সময় কড়কড় করে ডালটি ভেঙে পড়ল। সাথে সাথে লাফ দিল সাদ এবং ঝপ করে নদীতে গিয়ে পড়ল।

টহলদার সিপাই ঘুরেই প্রাচীরের ওপর থেকে শব্দ লক্ষ্য করে ঝাকে ঝাকে তীর ছুঁড়তে লাগল। সাদ ডুব দিয়ে সেখান থেকে সরে যেতে চাইল, কিন্তু একটি তীর সাদের বাম উরুতে এসে বিধে গেল। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল সাদের চেহারা। সে দ্রুত ওখান থেকে সরে পড়ার তাড়া অনুভব করল এবং তীরবিদ্ধ অবস্থাতেই পানির নীচে ডুব মেরে কিছু দূর এগিয়ে গেল। এভাবে কয়েকবার ডুব দিয়ে সে প্রহরীদের নিক্ষিপ্ত তীরের আওতার বাইরে চলে আসতে সক্ষম হলো। প্রহরীরা তখনও হাঁক ডাক করছিল আর ক্রমাগত তীর ছুঁড়ে মারছিল।

সাদ বুঝতে পারছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই এসব প্রহরীরা ছাড়াও পুলিশ এবং সেনাবাহিনী নদী তীরে এসে পৌছবে। সে যতটা সম্ভব দ্রুত স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটতে শুরু করল।

মহলের প্রাচীর যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই শুরু হয়েছে নানা রকম ফুলের ও ফলের বাগান। সেভিলবাসীরা সকাল-সন্ধ্যা এ বাগানে এসে অবসর বিনোদন করে। অসংখ্য নর-নারীর কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠে এ বাগান। সাদ নদী থেকে উঠে এসে বাগানে প্রবেশ করেই দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারল না, তীরবিদ্ধ পা অসাড় হয়ে এল। সাদ দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে সজোরে তীরটি টেনে বের করেই আবার দৌড়াতে শুরু করল।

একটু পর সে বাগান পেরিয়ে এক খোলা ময়দানে এসে পড়ল। বিভিন্ন বাগানে পানি

দেয়ার জন্য মাঠের মধ্য দিয়ে কয়েকটি নালা কাটা হয়েছে। সাদ একটি নালার কিনার ধরে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। সাদ তাড়াতাড়ি মাঠ ছেড়ে নালায় নেমে গেল এবং হাঁটু পরিমান পানিতে চুপ করে লম্বা হয়ে শুয়ে রইল। জনা পনের অশ্বারোহীর একটি দল নালার কাছে এসে থামল।

একজন বলল, 'সে এদিকে এসে থাকলে নিশ্চয় বাগানের ভেতর কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে। পদাতিক বাহিনী না আসা পর্যন্ত তোমরা এদিকে খেয়াল রাখো। পাঁচজন চালো আমার সাথে। নদীতে কোন নৌকায় লুকিয়ে আছে কিনা দেখে আসি।'

অশ্বারোহী বাহিনীর একদল চলে গেল নদীর দিকে, বাকীরা মাঠের চারদিকে টহল দিতে লাগল। এভাবেই কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। তীরের আঘাত থেকে অনবরত রক্ত ঝরছিল। ফলে ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছিল তার শরীর। টহলদার বাহিনীর কারণে সে নালা থেকে বের হতে পারছিল না, কিন্তু সে প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছিল, পদাতিক সৈন্যরা একবার পৌঁছে গেলে নিরাপদে সরে পড়া এখনকার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন হয়ে পড়বে।

হঠাৎ এ সময় একটা ঘটনা ঘটল। অশ্বারোহীদের একজন বাগানের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। ভয় পেয়ে কোন ছোট প্রাণী হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাল। অশ্বারোহী ভাবল আসামী পালাচ্ছে। সে চিৎকার করে উঠল, 'আসামী বাগানের ভেতরেই আছে। এই মাত্র সে ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে গেল। তোমরা সব তাড়াতাড়ি এদিকে এসো।'

অশ্বারোহীরা পড়িমরি ছুটল সে দিকে। সাদ আবার আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। সে উবু হয়ে হাত-পায়ে ভর করে নালার মধ্য দিয়ে চলতে লাগল। যখন বুঝল টহলদাররা আর দেখতে পাবে না তখন নালা থেকে উঠে আবার দৌড়াতে শুরু করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ময়দান পার হয়ে সরকারী অফিসারদের মহল্লায় পৌঁছে গেল। গলিপথ ধরে আরেকটু এগিয়েই বড় সড়কে উঠল। ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে সড়কে কাউকে দেখতে পেল না। সে সড়কের অন্ধকার পাশ ঘেঁষে চলতে লাগল।

একটু এগুতেই এক মসজিদ নজরে এল তার। সাদ চিনতে পারল, এটি ইদ্রিসদের মসজিদ। এখান থেকে ইদ্রিসের বাড়ি মাত্র দেড়শো গজ দূরে। সাদের অবস্থা তখন খুবই কাহিল। চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল তার, ব্যথায় পা অবশ হয়ে আসছিল। চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার দেখছিল সে। প্রায় একশো গজ চলার পর সে পেছনে মানুষের পদশব্দ শুনতে পেল। সে বাড়ি ঘরের ছায়ার অন্ধকারে লুকিয়ে চলতে লাগল।

ইদ্রিসের বাড়ির প্রায় সামনে এসে পড়েছে। রাস্তার উল্টো পাশে তাদের বাড়ির গেট। সাদ পিছন ফিরে দেখল চারজন টহলদার এদিকেই আসছে। ইদ্রিসের বাড়ির ফটক দেখা গেলেও এখন আর রাস্তা পেরুনো সম্ভব নয়। টহলদাররা অনেক কাছে চলে এসেছে।

সে দেয়ালের গা ঘেঁষে দ্রুত গলিতে ঢুকে পড়ল এবং গলি ধরে এগিয়ে গিয়ে ইদ্রিসের বাড়ির পিছন দিকের দেয়াল টপকে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

৩.

প্রতিদিনের মত মায়মুনা তাহাজ্জুদ নামাজের ওজু করার জন্য কামরা থেকে বের হয়ে রাস্তার দিকে মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেল। কান খাড়া করল মায়মুনা। একজন বলল, 'ভাই, ও মানুষ নয়, জ্বিন-ভূত কিছু একটা হবে। হয়তো এখনো শাহী মহলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

দ্বিতীয় জন বলল, 'কিন্তু আমি যে নিজ কানে কোতোয়ালকে বলতে শুনেছি, সে নাকি প্রাচীর থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, 'আমার মনে হয়, নদী তীরের বাগানের দিকে ওকে খোঁজা দরকার।'

'না, না. ওদিকে সেনাবাহিনী পৌঁছে গেছে। আমরা আমাদের মহল্লার সবগুলি অলিগলি ও রাস্তায় ঠিকমত ডিউটি করলেই হবে।'

'কিন্তু সে যদি সাঁতরে নদীর ওপার চলে গিয়ে থাকে?'

'আমার মনে হয় না। হয়তো সে নদীতে লাফই দেয়নি, সাঁতরে নদী পার হওয়া তো পরের কথা! মনে হয় খুব ঘাগু মাল। নইলে এতগুলো পাহারাদারের চোখে ধুলো দিতে পারে?'

'কিন্তু লোকটা কে রে ভাই?'

'আল্লাহ মালুম! শুনেছি, লম্বা চওড়া সুদর্শন এক যুবক নাকি রাজ প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেছে।'

'যা বাবা! রাজ প্রাসাদ থেকে আবার কেউ পালায় নাকি! যতসব আজগুবী কথা।'

'আরে বাবা পালিয়ে আর যাবে কই? সকালে শুনবে, গণ্ডায় গণ্ডায় গ্রানাডার যুবকরা গ্রেফতার হয়ে যাচ্ছে।'

অজানা আশংকায় দুলে উঠল মায়মুনার মন। নিঃশব্দ পায়ে সে এগিয়ে গেল দেউড়ির কাছে। দেউড়ি লাগোয়া কামরা থেকে চাকরদের নাক ডাকার শব্দ আসছে। মায়মুনা দেউড়িতে প্রবেশ করল। যে বুড়ো চাকরকে রাতে পাহারায় থাকতে বলা হয়েছিল সে দেউড়িতে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে।

মায়মুনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ প্রহরীদের কথাবার্তা শুনল। প্রহরীরা চলে যাবার পর মায়মুনা বুড়ো চাকরকে জাগিয়ে বলল, 'দেখ, তুমি খুবই দায়িত্বহীন কাজ করেছো। সিপাইরা সাদকে খুঁজছে। হয়তো তিনি দরজা বন্ধ দেখে ফিরে গেছেন।'

'আপামনি, দরজা তো খোলাই আছে। দরজার খিল লাগানো হয়নি। তিনি এখানে

আসেননি। আমি তো সারা রাত জেগেই ছিলাম, এই মাত্র চোখ বুজেছি। সিপাইরা এল কখন?'

'ওরা রাস্তায় টহল দিচ্ছে। এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, এইমাত্র চলে গেল। আমি ওদের কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি, তিনি মহল থেকে পালিয়েছেন।'

হঠাৎ মেহমানখানার দরজা খুলে হাসান বেরিয়ে এল। বলল, 'বোন! আমি জেগেই আছি, ভাইজান এদিকে আসেননি।'

'তুমি পাহারাদারদের কথাবার্তা শুনেছো?'

'হ্যাঁ, আপা। আপনি ভেতরে চলে যান। এখানে কথাবার্তা বলা ঠিক না।'

মায়মুনা চারদিকের পরিস্থিতির ওপর নজর বুলানোর জন্য উঠান পেরিয়ে ছাদে উঠতে গেলে আচানক এক কোণে ভারী কিছু পতনের শব্দ হলো। মায়মুনা চমকে সেদিকে তাকিয়েই হতবাক হয়ে গেল। দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এক নওজোয়ান। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় তার চেহারা দেখেই মায়মুনার সমগ্র দেহে এক অজানা শিহরণ বয়ে গেল।

আগন্তুক আর্তস্বরে বলে উঠল, 'মায়মুনা, ঘাবড়িও না, আমি সাদ।'

মায়মুনা যেন স্বপ্ন দেখছিল। শত চেষ্টা করেও সে কোন কথাই বলতে পারল না। যে সাদকে সে নিজের জীবনাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে বিবেচনা করে আসছে, আহত অবস্থায় সে এখন তারই সামনে দাঁড়িয়ে। তার পরণের কাপড় চোপর কাদা-পানিতে একাকার।

কথা বলল সাদই প্রথম, 'আমার ভাইয়েরা বোধ হয় ওদিকে?'

মায়মুনা চঞ্চল হয়ে সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি আহত। দুশমন আপনাকে তালাশ করছে। আপনি আমার সাথে আসুন। বাড়ির ওদিক আপনার জন্য নিরাপদ নয়। আপনার ভাইদের আমি ডেকে নিয়ে আসছি।'

সাদের মাথা চক্কর দিল, চোখের সামনে নেমে এল অন্ধকার। কোন উত্তর না দিয়ে সে বারান্দার এক স্তম্ভের গায়ে হাত দিয়ে পতন ঠেকাতে চেষ্টা করল।

মায়মুনা এগিয়ে তার হাত ধরে বলল, 'আসুন।'

সাদ জড়িত কণ্ঠে বলল, 'আপনার কষ্ট করতে হবে না। মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল, এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।'

হঠাৎ দেউড়ির পাশের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। হাসান এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল, 'বোন, ভাইজান কি এসেছেন?'

বলতে বলতেই সে সাদকে দেখতে পেল এবং দ্রুত এগিয়ে গিয়ে এক হাতে সাদের বাহু ধরল এবং অন্য হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, 'কি হয়েছে ভাইজান?'

'আল্লাহর শোকর আমি ভাল আছি।'

মায়মুনা বলল, 'না, তিনি আহত। ওপর তলায় নিয়ে এসো তাকে। আমি তাঁর জন্য

বিছানা তৈরী করছি।'

মায়মুনা দ্রুত নিজের কামরা থেকে বাতি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করল। ততক্ষণে আহমদও এসে সাদের আরেক হাত ধরল।

৪.

একটু পরেই পাশের মসজিদে ফজরের আযান হল। আহমদ ও হাসান ভাইয়ের আহত স্থানে পট্টী বেঁধে তাকে ইদ্রিসের অতিরিক্ত কাপড় পরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। মায়মুনা পাশের কামরার আধ ভেজা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

সাদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, 'ইদ্রিস ঘুমুচ্ছে?'

'না, তিনি টলেডো রওনা হয়ে গেছেন।'

'কেন?'

'অর্থমন্ত্রী আলফানসুর জন্য খাজনার অর্থ নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে সাথে নিয়ে গেছেন।'

'কিন্তু আমাকে তো ইদ্রিস বলেনি যে, সে টলেডো যাচ্ছে?'

এ সময় মায়মুনা দরজার আড়াল থেকে কথা বলে উঠল। বলল, 'অর্থমন্ত্রী হঠাৎ করেই এ হুকুম জারী করে। সময়ের অভাবে ভাইয়া আপনার সাথে দেখা করে যেতে পারেননি। এখানে আপনার কোন কষ্ট হবে না।'

খানিক চিন্তা করে সাদ বলল, 'আহমদ, তুমি বেলা উঠার সাথে সাথে ইলিয়াসের কাছে চলে যাবে। তাকে বলবে, যত দ্রুত সম্ভব তারা যেন সেভিল ত্যাগ করে। সেভিলে অনেকেই তাকে আমার সাথে দেখেছে, কেউ চিনে ফেললে বিপদ হতে পারে। তাছাড়া কাল থেকেই হয়তো গ্রানাডাগামী সড়কের ওপর পুলিশ প্রহরা জোরদার করা হবে। পাহারা জোরদার হওয়ার আগেই তাদের চলে যাওয়া দরকার। আর তুমিও তাদের সাথে যাবে এবং বাড়ি গিয়ে আম্মাজানকে সান্ত্বনা দেবে। আম্মা নিশ্চয় আমাদের জন্য খুব পেরেশান হয়ে আছেন।'

আহমদ বলল, 'ভাইজান! আপনার শরীর ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই বাড়ি যাব না। ইলিয়াসকে আপনার হুকুম পৌছে দিয়েই আমি ফিরে আসবো।'

সাদ দৃঢ়স্বরে বলল, 'না, কিছুতেই তোমার এখানে ফিরে আসা চলবে না। আমার সংগী হিসাবে তুমি শাহী মেহমানখানার অধ্যক্ষের সাথে দেখা করেছ। সেখানে তোমাকে আরও অনেকেই দেখেছে। তাছাড়া সরাইখানার মালিক এবং তার চাকররাও রয়েছে। তোমার ওপর কারো চোখ পড়লে আর রক্ষে নেই।'

'ভাইজান! রক্ষা তো আমাদের কারোরই নেই!'

'বুদ্ধিমান কখনো শত্রুর টোপ হয়ে এক ঘরে বসে থাকে না। এখানে সবাই মিলে বসে বসে দুশমনের অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। আমি তো হাসানকেও পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু দুজনকেই একত্রে চলে যেতে বললে তোমরা রাজি হবে না দেখে তা বলিনি। আমার জখম নিয়ে ঘাবড়াবার কিছু নেই। অতিরিক্ত রক্তপাতের দরুন সামান্য দুর্বলতা বোধ করছি বটে, তবে দু' একদিনের মধ্যেই সেরে যাবে। তাছাড়া আমার দেখাশোনার জন্য হাসান তো রয়েছেই। এখানে লড়াই করা আমার মাকসাদ নয়। যে কদিন থাকবো, লুকিয়েই থাকতে হবে। তিনজনের জায়গায় দু'জন লুকাতে সুবিধা বেশী। আমাকে নিয়ে পেরেশান হচ্ছো, কিন্তু আম্মাজানের পেরেশানী নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা হয় না তোমার?'

আহমদ মাথা নত করল। মুখ নীচু রেখেই বলল, 'আচ্ছা ভাইজান! আমার জায়গায় আপনি হলে কি করতেন?'

হাসল সাদ। মুখে হাসি ধরে রেখেই বলল, 'জানতাম এ প্রশ্ন তুমি করবে। তোমার জায়গায় আমি হলে কিছুতেই অনর্থক সময় নষ্ট করতাম না।'

'আচ্ছা ভাইজান! আমি যাচ্ছি।'

সাদ বলল, 'এখন না। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এখন পাহারাদাররা খুবই সর্তক। ইদ্রিসের সহিসকে বল, সে যেন তোমার ঘোড়া শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করে। তুমি সাধারণ মজুরের পোশাক পরে হেঁটে শহরের ফটক পার হয়ে যাবে। তালোয়ার, বর্ম ও এইসব পোশাক-আষাক কিছুই সাথে নেয়ার দরকার নেই, সবই এখানে থাকুক।'

মায়মুনা দরজার আড়াল থেকে বলল, 'আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

সাদ বলল, 'আহমদ, যাও! প্রস্তুত হও।'

সূর্যোদয়ের পর আহমদ এক চাকরের পোশাক পরে সাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে কি মনে করে আবার ফিরে এলো এবং মায়মুনার কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'বোন মায়মুনা! এখানে থাকাটা কি ভাইজানের জন্য আপনি নিরাপদ মনে করেন? মানে, আপনার চাকররা কি সবাই বিশ্বাসী?'

মায়মুনা বলল, 'ওদের নিয়ে তুমি কোন চিন্তা করো না। ওদের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।'

'হাসানও দেখতে অনেকটা ভাইজানের মতই। ওকে আপনি বাইরে যেতে বারণ করবেন।'

মায়মুনা বলল, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। হাসান খুবই বুদ্ধিমান ছেলে। বাড়ি গিয়ে আম্মাকে আমার সালাম দিও এবং শান্ত্বনা দিও।'

আহমদ নীচে নেমে দেখল হাসান দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখতে পেয়েই হাসান বলে উঠল, 'ভাইজান! আম্মার উৎকণ্ঠা বাড়ে এমন কোন কথা তাকে বলবেন না।

আলমাস চাচাকে এখানে আসতে নিষেধ করবেন। ভাইজান সুস্থ হলেই আমরা রওনা হয়ে যাবো।'

আহমদ বলল, 'হাসান! আমার জন্যই ভাইজানের আজ এ অবস্থা। ভাইজানের কিছু হলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ভাইজানের অবস্থা আশংকাজনক নয়। আর মুসলমানের কথা ভাবছেন? দেখবেন কাল থেকেই ওরা আবার বিজয়োৎসবে মেতে উঠবে।'

আহমদ বলল, 'আমি একটা পরিকল্পনা তৈরী করেছি, যদি সফল হই, তাহলে ভাইজানকে ওরা আর সেভিলে তালাশ করবে না।'

হাসান চমকে উঠে বলল, 'দেখুন ভাইজান! আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আর কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে যাবেন না। ওয়াদা করুন, আপনি সোজা বাড়ি যাবেন?'

আহমদ হেসে বলল, 'চিন্তা করো না। আমি সোজা গ্রানাডাই যাচ্ছি। তুমি মায়মুনার কাছ থেকে একটা কলম নিয়ে এসো।'

হাসান ছুটে গিয়ে ওপর থেকে কলম নিয়ে এলো। আহমদ পকেট থেকে একটুকরা কাগজ বের করল। তাতে মুতামিদ ও ইবনে আম্মারের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখা। আহমদ কাগজের ওপর আরও কয়েকটি শব্দ লিখে পুনরায় তা পকেটে রেখে দিল। হাসান বলল, 'ভাইজান আপনি কি করতে যাচ্ছেন, আমাকে বলে যান!'

আহমদ ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এখন না, তুমি যখন গ্রানাডা আসবে তখন সব জানতে পারবে।'

হাসান ফটক পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল। আহমদ রাস্তায় নামল। দোতালায় উঠে সেদিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল হাসান।

বাঘের ঘরে হানা

ছোটবেলা থেকেই সাদ ছিল দুঃসাহসী ও নির্ভীক। এটা ছিল তার সহজাত স্বভাবগুণ। সৈনিক হওয়ার পর তার এই নির্ভীক চরিত্র আরো দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়েছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে দেশপ্রেম ও কওমের চিন্তা। নিজের জীবন নিয়ে তার কোন ভাবনা নেই। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য যে সহায় সম্পদ দরকার তারও অভাব নেই তার। তার একমাত্র চিন্তা দেশ ও জাতিকে নিয়ে। জাতির ভবিষ্যত চিন্তা করে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিল না সাদ। কি করে কওমের দুর্দিন ঘুচানো যাবে, কি করে আবার স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনা যাবে মুসলিম মিল্লাতকে এ নিয়ে ভাবনার তার অন্ত ছিল না। মুতামিদের

দরবার থেকে পালানোর সময় জীবন বাঁচানোর চিন্তা তাকে একবারও আচ্ছন্ন করেনি, বরং তার মনে হয়েছিল, এক মহান আদর্শের জন্য তার বেঁচে থাকা দরকার। আহাম্মকের মত জীবন বিলানোয় কোন গৌরব নেই, তবে জাতির প্রয়োজনে বাহাদুরের মত লড়াইয়ের ময়দানে জীবন দিতে তার আপত্তি নেই। ইদ্রিসের বাড়িতে আহত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে দিন কাটানোর সময় মুতামিদের সিপাইদের হাতে ধরা পড়ে যাবার দুশ্চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলতে পারেনি। তার একমাত্র ধ্যান ও চিন্তা ছিল স্পেনের ভবিষ্যত নিয়ে।

যখনই সে স্পেনের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতো, এক অপরিসীম কষ্ট ও ব্যথা আচ্ছন্ন করে ফেলতো তার হৃদয়। ইদ্রিসের বাড়ি থেকে বের হয়ে কি করে গ্রানাডায় ফিরবে, সে নিয়ে তার মোটেই চিন্তা ছিল না। শুয়ে শুয়ে সে শুধু ভাবতো, পতনোন্মুখ এ জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের সুগভীর গর্ত থেকে কি করে উদ্ধার করা যায়, কি করে উন্নতি ও কল্যাণের সড়কে তুলে আনা যায় পতনের অতল গহবরে ধেয়ে চলা বিভ্রান্ত এ জাতিকে। যখন সে মুতামিদের দরবারে পা রেখেছিল তখনই সে বুঝতে পেরেছিল, সুখ ও শান্তির জীবন তার জন্য নয়। জনগণের রক্ত শোষণ করে যারা বিলাসের বালাখানা বানায়, মানবতার দুশমন তারা। এদের সাথে তোশামোদের জীবন কাটানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে তথাকথিত ফুল বিছানো সড়ক ছেড়ে জীবনকে কঠিন আর পিচ্ছিল পথে ছুড়ে দিল। দরবারে ভাষণ দিয়ে আপোষ ও দোস্তির পরিবর্তে সে কিনে নিল সীমাহীন শত্রুতার অগ্নিমালা। বেছে নিল সংগ্রাম ও সংঘাতের পথ।

এ কঠিন ও সংঘাতময় জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে যখন সে তন্ময় হয়ে যেতো তখন কোথা থেকে যেন তার হৃদয় আকাশে উদয় হতো এক মায়াময় চেহারা। সাদের মন চিৎকার করে বলতো, 'না, না, মায়মুনা– এ বড় কঠিন পথ, বড় ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে তোমাকে আমি টেনে আনতে পারি না।' অদৃশ্য থেকে কে যেন হেসে উঠতো, 'যদি না-ই পারবে তাহলে তুমি এখানে কেন? এ পথে পা বাড়ানোর পর প্রথম জখম নিয়ে কেন তবে মায়মুনার কাছেই পড়ে আছো? জীবনের নাট্যমঞ্চে একই দৃশ্যে একসাথে এই যে অভিনয় করে যাচ্ছো এখন তুমি এড়াবে কি করে?'

সাদ অনুভব করলো, এই দুর্ঘটনা উভয়কে আরও বেশী কাছাকাছি টেনে এনেছে। জীবনের ডায়েরী ওরা কেউ কারো কাছে মেলে ধরেনি ঠিক, কিন্তু উভয়েই হৃদয় বীণায় শুনতে পাচ্ছিল অভিন্ন সুর, অভিন্ন গান। সাদ তার বিপদসংকুল জীবন পথের বাঁক থেকে মায়মুনাকে যতই তাড়াতে চাচ্ছিল, তার ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্নে ততই সে মায়াময় মুখ প্রভাত রবির মত রাঙা হয়ে তার জীবনকে আরো বেশী রাঙিয়ে তুলছিল।

সারা গায়ে কাঁদা মেখে ক্লান্ত, আহত শরীরে শেষ রাতে সাদ যখন পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে মায়মুনাদের দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করেছিল তখন সে ভাবতে পারেনি ঢুকেই সে মায়মুনার সামনে পড়ে যাবে। অথচ চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় লাফিয়ে পড়েই সে দেখতে পেল নিস্তব্ধ রাতের কোলে ঘরের বাইরে তারই প্রতীক্ষায় অধীর চিত্তে

দাঁড়িয়ে আছে এক যুবতী, যার সাথে জীবনের নোঙর বাঁধবে বলে তাদের মধ্যে কোনদিন কোন কথা হয়নি। সাদ তার কে যে তার জন্য মায়মুনা এতটা উদগ্রীব, এতটা পেরেশান? মনে পড়ে তার পরের রাতের ঘটনা। গায়ে প্রবল জ্বর নিয়ে আচ্ছন্নের মত বিছানায় পড়েছিল সাদ। রাতের শেষ প্রহর। বিছানার পাশে চেয়ারে বসে ঝিমুতে ঝিমুতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে হাসান। পিপাসায় কাতর হয়ে আর্তস্বরে পানি চাইল সে। পাশের কামরা থেকে ছুটে এল মায়মুনা। মনে হয় সারা রাত পাশের কামরায় সে জেগে বসে ছিল। পানি পান করে কয়েক মুহূর্ত মায়মুনার উদ্বেগাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সাদ। শুনতে পেল মায়মুনার দরদভরা কণ্ঠ, 'এখন কেমন বোধ করছেন?'

'ভাল। তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি, তাই না মায়মুনা!'

মায়মুনা মনে মনে বলল, 'হায়! আপনার কষ্ট যদি আমিও কিছুটা ভাগ করে নিতে পারতাম!' মুখে বলল, 'না, না, আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। আপনার জন্য কিছু করতে পারছি, এ তৃপ্তি, এ সুখ তো আমার জীবনের পরম সম্পদ।' এটুকু বলেই মায়মুনা তার কামরার ফিরে গেল।

যে কয়দিন সাদ অসুস্থ ছিল, মায়মুনা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসানের কাছ থেকে সাদের স্বাস্থ্যের খবর নিত। অদূরে শুয়ে সাদ শুনতো মায়মুনার কথা। তার মিষ্টি সুরেলা আওয়াজ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সাদের কানে প্রতিধ্বনিত হতো। মায়মুনা লঘু পায়ে বারান্দায় বা পাশের কামরায় যখন চলাফেরা করতো তখন সাদের হৃদয়ের স্পন্দন বেড়ে যেতো এবং সে কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যেতো। কিন্তু খানিক বাদেই সে স্বপ্ন বদলে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠতো স্পেনের আকাশের দুর্যোগের ঘনঘটা ও ভয়ানক চিত্র।

সে কল্পনার চোখে দেখতে পেতো, স্পেনের হৃদয়হীন শাসকরা দল বেঁধে শকুনের মত জনসাধারণের দেহের গোশত ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে। পৃথিবীর বুক থেকে স্পেনের মুসলমানদের নাম মুছে ফেলার জন্য দুশমনের রণপ্রস্তুতিও সে দিব্য চোখে দেখতে পেতো। অস্থির আবেগে আফসোস করে সাদ মনে মনে বলতো, 'হায়! আমি কতকাল এখানে পড়ে থাকবো? আমার তো অনতিবিলম্বে এখান থেকে বিদায় হওয়া দরকার।'

মায়মুনার অবস্থা ছিল ভিন্ন। সাদ যে দিন তাদের উদ্ধার করে কর্ডোভা পৌছে দিয়েছিল, সেদিন থেকেই মায়মুনার চোখে ভেসে বেড়াতো এক বাহাদুর নওজোয়ানের ছবি। তার কিশোরী মন অবাক বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল পৌরুষদীপ্ত এক বীরকে, যার সাহস, বুদ্ধি আর আন্তরিকতা এক কিশোরীর বাড়ন্ত মনে মোহমুগ্ধ অপূর্ব আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল।

যৌবনে পা দেয়ার পর বান্ধবীরা যখন সেভিলের যুবকদের নিয়ে নানা আলোচনায় মেতে উঠতো, মায়মুনার মনের পর্দায় তখন একটা ছবিই শুধু ভাসতো, সে ছবি সাদের। মায়মুনা যখন ভবিষ্যতের ভাবনায় বিভোর হতো তখন সাদের সুদর্শন, সাহসী, সচ্চরিত্র ও দয়ালু ছবিটিই দেখতে পেতো তার হৃদয়পটে আঁকা। সে মনে মনে বলে উঠতো,

'অবশ্যই একদিন তিনি এখানে আসবেন। আমার এ হৃদয়-মন সেদিন আমি তারই হাতে তুলে দেবো।'

সাদের ছবি বুকে এঁকে মায়মুনা নিরবে অপেক্ষা করছিল তার জন্য। মনের গোপন গহীনে সাদের জন্য এই প্রতীক্ষায় এক ধরনের পুলক ও সুখ অনুভব করতো সে। নামাজ পড়ে সে সাদের জন্য দু হাত তুলে দোয়া করতো। দোয়ার পর প্রশান্তিতে ভরে উঠতো তার মন। বার বার মনে মনে বলতো, 'সাদ! তুমি আমার! শুধু আমার!' এ বিশ্বাস করতো, সময়ের ব্যবধান আর স্থানের দূরত্ব তাদের মাঝে কখনো বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

শাহজাদা রশীদ তার প্রতি আকৃষ্ট হলে হঠাৎ করেই মায়মুনা নিজের অন্তরে এক ধরনের অস্থিরতা ও পেরেশানী অনুভব করল। মোনাজাতের জন্য হাত উঠিয়ে অশ্রুসজল কণ্ঠে বলতো, 'সাদ! তুমি কোথায়? তুমি কি আমাকে ভুলে গেছো? কবে আসবে তুমি?'

মায়মুনা ভাবছে, নিশুতি রাতে উঠে এতদিন যে মহান প্রভুর দরবারে হাত উঠিয়ে সে দোয়া করতো, তিনি তার মোনাজাত কবুল করেছেন। সাদকে এনে তাদের বাড়িতেই তুলে দিয়েছেন আল্লাহ। সাদ এখন তার পাশের কামরাতেই আছে। মায়মুনা ভাবছে, সাদের সেভিল আগমন ও আহত অবস্থায় তাদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ নিছক দুর্ঘটনা নয়, কুদরতেরই ফয়সালা।

মুতামিদের সিপাইরা সাদকে খুঁজে বেড়াচ্ছে জেনেও মায়মুনা ছিল নিশ্চিন্ত। তার দৃঢ় বিশ্বাস, যে মহান শক্তি সাদকে মায়মুনার বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন তিনি কিছুতেই সাদের অনিষ্ট হতে দেবেন না। সে কখনো তার মনের কথা সাদকে বলার প্রয়োজন বোধ করেনি। সাদের সাথে তার নিজের ভবিষ্যৎ যে এক সূত্রে গাথা, এ ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কল্পনার রাজ্যে মায়মুনা যে প্রাসাদ তৈরী করছিল, সে প্রাসাদ কখনো ধূলায় লুটিয়ে পড়বে এমন আশংকা তার মনে কখনো বাসা বাঁধতে পারেনি।

২

প্রথম দিনই মায়মুনা সাদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সাদ আপত্তি করে বলেছিল, 'আঘাত গুরুতর কিছু নয়। এ মামুলি জখম প্রাথমিক চিকিৎসাতেই সেরে যাবে ইনশাআল্লাহ।'

কিন্তু পরের দিন সাদের অসুখ বেড়ে গেল, গায়ে জ্বরও এলো। মায়মুনা চাকর পাঠিয়ে পারিবারিক বুড়ো হেকিমকে ডেকে আনালো। তার মা-ও জীবনের শেষ দিনগুলোতে এ হাকিমেরই চিকিৎসাধীন ছিলেন। মায়মুনা ও ইদ্রিসকে হাকিম খুব স্নেহ করতেন। ভাইবোন তাঁকে চাচাজান বলে ডাকতো।

হেকিম সাহেব সাদের ঘা পরিষ্কার করে ঔষধ লাগালো। মায়মুনা নেকাবে মুখ

ঢেকে দাঁড়িয়েছিল পাশে। হেকিমকে বলল, 'হেকিম চাচা, ইনি ভাইজানের বন্ধু। তাঁরই চেষ্টায় আমরা কর্ডোভা থেকে এখানে আসতে পেরেছিলাম। শুনেছি, পুলিশ একজন বিদেশীকে খুঁজছে। এখানে একজন বিদেশী লোক আছে জানলে পুলিশ অনর্থক তাঁকে নিয়ে টানাটানি করতে পারে।'

হাসান একজন ভৃত্যের পোশাক পরে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। হেকিম চুপচাপ মায়মুনার কথা শুনে হাসানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ছেলেটি কে?'

'ওর সাথে এসেছে।'

হেকিম আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'মা! আমাকে না বুঝিয়ে তোমার নোকরদেরকে সতর্ক করো। আর আমাকে ডাকার জন্য কাউকে পাঠানোর দরকার নেই। সময়মত আমি নিজেই এসে দেখে যাবো। ও ইদ্রিসের বন্ধু না হলেও তার চিকিৎসা ও নিরাপত্তার দিকে আমার নজর থাকতো। স্পেনে আজ তার মত যুবকদেরই দরকার।'

'আপনি ওকে চেনেন! মাফ করবেন আমি......'

তার কথার মাঝখানেই হেকিম বলে উঠলেন, 'ওকে একবার দেখার পর কেউ কি ভুলতে পারে! আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, পুলিশ ধারণাও করতে পারবে না, আহত হয়ে এ যুবক এখনো সেভিলেই লুকিয়ে আছে। ওরা তো জানে, সে অনেক আগেই সেভিলের সীমানা ছেড়ে পালিয়েছে। আমার মনে হয়, যারা গেছে তারা ওরই সংগী ছিল।'

সাদ হঠাৎ উঠে বসার চেষ্টা করে বলল, 'পুলিশ কি করে জানলো, আমার সাথীরা সেভিল ছেড়ে পালিয়েছে?'

'না, না, আপনি উঠতে চেষ্টা করবেন না!' হেকিম সাদকে পুনরায় শুইয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আমি অনেক কিছুই জানি। আপনাকে সবকিছুই খুলে বলছি তাহলে। আল্লাহর শোকর স্পেনের মায়েরা আপনার মত নওজোয়ানদের এখনো জন্ম দিতে পারছে। আপনি যে অধ্যায়ের সূচনা করেছেন সহসাই তা থেমে যাবে এমনটি মনে হয় না। আমার মনে হয়, এখানে আরো কিছু অদ্ভুত ঘটনাবলী ঘটবে। আমি পুলিশের এক আহত সিপাইকে দেখতে গিয়েছিলাম। তার মুখে শুনলাম, শহরের দক্ষিণ দিকের ফটকের বাইরে এক মদ্রাসার দরজায় গতকাল সকালে লোকজন একটি হাতে লেখা লিফলেট দেখতে পায়। তাতে মুতামিদ, ইবনে আম্মার ও রাণী রেমিকাকে নিয়ে খুবই কৌতুককর পদ্য লেখা ছিল। সকালে মদ্রাসায় ঢুকার সময় জনৈক ছাত্র তা দেখে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে বহু লোকের সমাবেশ ঘটে যায়।

দুঃসাহসী কবি তার পদ্যের শেষাংশে লিখেছে, 'গত রাতে মুতামিদের দরবারে এই প্রথম সত্যের বজ্রকণ্ঠ বেজে উঠেছিল। হে সেভিলবাসী, এখন তোমাদের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে, এ সত্য প্রকাশের ধারা অব্যাহত রাখা। যদি সুযোগ পেতাম, সেভিল ত্যাগ করার আগে আমিই এ কবিতা মুতামিদকে শুনিয়ে যেতাম। কিন্তু অনিবার্য কারণে আমাকে

সেভিল ত্যাগ করতে হচ্ছে। যাওয়ার সময় সেভিলের প্রতিটি যুবকের কাছে আমি এ উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি, তোমরা এ কবিতা মুতামিদের দরবার থেকে শুরু করে দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্যন্ত পৌছে দিও।'

পদ্যটি নকল করার জন্য রীতিমত হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে ছুটে আসে পুলিশ। তদন্ত করে তারা জানতে পারে, মাদ্রাসা খোলার একটু আগে ময়লা কাপড় পরা এক ঘোড়সওয়ার সেখানে এসে এটি দরজায় সেটে দিয়েই দ্রুত সরে পড়ে।

লোকটি কোন দিকে গেছে তার হদিস নিয়ে পুলিশ তার পেছনে ধাওয়া করে। শহর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে এক সরাইখানায় পৌছে জানতে পারে, ওখানে কিছু বিদেশী যুবক আগে থেকেই ছিল, আজ সকালে এক ঘোড়সওয়ার এলে ওরা সবাই বিদায় নিয়ে চলে যায়।

সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পুলিশ আবার ওদের ধাওয়া করে। কিছুক্ষণ পর দুপক্ষের মধ্যে মুকাবিলা হয় এবং ছয়জন পুলিশ আহত হয়ে ফিরে আসে। তাদেরই একজনকে আমি দেখতে গিয়েছিলাম। সে আরো বলেছে, অপর পক্ষে কেউ আহত হয়নি, শুধু একটি ঘোড়া সামান্য আঘাত পেয়েছে।'

প্রথমে হাসান খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল, হেকিমের কথা শেষ হলে সে প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং হেসে দিল

সাদ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি মনে করেন, তারা সেভিল ত্যাগ করতে পেরেছে?'

'শুধু আমি কেন, পুলিশও তাই মনে করছে। আজ সকালে মসজিদেও এ নিয়েই মুসল্লিদের আলাপ করতে শুনলাম।'

'পুলিশের আর কোন দল ওদের পিছু নেয়নি?'

'পুলিশ কেন, সম্ভবত সামরিক বাহিনীই তাদের পিছু নিত। কিন্তু এরই মধ্যে তারা আরেক বিপদের সম্মুখীন হয়। দিনের মধ্যেই পদ্যটির নকল শহরের সব মাদ্রাসায় পৌছে যায়। ছাত্ররা বিকেল নাগাদ মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তার পাশের বাড়ি এমনকি বাজারের দোকানপাটের দরজায়ও লিখে কবিতার নকল ঝুলিয়ে দেয়।

সাথে সাথে পুলিশরা লেগে পড়ে তা সরানোর কাজে। কিন্তু যতো সরানো হচ্ছে, লাগানো হচ্ছে তারচে বেশী। আমীর-ওমরা, সরকারী কর্মচারী কারো দরজাই রেহাই পাচ্ছে না। আজ সকালে দেখলাম আমাদের মসজিদেও তার কয়েকটি লাগানো আছে। রাতে আমার বাড়ির সদর দরজায়ও কে যেন তা লাগিয়ে দিয়ে যায়। আমি দেখতে পেয়েই ওটা খুলে নিয়েছি, সম্ভবত এখনও আমার পকেটেই আছে।'

সাদ হাত বাড়িয়ে বলল, 'দেখি তো!'

হেকিম পকেট থেকে ওটা বের করে সাদের হাতে দিলে সাদ পড়তে আরম্ভ করল, 'সেভিল কবিরা বদলে দিয়েছে আজ কবিতার ভাষা,

এদেশে আজ সিংহের চেয়ে শিয়ালের জোর খাসা।'

এটুকু পড়েই সাদের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটল। মনে মনে বলল, 'আহমদ! ভারী পাজি হয়েছ তো!'

হাসান কাগজটি সাদের হাত থেকে নিয়ে মায়মুনাকে দিতে দিতে বলল, 'আপা, এটিই সেই কবিতা।'

হেকিম বললেন, 'আমার মনে হয়, এখন আমাদের মধ্যে আর কোন গোপনীয়তার কিছু নেই। মায়মুনা, আমার ওপর ভরসা করতে পারো। এ রোগী খুব তাড়াতাড়িই সুস্থ হয়ে যাবে। বড়জোর তিন-চার দিন তাকে শুয়ে থাকতে হবে। আমার খুবই কৌতুহল হচ্ছে, কবিতাটি কার লেখা তুমি জানো?'

সাদ শান্তভাবে বলল, 'এটি আমার ছোট ভাইয়ের কবিতা।'

'আমারও তাই ধারনা ছিল। আর এ ছেলেও সম্ভবত আপনার ভাই!' হাসানের দিকে ইশারা করে বললেন হেকিম।

হাসান বলল, 'দেখুন! আপনি কিন্তু নিজের মাথায় এক দায়িত্ব তুলে নিচ্ছেন।'

'বেটা! এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

সাদের অবস্থার ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে। একটু সুস্থ হতেই তার মন বাইরে বোরোনোর জন্য ছটফট করতে শুরু করে। এদিকে মায়মুনার ব্যস্ততার অন্ত নেই। বিশেষ করে নির্লিপ্ত ও স্বাভাবিক থাকাই তার কাছে হয়ে উঠেছে অনেক কষ্টকর। বান্ধবীরা যাতে কেউ কোন সন্দেহ না করে এবং উপরে না যায় সে জন্য তাকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। নীচের ঘরেই সব সময় তাদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে রেখেছিল সে, যাতে বান্ধবীদের রেখে তাকে উপরে যেতে না হয়। ফলে দিনের বেলা যখন তখন সে সাদকে দেখার জন্য ছুটে যেতে পারতো না।

যে দু রাত সাদের প্রবল জ্বর ছিল, সে দুদিন মায়মুনা পাশের কামরায় সারা রাত জেগে কাটিয়েছিল। সাদ যত সুস্থ হতে থাকে ততই উপরে যেতে মায়মুনার সংকোচ হতে থাকে। তবুও সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে শুতে যাওয়ার আগে সে সাদের খোঁজ-খবর নিয়েই ঘুমুতে যেতো। সাদকে নিয়ে মায়মুনার অন্তহীন ব্যস্ততা ও পেরেশানী দেখে হাসান একটু পর পরই নীচে নেমে আসতো এবং মায়মুনাকে বলতো, 'আপা! ! ভাইয়ার অবস্থার আরো উন্নতি হয়েছে।'

৩

একদিন দুপুর বেলা জিয়াদের বোন এলো মায়মুনাদের বাড়িতে। নীচের ঘরে ওরা আলাপ করছে, হঠাৎ সাদ ও হাসান শুনতে পেল মায়মুনা চেঁচিয়ে কথা বলছে। হাসান

তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। মায়মুনা তখনো ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলছে, 'আমি তোমাকে আগেও বলেছি, ঐ বেহায়া সম্পর্কে আমি কোন কথা শুনতে চাইনা। তোমার ভাই তার পক্ষ হয়ে ওকালতি করলে বুঝবো সেও বেহায়া, তুমিও বেহায়া। না হলে এক বেহায়াকে খুশী করার জন্য এভাবে দালালী করতে আসতে না। আল্লাহর ওয়াস্তে এখান থেকে কেটে পড়ো, নইলে তোমার ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

জিয়াদের বোন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'মনে রেখো! তুমি লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হয়ে একদিন তার পায়ে মাথা রেখে কাঁদবে। আমি তোমাকে রাণী বানাতে চাচ্ছি, অথচ তুমি রাজী হচ্ছো না। কিন্তু এমন দিন আসবে, তুমি তার দাসী হতে পারলেও নিজেকে ধন্য মনে করবে। স্পেনের কোন শক্তিই তোমাকে তার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।'

মায়মুনা বিদ্যুৎ বেগে ধেয়ে গেল তার কাছে, 'বের হও না মুখপুড়ি। আর তাকে বলে দিস, পাগলা কুত্তার উৎপাত বেশীদিন টেকে না।'

ততক্ষণে সাদও কামরা থেকে বেরিয়ে এসে হাসানের পাশে রেলিং ঘেষে দাঁড়াল। রাগে থরথর করে কাঁপছিল মায়মুনার দেহ। জিয়াদের বোন ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এ জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে মায়মুনা।'

'সে জন্য তোকে চিন্তা করতে হবে না, তুই এখন যা বলছি।'

অবস্থা বেগতিক দেখে জিয়াদের বোন নিজেই করে বেরিয়ে গেল। আগুন ঝরা চোখ নিয়ে মায়মুনা সেদিকে তাকিয়ে রইল। এক পরিচারিকা গিয়ে ফটক বন্ধ করে দিয়ে মায়মুনার কাছে এসে বলল, 'তার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করা আপনার ঠিক হয়নি।'

মায়মুনা ঝট করে তার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি তোমার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো কিন্তু।'

তার চোখ তখন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। সাদ হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও হাসান, ওকে শান্তনা দাও গিয়ে।'

হাসান যখন নীচে পৌঁছল তখন মায়মুনার কামরা থেকে কান্নার শব্দ আসছিল।

'কি হয়েছে আপা?' হাসান ভারাক্রান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

মায়মুনা কোন উত্তর দিল না। হাসানের প্রশ্নের জবাবে সে কেবল দুহাতে নিজের মুখ ঢাকল।

'আপা, আপনি কাঁদছেন। খোদার কসম, যদি কোন পুরুষ আপনার মনোকষ্টের কারণ হতো তাহলে আপনার এ ভাই যে কাপুরুষ নয় তা এতক্ষণে প্রমাণ হয়ে যেতো। কিন্তু কি করবো, ইনি ছিলেন মহিলা।'

'তুমি জানো না হাসান.....' বলে মায়মুনা পুনরায় ফুপিয়ে উঠল।

হাসান বলল, 'আমি শুধু জানি, ইদ্রিসের অনুপস্থিতিতে আপনার আরও দুজন ভাই এখানে রয়েছে। আর আমাদের লাশ না মাড়িয়ে কেউ এ বাড়িতে ঢুকতে পারবে না।'

বিছানার ওপর কতগুলো কাগজের টুকরো পড়েছিল। মায়মুনা চোখ মুছে টুকরোগুলো জড়ো করে হাসানের হাতে দিয়ে বললো, 'ওই মেয়ে এ চিঠি নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমি রাগে তা ছিঁড়ে ফেলেছি। তুমি এগুলো তোমার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাও।'

একটু পর। সাদ কাগজের টুকরোগুলো সাজিয়ে নিয়ে পড়ছিলঃ

'বোন মায়মুনা!

এই পত্র দিয়ে আপনার কাছে আমার বোনকে পাঠালাম। বাকী কথা ওর মুখ থেকে শুনে নেবেন। অপমান সহ্য করার মত লোক শাহাজাদা রশীদ নন। তার প্রেম নিবেদন উপেক্ষা করলে তার পরিণতি বড় ভয়াবহ হবে। আপনি শুনে খুশি হবেন, কর্ডোভার ভাবী গভর্ণর আপনার অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং আপনাকে তার রাণী বানাতে চাচ্ছেন। ইচ্ছে করলে তিনি আপনার পায়ে শিকল পরিয়ে তাঁর কাছে হাজির করতে পারতেন। কিন্তু তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চান না, তিনি আপনার প্রেম চান। আপনি যদি তার এই মেহেরবানীকে পায়ে ঠেলে দেন, তাহলে আপনি ও আপনার ভাইয়ের জীবনে নেমে আসবে অবর্ণনীয় বিপদ ও মুসিবতের তুফান। স্পেনে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আপনারা নিরাপদে থাকতে পারবেন, এমন কোন শক্তি নেই যে আপনাদের বিন্দুমাত্র মদদ করতে পারবে। ভাই-দরদী এক বোন হয়ে আপনি কি ইদ্রিসকে চিরদিনের জন্য কারাগারে ধুকে ধুকে মরতে দেখতে চান?

আমি ইদ্রিসের বন্ধু বলেই এ চিঠি লিখছি। বন্ধুর বোনের প্রতি যে সহানুভূতি ও মমতা থাকা উচিত, সেই মমমতার খাতিরে আপনাকে দেখি বলেই আপনাকে এসব জানাচ্ছি। কর্ডোভা যাওয়ার আগে শাহজাদা রশীদ ইদ্রিস সম্পর্কে নির্মম সিদ্ধান্তের আভাস দিয়েছে। সম্ভবত ফিরে আসার সময় পথেই তাকে গ্রেফতার করা হবে। হুকুমতের এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করার জন্য তার কোন অজুহাত দেখানোরও দরকার হবে না। তার গ্রেফতারীর পর আপনার কি দশা হবে তা নিজেই কল্পনা করে নিন।

আপনি যদি শাহজাদা রশীদের জীবন সঙ্গিনী হতে রাজি হন তাহলে আপনিই কেবল ভাগ্যবতী হবেন না, তাতে ভাই ইদ্রিসের পদোন্নতি ও তরক্কীর পথও খুলে যাবে।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু আমার এক বন্ধু ও তার বোনের কল্যাণ কামনা করছি। সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। আপনি চাইলে এ নিয়ে সামনাসামনি আলাপ হতে পারে আমাদের। ইচ্ছে করলে আপনি আমাদের বাসায় আসতে পারেন আর যদি আমাকে যেতে বলেন তাহলে আমিও আসতে পারি আপনাদের বাসায়। আপনি নারি বোন হয়ে এমন কিছু করবেন না, যাতে ইদ্রিসের জীবন বিপন্ন হয়।'

আপনার নিত্য শুভার্থী
জিয়াদ

চিঠি পড়া শেষ করে সাদ অনেকক্ষণ বিমূঢ়ভাবে বসে রইল। হাসান তাকিয়ে ছিল ভাইয়ের মুখের দিকে। দেখতে পাচ্ছিল তার চেহারায় কখনো রাগ, কখনো চিন্তার রেখা ফুটে উঠছে। পেরেশানীর কারণে তার কপালে দেখা দিচ্ছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

সিঁড়িতে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। হাসান সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'তিনি আসছেন।'

সাদ বলল, 'হাসান, তুমি গ্রানাডা যাওয়ার জন্য তৈরী হও। ইদ্রিসের ঘোড়া ও টাঙ্গা এখানেই আছে তো?'

'জি।'

'তুমি মায়মুনাকে নিয়ে টাঙ্গায় চাপো, আমি টলেডো যাচ্ছি।'

সাদ উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'মায়মুনা! সেভিল তোমার জন্য নিরাপদ নয়। তুমি হাসানের সাথে গ্রানাডা রওনা হয়ে যাও। ইদ্রিসকে নিয়ে আমি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসব সেখানে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আজকে আর রওনা করার সময় নেই। রাতের বেলা সফর করা তোমার জন্য নিরাপদ হবে না। তবে কাল খুব ভোরেই রওনা করবে তোমরা। আমি তোমাদের আগেই চলে যাবো। শহরের দক্ষিণ দিকের ফটকের বাইরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব আমি। ওখান থেকে কিছু দূর তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আমি টলেডোর পথ ধরবো। তুমি তোমার চাকর চাকরাণীদের বলে যেয়ো, কেউ তোমার খোঁজ করলে তারা যেন বলে, তুমি কোন বান্ধবীর সাথে দেখা করতে গেছো। তাহলে অন্তত একদিন তুমি নিরাপদে সফর করার সুযোগ পাবে।'

মায়মুনা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সাদের কথা শেষ হলেও সে কিছুই বলছে না দেখে সাদ পুনরায় বলল, 'আমার কথায় মনে আপত্তি করো না। এ অবস্থায় এরচে ভাল কোন বুদ্ধি আমার মাথায় আসছে না। সেভিল বর্তমানে নেকড়েদের অভয়ারণ্য হয়ে গেছে। রশীদের মত হায়েনা কিছুতেই তোমার পিছু ছাড়বে না।'

মায়মুনা দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বলল, 'আমি জানি। কিন্তু আমি ভাবছি আপনাকে নিয়ে। আপনার শরীর এখনো সফরের উপযোগী হয়নি।'

'আমি বিলকুল ঠিক হয়ে গেছি। বিশ্বাস না হলে হাসান ও তোমার বুড়ো চাকরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

মায়মুনা বলল, 'আপনি যা ভাল বুঝেন। আমি আপনার যে কোন হুকুম তামিল করার জন্য হামেশা তৈয়ার।'

৪.

সেদিনই এশার নামাজের পর। মায়মুনা ওপর তলার কামরা থেকে তার সফরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নীচে নামছে, এমন সময় দেউড়ির দিক থেকে বুড়ো নওকরের উত্তপ্ত স্বর শুনতে পেল, 'আপনি জানেন ইদ্রিস বাড়িতে নেই। রাত দুপুরে কোন

ভদ্র ঘরে প্রবেশ করা অন্যায়।'

একজন গর্জন করে উঠল, 'নাদান কোথাকার! তুমি জান না আমি কে? চুপ থাকো, নইলে বিপদে পড়বে।'

'আমি জানি আপনি শহরের কোতোয়াল এবং ইদ্রিসের বন্ধু। আপনার জন্য মেহমানখানা খোলা আছে। এত রাতে কাউকে যুবতী মেয়ের ঘরে কিছুতেই আমি যেতে দিতে পারি না।'

মায়মুনা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেউড়ির দিকে তাকাল। দেখতে পেল আগন্তুক বুড়ো চাকরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভেতরে আসতে চাইছে। অন্যান্য চাকররাও এরই মধ্যে আঙ্গিনায় এসে জমা হয়েছিল কিন্তু শহরের কোতোয়াল ও তার সিপাইদের বিরুদ্ধে তারা কিছু করার সাহস পাচ্ছিল না।

এক লোক বুড়ো চাকরের কাছে এগিয়ে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই! আমরা ইদ্রিসের বোনের কাছে জরুরী খবর নিয়ে এসেছি। খবর দিয়েই চলে যাবো, ও কোথায়?'

মায়মুনার পরিচারিকা বারান্দার এক কোণে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মায়মুনা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই সাদ ও হাসানকে বারান্দায় দাঁড়ানো দেখতে পেল। মায়মুনা কাউকে কিছু না বলে দ্রুত তার কামরায় প্রবেশ করল এবং তীর ধনুক বের করে ধনুকের ছিলায় তীর লাগাতে শুরু করল।

সাদ এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে ফেলল, 'মায়মুনা! দাঁড়াও, কি করছো তুমি? আমার কথা শোন! ওরা সংখ্যায় অনেক। বাড়ির বাইরেও অনেক লশকর। তুমি কৌশলে জিয়াদকে উপরে ডেকে নিয়ে এসো। জলদি করো, নইলে ওরা সবাই উপরে উঠে আসবে। আমরা লুকোচ্ছি, ওকে উপরে আনার পর যা করার আমরাই করবো। ও কতটা ভীরু আমি জানি। ভয় পেয়ো না, তুমি তাড়াতাড়ি করো।'

সাদ হাসানকে নিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে বাতি নিভিয়ে দিয়ে ওঁৎ পেতে রইল।

জিয়াদ চিৎকার করছিল, 'বলছো না কেন মায়মুনা কোথায়? বেশ, তোমরা মুখ না খুললে আমি নিজেই তালাশ করে নিচ্ছি।'

মায়মুনা দোতালার রেলিং থেকে গলা বের করে কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কে এসেছে? এত হট্টগোল কিসের?'

জিয়াদ ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার নগন্য এক গোলাম জিয়াদ। অধম আপনার খেদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি চায়।'

জিয়াদের কথাগুলো ছিল বিদ্রুপে ভরা। মায়মুনা রাগ সামলে বলল, 'সামান্য এক যুবতীর সাথে দেখা করার জন্য এত বড় বাহিনী নিয়ে আসার কি দরকার পড়ল তোমার?'

'এরা সবাই এসেছে আপনাকে সম্মান জানাতে। মেহেরবানী করে আপনি কি একটু নীচে তশরীফ আনবেন? নাকি আমিই আপনার খেদমতে উপরে উঠে আসবো?'

'জানি, তোমাকে বাধা দেয়ার শক্তি আমাদের নেই। খাদেমা, ওকে উপরে নিয়ে

এসো। ওর সংগী সিপাইদের মেহমানখানায় বসতে দাও।'

জিয়াদ সিপাইদেরকে ওখানেই দাঁড়াতে বলে পরিচারিকার সাথে উপরে উঠে এল। মায়মুনা খাদেমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ওকে হলরুমে নিয়ে যাও। ওখানেই ওর সাথে আলাপ হবে আমার।'

জিয়াদ মায়মুনার ব্যবহারে যেমন অবাক হচ্ছিল, তেমনি খুশীও। সে নিশ্চিন্তে কামরায় প্রবেশ করে গদিমোড়া চেয়ারে বসল। মায়মুনা পাশের কামরা ঘুরে জিয়াদের রুমের দরজা খুলে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'তুমি আরও একবার আমার ভাইয়ের বন্ধুত্বের হক আদায় করতে এসেছো বুঝি?'

জিয়াদ বলল, 'আমি আপনার সাথে বেশী কথা বলব না। আপনাকে সসম্মানে কর্ডোভা পৌছে দেয়ার দায়িত্ব এসেছে আমার ওপর। বাইরে আপনার জন্য টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে। আপনি যদি যেতে অস্বীকার করেন, তাহলে সেভিলের সীমান্ত চৌকিতে পৌছার সাথে সাথে ইদ্রিসকে গ্রেফতার করে কর্ডোভায় নিয়ে যাওয়া হবে। শাহাজাদা রশীদ যাওয়ার আগে এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এরপর তার ভাগ্যে কি ঘটবে তা নির্ভর করবে আপনার ওপর। আপনি চাইলে তাকে উচ্চ পদে সমাসীন করতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে কারাগারেও পাঠাতে পারবেন।'

মায়মুনা বলল, 'আমি শুধু একটি কথাই জানতে চাই, আমার জায়গায় তোমার বোন হলে তুমি কি করতে?'

জিয়াদ খানিক থেমে রাগ সামলানোর চেষ্টা করে বলল, 'আমি আপনার সাথে তর্ক করতে আসিনি। আমি জানতে চাই, আপনি কি স্বেচ্ছায় যাবেন, না সিপাইদের ডাকতে হবে?'

সাদ হাসানের কানে কানে কিছু বলল। তারপর হঠাৎ দরজা খুলে মায়মুনার পাশ ঘেষে এগিয়ে গেল জিয়াদের সামনে। দরজা খোলার শব্দ পেয়েই জিয়াদ চমকে উঠল। ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল সে কিন্তু চমক ভাঙার আগেই সাদের তরবারির আগা জিয়াদের বুক স্পর্শ করল। সাথে সাথে অন্য পাশের দরজা খুলে হাসান কামরায় প্রবেশ করল এবং তার তরবারির অগ্রভাগ জিয়াদের ঘাড় স্পর্শ করল। জিয়াদ এতটাই হতবাক হয়ে গেল যে মুখ দিয়ে কোন রকম শব্দও উচ্চারণ করতে ভুলে গেল।

সাদ বলল, 'গোলমালের চেষ্টা করার আগে মনে রেখো, কথার চেয়ে এ তরবারি অনেক বেশী ধারালো। মরতে না চাইলে চুপ করে বসো।'

জিয়াদ কিছু না বলে বসে পড়ল এবং অবাক হয়ে হাসান ও সাদকে দেখতে লাগল। ভয়ে সে রীতিমত কাঁপছিল এবং তার চেহারায় জমা হচ্ছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

সাদ বলল, 'দাঁড়াও।'

জিয়াদ উঠে দাঁড়াল।

সাদ তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলল, 'তুমি আগে যেমন ভীতু ছিলে এখনো দেখছি

তেমনি কাপুরুষই আছো।'

হাসান জিয়াদের খাপ থেকে তরবারি ও খঞ্জর খুলে নিলো।

সাদ বলল, 'ভয় পেয়ো না জিয়াদ! একজন ভীরু কাপুরুষের রক্ত দিয়ে আমার হাত অপবিত্র করবো না। বাইরে চলো। সংগীদের বলে দাও, তোমার ফিরতে সময় লাগবে। এখানে আর কোন পাহারার প্রয়োজন নেই। সবাইকে চলে যেতে বলো। কিন্তু মনে রেখো! চাতুরীর আশ্রয় নিলে চোখের নিমিষে তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে পৌঁছে যাবে। হাসান! বাতি নিয়ে পাশের কামরায় যাও। আর মায়মুনাকে বলো জলদি তৈরী হয়ে নিতে। চল জিয়াদ।'

তরবারির দরকার ছিল না, সাদের কথা আর চাহনিতেই কাবু হয়ে গিয়েছিল জিয়াদ। ভড়কে গিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত সাদের আগে আগে হেঁটে বেলকুনিতে গিয়ে দাঁড়াল। সাদ নিজেকে সংকুচিত করে জিয়াদের আড়ালে দাঁড়িয়ে তরবারির অগ্রভাগ জিয়াদের পাঁজরের হাড়ে ঠেকিয়ে রাখল। জিয়াদ ভয়কম্পিত স্বরে বলল, 'তোমার কথামত কাজ করলে তুমি কি সত্যি আমার জীবন ভিক্ষা দেবে?'

সাদ বলল, 'এটা নির্ভর করছে আমরা নিরাপদ হতে পারছি কিনা তার ওপর। আমি ওয়াদা করছি, আমরা নিরাপদে এ এলাকা ত্যাগ করতে পারলে তুমিও নিরাপদে নিজের বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু কোন কারণে আমাদের জীবন বিপন্ন হলে কিছুতেই তোমার জ্যান্ত ফেরার সম্ভাবনা নেই।'

জিয়াদ সামান্য এগিয়ে নীচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সংগীদের ডেকে বলল, 'মায়মুনার তৈরী হতে কিছু সময় লাগবে। অযথা এখানে আর পাহারায় থেকে কষ্ট করার দরকার নেই তোমাদের। তোমরা চলে যাও।'

নীচ থেকে এক সিপাই বলল, 'টাঙ্গা কি এখানেই থাকবে?'

জিয়াদ পেছন ফিরে সাদের দিকে তাকাল। সাদ ইশারায় হ্যাঁ বললে জিয়াদ আবার হেঁকে বলল, 'হ্যা, টাঙ্গা এখানেই থাকুক।'

'আমরা কি সবাই চলে যাবো?'

জিয়াদ আবার সাদের দিকে তাকাল।

সাদ জিজ্ঞেস করল, 'বাইরে কতজন লোক আছে?'

সে জানাল, 'দুজন অশ্বারোহী ও দুইশ সিপাই।'

'অশ্বারোহীদের থাকতে বলো।'

জিয়াদ উচ্চঃস্বরে বলল, 'অশ্বারোহী দুজন ছাড়া বাকী সবাই চলে যাও।'

সিপাইরা বের হয়ে গেলে সাদ হাসানকে বলল, 'তুমি নীচে গিয়ে দেখে আসো সে ফাঁকি দিয়েছে কিনা! আর দুজন চাকরকে উপরে পাঠিয়ে দাও। মায়মুনা! জলদি ভেতরের কামরায় গিয়ে আলো জ্বালো। চল জিয়াদ।'

জিয়াদকে ভেতরের কামরায় নিয়ে আসা হলো। সাদ তার গায়ের জামা খুলে

নিলো। ততক্ষণে মায়মুনার দুজন চাকর উপরে উঠে এসেছে। সাদ শক্ত দড়ি দিয়ে জিয়াদকে বাঁধতে হুকুম দিল তাদের।

হাসান হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে এসে বলল, 'ভাইজান! টাঙ্গার কোচম্যান ও দুজন অশ্বারোহী ছাড়াও সেখানে আরেকজন লোক রয়েছে। টাঙ্গার ভেতর বসে আছে সে।'

সাদ তরবারির মাথা জিয়াদের ঘাড়ে লাগিয়ে বলল, 'জিয়াদ! আমাদের ধোঁকা দিলে তুমি জীবনে বাঁচবে না। অন্য কোন বিপদে পড়ার আগেই আমরা তোমার জীবন শেষ করে দেবো।'

জিয়াদ কাতর অনুনয় করে বলল, 'আপনি বিশ্বাস করুন আমি কোন চালাকি করিনি। ওটা শাহজাদা রশীদের খোজা চাকর। ভেতরে আর কেউ নেই।'

সাদ বলল, 'আমি এক্ষুণি দেখছি। তুমি ওদের ভেতরে ডেকে নিয়ে এসো। উপরে এসে মালপত্র নিয়ে যেতে বলো তাদের। হাসান! তুমি নীচে যাও।'

জিয়াদ সাদের তরবারির ইশারায় আবার কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে উচ্চঃস্বরে সংগীদের নাম ধরে ডাকল। ওরা জবাব দিতেই অশ্বারোহীদেরকে এসে মালপত্র নিয়ে যেতে বলল। খোজা শোরাই এল সবার আগে আগে। সে আঙ্গিনায় পৌছেই চেঁচামেচি শুরু করল, 'এ আল্লা, এ সব কী হচ্ছে? অর্ধেক রাত চলে গেল। শাহজাদা পথ চেয়ে বসে আছেন। আমরা না যাওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুই খাবেন না।'

জিয়াদ নীরব দেখে সাদ তরবারির খোঁচা মেরে বলল, 'তাদের উপরে ডাকো।'

জিয়াদ সংগীদের বলল, 'তোমরা এখান থেকে মালপত্র সব নিয়ে টাঙ্গায় তোল। আমরা তৈরী হচ্ছি।'

খোজা আবার চেঁচামেচি শুরু করল, 'উপরে যাওয়ার রাস্তা কই? অন্ধকারে কিছুই তো ঠাহর করতে পারছি না। মোম-টোমও কি নেই এ বাড়িতে?'

হাসান এগিয়ে বলল, 'আমার সাথে এসো।'

৫.

সাদের ইশারায় মায়মুনার চাকররা জিয়াদকে রশি দিয়ে আচ্ছামত বাঁধতে শুরু করল। সিঁড়িতেও খোজা হৈ চৈ করছিল, 'তওবা! তওবা! কি অন্ধকাররে বাবা। আরে, আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছো কেন?'

এক অশ্বারোহী বলল, 'তুমি আরামে টাঙ্গাতে বসে থাকলেই পারতে, এলে কেন?'

ওপরের বেলকনিতে পৌছে খোজা ও তার সংগীরা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। নিশ্চুপ সবাই। প্রথম দুটো কামরার দরজা খোলা থাকলেও ভেতরে অন্ধকার। তৃতীয় কামরার ভেতর থেকে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। খাজা শুরাই বলছে, 'ধ্যাত, এ কোথায় এলাম? আপনি কোথায়?'

হাসান পেছন থেকে বলল, 'সামনে বাড়ো।'

খাজা শোরাই অন্ধকার দরজা পাশ কাটিয়ে যে রুম থেকে আলো আসছে তার কাছাকাছি এসে পড়েছে, হঠাৎ সাদ অন্ধকার কামরা থেকে বের হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করল এক অশ্বারোহীকে। দ্বিতীয় অশ্বারোহী তরবারি বের করতে যাচ্ছিল, হাসান পেছন থেকে তার ঘাড়ে তরবারি ঠেকিয়ে বলল, 'বোকামী করেছো কি মরেছো, অন্য চালাকির চেষ্টা না করলে গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগবে না।'

খোজা এতক্ষণ আলোর জন্য চেঁচামেচি করছিল, এখন আলো-ই হয়ে উঠল তার ভয়ের কারণ। আলোকিত কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে সে কাঁপছিল, সামনে একটু আড়াল পাবার আশায় অন্ধকারে সেঁধিয়ে যেতে চাইছিল। মায়মুনা খঞ্জরের মাথা খোজার ভূড়িতে ঠেসে ধরে বলল, 'যদি একটা কথাও বলো তাহলে .....' কথা শেষ করার পরিবর্তে খঞ্জরটা একটু সামনে ঠেলে দিল সে।

খাজা শোরাই ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

কিছুক্ষণ পরে সাদ, হাসান ও মায়মুনার চাকররা এ তিনজনকেও জিয়াদের পাশে শুইয়ে দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে দিল।

মায়মুনা পাশে দাঁড়িয়ে অতীতের সেই দিনটির কথা স্মরণ করল, যেদিন সাদ তীর মেরে গাছ থেকে তার পুতুল পেড়ে দিয়েছিল, যখন সে তাদের সাহায্য করার জন্য কর্ডোভা পৌঁছেছিল। তার শৈশব কেটেছে কর্ডোভায় আর যৌবন কেটেছে সেভিলে। মায়মুনা অনুভব করল, কালের ব্যবধান ও সময়ের দূরত্ব পার হয়ে সাদ সবসময় তার সাথেই ছিল। আপদে বিপদে তার জীবন সারাক্ষণ ঘিরে আছে সাদ।

হাসানের কথায় চমক ভাঙল মায়মুনার। হাসান বলল, 'এখন শুধু কোচম্যান বাকী। আমি ওকে নিয়ে আসছি।'

সাদ বলল, 'তাকে নীচেই কোন কামরায় বন্দী করো। যা করার জলদি করো। আমাদের হাতে সময় খুব কম। দুটি ঘোড়ায় জিন লাগাতে বলো চাকরদের।'

হাসান একজন চাকরকে সাথে নিয়ে নীচে নেমে গেল। সাদ বাকী দুজনকে বলল, 'আমরা অনেক দূর যাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে যে আমাদের সাথে যেতে চাও, চটপট আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করে নিয়ে তৈরী হয়ে নাও।'

বুড়ো চাকর বলল, 'আমরা কেউ সেভিলের লোক নই। আমরা সবাই আপনার সাথে যাব। আস্তাবল থেকে বেশী ঘোড়া নেয়ার দরকার নেই। অশ্বারোহীদের দুটো ঘোড়া নীচে দাঁড়িয়ে আছে। সহিসও সম্ভবত টাঙ্গাতেই আছে।'

'ঠিক আছে, তাহলে শুধু হাসানের ঘোড়ায় জিন লাগাও।'

সাদ এবার পরিচারিকার দিকে তাকাল। সে বলল, 'আমার কোন বাড়ি ঘর নেই। আমি মায়মুনার সাথেই আজীবন থাকতে চাই।'

সাদ মায়মুনাকে বলল, 'তুমি শীগগীর যা কিছু নেয়ার নিয়ে তৈরী হয়ে যাও। কিন্তু

খুব তাড়াতাড়ি।'

'আমি তো সেই কখন থেকেই তৈরী হয়ে আছি।'

মায়মুনা একজন চাকরকে নিয়ে কামরায় গেল এবং একটি ছোট বাক্স তার হাতে তুলে দিল।

দড়িতে মজবুত ভাবে বাঁধা বন্দীদেরকে সাদ পৃথক পৃথক কামরায় রেখে বাইরে থেকে শিকল টেনে দিল। আর খোজাকে নিয়ে গিয়ে ছাদের দিকে উঠার সিঁড়িতে আটকে দিল। হাসান এসে খবর দিল, কোচম্যানকে নীচেই বন্দী করা হয়েছে।

'হাসান, তুমি মায়মুনা ও পরিচারিকাকে টাঙ্গাতে বসিয়ে দাও। চাকরদের বলো, ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যেতে। আমি এক্ষুণি আসছি।'

সাদ দ্রুত বাড়ির একদম কোণের ঘরে চলে এল। এ কামরায় আলো জ্বলছিল। জিয়াদ উপুড় হয়ে মেঝের উপর পড়ে ছিল। সাদ তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বলল, 'জিয়াদ, আমি চলে যাচ্ছি। তোমার মনিব কালকেই তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিতে পারবে। তাকে বলে দিও, আমার পেছনে ধাওয়া করে কোন ফায়দা হবে না। আর বলো, আমি আবারও আসবো এই সেভিলে, আসবো প্রলয়ের তুফান নিয়ে। আর সে তুফান সেভিলের কমবখত শাসকদের সুখের প্রাসাদ টালমাটাল করে দেবে।

আমি তোমাকে ছোটবেলা থেকেই জানি। সব সময়ই তুমি ছিলে অসম্ভব বদ। কিন্তু মনে রেখো, যদি ইদ্রিসের একটি চুলও কেউ স্পর্শ করে, তাহলে মুতামিদের কোন সুরক্ষিত দুর্গই তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। অন্তত নিজের প্রাণের মায়ায় হলেও শাহজাদা রশীদের কোন কুবুদ্ধিতে কান দিও না।'

জিয়াদের হাত-পা শক্তভাবে দড়িতে বাঁধা ছিল। মুখে কাপড় ঠাসা থাকায় সে কিছুই বলতে পারছিল না। ফ্যালফ্যাল করে সে তাকিয়ে ছিল সাদের দিকে। তার চোখ দুটি যেন বলছিল, 'আমিও তোমাকে জানি। সেদিন শাহী মহলের দরজায় তোমার সাথে আমার যে সাক্ষাত হয়েছিল, সেটাই আমাদের প্রথম সাক্ষাত ছিল না। এর আগেও আমি তোমাকে কোথাও দেখেছি। কিন্তু কোথায়? কবে?'

সাদ বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতির পাতায় জিয়াদ খুঁজে ফিরছিল তার প্রশ্নের জবাব।

৬.

একটু পরই টাঙ্গা ছাড়ল। টাঙ্গায় বসেছে মায়মুনা, পরিচারিকা ও সাদ। হাসান ও দুই চাকর টাঙ্গার পেছনে ঘোড়ায় সওয়ার। টাঙ্গা চালাচ্ছে ইদ্রিসের সহিস। বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও শাহী আস্তাবলের চারটি দ্রুতগামী সাদা ঘোড়া চালিয়ে নিতে বেশ আনন্দ পাচ্ছিল সে।

কোন রকম বিপদ-আপদ ছাড়াই তারা সেভিলের সীমানা অতিক্রম করল। অন্ধকারের কারণে কোচম্যানকে টাঙ্গা চালাতে হল বেশ ধীরে ধীরে। সেভিল থেকে আট মাইল দূরে নদীর এক পুলের কাছে এক অশ্বারোহী তাদের পথ আটকে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, 'টাঙ্গা থামাও।'

টাঙ্গার গতি দ্রুত থাকায় গাড়ী তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। পেছনের ঘোড় সওয়ারদের সামনে পড়ল সে। হাসান তার কাছে ঘোড়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

অশ্বারোহী প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'টাঙ্গায় কি জিয়াদ আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'একাই আছেন না তার সাথে অন্য কেউ আছেন?'

'তার সাথে এক মহিলা ও তার চাকরাণী আছে। কিন্তু তুমি কে?'

'আমাকে শাহজাদা রশীদ পাঠিয়েছেন।'

'তিনি কোথায়?'

'এখান থেকে দু মাইল দূরে তিনি অপেক্ষা করছেন। সামনের মোড় ঘুরলেই তার শিবিরের আলো দেখতে পাবে।'

মোড়ে এসে কোচম্যান টাঙ্গা না ঘুরিয়ে সোজা সামনের দিকে চালিয়ে দিল। অশ্বারোহী চিৎকার করে বলল, 'দাঁড়াও! টাঙ্গা ফিরাও। এ সড়ক অন্য দিকে গেছে।'

কোচম্যান তাতে কান না দেয়ায় সে নিজের ঘোড়া দ্রুত টাঙ্গার সামনে নিয়ে গেল। হাসান নিজের ঘোড়া টাঙ্গার সাথে লাগিয়ে বলল, 'টাঙ্গা থামাও।'

কোচম্যান গাড়ী থামাতেই অশ্বারোহী দরজার কাছে এসে বলল, 'দেখুন, কোচম্যান আপনাকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে।'

'এ কোচম্যান নতুন, রাস্তা চেনে না। তুমি ঘোড়া ছেড়ে কোচম্যানের পাশে বসে যাও এবং ঘোড়াটি সিপাইদের কাছে দিয়ে দাও।'

সাদের আওয়াজ অশ্বারোহীর কাছে অপরিচিত মনে হল। সে সন্দিহান হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে?'

ততক্ষণে হাসান ও তার দুই সংগী অশ্বারোহীকে ঘিরে ফেলেছিল। হাসান নিজের তরবারি দিয়ে তার উরুতে আস্তে খোঁচা মেরে বলল 'সে খবর পরে নিও, আগে নামো।'

অশ্বারোহী দেখতে পেল হাসানের তরবারি ছাড়া আরও দুটি বর্শা তার দিকে তাক করে আছে। সাদ টাঙ্গা থেকে লাফিয়ে নেমে আগন্তুকের ঘোড়ার বাগ ধরে ফেলল। বাধ্য হয়ে আগন্তুক ঘোড়া থেকে নেমে এল। সাদ তার হাত পা ভাল করে বেঁধে টাঙ্গায় তুলে দিয়ে বলল, 'মায়মুনা, ওর দিকে খেয়াল রেখো। আমি ঘোড়ায় চড়ে আসছি।'

হাসান বলল, 'ভাইজান, আমরা যা আশা করছিলাম, তারচে বেশী সময় পেয়ে যাব। ভোরের আগে রশীদ আর কাউকে খবর নিতে পাঠাবে না। দুপুরের আগে বাড়ি

তল্লাশীর সম্ভাবনা নেই ! তবে জিয়াদের চাকর বা কোন সিপাই তার খোঁজে সেখানে গেলে বিপদের আশংকা আছে।'

'আমি অবশ্য এ আশংকাও করি না। কারণ তারা সবাই জানে, জিয়াদ কর্ডোভা যাচ্ছে। বাড়ির সদর দরজায় কাউকে দেখতে না পেলে মনে করবে, জিয়াদ রওনা হয়ে গেছে। দুপুরের আগে জিয়াদকে কেউ তালাশই করবে না।'

পরদির ভোরে তারা একটি জনমানবহীন এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। কোচম্যান বলল, 'বন্দীকে এখানে ছেড়ে গেলে কেমন হয়?'

সাদ জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে জনবসতি কত দূরে?'

'তিন মাইলের মধ্যে কোন বাড়িঘর নেই। কোথাও কোথাও রাখালদের দুএকটি ডেরা থাকলেও তাদের নিয়ে কোন ভয় নেই। এখান থেকে কাছের গ্রামও কম করে আট মাইল।'

হাসান বন্দীকে টাঙ্গা থেকে নামিয়ে গাছের সাথে বাঁধতে চাইল। সাদ বলল, 'দরকার নেই হাসান। বিনা কারণে ওকে আমি কষ্ট দিতে চাই না।'

তারপর বন্দীর দিকে ফিরে বলল, 'তুমি এখন মুক্ত। বিদায়ের আগে তোমাকে কিছু পরামর্শ দিতে চাই। তুমি এখন সোজা সেভিলে চলে যাও। সেখানে ইদ্রিসের বাড়িতে তোমাদের কোতোয়াল এখনো বন্দী। তুমি যদি সবার আগে তাকে উদ্ধার করতে পারো তাহলে সে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। তোমার ঘোড়া আমি নিয়ে যাচ্ছি। বিনিময়ে ইদ্রিসের আস্তাবল থেকে তুমি একটি ঘোড়া নিয়ে নিও। আর শাহজাদা রশীদের সাক্ষাত পেলে তাকে বলো, তার সাথে আমার কিছু হিসাব নিকাশ আছে। আমি অচিরেই আবার আসবো, সে যেন সেই হিসাবের দিনের অপেক্ষায় থাকে।'

ওকে বিদায় দিয়ে টাঙ্গা আবার সেখান থেকে রওনা হল। কিছু দূর যাওয়ার পর সাদ বলল, 'ঘোড়া খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর বেলা উঠে গেলে আমাদের পক্ষে সরকারী টাঙ্গায় সফর করা কিছুতেই ঠিক হবে না। সামনের শহরগুলোতে ঢুকার আগেই আমাদের ঘোড়া বদলাতে হবে।'

হাসান বলল, 'এমনও তো হতে পারে, শাহজাদা রশীদ দূতের ফিরতে দেরী দেখে নিজেই সেভিলে চলে গেছে এবং সবকিছু জানার পর আমাদের পেছনে ধাওয়া করার জন্য লোক পাঠিয়েছে, তাহলে আমরা বিপদে পড়তে পারি। আমার মনে হয়, এখানেই টাঙ্গা ফেলে এখন থেকে ঘোড়া নিয়েই আমাদের সফর করা উচিত। আর এ সড়ক পথ ছেড়ে অন্য পথে চলা দরকার।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

কোচম্যান বলল, 'এখান থেকে সামান্য দূরে একটা গিরিপথ আছে। পাহাড়ের ওই পাশে আমাদের গ্রাম। সেখানে পৌঁছতে পারলে আমাদের আর কোন ভয়ের আশংকা নেই।'

সাদ বলল, 'আমি যদি জানতাম, এসব পথ তোমার পরিচিত তাহলে এত চিন্তা করতাম না।'

খানিক পর। ঘোড়া ছেড়ে ওরা টাঙ্গাটি রাস্তার পাশের এক গর্তে ফেলে দিল। বুড়ো চাকর মায়মুনার বাক্স ও মালপত্র এক ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিল। হাসান ও এক চাকর তাদের ঘোড়া মায়মুনা ও পরিচারিকাকে দিয়ে নিজেরা টাঙ্গার ঘোড়া দুটোর শূন্য পিঠে চড়ে বসল।

সড়ক ছেড়ে গিরিপথে কিছু দূর এগিয়ে তারা কৃষকদের এক ছোট পল্লীতে পৌছল। কোচম্যানের গ্রাম তখনো কয়েক মাইল দূরে। গ্রামে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তারা পুনরায় রওনা হল এবং ভোরেই কোচম্যানের গ্রামে পৌছে গেল। ওই গ্রামে তারা দিনটা কাটিয়ে রাত নামলে পুনরায় যাত্রা শুরু করল।

৭

সেই রাত এবং পরের সারাদিন পথ চলে তারা লুশা পৌছল। লুশার কয়েকজন যুবক সাদের সাথে গ্রানাডার সামরিক কলেজে পড়েছিল। এদের মধ্যে লুশার কাজীর ছেলেও ছিল। সাদ কোন সরাইখানায় না উঠে সোজা কাজী সাহেবের বাড়িতে গিয়ে উঠল। বাল্যবন্ধু তাঁকে পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা করে সে মায়মুনা ও পরিচারিকাকে অন্দর মহলে পাঠিয়ে দিল। সাদ, হাসান ও সংগীরা রইল মেহমানখানায়।

কাজী সাহেব সাদের কাহিনী মনোযোগের সাথে শুনলেন। কাহিনী শেষ করে সাদ বলল, 'যাক, এক উসিলায় শেষ পর্যন্ত আপনাদের বাড়ি দেখার সৌভাগ্য হলো। এখন ভালোয় ভালোয় কাল ভোরে রওনা হতে পারলে রক্ষা।'

কাজী সাহেব সাদের কথায় দুঃখিত স্বরে বললেন, 'বাবা! দীর্ঘ ও কষ্টকর সফর করেছো তোমরা। সাথে আবার মেয়েও আছে। দু তিন দিন এখানে থেকে যাও। এখানে কোন বিপদ নেই তোমাদের।'

সাদের বন্ধু বলল, 'বলছো কি সাদ! কাল তো কিছুতেই এখান থেকে বেরোতে পারবে না!'

বন্ধুর পীড়াপীড়িতে অবশেষে সাদ বলল, 'ঠিক আছে, হাসান ও সংগীরা থাকুক, কিন্তু আমাকে শেষ রাতে কার্ডিজ রওনা হতেই হবে। আমার একটি তাজাদম ঘোড়া প্রয়োজন।'

'ঘোড়ার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু কার্ডিজ যাচ্ছ কেন?'

'মায়মুনার ভাই কার্ডিজ আছে। তাকে সময় মত সতর্ক করতে না পারলে তাকে

গ্রেফতার করে কর্ডোভা পাঠিয়ে দেবে। আর ওকে বন্দী করতে পারলে শাহজাদা রশীদ ওকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠবে।'

কাজী বললেন, 'তাহলে তোমার যাওয়াই উচিত। দরকার হলে কয়েকজন লোকও নিয়ে যাও।'

'না, এ কাজের জন্য বেশী লোক দরকার নেই।'

কাজী বললেন, 'সাদ, চলতি মাসের পনর তারিখে কাজী আবুল ওয়ালিদের দাওয়াতে ভিগায় জাতির নেতৃস্থানীয় আলেমদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আমিও সেখানে আমন্ত্রিত। গ্রানাডা থেকে সম্ভবত কাজী আবু জাফর আসবেন। সম্মেলনে স্পেনের বিভিন্ন শহরের মশহুর আলেমদের নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল গঠন করা হবে। এ প্রতিনিধি দল স্পেনের খণ্ডরাজ্য শাসকদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে ইসলামের দুশমনের বিরুদ্ধে একটি যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করবে।'

সাদ বলল, 'আমার বিশ্বাস, বর্তমানে খণ্ড রাজ্যের শাসকরাই ইসলামের বড় দুশমন। তারা দুনিয়ার সকল প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা স্বীকার করতে প্রস্তুত কিন্তু ইসলামের নামে কখনো এক হতে রাজি হবে না।'

'আমিও তোমার সাথে একমত। এ জন্যই আমি চাই তোমার মত নওজোয়ানরা এ সম্মেলনে যোগ দিক।'

সাদ বলল, 'আমি চেষ্টা করবো সম্মেলনের আগেই ভিগায় পৌছে যেতে।'

৮.

এশার নামাজের পর মায়মুনা কাজী পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের সাথে বসে রাতের খানা খেল। খাওয়া দাওয়ার পরও অনেক রাত পর্যন্ত তারা গল্প করে কাটাল। ভোরে ঘুম ভাঙল পরিচারিকার ডাকে।

'মায়মুনা, উঠ, নামাজের সময় পার হয়ে যাচ্ছে।'

ঘুম ভাঙতেই মায়মুনা হুড়মুড় করে উঠে বসল। নামাজ পড়ে ব্যস্ত কণ্ঠে পরিচারিকাকে বলল, 'আমাকে আরো আগেই ডাকলে না কেন? উফ, বড্ড দেরী হয়ে গেল। খুব ভোরেই আমাদের রওনা হওয়া উচিত ছিল। তুমি গিয়ে তাঁকে বলে এসো যে, আমরা তৈরী।'

রাতেই কাজী সাহেবের মেয়ের সাথে মায়মুনার বেশ ভাব জমে উঠেছিল। দরজা ঠেলে কামরায় ঢুকতে ঢুকতে সে বলল, 'তৈরী হয়ে আর কাজ নেই। আব্বাজান রাতেই বলেছেন, আজ আপনাদের যাওয়া হচ্ছে না।'

মায়মুনা পরিচারিকাকে বলল, 'ও নিশ্চয় ঠাট্টা করছে, তুমি গিয়ে খোঁজ নিয়ে

এসো।'

'তিনি তো ভোর রাতেই কার্ডিজ চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ, হাসানের কাছ থেকে জেনেই বলছি।'

মায়মুনার চেহারা আচানক হতাশায় ভরে গেল। সাদ তাকে পথেই জানিয়েছিল, লুশা থেকেই সে কার্ডিজ রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু যাওয়ার আগে মায়মুনার কাছ থেকে সে বিদায়ও নেবে না, এটা সে ভাবতে পারেনি। তার ধারণা ছিল, এক সাথে এখান থেকে রওনা হবে ওরা। তারপর শহরের কোন চৌরাস্তায় পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবে।

সাদের কার্ডিজ যাত্রা ছিল এক বিপদসঙ্কুল অভিযান। বিদায়ের সময় সাদকে কি বলে বিদায় জানাবে ভাবতে গিয়ে মায়মুনা অনুভব করছিল, তাকে বিদায় দেয়ার কোন ভাষা তার জানা নেই। অথচ সাদ চলে যাওয়ার পর শত শত বাক্য তার মনের মণিকোঠায় তোলপাড় করতে লাগল, 'হায়! আপনি কবে ফিরে আসবেন? এই বিপদসঙ্কুল সফরে যদি আমি আপনার সাথে যেতে পারতাম! আপনার পাশে পাশে থাকতে পারতাম! যদি আবার আহত হন কে আপনাকে দেখবে?'

মায়মুনার দু চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠল।

নতুন অভিযান

সাদের আম্মা জোহরের নামাজের পর মুনাজাত করছিলেন, এমন সময় আঙ্গিনায় কারো পায়ের আওয়াজ পেলেন। তিনি মোনাজাত শেষ করে দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন হাসান দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের মলিন চেহারা ভরে উঠল উজ্জ্বল হাসিতে। হাসান এগিয়ে এসে সালাম করল। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'সাদ কোথায়?'

'আম্মাজান, তিনি আমাদের লুশা পৌঁছে দিয়ে কার্ডিজ গেছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই এসে যাবেন। ইদ্রিসের বোন আমার সাথে এসেছেন। তিনি আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আছেন।'

'কে, মায়মুনা?' বলতে বলতে ত্রস্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

উঠানে মায়মুনা ও পরিচারিকা দাঁড়িয়েছিল। তিনি মায়মুনাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন তাকে।

হাসান আস্তাবলে ঘোড়া বেঁধে চাকরদেরকে মেহমানখানায় নিয়ে গেল। ততক্ষণে আহমদ ও আলমাস পাশের মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে ফিরে এল।

আলমাস হাসানকে দেখেই খুশি ভরা হাসি দিয়ে বলে উঠল, 'হাসান! খোদার কসম! আজ তোমরা না এলে অবশ্যই আমি সেভিলের পথ ধরতাম। আজই আহমদকে বলছিলাম, সূর্যাস্তের মধ্যে তোমাদের খবর না পেলে আমি তোমাদের খুঁজতে বেরোবো।'

'তাহলে ভাইজানের হুকুম অমান্য করা হতো।'

'আল্লাহর শোকর তার হুকুম অমান্য করতে হয়নি। তিনি কোথায়?'

'ইদ্রিসকে আনতে কার্ডিজ গেছেন।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, চাচা! আমাদের লুশা পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকেই রওনা হয়েছেন।'

'তাহলে আমিও কার্ডিজ যাবো।'

'তোমার যাওয়ার দরকার নেই। ইদ্রিসকে পেলেই তিনি গ্রানাডার পথ ধরবেন।'

'সত্যি করে বলো, ওর কোন বিপদ হবে না তো?'

'না, চাচা! আল্লাহ চাহেতো সহিসালামতেই ফিরে আসবেন তিনি।'

হাসান সেভিল থেকে আহমদের রওনা হয়ে আসার পর থেকে যা কিছু ঘটেছে সব সংক্ষেপে খুলে বলল। বাড়ির ভেতরে সাদের আম্মার কাছে একই কাহিনী তখন বলে চলছিল মায়মুনা।

সাদের মায়ের সাথে প্রথম আলাপেই মায়মুনা অনুভব করল, এ ঘরে সে মোটেই নতুন বা অপরিচিতা নয়। সন্ধ্যায় সাদের খালা আসলেন, তিনিও মায়মুনাকে মেয়ের মমতায় জড়িয়ে নিলেন। পরের দিন তিনি আবার এলেন এবং সারাদিন মায়মুনার কাছেই কাটিয়ে দিলেন। এভাবে দিনে অন্তত একবার মায়মুনাকে দেখা তার অভ্যাসে পরিণত হলো।

একদিন তিনি মায়মুনার জন্য চার সেট নতুন কাপড় নিয়ে এলেন। মায়মুনা অবাক হয়ে বলল, 'খালাজান! একি করেছেন! এত কাপড় আনতে গেলেন কেন? আমার তো এমনিতেই অনেক পোশাক। আম্মাজান গতকালও দু জোড়া নতুন পোশাক কিনে দিয়েছেন।'

'মামনি! এগুলো হাসানের খালুজান দিয়েছেন। তিনি তোমাকে নিজের মেয়ে ডেকেছেন। ওনার খায়েশ, তুমি আমাদের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকো।'

'কিন্তু এটাও তো আপনাদেরই ঘর খালাম্মা!'

মায়মুনা খালার দেয়া লাল রঙের একসেট রেশমী কাপড় হাতে নিয়ে অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল। হাসানের খালা বললেন, 'মা! এ রঙটা আমিই পছন্দ করেছি।'

খালার এ ভালবাসা ও স্নেহ দেখে মায়মুনার হৃদয়ে ঝড় উঠল, আবেগে চোখে পানি এসে গেল। বলল, 'আমার আম্মাও এ রঙ পছন্দ করতেন। তিনি সবসময় আমাকে এ রঙের কাপড় কিনে দিতেন।'

হাসানের খালা বললেন, 'মা! মনে করো আমিই তোমার মা।'

রাতে বিছানায় শুয়ে সাদের আম্মার সাথে কথা বলছিল মায়মুনা। সকিনা বলল, 'মায়মুনা, আপার কোন সন্তান নেই তো তাই তোমাকে নিজের মেয়ে মনে করছেন।'

'আম্মাজান! আপনি অনুমতি দিলে আমি খালাম্মার খেদমতে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতে চাই।'

'তুমি গেলে ওরা দীলে বড়ই শান্তি পাবেন। তুমি ওদের সুখী করতে পারলে আমিও খুবই খুশী হবো।'

পরদিন সকালে মায়মুনা পরিচারিকাকে নিয়ে খালার সাথে ওদের বাড়ি চলে এল। হাসানের খালা খুশীতে পাড়া-প্রতিবেশী মহিলাদের ডেকে আনলেন। বললেন, 'আল্লাহতায়ালা আমার সারা জীবনের দোয়া কবুল করেছেন, আমাকে এক যুবতী কন্যা দান করেছেন।'

এরপর থেকে মায়মুনা রাতে হাসানের খালার কাছেই থাকতো, দিনের বেলা কখনো কখনো হাসানদের বাড়ি আসতো। ইদ্রিসের চাকর দুজন তিন দিন সাদের বাড়িতে থাকার পর চলে যাওয়ার অনুমতি চাইল। আহমদ ওদের প্রত্যেককে একটি করে ঘোড়া দিল, মায়মুনা নিজের পুঁজি থেকে পঞ্চাশ দীনার করে বকশিশ দিয়ে ওদের বিদায় দিল। মায়মুনার সুপারিশে হাসানের খালু বুড়ো চাকরকে নিজের বাড়িতে রেখে দিলেন।

২

মায়মুনাকে পেয়ে শেখ আব্দুল্লাহ ও তার বিবির হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। মেয়ের জন্য কি করবেন না করবেন তাই নিয়ে মেতে উঠলেন ওরা। সাদের আম্মাও অপত্য স্নেহে আপন করে নিলেন মায়মুনাকে। হাসান এবং আহমদও তাকে খুশী করার জন্য সবসময় ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতো। কিন্তু তবুও মায়মুনার হৃদয়ের পেরেশানী দূর হয় না। ইদ্রিস ও সাদের চিন্তায় সারাক্ষণ ও পেরেশান থাকে।

তার মনে জেগে উঠে নানারকম ভয় ও শংকা। যদিও সে জানতো, কার্ডিজ অনেক দূর এবং সেখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসা সম্ভব নয়, তবুও যতই সময় যেতে লাগল তার মনের চাঞ্চল্য ততই বেড়ে চলল। সবাই চাইতো তাকে হাসি আর আনন্দে রাখতে কিন্তু একটু একাকী হতে পারলেই বিষাদের কাল ছায়া নেমে আসতো তার মুখের ওপর।

একদিন বিকালে খোলা বারান্দায় বসে সে তাকিয়েছিল দূর নীলিমার দিকে। দেখছিল মেঘের খেলা। হঠাৎ হাসান ছুটে এসে বলল, 'আপা! ইদ্রিস ভাইয়া এসেছে।'

'কোথায়?' নিজের আবেগ কোনমতে সামাল দিয়ে জিজ্ঞেস করল মায়মুনা।

হাসানের পিছু পিছু একটু পরেই ইদ্রিস অন্দরে প্রবেশ করল। মায়মুনা ছুটে গিয়ে ভাইকে জড়িয়ে ধরল। ইদ্রিস তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'মায়মুনা! তুমি কাঁদছ, পাগলী কোথাকার!'

মায়মুনা একপা পিছিয়ে ভাইয়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, 'ভাইজান! আপনি কি আনন্দের অশ্রুও চেনেন না?'

হাসানের খালা কামরা থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হাসান, সাদ কোথায়?'

'খালাম্মা, উনি আসেন নি।'

মায়মুনার আনন্দাশ্রুর জায়গায় দেখা দিল বিস্ময় ও বিষাদের ছায়া। গোলাপী চেহারা ছেয়ে গেল বিমর্ষ বেদনায়। খালা সামনে এগিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'কি বললে! সাদ আসেনি?'

এবার জবাব দিল ইদ্রিস। 'জ্বিনা, উনি ভিগায় রয়ে গেছেন। সেখানে একটি সম্মেলন হচ্ছে। দিন তিনেকের মধ্যে এসে যাবেন।'

মায়মুনার চেহারায় সুখ ও আনন্দের দ্যুতি ফুটে উঠল। খালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইনি আমার ভাই।'

'তোমার ভাইকে দেখে চিনতে পারবো না ভাবলে কি করে। এসো বাবা! ভেতরে এসে বসো।'

ইদ্রিস বলল, 'নামাজের সময় হয়ে আসছে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, নামাজ পড়েই চলে আসবো।'

'বেশ, সাদ ভাল আছে তো?'

'জ্বি, উনি ভাল আছেন।'

মায়মুনা জিজ্ঞেস করল, 'তিনি কি আপনাকে কার্ডিজেই পেয়েছিলেন?'

'না, ফিরে আসার পথে তিনি আমার সাথে দেখা করেন।'

মায়মুনা বলল, 'ভাইজান, আমাকে আপনার সফরের পুরো কাহিনী শুনিয়ে যান।'

ইদ্রিস বলল, 'আমি কার্ডিজ থেকে ফিরে আসছিলাম। সেভিলের সীমান্তে পৌঁছলে ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমাকে সেভিলের পরিবর্তে কর্ডোভা যাওয়ার নির্দেশ শোনাল। আমি বললাম, আগে আমি নিজের বাড়ি যাবো, তারপর অন্য কথা। আদেশ লংঘনের অপরাধে আমাকে গ্রেফতার করা হল। চারজন সিপাইয়ের পাহারায় আমাকে কর্ডোভা পাঠিয়ে দেয়া হল। মাইল দশেক আসার পর পেছন দিক থেকে এক দ্রুতগামী অশ্বারোহী এসে আমাদের সাথে মিলিত হল। কর্ডোভার রাস্তা জিজ্ঞেস করার বাহানায় সে ঘোড়া আমাদের কাছে নিয়ে এল এবং তার মুখের মুখোশ সামান্য একটু সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। তারপর সে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। এ অশ্বারোহী ছিল সাদ।'

'তারপর কি হল?' খালা অস্থির হয়ে প্রশ্ন করল।

'তারপর আমরা আরো কিছু দূর এগিয়ে গেলাম। এক সময় আমরা কতগুলো গাছের নীচ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটি গাছের আড়াল থেকে তীর আসতে শুরু করল। দুজন সিপাই আহত হল, আর দুজন পালিয়ে গেল। এভাবেই সে আমাকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করল।'

খালা বললেন, 'বাবা! এত তাড়াতাড়ি বললে চলবে না। তুমি নামাজ পড়ে এসো। আমি তোমার মুখে বিস্তারিত সব কথা শুনতে চাই।'

৩.

ভিগায় কাজী আবুল ওয়ালিদের বাড়ির সামনে একটি খোলা ময়দান। সারা দেশের নেতৃস্থানীয় আলেমদের সম্মেলন চলছে এখানে। সম্মেলনে প্রায় দুশো প্রভাবশালী ও বিখ্যাত আলেম কাজী আবুল ওয়ালিদের আমন্ত্রণে স্পেনের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে সমবেত হয়েছেন। স্পেনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যই এখানে ডেকে আনা হয়েছে এ সব আলেমদের।

গ্রানাডার মশহুর আলেম কাজী আবু জাফরের সভাপতিত্বে কাজী আবু ওয়ালিদের একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। তিনি ওলামাদের একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে স্পেনের সকল শাসকদের কাছে খৃস্টানদের আক্রমণের মুখে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হবার আবেদন নিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করার প্রস্তাব পেশ করেন। প্রথম দিনে যারা বক্তৃতা করেছেন, তাদের বেশীর ভাগই এ প্রস্তাবের পক্ষে রায় দিলেন। কেউ কেউ এ অভিযানের সফলতা সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করলেও এর বিরোধিতা করেননি। খণ্ড রাজ্যের শাসকদের কাছ থেকে কতটুকু সাড়া পাওয়া যাবে এ নিয়ে সন্দেহ থাকলেও চেষ্টা করতে দোষ নেই বলে তারা মত প্রকাশ করেন।

প্রথম দিন সাদ একজন সাধারণ শ্রোতা হিসাবে সম্মেলনের সকল বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনল। মাঝ রাতে অধিবেশন মুলতবী হলে সাদ এক সরাইখানায় রাত কাটাল। পর দিন ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে গেলে কাজী আবু জাফরের সাথে দেখা হয়ে গেল তার। তিনি সাদকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখানে কখন এসেছ?'

'গত পরশু।'

'গ্রানাডায় আহমদের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সে আমাকে তোমার তৎপরতার কাহিনী শুনিয়েছে। এখন তোমার জখম কেমন?'

'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'এ সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?'

'আমার খুব অবাক লাগছে, এখনো আমাদের মুরুব্বিরা কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করছেন। আমি এ প্রস্তাব সম্পর্কে আপনার মতামত শোনার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'আমার কাছে তুমি কি আশা করো?'

'স্পেনের এ দুর্দিনে আমি আপনার কাছ থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা চাই। আমি আশা করি, ইবনে আম্মার ও মুতামিদ আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে তার আলোকে আপনি জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।'

কাজী আবু জাফর কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না কেন, এ সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে আমাকে সম্মিলিত সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হবে। কিন্তু তোমার মত একজন যুবক এ সম্মেলনে নিরব বসে থাকবে, এটা আমি পছন্দ করতে পারছি না। ভাল হয়, তোমার মতামত সবার সামনে খোলাখুলি পেশ করলে। এতে অনেকের চিন্তাধারা পাল্টে যেতে পারে।'

'এতসব নামী দামী মশহুর আলেমদের সামনে আমার কথা কেউ শুনবে বলে আপনি মনে করেন?'

'সাদ, জাতি আজ সেই সব তরুণদের নেতৃত্ব চায় যাদের শিরায় শিরায় বইছে জিন্দেগীর গরম রক্ত। তোমাদের যে হিম্মত ও সাহস আছে বুড়োরা সেসব কোথায় পাবে? যাদের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে জাতির দুর্দিনে তারা অনুশোচনার অশ্রু বর্ষণ করতে পারবে, কিন্তু প্রতিকারের জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত তাদের কাছে আশা করতে পারো না। এসব আলেমদের আমি বুজদিল ভাবি না, অসহায় ভাবি। তারা যে খড়কুটু আঁকড়ে ধরে হলেও বাঁচার চেষ্টা করছে এ সত্য তো তুমি অস্বীকার করতে পারো না। যাক, আমি তোমাকে সম্মেলনে মতামত পেশ করার জন্য আহবান জানাবো, তুমি যা চাও তা আমাকে না বলে ওখানেই বলো।'

সাদ কাজী আবু জাফরের সাথে কথা বলতে বলতে সম্মেলন স্থলে পৌঁছল। আলেমরা সবাই আসন গ্রহণ করলে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হল। আলেমরা একের পর এক প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করে গেলেন। আলেমদের বক্তব্য শেষ হলে কাজী আবু জাফর উপস্থিত আলেমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'এখানে গ্রানাডা থেকে এক যুবক এসেছে। সে আপনাদের সামনে কিছু বলতে চায়। আমি তাকে তার মতামত পেশ করার অনুমতি দিচ্ছি। যুবক এক মর্দে মুজাহিদের রক্তের ধারা বয়ে নিয়ে এসেছে আমাদের সামনে। যুবকের নাম সাদ ইবনে আবদুল মুনীম। আমি তাকে তার বক্তব্য পেশ করার আহ্বান জানাচ্ছি।'

সাদ উঠে দাঁড়াল। সসংকোচে মঞ্চে এসে তার বক্তৃতা শুরু করলঃ

'বুজর্গানে মিল্লাত!

যে কাজ কয়েক বছর আগেই শুরু করে দেয়া দরকার ছিল, সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সবেমাত্র আপনারা মিলিত হয়েছেন। আমাদের উদাসীনতা ও নিস্পৃহতার কারণেই স্পেনের গদীতে আজ সেই সব লোক, মুসলিম মিল্লাতের কলঙ্ক ছাড়া যাদের আর কোন পরিচয় নেই। তাদের কাছে ভাল কিছু আশা করলে নিরাশার সমুদ্রে হাবুডুবু

খাওয়া ছাড়া আর কিছুই পাবেন না আপনারা।

খৃষ্টানদের মোকাবিলা করার জন্য আপনারা খণ্ড রাজ্যের শাসকদের এক করতে চাচ্ছেন। ভাবছেন, ক্রুশের পতাকা নামিয়ে তারা উড়াবে ইসলামের বিজয় নিশান। অথচ আপনাদের অজানা থাকার কথা নয়, ইসলামের মর্যাদা ও জাতির স্বাধীনতা বিক্রি করে সেই দামে আলফানসুর বন্ধুত্ব ক্রয় করার জন্য খণ্ড রাজ্যের শাসকরা আজ পরস্পর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মহা ব্যস্ত।

যে শাসকরা প্রজাদের রক্ত শোষণ করা অর্থে আলফানসুর খাজনা আদায় করছে, যারা নিজেদের কোষাগার শূন্য করে আলফানসুকে উপঢৌকন দেয়ার জন্য উদগ্রীব, যারা একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আলফানসুর সাথে মৈত্রী চুক্তি করছে, তাদের কাছেই আপনারা আশা করেন আলফানসুর পতন? যারা এ আশা করছেন তারা চরম দুরাশা ও দুর্বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন। কেউ নিকট অতীত থেকে বিমুখ হলে এবং বর্তমান পরিস্থিতি থেকে চোখ বন্ধ করে রাখলেই কেবল এমন চিন্তা করতে পারেন। দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষলে এবং আদরে আদরে তার চেহারা নাদুস নুদুস হলেই সে মানুষের বন্ধু হয়ে যায় না। আমাদের খণ্ডরাজ্যের চোখ ধাঁধানো জৌলুস দেখে আপনারা বিভ্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু আমি জানি ওই প্রাসাদের প্রতিটি ইটে আছে আমারই রক্ত, ঘাম। আর ওই প্রাসাদে যে কালসাপ আমরা পুষছি, জাতির শিরায় শিরায় তারা কেবল বেঈমানীর বিষ-ছোবলই হানতে পারবে, এরচে ভাল কিছু নয়।

শ্রদ্ধেয় বুজর্গাণে দ্বীন!

আপনাদের আন্তরিকতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার গুনাহ থেকে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। কিন্তু তারপরও আমি বলবো, আপনারা কাঠের ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ জয়ের যে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। আপনারা জেনে রাখুন, ওদের হৃদয় থেকে মিল্লাতের চেতনা বহু আগেই মারা গেছে। ইসলামী চেতনার রাজ্যে ওদের সেই পঁচা লাশ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। এ দুর্গন্ধময় পঁচা লাশগুলোকে ইসলামের গাজীদের সারিতে দাঁড় করানো কি করে সম্ভব হতে পারে আমার তা বুঝে আসে না।

ওরা আল্লাহর সাথে নাফরমানী করছে, রাসুলের সাথে নাফরমানী করছে। গান, বাজনা, মদ আর নারী কত বেহায়া হতে পারে সে যুদ্ধে তারা হয়তো ভালই সাফল্য দেখাতে পারবে, কিন্তু ইসলামী আদর্শের জন্য লড়াই শুরু হলে তার স্বপক্ষে তারা কেন দাঁড়াবে, যে আদর্শ তাদের সব নাপাক ইচ্ছার বিনাশ চায়? তাদের রঙ মহলের বেলেল্লাপনাকে যে হারাম ঘোষণা করে?

নায়েবে নবীর দাবীদার হে জাতির বিবেকবৃন্দ!

আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে যারা মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তাদের কাছে আপনাদের এ অভিযানের কোন সাফল্যই আমি আশা করতে পারি না। যদি মনে করেন গান, বাজনা,

কাব্যচর্চা, বেহায়াপনা ও শাহী জাঁকজমক দেখিয়ে দুশমনকে ভীত ও পরাস্ত করতে পারবেন, তাহলে এসব শাসকবর্গ আপনাদের উপকারে আসতে পারে।

যদি যুদ্ধের ময়দানে সৈনিকদের খুরধার তরবারির পরিবর্তে কবিদের কবিতামালাই অধিক ফলপ্রদ বিবেচনা করেন, তাহলে শুধু মুতামিদের দরবারের কবিরাই সারা দুনিয়ার কবিদের নিরুত্তর করে দিতে পারে। কিন্তু আপনারা জানেন, এ সব বিষয়ের কোনটিই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়। তাই এ সব লোকের পেছনে ঘুরে আপনারা সময় অপচয় করা ছাড়া আর কিছুই পাবেন না। কেউ আছাড় খেলে মানুষ যেমন তার দুঃখে দুঃখিত না হয়ে আনন্দের খোরাক পায়, এসব শাসকরা তেমনি জনসাধারণের কান্না ও জিল্লতির মজা উপভোগ করতে পারবে, কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে জাতির পাশে এসে কখনোই তারা দাঁড়াতে পারবে না।'

এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'তাহলে আপনি কি বলতে চান, খণ্ডরাজ্যের শাসকদের ব্যাপারে বিমুখ হয়ে আমরা ভাববো, স্পেনে মুসলমানদের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে এবং হিজরত করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই?'

সাদের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠল। সে রাগত স্বরে বলল, 'না, আমার কথায় এমন ভুল ধারনা করার কোন অবকাশ নেই। আমি আপনাদের ভীরুতা ও কাপুরুষতার দিকে দাওয়াত দিচ্ছি না। স্পেনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমি আমার দেহের প্রতি ফোটা রক্ত ঢেলে দিতে প্রস্তুত। আমি শুধু আপনাদেরকে ভ্রান্ত আশার ছলনা থেকে উদ্ধার করতে চাচ্ছি। যুদ্ধের নেতৃত্ব খণ্ডরাজ্য শাসকদের হাতে তুলে দেওয়ার যে চিন্তা আপনারা করছেন, আমি কেবল তার বিরোধিতা করছি।

যদি আপনারা ইসলামের বিজয় চান, যদি ইসলামের জন্য আপনাদের জীবন-মরণ সঁপে দিতে চান, তাহলে সে পথ অবশ্যই খোলা আছে। তবে সে পথ আরামপ্রিয় শাসকদের পায়ে তেল মারার পথ নয়, সে পথ জনগণের সম্মিলিত ইসলামী আন্দোলনের পথ। ইসলামের বিজয় চাইলে কায়েমী স্বার্থবাদীদের সাথে আপোষরফার পরিবর্তে আপনাদের যেতে হবে বুভুক্ষ নিরন্ন মানুষের বস্তিতে, খেটে খাওয়া ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে, সর্বস্তরের সাধারণ জনগণের কাছে। কারণ, ইসলামী শাসন না থাকার কারণে কেউ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তারা হচ্ছে এই সব নিরীহ জনতা। ইসলামের সাম্য ও ইনসাফ কায়েম না থাকায় এদেরই মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে শাসক নামের শোষকরা। ওদের বুঝাতে পারলে দেখবেন, মুক্তির সংগ্রামে ওরাই এসে দাঁড়াবে সামনের কাতারে। বিত্ত-বৈভব নয়, ইসলাম চিরকাল বিজয়ী হয়েছে ঈমানের জোরে। ঈমানের সম্পদই আমাদের প্রধান সম্পদ, আল্লাহর ওপর ভরসাই আমাদের একমাত্র ভরসা। দুনিয়াবী অংক কষে ইসলামকে জয়ী করা যায় না। যা আছে তাই নিয়ে মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহর গায়েবী মদদ এসে সে বিজয় সম্পন্ন করে দেয়।

তাই জনগণকে সচেতন করে তোলাই হবে এখন আমাদের প্রথম কাজ। আজই

এ কাজ শুরু করে দেয়া কর্তব্য। জানি, এ পথে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে। ইসলামী গণজাগরণকে বিপদ মনে করবে শাসক শ্রেণী। এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবে তারাও। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, আমরা যদি নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ ও রাসুলের পথ ধরে অগ্রসর হই, তাহলে এসব বিপদ আপদের মুকাবিলায় আমরা এমন এক অলংঘনীয় প্রাচীর দাঁড় করাতে পারবো, যা ডিঙিয়ে যাবার সাধ্য হবে না কারো।

বুজর্গানে দ্বীন!

দুশমন আমাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক রণসজ্জার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের অস্ত্রগুলোতে তারা শান দিচ্ছে, আর আমরা এখানে বসে মরা ঘোড়ার পিঠে জিন লাগানোর পরামর্শ করছি। আমি আবারো বলছি, আপনাদের নিয়তের ওপর আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাকে স্রেফ আহাম্মকী ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। খণ্ডরাজ্যের শাসকদের কাজকর্ম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আপনারা দেখতে পাবেন, আমাদের উদাসীনতাকে সম্বল করে সুবিধাবাদীদের বিশাল বাহিনী গড়ে তুলছে তারা। আর এই বাহিনী জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে জিল্লতির বোঝা।

হে আমাদের নেতৃবৃন্দ!

আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতিকে এই জিল্লতির হাত থেকে বাঁচান। যে জিল্লতির বোঝা বইতে বইতে তাদের কোমর বাঁকা হয়ে গেছে সে কোমর আবার সোজা করার পথ দেখান। পথহারা জাতি অসহায় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে আপনাদের দিকে। দোহাই খোদার, তাদের চোখের আলো আপনারা নিভিয়ে দেবেন না। কি করে হারানো ইজ্জত ও সম্মান আবার ফিরে পেতে পারে সেই পথ দেখান এই পথহারা জাতিকে।'

৪.

সাদের বক্তৃতার পর আলোচনায় কেমন ছন্দপতন ঘটল। অনেকেই সাদকে সমর্থন করে বক্তৃতা করল। তবে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বেশীর ভাগ আলেম তখনো পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল। আলেমদের একটা বিরাট দল বিরোধিতা করছে দেখে কাজী আবুল ওয়ালিদ বললেন, 'আমাদের ছয় মাসের সুযোগ দিন। এর মধ্যে আমাদের প্রচেষ্টা সফল না হলে অন্য চিন্তা করা যাবে।'

সম্মেলনের সভাপতি কাজী আবু জাফর জওয়াবে বললেন, 'সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম! আমার মতামত আপনাদের অজানা নয়। সাদ ইবনে আবদুল মুনীম আমার অন্তরের কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি করেছে। তবুও আপনাদের অধিকাংশের মতামতকে আমি গুরুত্ব না দিয়ে পারি না বলেই খণ্ডরাজ্যের শাসকদের সংশোধন করার এ শেষ

প্রচেষ্টায় বাঁধা দেবো না। এদের প্রতি আমার অন্তরের ঘৃণা ও ক্ষোভ আমি বহুবার আমার লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছি। তারপরও আমি দোয়া করি, যেন আল্লাহর এসব নাফরমান বান্দারা দ্বীনের পথে ফিরে আসে এবং জাতির শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার পরিবর্তে গাজীদের সারিতে এসে দাঁড়াতে পারে।

ওলামা প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে আমি কাজী আবুল ওয়ালিদকেই উত্তম ব্যক্তি বিবেচনা করি। দলের সদস্য বাছাই করার দায়িত্বও আমি তার ওপরই অর্পণ করতে চাই।

তবে আমার এ মতের অর্থ এ নয় যে, যারা এ অভিযানের সফলতা সম্পর্কে খুব বেশী আশাবাদী নন তারা এ ছয় মাস চুপ করে বসে থাকবেন। জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া কিছুতেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হতে পারে না। সকল অবস্থায় সচেতন জনগণ আমাদের মূল্যবান সম্পদ। এ জন্য জাতিকে জাগিয়ে তোলার কাজও আজ থেকেই শুরু করে দিতে হবে। খণ্ডরাজ্যের শাসকরা এ দাওয়াতের পরও যদি জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা অব্যাহত রাখে তবে তাদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ অনিবার্য। একযোগে বাইরের ও ভিতরের দুশমনদের মুকাবিলা করতে হলে আমাদের বিপুল শক্তির অধিকারী হতে হবে। আর সে শক্তি সংগ্রহের কাজও আমাদের আজ থেকেই শুরু করতে হবে।

আমি স্বীকার করছি, আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু করেছি সবই ছিল প্রদর্শনীমূলক। ফলে, আমাদের তৎপরতায় আমরা যতটা উজ্জীবিত হয়েছি, আমাদের দুশমন সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেয়েছে তার চেয়েও বেশী। এ সভায় অনেক যুবক উপস্থিত রয়েছে। আমি তাদেরকে বলতে চাই, জাতিকে অবসাদের ঘুম থেকে জাগানোর জন্য তোমাদের দিন রাত পরিশ্রম করতে হবে। রাতের আরাম আর দিনের বিশ্রাম হারাম করে গড়ে তুলতে হবে বিপ্লবের মজবুত কাফেলা। যুগের নকীব জীবনের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমাদের ডাকছে, হে যুবক, তোমাদের ধনুক ঠিক করে নাও, তূনে তীর ভরে নাও। তোমাদের লক্ষ্য কি, তা বলে দেবার সুযোগ হয়তো আমাদের আর নাও ঘটতে পারে।'

কাজী আবুল ওয়ালিদ প্রতিনিধি দলের সাতজন সদস্যের নাম ঘোষণা করলেন। তারপর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হল।

সম্মেলন শেষে লোকজন চারদিক থেকে সাদকে ঘিরে ধরল। তারা যখন শুনল, সাদ এক সরাইখানায় উঠেছে তখন অনেকেই তাকে বাড়িতে নেওয়ার জন্য আবদার ধরল। সাদ বলল, 'আমাকে আজই এখান থেকে রওনা হয়ে যেতে হবে।'

কাজী আবু জাফরের চারদিকেও অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। তিনি সকলকে সরিয়ে সাদের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'সাদ, যাওয়ার আগে তুমি আমার সাথে অবশ্যই দেখা করে যাবে। তোমার সাথে জরুরী আলাপ আছে। বাদ জোহর আমার ওখানে চলে এসো।'

সাদ জোহরের নামাজের পর আবুল ওয়ালিদের বাড়িতে হাজির হল। ওখানেই উঠেছিলেন কাজী আবু জাফর। তিনি সাদের সাথে করমর্দন করে নিজের কাছে একটি

চেয়ারে তাকে বসিয়ে বললেন, 'সাদ, আমার ধারনা, কয়েক মাস পর এসব আলেমরা আবার যখন মিলিত হবে, তখন তারা আফসোস করে বলবে, হায়! অনর্থক কিছু সময় নষ্ট করলাম মাত্র। তারা কেবল নিরাশই হবে না, হতোদ্যমও হয়ে পড়বে।

খণ্ডরাজ্যের শাসকরা ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের কাছে ভাল কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং এখন আমাদের একটিই কাজ, জনগণকে জাগিয়ে তোলা। শহরে শহরে সংগঠন কায়েম করো। পাড়ায় পাড়ায় দুর্গ গড়ে তোল। এ পৃথিবীর সম্পদে হক আছে প্রতিটি আদম সন্তানের। কিন্তু শোষক রাজনীতিবিদরা শোষণ করে নিঃস্ব করে ফেলেছে জনগণকে। সেই সব নিপীড়িত জনগণকে আজ জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাদের সব দুঃখ, সব কষ্ট আমাদের হাতের কামাই। আল্লাহর দ্বীন থেকে সরে পড়ার কারণেই আমাদের এ দুর্গতি। এর থেকে বাঁচার উপায় একটাই, ঈমানের আলোয় জীবনকে রাঙিয়ে তোলা। জনগণের সামনে এ সত্য আজ তুলে ধরতে হবে।

কিন্তু তুমি জানো, এ জন্য দরকার দীর্ঘ সময়ের। দরকার প্রচণ্ড পরিশ্রম ও ব্যাপক তৎপরতার। আর এ তৎপরতা শুরু হলেই শিউরে উঠবে শাসকবর্গ, শংকিত হবে কায়েমী স্বার্থবাদীরা। অংকুরেই এ তৎপরতা বিনাশ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে তারা। শুরু হবে জেল, জুলুম, গুম, খুন। নির্যাতনের সয়লাব বয়ে যাবে মুজাহিদদের ওপর দিয়ে। স্পেনে ইসলামের অগ্রযাত্রায় খৃষ্টানরা যতটা ভীত হবে এসব শাসকরা শংকিত হবে তারচে বেশী। কারণ তারা জানে, যে হাত একবার হকের পতাকা তুলে ধরে সে হাত কোন নাপাক কাজই বরদাশত করে না। ফলে, ইসলামের অগ্রযাত্রায় তারা নিজেদের মৃত্যুঘণ্টা শুনতে পাবে। তাই এ অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য খণ্ডরাজ্যের শাসকরা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

তবুও যদি কয়েক বছর ধৈর্য ও একাগ্রতা নিয়ে কাজ করতে পারো তাহলে এ আন্দোলন ব্যর্থ হবার কোন কারণ দেখি না। কিন্তু উত্তর দিক থেকে যে গতিতে খৃষ্টানদের বন্যা এগিয়ে আসছে তাতে মনে হয় না তারা আমাদের বেশী সময় দেবে। এ অবস্থায় আফ্রিকার মুসলমানরা হবে আমাদের শেষ ভরসা ও আশ্রয়স্থল।

সারা দুনিয়ার মুসলিম জাতি যখন নিষ্প্রাণ পাথরের মত বসে আছে তখন আফ্রিকায় নতুন এক শক্তি জেগে উঠেছে। এই শক্তিকে জাগিয়ে তুলছেন রাবাতের আমীর ইউসুফ বিন তাশফিন। তিনি আলজেরিয়া থেকে শুরু করে তানজানিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সকল উপজাতীয় লোকদের একত্রিত করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

তাঁর সততা ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে আফ্রিকার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার পতাকা তলে এসে সমবেত হচ্ছে। এ পর্যন্ত তিনি ইসলামের অগ্রযাত্রায় বাঁধাদানকারী শত শত বিদ্রোহী দলকে শায়েস্তা করেছেন। তার প্রচেষ্টায় হাজার হাজার অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। আমার বিশ্বাস, এ মহামানব অচিরেই মানবতার মহান রক্ষক হিসাবে বিশ্বময় আবির্ভূত হবেন।

গতবছর আমি হজ্জে গিয়ে তার সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি। আফ্রিকার বেশ কিছু ফকীহ ও শায়খ ইউসুফ বিন তাশফিনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। হজ্জ থেকে ফিরে আমি তিনজন আলেমকে তাঁর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলাম। ইউসুফ বিন তাশফিন তখন সাবতা থেকে শত শত মাইল দক্ষিণে কয়েকটি বিদ্রোহী গোত্রকে দমন করতে ব্যস্ত ছিলেন।

ওরা সাবতায় বসে তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষা করছিল। ওখানে তাদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে সে ফিরে আসে। বাকী দুজন অধৈর্য হয়ে একদিন তাঁর ঠিকানায় রওনা হয়ে যায়। কিন্তু মরুভূমির গরমের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে পথ থেকেই আরেকজন ফিরে চলে আসে। তৃতীয় জন অনেক কষ্টে ইউসুফের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং ওখানেই ইসলামী দাওয়াতী কাজে লেগে পড়ার আবেদন জানান। তিনি বহু কষ্টে ইউসুফ বিন তাশফিনের সাথে তিন মাস থাকার পর আর টিকতে পারলেন না। তিনিও সেখান থেকে ফিরে চলে এলেন এবং জানালেন কোন দুর্বলের পক্ষে তার সাথে চলা সম্ভব নয়। আসলে এরা সবাই ছিল আরাম প্রিয়। সাদ, আমার বয়স যদি আরেকটু কম হতো আর দুর্বল শরীর বাঁধা হয়ে না দাঁড়াতো তাহলে সেই উত্তপ্ত মরুভূমি ও গভীর অরণ্যে গিয়ে মুজাহিদদের সাথে বসবাস করতাম।'

সাদ বলল, 'আপনি চাইলে আমি সেখানে যাবো। আপনি আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করবেন তা শেষ না করে আমি ফিরে আসবো না। আপনি শুনলে খুশী হবেন, আমি উপজাতীয়দের ভাষাও জানি।'

আবু জাফর চমকে উঠে বললেন, 'তুমি উপজাতীয়দের ভাষা জানো! আহা! এক বছর আগে এ কথা জানলে আমি সে অভিযানে তোমাকেই পাঠাতাম। আমি এখন বুঝতে পারছি, কুদরত কেন তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তুমি অবিলম্বে মরক্কো যাবার জন্য তৈরী হয়ে যাও। সেখানে প্রথমেই তুমি ইউসুফ বিন তাশফিনের সাথে দেখা করবে। যখন তুমি বুঝতে পারবে, উনি তোমার কথার গুরুত্ব দিচ্ছেন, তখন তাঁকে ইসলামী জাহানের বিরুদ্ধে আলফানসুর জঘন্য অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করবে। যদি ইউসুফ বিন তাশফিনের তরবারি ইসলামের জন্যই কোষমুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে স্পেনের মুসলমানদের এ দুর্দিনে তিনি নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারবেন না।'

'স্পেনের সাধারণ মানুষ উপজাতীয়দের জাহেল ও রক্ত পিপাসু মনে করে। এখনও সম্ভবত তারা স্পেনের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে উপজাতীয়দের হস্তক্ষেপ পছন্দ করবে না। কিন্তু আলফানসুর বাহিনী যদি সেভিল ও কর্ডোভা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন স্পেনের প্রতিটি মুসলমানই সেইসব উপজাতীয়দেরকে নিজেদের ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এমনকি খণ্ডরাজ্যের শাসকরাও সে সময় তাদেরকে সর্বশেষ ভরসাস্থল বিবেচনা করতে পারেন। সাদ, আমি জানি, এ অভিযান খুবই কষ্ট সাধ্য। নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে সুদূর আফ্রিকার জংগল ও মরুভূমিতে গিয়ে দিন কাটাতে আগ্রহী যুবকের সংখ্যা স্পেনে

খুবই কম। কিন্তু মনে রেখো, কবরের নিঝুম পুরীতে ঘুমিয়ে থাকা মুজাহিদদের রক্ত দিয়েই জাতির আজাদী ও ইজ্জতের ইতিহাস লেখা হয়।

আফ্রিকায় সাফল্যের সম্ভাবনা না দেখলে ফিরে এসো। কিন্তু যদি মনে করো, সেখান থেকে কোনদিন তুমি ইউসুফ বিন তাশফিনকে স্পেনের মুসলমানদের সাহায্যে নিয়ে আসতে পারবে তাহলে ততদিন সেখানে অপেক্ষা করবে। আমার বিশ্বাস, তুমি একদিন স্পেনের মুক্তিদাতা হয়ে ফিরে আসবে!

আর যদি ইউসুফ বিন তাশফিন সম্পর্কে আমার আশা ভরসা ব্যর্থ হয়েই যায় তাহলেও মনে রেখো, জীবনের যে আগুন স্পেনে শীতল হয়ে গেছে আফ্রিকায় তা এখনও জ্বলছে। সেখানে তুমি কোন না কোন মর্দে মুজাহিদের সাক্ষাত অবশ্যই পাবে, যারা তোমার সংগী হয়ে স্পেনে আসতে রাজি হয়ে যাবে।'

কাজী আবু জাফরের কথা শুনতে শুনতে সাদের মন উড়ে গেল সুদূর আফ্রিকায়। সে তখন কল্পনায় আফ্রিকার জংগল, মরুভূমি ও পাহাড়ে বিচরণ করছিল, আর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল মর্দে মুজাহিদ ইউসুফ বিন তাশফিনের তলোয়ারের বিজলি চমক।

৫.

শেখ আবু সালেহ ইদ্রিসকে নিজের ব্যবসার অংশীদার করে নিলেন। এ জন্য সারাদিন ইদ্রিসকে বাইরে বাইরে থাকতে হতো। শেখ আবু সালেহের বাড়ি সাদের বাড়ি থেকে প্রায় তিনশো গজ দূরে। মায়মুনা প্রতিদিন এসে সাদের মায়ের সাথে দেখা করে যেতো। কোনদিন তার আসতে দেরী হলে সকিনাই তাকে দেখতে চলে যেতেন।

একদিন ফজরের পর মায়মুনা সাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য পরিচারিকাকে নিয়ে বের হতেই দেখতে পেল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সাদ। সে থমকে দাঁড়িয়েই তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল এবং দরজার কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। সাদ পরিচারিকার কাছে এসে বলল, 'মায়মুনা কেমন আছে? খালাজান?'

শেখ আবু সালেহের স্ত্রী হঠাৎ নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে মায়মুনাকে দেখে বললেন, 'মায়মুনা! তুমি এখনও যাওনি! আচ্ছা, দাঁড়াও, আমিই তোমার সাথে যাচ্ছি।'

লজ্জায় ও সংকোচে জড়সড় হয়ে মায়মুনা কোনরকমে বলল, 'আম্মাজান, তিনি ..... তিনি এসে গেছেন।'

'কে?'

'হাসানের ভাই।'

একথা বলেই সে দ্রুত অন্য কামরায় চলে গেল। সাদ সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। বৃদ্ধা খালার চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সাদ এগিয়ে এসে খালাকে

সালাম করল। তিনি তাকে দোয়া করতে করতে বললেন, 'তুমি কখন এলে বাবা?'

'খালাজান! শেষ রাতে এখানে পৌছেছি।'

সে বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসল। মায়মুনা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তার সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। খালা সাদকে তিরস্কার করে বললেন, 'তুমি কেমন আহাম্মক বলতো! এতদিন কেউ গায়েব থাকে? জিহাদ করা ফরজ, কিন্তু মুতামিদ ও রেমিকাকে ওয়াজ শুনানো কেমন ফরজ বলো তো?'

'খালাজান, ওটাও একটা ফরজ ছিল।'

'কিন্তু সারা দুনিয়ার সব ফরজ আদায় করার দায়িত্ব তোমার কাঁধে চাপল কবে থেকে? সেভিলে কি এ জন্য কোন লোক ছিল না?'

সাদ মৃদু হেসে বলল, 'এ কাজ আমাকে দিয়ে করানোই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল।'

'কিন্তু এতে লাভ কি? তুমি কি মনে কর তোমার বক্তৃতা শুনে মুতামিদ ও রেমিকা ভাল হয়ে যাবে?'

'না, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের নাফরমানদের হেদায়াত করার শক্তি আমার নেই। তবে আমি তাদের বলে আসতে পেরেছি, তাদের বিলাসের দিন আর বেশী দূরে নয়। আমি একটি কাজ শুরু করে দিয়ে এসেছি, এখন দেখবেন, সেভিলের হাজার হাজার মুখ তাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠবে। হাসান আপনাকে বলেনি, আহমদের ছোট একটি কবিতা আজ সেভিলের দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে? এমনকি মুতামিদের শাহী মহলের দেয়ালেও তা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।'

খালা কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বললেন, 'বাপের মতই হয়েছো সব।'

'খালাজান! তাঁর সন্তান হতে পেরে আমি গর্বিত। দেখবেন, অচিরেই সমগ্র স্পেন তাঁকে নিয়ে গর্ব করবে।'

খালার চোখে পানি এসে গেল। তিনি আলোচনার মোড় ঘুরানোর জন্য বললেন, 'আচ্ছা, এখন কি করার ইচ্ছা?'

'খালাজান! আমি সে কথাই আপনাকে বলতে এসেছি। এবার আমি অনেক লম্বা সফরে যাচ্ছি।'

'কোথায়?' খালা অস্থির হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আফ্রিকা।'

'না, না।'

'সত্যি বলছি, খালাজান! আমি কাল ভোরেই রওনা হচ্ছি। এখন উঠি, অনেক কাজ পড়ে আছে। রাতে আবার আসবো।'

একথা বলে সাদ উঠে দাঁড়াল। খালা বললেন, 'তুমি সত্যি সত্যি আফ্রিকা যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মায়ের অনুমতি নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, তিনি খুশী মনেই অনুমতি দিয়েছেন।'

'কিন্তু ওখানে তোমার কাজ কি?'

'আলফানসু তার বিপুল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলে আফ্রিকা থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা তাই যাচাই করতে যাচ্ছি। এবার অনুমতি দিন।'

খালা কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'সাদ! তুমি মায়মুনার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে না?'

সাদ চোখ নামিয়ে বলল, 'বাড়ি এসে আম্মাজানের কাছ থেকে আমি সবার আগে তার খবরই নিয়েছি। আপনি তাকে আমার সালাম দেবেন।'

সাদ বের হয়ে গেল। খালা মায়মুনার কামরায় ঢুকলেন। মায়মুনা কাঠের মূর্তির মত নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল। যে চোখে একটু আগেও ছিল খুশীর ঝিলিক এখন সেখানে টলমল করছে বাঁধ ভাঙা অশ্রু।

খালা বললেন, 'মা! তুমি চিন্তা করো না। তার খালু বুঝিয়ে সুজিয়ে হয়তো তাকে ফিরাতে পারবেন।'

'না, না।' মায়মুনা চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, ওকে ওর দায়িত্ব পালনে কখনো বাধা দেবেন না।'

৬.

গ্রানাডার কোতোয়াল শহরের মেয়রের কাছে গিয়ে যথারীতি সালাম দিয়ে বলল, 'ভিগা থেকে আমাদের গোয়েন্দা জরুরী খবর নিয়ে এসেছে।'

মেয়র তাকে বসতে ইঙ্গিত করে বলল, 'বসুন।' তারপর হাতের ফাইল একদিকে সরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, বলুন সে কি খবর নিয়ে এসেছে?'

কোতোয়াল ভিগা সম্মেলনের পুর্ণ বিবরণ তুলে ধরল মেয়রের কাছে এবং পকেট থেকে কাগজ বের করে মেয়রের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা সাদ ইবনে আবদুল মুনীমের বক্তৃতা। এটা পড়লেই বুঝতে পারবেন, গ্রানাডায় যুবকরা কি সাংঘাতিক তৎপরতা চালাচ্ছে।'

কাগজটিতে চোখ বুলিয়ে মেয়র জিজ্ঞেস করল, 'এ কি সেই যুবক, যে সেভিলকে সাহায্য করার জন্য মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে গিয়েছিল?'

'জি, শুনেছি সে গ্রানাডা ফিরে এসেছে। আমি তাকে গ্রেফতার করার অনুমতি নিতে এসেছি। আমার বিশ্বাস, আলেমরা ব্যর্থ হলে শাসকদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হবে তার নেতৃত্ব দিবে এসব যুবকরা। জনসাধারণ তাদের ডাকে সহজেই সাড়া দেবে।

সাদ তার বক্তৃতায় স্পেনের সব খণ্ডরাজ্যের শাসকদেরই সমালোচনা করেছে। কিন্তু

গ্রানাডাকে যদি সে কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে তবে সর্বপ্রথম আমরাই বিপদে পড়বো। অন্যদের জন্য হুমকি হওয়ার আগে সে আমাদের জন্যই মস্ত হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।'

মেয়র বলল, 'এ ধরনের রাজদ্রোহীকে গ্রেফতার করার জন্য অনুমতির অপেক্ষা করবে না। পাকড়াও করে আমাকে জানালেই হবে।'

'সে আমাদের গোয়েন্দার আগেই ফিরে আসে। কাজী আবু জাফরের মত প্রভাবশালী ব্যক্তি ওকে মদদ দিচ্ছে বলেই আপনার সাথে পরামর্শ করা জরুরী মনে করলাম। কারণ, কিছু হলেই তিনি সোজা আমীর আবদুল্লাহর কাছে চলে যাবেন। আর আমীর আবদুল্লাহ তাকে এত বেশী ভয় করেন যে, সাথে সাথে তার মুক্তির আদেশ দিয়ে দিবেন। ফলে আমার ভাগ্যে অপমান ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।'

মেয়র বলল, 'তুমি দেখছি অনেক কিছুই জানো না। যেদিন থেকে কাজী আবু জাফর মুজাহিদ বাহিনী গঠনের কাজে লেগেছে সেদিন থেকেই আমীর আবদুল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক খারাপ। এখন তিনি তাঁকে ঘোরতর শত্রু মনে করেন। আমীর আবদুল্লাহর মা কাজী আবু জাফরের পক্ষে না থাকলে কবেই তিনি কারাগারে চলে যেতেন।'

কোতোয়াল বলল, 'তবুও সুলতানের দরবার থেকে আপনার একবার ঘুরে আসা ভাল। সাদকে গ্রেফতার করলে শহরে গোলযোগ হতে পারে। তখন কঠিন পদক্ষেপ নিলে তিনি ক্ষেপে যেতে পারেন। আপনি তো জানেনই, অল্পতেই তিনি দিশেহারা হয়ে যান এবং তখন কয়েদীদের খালাস করে কোতোয়ালকে জেলে পাঠাতেও চিন্তা করেন না উনি।'

'তুমি ঠিকই বলেছো। আমি এখুনি সুলতানের কাছে যাচ্ছি। আশা করি শীগগীরই সুলতানের লিখিত অনুমতি পেয়ে যাবো।'

৭

এশার নামাজের পর।

আহমদ, হাসান ও ইদ্রিসকে সাথে নিয়ে সাদ ইলিয়াসদের বাড়ি এল। সেখানে পনের জন যুবক তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওরা পৌঁছেই সবার সাথে কোলাকুলি করল। তারপর সাদ তাদের শোনাল ভিগায় অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনের বিবরণ। কাজী আবু জাফরের সাথে আলাপের সূত্র ধরে বলল, 'আগামীকাল ভোরেই আমি আফ্রিকা রওনা হয়ে যাবো।'

যুবকরা তার এই সফর সম্পর্কে জানতে চাইলে সাদ বলল, 'রাবাতের আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে অনেক আশা নিয়ে যাচ্ছি আমি। হয়তো তিনিই একদিন আমাদের মুক্তিদূত হয়ে আসবেন। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তোমরা হাত গুটিয়ে বসে

থাকবে। জাতিকে গাফলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য তোমাদের আরও তৎপর হতে হবে।'

কয়েকজন উৎসাহী যুবক সফরে সাদের সংগী হতে চাইল। সাদ বলল, 'আফ্রিকার সঠিক অবস্থা না জেনে কাউকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।'

অনেক রাতে বৈঠক ভাঙল। সাদ তার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল, এমন সময় ইলিয়াসের চাকর খবর দিল, 'আলমাস নামে এক লোক সাদ বিন আবদুল মুনীমের সাথে দেখা করতে চায়।'

সাদ বলল, 'তাকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

আলমাস ঘরে প্রবেশ করল। তার চেহারায় অজানা ভীতি ও চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে সাদ জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার চাচা, তোমাকে এত পেরেশান দেখাচ্ছে কেন?'

'পুলিশ আপনাকে খুঁজছে। তারা আপনার এবং আপনার বন্ধুর বাড়িতে খানাতল্লাশী করেছে। কয়েকজন সিপাই এখন সেখানে পাহারা দিচ্ছে। আমাদের কাউকে বাড়ি থেকে বের হতে দিচ্ছে না। আমি অতি কষ্টে বাড়ির পেছনের প্রাচীর টপকে পালিয়ে এসেছি। আপনার বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজ করতে করতে অবশেষে এখানে এসে পৌঁছেছি।'

কামরায় কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা নেমে এল। অবশেষে সাদ বলল, 'মনে হচ্ছে ভিগায় আমি যে ভাষণ দিয়েছি এটা তারই পুরস্কার।'

আলমাস বলল, 'প্রথমে এক দারোগা এসে আমাকে বলল, সাদ ইবনে আবদুল মুনীমকে শহরের মেয়র ডেকেছেন। আমি বললাম, উনি তো বাড়ি নেই। তখন দারোগা চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর আট দশ জন সিপাই নিয়ে আবার ফিরে এল।'

সাদ জিজ্ঞেস করল, 'কারো সাথে দুর্ব্যবহার করেনি তো?'

'না, তবে আমার ওপর দিয়ে ধমক-ধামক ও হুমকির ঝড় বয়ে গেছে।'

সাদ সংগীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন তারা আমার তালাশে সারা শহর চষে ফেলবে। সুতরাং এই মুহূর্তে সবাই এখান থেকে সরে পড়ো।'

'আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

'এখান থেকেই আমি সরাসরি মরক্কোর পথ ধরবো। এখন আর বাড়ি যাওয়ার অবকাশ নেই।'

'ঠিক আছে, আপনি আমার ঘোড়া নিয়ে যান।' বলল ইলিয়াস।

'তোমার তলোয়ার এবং বর্মও দিতে হবে।'

'আপনি নদীর পুলের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি আপনার সফরের সবকিছু নিয়ে ওখানে আসছি।'

সাদ অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা এখন বাড়ি চলে যাও। যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে চেষ্টা করবে। আমাকে না পেলে তারা তোমাদেরকেই গ্রেফতার করে বসতে পারে। ইদ্রিসকে এখানে না নিয়ে এলেই ভাল করতাম।'

ইদ্রিস বলল, 'আহমদ ও হাসান যে শাস্তি ভোগ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ আমিও তা হাসি মুখেই বরণ করে নিতে পারবো।'

ইলিয়াস বলল, 'আপনি অযথা চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় না পুলিশ তাদের গায়ে হাত দেবে। আর যদি দেয়ও তবুও তারা যখন জানতে পারবে, আপনি গ্রামে নেই তখন ছেড়ে দেবে। আর যদি না ছাড়ে তবে তাদেরকে উদ্ধার করার শক্তি আমাদের আছে। এখন পয়লা কাজ, আপনার আফ্রিকা পৌছার ব্যবস্থা করা। আর কথা নয়, আপনি পুলের কাছে চলে যান। আমি সবকিছু নিয়ে আসছি।'

সাদ দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে আলমগীরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাচা, তোমাকে আসল কথাই বলা হয়নি। আমি তোমার জন্মভূমিতে যাচ্ছি। অবস্থা ভাল দেখলে তোমাকেও সেখানে ডেকে নেবো ভাবছি। এখন বাড়ি যাও। যে পথে পালিয়েছিলে সে পথেই বাড়িতে ঢুকবে। তাহলে পুলিশ কোন সন্দেহ করবে না।'

খানিক পর। সাদ পুলের কাছে রাস্তা থেকে একটু দূরে নিরিবিলি এক জায়গায় অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। তার সংগীরা দুজন দুজন করে অতি ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন পথে এসে তার পাশে জড়ো হলো। ইদ্রিস, আহমদ, হাসানও পৌছল সেখানে।

শেষ রাতের আবছা আলোয় সবাই তাকিয়েছিল সাদের দিকে। সাদ বলল, 'আমরা যে পথ বেছে নিয়েছি তাতে এ ধরনের বিপদ বারবারই আসবে। তোমাদের হয়তো এর চেয়েও বেশী বিপদ মোকাবেলা করতে হতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি অকাতরে অম্লান বদনে সব বিপদ মুসিবত মাথা পেতে নিতে পারো তাহলে এই ছোট্ট দলটিই একদিন স্পেনের মুক্তি বয়ে নিয়ে আসবে। এসো, সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করার শপথ গ্রহণ করি। আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি তিনি যেন হকের এই কাফেলাকে টিকিয়ে রাখেন এবং তাদের বিজয় দান করেন।'

সাদের সাথে আল্লাহর দরবারে হাত তুলল সবাই। শেষ রাতের শান্ত সমাহিত পরিবেশে উন্মুক্ত আকাশের নীচে গ্রানাডার কয়েকজন যুবক বিগলিত কান্নায় ভেঙে পড়ে কাতর অনুনয় করে আল্লাহর কাছে বলছিল, 'হে আল্লাহ, তুমি আমাদের কবুল করো। আমাদের রক্তের বিনিময়ে তুমি হেফাজত করো এ জাতির ইজ্জত ও আজাদী। তোমার রহমতের ফেরেশতা দিয়ে তুমি আমাদের সাহায্য করো। আমাদের একীন ও হিম্মত বাড়িয়ে দাও।' চোখ থেকে তাদের অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। এ অশ্রু যেন জাতির দেহ থেকে গ্লানি ও অপমানের দাগ ধুয়ে দিচ্ছিল। আর সম্ভবত রহমতের ফেরেশতা আফ্রিকার মরুপ্রান্তরে এ খবর পৌছে দিচ্ছিল, আল্লাহতায়ালা তোমার ঈমান, একীন ও সাহসের পরীক্ষার জন্য এমন এক জায়গা বাছাই করেছেন যেখানে একদিন তারিক বিন জিয়াদ ও মুসা বিন নুসায়েরের মত জগত বিখ্যাত মুজাহিদরা ইসলামের বিজয় পতাকা তুলে ধরেছিলেন।

শেষ হল মোনাজাত। ইলিয়াস ঘোড়া নিয়ে হাজির হল সেখানে। সাদকে তরবারি,

তীর, ধনুক বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন বর্ম, আর কাপড়ের এই থলেতে আড়াইশো দীনার আছে। আগামী সপ্তাহে আমি সাবতায় আপনার কাছে লোক পাঠাবো। তার মুখে পুলিশের তৎপরতার খবর জানতে পারবেন। আপনিও আমাদেরকে ওদিকের খবরাদি জানাবেন। আর অর্থের দরকার পড়লে বিনা দ্বিধায় আমাকে জানাবেন।'

সাদ বলল, 'এ অর্থই আমার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী।'

'বেশ, এবার ঘোড়ায় সওয়ার হোন।'

সাদ ঘোড়ায় চড়লে হাসান এগিয়ে ঘোড়ার বাগ ধরে হাঁটতে শুরু করল। সাদ বলল, 'যাও হাসান। আম্মাজানকে শান্ত্বনা দিও। যদি বিপদ মুসিবতের ঝড় নেমে আসে জীবনে, তাহলে মনে করবে, মুমীনের জীন্দেগীতে এগুলো এসেই থাকে।'

হাসান বলল, 'ভাইজান! আমি বাড়ি যাওয়ার আগে খালার কাছে যাবো। আপনি কি মায়মুনা আপার জন্য কোন পয়গাম দেবেন?'

সাদ অত্যন্ত শান্ত স্বরে বলল, 'মায়মুনাকে বলবে, আমি আজ রাতের অন্ধকারে এ আশা নিয়েই গ্রানাডা ত্যাগ করছি, যখন ফিরে আসব তখন তার জন্য বয়ে নিয়ে আসব এক নব প্রভাতের সুসংবাদ। শুধু মায়মুনাই নয়, সেই শুভ প্রভাত স্পেনের লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবার জন্য বয়ে আনবে আনন্দের পসরা।'

'খোদা হাফেজ' বলে সাদ ঘোড়াকে চলতে ইশারা করল। সাদের বন্ধুরা অস্পষ্ট আলোয় তাকিয়ে রইল তার গমন পথের দিকে।

ইউসুফ বিন তাসফীন

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে স্পেন কমপক্ষে বিশটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। মুষলধারে বৃষ্টির মত স্পেনের মুসলমানদের ওপর নেমে এল বিপদ ও মুসিবতের তুফান। নির্যাতিত জনগণ অধীর হয়ে উঠল একজন উদ্ধারকারীর অপেক্ষায়। সে সময় আফ্রিকার দিগন্ত রেখায় ধূলিঝড় উড়িয়ে ছুটে এল এক ঘোড়সওয়ার। কর্ডোভা, সেভিল ও গ্রানাডার অধিবাসীরা যখন হতাশার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল, ঠিক সে সময় আফ্রিকার মরুচারীদের পর্ণ কুটীরে জ্বলে উঠল আশার বিদ্যুৎকণা।

উমাইয়াদের গৌরবময় শাসনের বাতি যখন নিভু নিভু, তখন ভূমধ্য সাগরের অন্য পারে নতুন এক আলোক শিখা ক্রমেই প্রবল প্রতাপ নিয়ে জ্বলে উঠতে লাগল। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে ইসলামের এক মহান মুবাল্লিগের প্রচেষ্টায় যুদ্ধপিপাসু উপজাতীয়দের একটা গোত্র মুসলমান হয়ে যায় এবং তারা রাবাতে এক ইসলামী

সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে। এ রাষ্ট্রের প্রথম আমীর নির্বাচিত হন আবু বকর বিন ওমর।

আবু বকরের ন্যায়পরায়নতা, দ্বীনদারী ও পরহেজগারীতে আকৃষ্ট হয়ে মরক্কোতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদেরও কয়েকটি গোত্র তাঁর পতাকাতলে শামিল হল। কিন্তু তখনো আলজেরিয়া থেকে শুরু করে তাঞ্জানিয়া পর্যন্ত অসংখ্য উপজাতীয় গোত্র আফ্রিকায় কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে তাদের স্বাধীনতার জন্য হুমকি মনে করতো। এদের মধ্যে যে সব গোত্র মুসলমান ছিল তাদেরও অনেকেই ইসলামী ঐক্যের মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিলীন করে দিতে রাজী ছিল না।

রাবাতের আমীর তাদেরকে একই ইসলামী পতাকার তলে সমবেত হতে আহবান জানালে স্বার্থান্ধ উপজাতীয় সরদাররা তার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যেসব অমুসলমান গোত্র ইসলামী শক্তির উত্থানকে তাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করতো তারাও এ জোটে যোগ দিল। তারা জংগল, পাহাড় ও মরুভূমি থেকে বের হয়ে এসে আফ্রিকা উপকূলের শান্তিপূর্ণ শহর ও জনপদগুলোতে হত্যা ও লুটতরাজ শুরু করল। উপজাতীয়দের গোত্রীয় কলহ এ গৃহবিবাদে আরও ইন্ধন যোগাল।

এ নাজুক পরিস্থিতিতে রাবাতের ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রে আবির্ভাব ঘটল এক দৃঢ়চেতা মহামানবের। এক হাতে পবিত্র কোরআন ও অন্য হাতে মুক্ত তরবারি তুলে নিলেন তিনি। প্রভাত সূর্যের মতই ঝলসে উঠলেন তিনি রাবাতের আকাশে। আমীর আবু বকর বিন ওমরের ভাইপো তেজস্বী এই যুবকের নাম ইউসুফ বিন তাশফিন। তাঁর সংগী হলো এমন একদল গাজী যাদের খুরধার তরবারি ইসলামের দুশমনদের জন্য বয়ে আনতো মৃত্যুর পরোয়ানা। আফ্রিকার দূর দূরান্তের বিভিন্ন এলাকাগুলোতে যেসব ওলামা, ফকীহ ও মুবাল্লিগ মানুষের মনে ইসলামের আলো জ্বালানোর চেষ্টা করছিলেন, ইউসুফ বিন তাশফিনের তলোয়ারের চমকের সাথে তার মহিমান্বিত গুণের চমকে চমকে উঠলেন তারা।

রাবাত বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে ইউসুফ বিন তাশফিন ছোট বড় অনেকগুলো যুদ্ধে যোগদান করেন এবং প্রতিটি ময়দান থেকেই বিজয় ছিনিয়ে আনেন। ফলে অচিরেই রাবাত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হল।

তার সামনে তখন মহান এক স্বপ্ন। আফ্রিকার বিশাল প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য উপজাতীয় গোত্রের মধ্যে বিরাজমান প্রতিহিংসা ও অশান্তির মুলোৎপাটন করতে চাইলেন তিনি। কারণ সারা আফ্রিকার সর্বত্রই ছিল এসব উপজাতীয়দের অপ্রতিহত আধিপত্য। পাহাড়, জংগল, মরুভূমি ছাড়াও ভূমধ্যসাগর এবং সাগর উপকূলেও ছিল তাদেরই প্রভাব। আফ্রিকা ও ইউরোপের সমুদ্র উপকূলগুলো তাদের হিংস্রতা ও লুটতরাজ থেকে নিরাপদ ছিল না। ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলো ও আফ্রিকা উপকূলের বেশ কয়েকটি শহর তারা দখল করে নিয়েছিল। এদের শায়েস্তা করার জন্য এবং আফ্রিকার বিশাল এলাকায় শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য ইউসুফ বিন তাশফিন

একটি সামরিক নৌবহর গঠন করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

৪৬২ হিজরী সালে আবু বকর বিন ওমর ইন্তেকাল করলে মরক্কোর ওলামাদের প্রস্তাবে এবং উপজাতি সরদারদের সম্মতিতে ইউসুফ বিন তাশফিন সালতানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড সম্মোহনী শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে প্রথমেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন তাঁর চাচাতো ভাই সিয়ার বিন আবু বকর। এরপর একে একে সালতানাতের প্রতি অনুগত উপজাতীয় গোত্র প্রধানগণ।

রাবাতের আমীর নির্বাচিত হয়ে ইউসুফ বিন তাশফিন আফ্রিকায় একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের চেষ্টা আরও জোরদার করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই এ দুঃসাহসী অশ্বারোহী আফ্রিকার সেসব দূর দূরান্তে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেন যেখানে আগে আর কখনো ইসলামের বাণী পৌছেনি। এতদিন যেখানে অর্ধ-উলঙ্গ অসভ্য লোকেরা বাস করতো, আজ সে সব অঞ্চল নারায়ে তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

২

সাবতায় পৌছে সাদ শুনতে পেল, আমীর ইউসুফ বিন তাশফিন আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি তাঞ্জানিয়ায় কিছুকাল থাকবেন।

সাবৃতার সরকারী মেহমানখানা ছিল অতিথিদের জন্য উন্মুক্ত। সাদ পনর দিন সেখানে কাটিয়ে দিল। এর মধ্যে গ্রানাডা থেকে কোন খবর না আসায় সে অস্থির হয়ে পড়ল। তার বিশ্বাস ছিল, তারা তাকে গ্রানাডার খবরবার্তা জানাতে বিলম্ব করবে না। কিন্তু পনের দিনেও কোন খবরাদি না পেয়ে সে সীমাহীন পেরেশানীতে পড়ে গেল। প্রতিদিন খুব ভোরে সে বন্দরে চলে যেতো এবং স্পেন থেকে আগত প্রতিটি জাহাজে খুঁজে ফিরতো নিজের লোক। একদিন এক জাহাজ থেকে একজন বুড়ো লোক নামতেই সাদ তাকে চিনে ফেলল। সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ইলিয়াসের নওকরের হাত ধরে একদিকে টেনে নিয়ে গেল।

সাদের প্রশ্নের জবাবে বুড়ো নওকর জানাল, 'আপনি যে রাতে গ্রানাডা থেকে রওনা হয়েছিলেন সে রাতেই ইদ্রিস, আহমদ ও হাসান গ্রেফতার হয়ে যায়। ছয় দিন ধরে ওদের ওপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়। কিন্তু সরকার যখন বুঝতে পারল আপনি গ্রানাডায় নেই, তখন তাদের ছেড়ে দেয়। আমি আহমদ ও ইলিয়াসের পক্ষ থেকে আপনার জন্য চিঠিও নিয়ে এসেছি।'

সাদ তাড়াতাড়ি চিঠি খুলে পড়তে লাগল। ইলিয়াস গ্রেফতারী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লিখেছে 'আহমদ, হাসান ও ইদ্রিস যে পরিমাণ ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে, তা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। আপনার অবস্থান ও দলের সদস্যদের নাম

প্রকাশ করার জন্য তাদের ওপর নির্মম দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। তারা সামান্য দুর্বলতার পরিচয় দিলেই আমরা অনেকে আজ কারাগারের বাসিন্দা হয়ে যেতাম। সবচে বেশী অত্যাচার করেছে হাসানের ওপর। কারণ সে কোতোয়ালের গালাগালির জবাবে তার মুখের ওপর ঘুসি মেরে দিয়েছিল। সাদ, স্পেনের মজলুম মানবতা এক মহান দিনের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। আমরা আপনার অভিযানের সফলতার জন্য দোয়া করছি।'

আহমদের চিঠি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। সে নিজের কথা কিছুই না বলে লিখেছে, 'আম্মা, খালা, বোন মায়মুনা এবং আলমাস চাচাসহ আমরা সবাই ভাল আছি। আমরা আপনার সাফল্যের জন্য সবসময় দোয়া করছি।'

পর দিন সাদ ইলিয়াসের নওকরের হাতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের নামে চিঠি দিয়ে নিজেও তাঞ্জানিয়া রওয়ানা হয়ে গেল।

কয়েক সপ্তাহ সাদ তাঞ্জানিয়ায় এদিক-ওদিক ঘুরাফিরা করে সময় কাটাল। কিন্তু গ্রানাডায় কোন সংবাদ পাঠাতে পারল না। গ্রানাডায় যারা তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল তারা মনে করছিল সে অনেক দূরে চলে গেছে। প্রায় দেড় মাস পরে একদিন সাবৃতার একজন ব্যবসায়ী আহমদ ইবনে আবদুল মুনীমের খোঁজ করে তাদের বাড়ি পৌছল এবং সাদের চিঠি দিল। চিঠিতে সাদ লিখেছিলঃ

'আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

স্নেহের আহমদ! ইলিয়াসের নওকরকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি তাঞ্জানিয়া চলে গিয়েছিলাম। দু সপ্তাহ তাঞ্জানিয়া থাকার পর জানতে পারলাম, সাহারা মরুভূমির অসংখ্য অমুসলিম ও অসভ্য গোত্র আলজেরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ইউসুফ বিন তাশফিন সোজা সে দিকে রোখ করেছেন। তাঞ্জানিয়ায় কয়েক দিন থাকার পর চিন্তা করে দেখলাম, শুধু বসে বসে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না। সাহারা মরুভূমির পথে আমীর ইউসুফ কি করছেন এ খবর সাবৃতা থেকে সংগ্রহ করাই সহজ বেশী। আর আফ্রিকার এ মুজাহিদদের সাথে রাজধানীর পরিবর্তে যুদ্ধের ময়দানে সাক্ষাত করাই আমার বেশী পছন্দ বলে আমি সাবৃতায় ফিরে এসেছি। এখানে এসে জানতে পারলাম, এখানকার সৈন্যরাও জাহাজ যোগে আলজেরিয়া চলে গেছে। এক সপ্তাহ আগে এলেই আমিও তাদের সাথে যেতে পারতাম।

যাক, গতকাল জানতে পারলাম, এখান থেকে একটি সরকারী মালবাহী জাহাজ আলজেরিয়া যাচ্ছে। আমি তাতে চড়তে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কাপ্তান জানাল, জাহাজে এমনিতেই জায়গাই নেই, আর থাকলেও কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে তিনি জাহাজে নিতে পারেন না।

একথা শুনে তাঞ্জানিয়ার এক বুজর্গ আমাকে সাহায্য করেন। তিনি আমাকে শহরের হাকীমের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। বহু কষ্টে আমি তাঁকে বিশ্বাস করাতে পেরেছি যে, আমি একজন মুজাহিদ হিসাবে রাবাত বাহিনীকে সাহায্য করতে চাই। তিনি আমাকে

একটি সুপারিশপত্র দিয়েছেন। ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাহাজের কাপ্তান আমাকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়েছেন।

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল তার সঙ্গে আলজেরিয়া রওনা হবো। কাপ্তান জানিয়েছেন, তিনি সমুদ্র পারের এক দুর্গে রসদপত্রাদি নিয়ে যাচ্ছেন। আমীর ইউসুফের সঙ্গে দেখা করতে হলে সেখান থেকে আমাকে উত্তপ্ত মরুভূমি পাড়ি দিতে হবে। হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আফ্রিকার সেই মহামানবের সাক্ষাত লাভ করবো। আবার এমনও হতে পারে, আমি সেখানে পৌঁছে দেখতে পাবো, তিনি অন্য কোন রণাঙ্গনের দিকে পা বাড়িয়েছেন। তাঁর দ্রুতগামী অশ্বের পথের ধুলা দেখেই হয়তো আমাকে তখন শান্তনা পেতে হবে।

আফ্রিকার মাটিতে পা দিয়েই আমি বুঝতে পেরেছি, এক নতুন দুনিয়ায় এসে পড়েছি আমি। মর্মর পাথরে তৈরী সুরম্য প্রাসাদে বসেও আমাদের শাসকরা চেতনাহীন ও নিষ্ক্রিয়। এখানকার অবস্থা ঠিক তার উল্টো। শাহী মহলের পরিবর্তে এখানে শুধু মাটির ঘর ও পর্ণকুটিরের ছড়াছড়ি। অথচ এসব পর্ণকুটিরে জন্ম নিচ্ছে এমন সব বীর্যবান সন্তানেরা, যারা জাতির জন্য বয়ে আনছে সৌভাগ্যের পসরা। স্পেনের ঐতিহাসিকদের কলম শুকিয়ে গেলেও আফ্রিকার এসব মুজাহিদরা তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে লিখে চলেছে ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।

আমাদের দুর্দিন দেখে এসব মুজাহিদরা কি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসবে না? আমি এক নিরীহ উপজাতীয়কে এ প্রশ্ন করেছিলাম। সে জবাবে বলল, আমীরের হুকুম পেলে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ঘোড়া দৌড়াতেও কুণ্ঠিত হবো না আমরা। এখানে এসে আমি বুঝতে পেরেছি, আমীর ইউসুফ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন। তিনি আলজেরিয়া থেকে সেনেগাল পর্যন্ত বিশাল এলাকার সকল গোত্রগুলোকে ইসলামী সালতানাতের অধীনে আনার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়ের। এ কাজ শেষ না করে হয়তো তিনি অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেবেন না। যাহোক, আমি তার বাহিনীতে নাম লেখাতে যাচ্ছি। আফ্রিকাতে আজ যা চলছে তার ঢেউ স্পেনের মাটিতে যেদিন আছড়ে পড়বে সেদিন স্পেনের আজাদী ও ইজ্জতের ওপর হামলা করার দুঃসাহস কেউ দেখাতে পারবে না। সেই দিনের অপেক্ষা করো আর আমার সাহস ও দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করো।

তোমাদেরই ভাই 'সাদ'

৩.

একদিন সন্ধ্যা। সাদ ইবনে আবদুল মুনীম জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে তাকিয়েছিল। শান্ত সাগর। দূরে আবছা মত দেখা যাচ্ছে পাহাড়শ্রেণী। কাপ্তানের কাছ থেকে ও জানতে পেরেছিল, জাহাজ আলজেরিয়ার কাছাকাছি এসে পড়েছে। ও

ভাবছিল, একটু পর জাহাজ নোঙর করবে। কল্পনায় ও ছুটে যাচ্ছিল মুজাহিদদের কাছে। জাহাজের কাপ্তান মাল্লাদের কাজ তদারক করছিল, হঠাৎ মাল্লাদের একজন চিৎকার করে বলল, 'হুশিয়ার! উপকূলে আলো দেখা যাচ্ছে।'

কাপ্তান ও মাল্লারা চঞ্চল হয়ে দক্ষিণ দিগন্তে একটি অস্বাভাবিক আলো দেখতে পেল। আলো ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে এবং অল্পক্ষণেই তা বিরাট অগ্নিকুন্ডে পরিণত হলো। কাপ্তান বলল, 'এ আগুন জ্বলছে আমাদের দুর্গের কাছে। মনে হচ্ছে, আমাদের কোন জাহাজে আগুন লেগেছে।'

কাপ্তানের অনুমান যথার্থ। খানিক পরেই জ্বলন্ত জাহাজের এক বিধ্বংস দৃশ্য নজরে পড়ল তাদের। একটু পর ধীরে ধীরে আগুন নিভতে শুরু করল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই আরও দুটো জাহাজে দেখা গেল দাউ দাউ আগুন। কয়েকটা নৌকাকে ছুটাছুটি করতে দেখলেন কাপ্তান। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'জাহাজের পাল নামিয়ে এখানেই নোঙর কর। আর সামনে যেতে চাই না।'

কাপ্তান ও মাল্লাদের চাইতে সাদের পেরেশানী বিন্দুমাত্র কম ছিল না। সে এগিয়ে কাপ্তানকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হচ্ছে ওখানে?'

'আমাদের নৌবহর আক্রান্ত হয়েছে। মনে হচ্ছে, তারা শুধু জাহাজের ওপর আক্রমণ চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, উপকূলে আমাদের দুর্গও ঘিরে ফেলেছে।'

'কিন্তু এত জাহাজ কোত্থেকে এলো?'

'আপনি সম্ভবত জানেন না, ইউরোপের বহু জলদস্যু আমাদের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়েছে।'

'আপনি এখন কি করতে চান?'

'আমার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দুশমনের হাত থেকে এ জাহাজটি রক্ষা করা। আল্লাহর অশেষ শোকর, আমরা আরো আগেই ওখানে পৌছে যাইনি। তাহলে এটিও রক্ষা পেতো না।'

সাদ বলল, 'কিন্তু যেগুলো জাহাজে আগুন লেগেছে সবই যে আমাদের তা কি করে বুঝলেন? শত্রুরওতো হতে পারে?'

কাপ্তান বলল, 'আমি জানি, এখানে আমাদের কোন যুদ্ধ জাহাজ নেই। এগুলো সবই রসদবাহী জাহাজ। আমাদের নৌবহরের বেশীরভাগ জাহাজ তিউনিসিয়ার উপকূলে রয়েছে, কয়েকটা আছে সমুদ্রে টহলরত। তবুও আমি নৌকা পাঠিয়ে খোঁজ নিচ্ছি। অবস্থা নাজুক হলে আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে হবে।'

কিছুক্ষণ পর জাহাজ থেকে নৌকা নামিয়ে কাপ্তান মাল্লাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে নৌকা ছাড়তে বলল। সাদ বলল, 'আমিও এদের সাথে যেতে চাই। আপনি এদের বলে দিন, অবস্থা খারাপ দেখলে তারা যেন আমাকে উপকূলের কোথাও নামিয়ে দেয়।'

কাপ্তান জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি করতে চাচ্ছেন?'

'আমি দুর্গ পর্যন্ত যেতে চেষ্টা করব।'

'দেখুন, আপনি ভয়ানক বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শত্রুরা ইতিমধ্যেই কেল্লা ঘেরাও করে ফেলেছে। আপনি উপকূলে নামতে পারলেও শত্রু বেষ্টনী ভেদ করে দুর্গে পৌঁছতে পারবেন না।'

কাপ্তানের সাথে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর সাদ বলল, 'আমি দুর্গে যেতে চাই এবং এ জন্য যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে আমি প্রস্তুত।'

কাপ্তান বলল, 'আপনি যেতে পারেন। তবে উপকূল পর্যন্ত নৌকা নেয়া বিপজ্জনক মনে করলে এদের ফিরে আসতে হবে।'

সাদ বলল, 'আমি সাঁতার কাটতে জানি।'

কাপ্তান মাল্লাদের বললেন, 'দেখো, এখন প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। যদি তোমরা দেখতে পাও, শত্রুরা দুর্গ ঘিরে ফেলেছে, তাহলে সাথে সাথে ফিরে আসবে। আর যদি দুর্গে পৌঁছতে পারো তবে বলে এসো, এ অবস্থায় জাহাজ উপকূলে ভিড়াতে পারব না। এখান থেকে দেড়শো মাইল পেছনে আমাদের একটি নৌ-ঘাটি আছে। সেখান থেকে আমি যুদ্ধ বহর নিয়ে শীঘ্রই ফিরে আসতে চেষ্টা করব। আর যদি দেখতে পাও, শত্রুরা পালিয়ে গেছে এবং জাহাজ উপকূলে ভিড়ানো সম্ভব তাহলে কেল্লার চূড়ায় আলো জ্বেলে দেবে।'

৪.

সমুদ্রের উপকূলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল কেল্লাটি। একটি সংকীর্ণ উপ-সাগর দুর্গের পাদদেশ পর্যন্ত চলে এসেছে। রাবাতের তিনটি জাহাজ জ্বালানোর পর আক্রমণকারীরা এ উপ-সাগরটিও দখল করে নিল। তারপর নৌকা নিয়ে তাড়া করে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়া সৈনিক ও মাল্লাদের। শত্রুদের একদল উপকূলে উঠে পড়ে। তারা উপকূল ঘেঁষে পাহারায় দাঁড়িয়ে যায়। সাঁতার কেটে কেউ কিনারায় পৌঁছতে পারলেও শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীরের আওতা থেকে রেহাই পায় না কেউ।

সাদ ও তার সঙ্গীরা জ্বলন্ত জাহাজ ও পার্শবর্তী উপকূল থেকে বেশ কিছুটা দূরে নৌকা থামিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করল। এক বুড়ো মাল্লা বলল, 'আমাদের কাপ্তান ঠিকই অনুমান করেছেন। শত্রুরা শুধু আমাদের জাহাজের ওপরই আক্রমণ করেনি, কেল্লাও অবরোধ করে রেখেছে। নৌকা আরো পশ্চিমে নিয়ে যাও। ওদের আওতার বাইরে কোন নিরাপদ জায়গায় সাদকে নামিয়ে দিয়ে আমরা ফিরে যাবো।'

কেল্লার প্রায় দুমাইল দূরে মাল্লারা সাদকে নামিয়ে দিল। সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে 'খোদা হাফেজ' বলে উপকূল বরাবর কোমর পানিতে নেমে পড়ল সে।

বুড়ো মাল্লা বলল, 'দেখো বাবা! সুর্যোদয়ের আগে দুর্গে ঢুকতে না পারলে দিনের

আলোয় কোথাও তুমি আশ্রয় খুঁজে পাবে না। সমুদ্র পারে দুশমন খুবই সতর্ক থাকবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুর্গের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে যেতে চেষ্টা করো। সেদিকে দুশমনের সংখ্যা বেশী হলেও রাতের অন্ধকারে তুমি যে তাদের দলের নও বুঝতে পারবে না। কি করে কেল্লায় ঢুকবে তা আমি বলতে পারছি না। যদি তারা ওপাশ থেকেও দুর্গ ঘেরাও করে থাকে, তাহলে রাতে কেউ দুর্গের ফটক খুলতে রাজী হবে না। তাহলে সকাল নাগাদ তোমার পরিণতি কি হবে, তা আমি ভাবতে পারছি না। তাই আমি অনুরোধ করছি, তুমি আমাদের সঙ্গেই ফিরে চলো।'

'আপনি আমাকে নিয়ে পেরেশান হবেন না।' আবারো দৃঢ়তার সাথে তাদের প্রত্যাখ্যান করে সাদ চলতে শুরু করল।

মাঝিরা মনে মনে বলতে লাগল, 'একেই বলে মুজাহিদ। আমরা নৌকায় বসে ভয়ে কাঁপছি, আর ও স্বেচ্ছায় সবকিছু জেনেশুনে আজরাইলের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দিচ্ছে।'

উপকূলে পৌঁছে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সাদ। অনেকক্ষণ অন্ধকারে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বালুর ওপর হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর সে একটি শিলাখণ্ডের সামনে পড়ল।

অন্ধকারের দরুণ শিলাখণ্ডে উঠার মত কোন রাস্তা পেল না। দুর্গের দিকে যাওয়া বিপজ্জনক মনে করে সে শিলাখণ্ডের আড়াল নিয়ে পশ্চিম দিকে চলতে থাকল। বেশ অনেকটা পথ এসে সে শিলাখণ্ডে উঠতে যাবে, এমন সময় ডান পাশে মাত্র কয়েক গজ দূরে কি যেন নড়ে উঠল। ধক করে লাফিয়ে উঠল তার বুক। সে তূণ থেকে তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করল এবং নরম বালুর ওপর শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। দেখল, নরম বালির ওপর একটা নৌকা পড়ে আছে এবং তার আশে পাশে কয়েকটা তরতাজা মৃতদেহ।

সাদ বুঝতে পারল, জ্বলন্ত জাহাজের কয়েক জন মাল্লা এ নৌকা নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল এবং আক্রমণকারীরা তাদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। সে আরও বুঝতে পারল, সমুদ্রের উপকূল ধরে দুশমনরা বহু দূর পর্যন্ত পাহারা দিচ্ছে।

সাদ শিলাখণ্ডে না উঠে আরও পশ্চিমে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলার উদ্যোগ নিচ্ছিল, এমন সময় দেখতে পেল, বালুর ওপর আবারো কিছু নড়াচড়া করছে। ভাল করে লক্ষ্য করে সাদ দেখতে পেল, হামাগুড়ি দিয়ে কেউ তার দিকে এগিয়ে আসছে। সাদ একটি লাশের আড়ালে শুয়ে ধনুকে সংযোজিত তীরটি আগন্তুকের দিকে ঘুরিয়ে দিল। কিন্তু সে দেখতে পেল, লোকটি তার দিকে না এগিয়ে নৌকার দিকে এগুচ্ছে।

নৌকার কাছে গিয়ে লোকটি এদিক ওদিক দেখে নিল। তারপর নৌকাটিকে ঠেলে পানিতে নামানোর চেষ্টা করল। নৌকাটি পানি থেকে কয়েক কদম দূরে বালুতে আটকে ছিল। একার পক্ষে ওটা সমুদ্রে নামানো সম্ভব নয়।

লোকটি কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাপিয়ে উঠল এবং নিরাশ হয়ে বসে পড়ল। কিন্তু

একটু পরেই পানির একটি বড় ঢেউ নৌকার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে আবার উঠে দাঁড়াল এবং নৌকাটি ঠেলতে লাগল। কিন্তু ঢেউটি নৌকা পর্যন্ত আসার আগেই পড়ে গেল। হঠাৎ শিলাখণ্ডের ওপর কিছুর আওয়াজ শুনতে পেয়ে লোকটি নৌকার আড়ালে বালুর ওপর শুয়ে পড়ল।

শিলাখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে একজন উপজাতীয় ভাষায় কথা বলল, 'আমি অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজে দেখেছি। আমার মনে হয় ও কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে। একজন লোকের জন্য আমাদের এত অস্থির না হলেও চলবে। আমরা অনেক মানুষ শিকার করেছি।'

'কিন্তু সে আমাদের তিনজন লোককে হত্যা করেছে। যদি আমি জানতাম, সে নৌকার ভেতর লুকিয়ে আছে, তাহলে সে এমনটি করতে পারতো না। অসতর্ক ছিলাম বলেই সে হঠাৎ চিতা বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে চক্ষের নিমিষে তিনজনকে হত্যা করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

আরেকজন বলল, 'এখন এ নিয়ে হৈ চৈ করে লাভ নেই। কিছুতেই ও পালাতে পারবে না। সমুদ্রের মাছ না হলে দিনের আলোতে সে ধরা পড়বেই। এখানে দুজন পাহারায় থাকো। সে নৌকার দিকে আসতে পারে।'

কিছুক্ষণ নিরবতা বিরাজ করল। তারপর শোনা গেল একজন বলছে, 'নৌকাটা আমাদের জাহাজের কাছে নিয়ে গেলে ভাল হতো না?'

একটু দূর থেকে শোনা গেল আরেকটি স্বর, 'না, আমরা নৌকা টেনে বালুর ওপর তুলে রেখেছি। একা কোন লোক ওটাকে পানিতে নামাতে পারবে না। তোমরা হুঁশিয়ার থেকো, লোকটাকে কোন সাধারণ সেপাই মনে হয় না। বড় কোন অফিসার হতে পারে।'

সাদ যখন বুঝল, শিলাখণ্ডের ওপর দুজন ক্লান্ত প্রহরী ছাড়া আর কেউ নেই তখন এক মুঠো ভিজা বালু সে নৌকার দিকে ছুঁড়ে মারল। নৌকার পাশের লোকটি মাথা সামান্য উঠিয়ে এদিক ওদিক তাকাল। সাদ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'ভয় পেয়ো না, আমি তোমার বন্ধু। তুমি ওখানেই থাকো, আমি আসছি।'

সাদ হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে গেল এবং বলল, 'সাবতা থেকে যে জাহাজ রসদ নিয়ে এসেছে আমি ঐ জাহাজেই এসেছি।'

লোকটি অস্থিরচিত্তে জিজ্ঞেস করল, 'সে জাহাজ এখন কোথায়?'

'বিপদ দেখে, ফিরে গেছে। জাহাজের কাপ্তান আমাকে নৌকায় করে এখানে নামিয়ে দিয়েছেন আপনাদের এ খবর দেয়ার জন্য। তিনি শীগগীরই সাহায্য নিয়ে ফিরে আসবেন বলেছেন। এখন থেকে আপনিই আমার পরিচালক, আমি আপনার সৈনিক।'

লোকটি নৌকার আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে সাদের আরো কাছে সরে এসে বলল, 'তুমি জাহাজ ছেড়ে এখানে এসে খুব ভুল করেছো। একটু পরেই ভোরের আলো ফুটবে, এখানকার প্রতিটি শিলাখণ্ডের আড়ালে শত্রু ওঁৎ পেতে আছে।'

'সূর্য উঠতে এখনো অনেক দেরী। এর আগেই আমরা বাঁচার কোন না কোন উপায় বের করে নিতে পারবো।'

'এখন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারছি না। আমি ডুবন্ত জাহাজ থেকে নৌকা নিয়ে এত দূর চলে এসেছিলাম। ভাবিনি শত্রুর পাহারা এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে আমার পাঁচ জন সঙ্গীর মৃতদেহ পড়ে আছে। তিনজনকে হত্যা করে আমি শিলাখণ্ডে চড়েছিলাম, দেখেছি, অসংখ্য সৈন্য চারদিকে টহল দিচ্ছে। তারপর দীর্ঘ সময় আমি একটি গর্তে লুকিয়েছিলাম। নৌকাটিকে শেষ আশা ভরসা মনে করে এসেছিলাম এদিকে। কিন্তু দুজন প্রহরী ওখানে বসে আছে। আমাদের আর কিছু করার উপায় নেই।'

সাদ বলল, 'এখন এ দুজনের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়াই আমাদের প্রথম কাজ। আপনি হামলা করার জন্য তৈরী হোন, দেখি আমার বুদ্ধি কোন কাজে লাগে কি না।'

সাদ তরবারি কোষ মুক্ত করে নৌকা থেকে সামান্য এগিয়ে গিয়ে আহত লোকের মত কাৎরাতে শুরু করল। শিলাখণ্ডের ওপর এক প্রহরী তার সঙ্গীকে বলল 'ওই শোন, এখনও কোন কমবখত বেঁচে আছে।'

সাদ কাৎরাতে কাৎরাতে উচ্চস্বরে বলল, 'পানি।'

পাহারাদার বলল, 'দাঁড়াও, জন্মের মত পানি পান করাচ্ছি।'

প্রহরী দুজন দ্রুত শিলাখণ্ড থেকে নেমে এল। সাদ নিরব হয়ে গেল। প্রহরীরা বিক্ষিপ্ত লাশগুলো পরীক্ষা করে দেখছিল। সাদ ও তার সঙ্গী প্রহরীদের ওপর অতর্কিত হামলা করে চোখের পলকে দুজনকে ধরাশায়ী করে ফেলল।

প্রহরী দুজনকে হত্যা করে ওরা কিছুক্ষণ চারদিকে নজর বুলিয়ে দেখল। দুর্গের দিক থেকে হট্টগোলের শব্দ আসছিল। সঙ্গী সাদকে বলল, 'এখন আপনার কি ইচ্ছা?'

সাদ জবাবে বলল, 'আপনার সাথে দেখা হওয়ার আগে আমি দুর্গে প্রবেশের উপায় চিন্তা করছিলাম। আমি এখনো নতুন। এখনকার করণীয় আপনিই ঠিক করুন।'

'আমরা দুজনেই এখন একান্তভাবে আল্লাহর কুদরতের ওপর নির্ভরশীল। দুশমন দুর্গের চারদিক ঘিরে রেখেছে। উপ-সাগরও তাদেরই দখলে। চারদিকের শিলাখণ্ড ও পর্বতগুলোতে তাদের পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। রাতের অন্ধকারে কোন উপায়ে যদি আমরা দুর্গ প্রাচীরের কাছে যেতেও পারি, তবু শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে দুর্গে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। যদি নৌকা নিয়ে পানিতে নামি তবু সূর্যোদয়ের আগে বেশী দূর যেতে পারবো না। সকালে নৌকাটি এখানে না পেয়ে তারা অবশ্যই আমাদের খুঁজে বের করবে।

কিছুক্ষণ আগে আমি ভেবেছিলাম, নৌকা নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে দূরে উপকূলের কোথাও অবতরণ করবো এবং মরু সাহারায় ঢুকে পড়বো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার হবে। এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে দক্ষিণ দিকে সরে পড়া। এখান

থেকে চল্লিশ মাইল দূরে আমাদের সেনা ছাউনি আছে। যদি কোন উপায়ে সেখানে পৌঁছতে পারি তাহলে হয়তো দুর্গের সৈন্যদেরকেও রক্ষা করা সম্ভব হবে।'

সাদ বলল, 'চলুন, তাহলে আর দেরী করা যায় না।'

আর কথা না বাড়িয়ে চলতে শুরু করল ওরা। কিছু দূর যাওয়ার পর সাদ অনুভব করল, সঙ্গীটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। সে তার হাত ধরে বলল, 'আপনি কি আহত?'

'হ্যাঁ, জ্বলন্ত জাহাজ ছেড়ে আমি যখন নৌকায় নামছিলাম তখন দুশমনদের একটি তীর এসে পায়ে বিঁধে যায়। একজন ওটা বের করে দিয়েছে। তবে এখনও ব্যথা করছে।'

একটি বড় শিলাখণ্ডের কাছে গিয়ে সাদ সঙ্গীকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে শিলাটির ওপর উঠল এবং চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নীচে নেমে এসে বলল, 'চলুন।'

আহত লোকটি ক্লান্ত পায়ে মাইল দেড়েক চলার পর এতটাই কাহিল হয়ে পড়ল যে, আহমদের সাথে তাল রেখে আর চলতে পারছিল না। এক সময় সে থেমে পড়ল এবং বলল, 'আমার জন্য আপনি বিপদের ঝুঁকি নেবেন না। আমি আপনার সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছি না। আপনি এগিয়ে যান। দুজনে প্রাণ হারানোর চেয়ে একজন নিরাপদে চলে যাওয়া অনেক ভাল। আপনি সেনাবাসে পৌঁছতে পারলে হয়তো দুর্গটি রক্ষা পাবে।'

সাদ বলল, 'আল্লাহর সাহায্য থেকে নিরাশ হবেন না। বেশী দূর আমাদের পায়ে হাঁটার প্রয়োজন নাও হতে পারে।'

সাদের উৎসাহে জখমী ব্যক্তির সাহস ফিরে এল এবং সে আবার সাদের সাথে চলতে শুরু করল।

পূর্ব দিগন্তে ফুটে উঠল ভোরের আলো। মাইলখানেক দূরে শত্রু সৈন্যের বিশাল শিবির চোখে পড়ল ওদের। তাদের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সাদ ডান দিকে ঘুরে টিলা ও পাহাড়ের আড়াল নিয়ে বন্ধুর পথে অগ্রসর হল। সূর্যের আলো বাড়ার সাথে সাথে ওদের চলার গতিও বাড়ছিল। সাদ আহত সঙ্গীর দিকে তাকাল। চেহারার ক্লান্তি তার আকর্ষণীয় অবয়বকে ম্লান করতে পারেনি। বয়সে সাদের চেয়ে সামান্য ছোটই হবে। সংগীর বলিষ্ঠ দেহ, গৌরবর্ণ গায়ের রং এবং নির্ভীক ব্যক্তিত্বপূর্ণ চাহনী সাদের মুগ্ধ দৃষ্টি কেড়ে নিল। সে বলল, 'বুঝতে পারছি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। তবে আমার বিশ্বাস, আর কিছুদূর যেতে পারলেই আমরা বিপদ সীমার বাইরে চলে যাবো। রাতে দুশমন অত্যন্ত সতর্ক ছিল, কিন্তু এখন তাদের সেই সতর্কতায় নেমে আসবে ঢিলাঢালা ভাব। এভাবেই আল্লাহর রহমত আমাদের মদদ করবে।'

'এখন তাদের মনোযোগ দুর্গের দিকেই নিবদ্ধ থাকবে। তবুও মরুভূমিতে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেদের নিরাপদ মনে করা উচিত নয়। পানির পিপাসা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। শুনেছিলাম, দুর্গ থেকে পশ্চিমে কিছু দূরে পানির একটি ঝর্ণা আছে। সম্ভবত তা এখান থেকে বেশী দূরে হবে না। যদি দুয়েক ঢোক পানি পান করতে পারি তাহলে আরও

অনেক দূর পর্যন্ত আপনার সাথে চলতে পারবো।'

হঠাৎ একটি আওয়াজে উভয়ে উৎকর্ণ হলো। সাদ চঞ্চল কণ্ঠে বলল, 'মনে হচ্ছে উটের আওয়াজ। আপনি দাঁড়ান, আমি দেখছি।'

সাদ একটি উঁচু টিলার ওপর উঠে দাঁড়াল। সঙ্গীটি বসে রইল পাথরের আড়ালে। একটু পর সাদ দৌড়ে নেমে এসে বলল, 'আসুন, আপনার পানি ও সওয়ারীর বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। এ টিলার অপর পাশেই পানির ঝর্ণা। সেখানে একটি লোক উটের পিঠে পানি বোঝাই করছে। আমরা আরেকটু আগে এলে তাকে ধরে ফেলতে পারতাম। এখন তা সম্ভব না হলেও একটু অপেক্ষা করলেই কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবো আশা করি।'

কিছুক্ষণ পর সাদ ও তার সঙ্গী ঝর্ণায় যাওয়ার এক সংকীর্ণ পথে নেমে এল। দূর থেকেই তারা দেখতে পেল ঝর্ণা থেকে পানি নেয়ার জন্য উটের নতুন কাফেলা এগিয়ে আসছে। কাফেলার আরো কাছাকাছি হলে ধনুকে তীর সংযোজন করতে করতে সাদ বলল, 'দুজন লোক চারটি উট নিয়ে আসছে।'

সঙ্গী তরবারি বের করে বলল, 'ঝর্ণার কাছে কতজন আছে?'

'পনর বিশ জন। উটের সংখ্যা তাদের দ্বিগুণ হতে পারে। কিন্তু ঝর্ণা এখনো অনেক দূর। অন্য কাফেলা আসার আগেই আমাদেরকে অন্তত আধ মাইল এগিয়ে যেতে হবে। এখন পথ দেখানোর দায়িত্ব আপনার।'

'আল্লাহ যদি আমাদের জন্য সওয়ারী পাঠান তাহলে পথ দেখাবার ব্যবস্থাও তিনিই করবেন। মরুভূমিতে বেদুঈনদের চাইতে উত্তম পথ প্রদর্শক আর কেউ নেই। আমরা উটের সাথে সাথে লোকগুলোকেও ধরে নিতে চেষ্টা করবো।'

কাছেই দুজন লোকের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে সাদ ও তার সঙ্গী রাস্তার পাশে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। এক বেদুঈন রশি ধরে উটের আগে আগে চলছে, অন্যজন পেছনে। পেছনের লোকটি পথের মোড়ে আসা মাত্রই সাদের সঙ্গী হঠাৎ বের হয়ে লোকটির বুকে তরবারি ঠেসে ধরল আর সাদ সামনের লোকটির দিকে তীর সোজা করে উপজাতীয় ভাষায় বলল, 'থামো।'

বেদুঈন লোকটি চমকে উঠে উটের রশিটি হাত থেকে ছেড়ে দিল। সাদ বলল, 'উটের রশি হাতে নাও এবং ডানে চলো। পালাতে বা চিৎকার করতে চেষ্টা করলে মারা পড়বে। খঞ্জরটি আমার হাতে দাও। জল্‌দি করো।'

বেদুঈন তার সঙ্গীকে তারই মত বিপদগ্রস্ত দেখে হুকুম তামিল করল। খঞ্জরটি সাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে উটের রশি হাতে নিয়ে ডান দিকে চলতে শুরু করল। তিনশো গজের মত চলার পর একটি টিলার আড়ালে গিয়ে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সাদের আদেশে উটগুলোকে ওরা শুইয়ে দিল। সাদ এবার সঙ্গীর দিকে ফিরে বলল, 'এবার আপনি পানি পান করতে পারেন।'

'না, জলদি আমাদের এ স্থান ত্যাগ করা উচিত। মশকের মুখ খোলা ও বন্ধ করার

এত সময়ও এখানে ব্যয় করা ঠিক হবে না। নিরাপদ জায়গায় গিয়েই আমি পানি পান করতে পারবো।'

সাদের সঙ্গী বেদুঈনদের লক্ষ্য করে বলল, 'দেখো, বাড়াবাড়ি না করে আমাদের সাথে সহযোগিতা করলে ভাল করবে। আমরা আমীর ইউসুফের শিবিরে যেতে চাই। যদি সে পর্যন্ত আমাদের পথ দেখাও তাহলে জীবনে বেঁচে যাবে এবং উটগুলোও ফিরে পাবে। আর আমাদের ধোঁকা দিয়ে পালাতে চেষ্টা করলে আমরা বাধ্য হবো তোমাদের হত্যা করতে।'

'আমরা সর্দারের আদেশে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে এসেছিলাম। রাবাতের আমীরের কাছে আমরা আশ্রয় পাবো এ আশ্বাস পেলে খুশী হয়েই আমরা আপনাদের সঙ্গ দেবো।'

'আমি তোমাদের নিরাপত্তার জিম্মা নিচ্ছি। এবার তোমরা উটে সওয়ার হয়ে যাও এবং আমাদের আগে আগে চলো।'

রওনা হয়ে সঙ্গী লোকটি আরবী ভাষায় সাদকে বলল, 'এদের ওপর ভরসা করা যায় না, আপনি সতর্ক থাকবেন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার একটি তীরও ব্যর্থ হবে না।' নির্বিকার চিত্তে জবাব দিল সাদ।

৫.

প্রায় তিন মাইল চলার পর থামল ওরা। সাদ ও তার সঙ্গী মশক খুলে পানি পান করে আবার রওনা হয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সাদের সঙ্গী বলল, 'এখন আর আমাদের কোন ভয় নেই। তবে প্রতিটি মুহূর্তই এখন অত্যন্ত মূল্যবান। কেল্লার সৈন্যরা দীর্ঘ সময় শত্রুদের প্রতিরোধ করতে পারবে না। আল্লাহ না করুন, শত্রুরা কেল্লাটি দখল করে নিলে মরু অঞ্চলে আমাদের সৈন্য, রসদ ও সাহায্য পাঠাবার পথ বিপজ্জনক হয়ে যাবে।'

'জাহাজে আপনার দায়িত্ব কি ছিল?' প্রশ্ন করল সাদ।

'আমি রাবাত নৌবাহিনীর অফিসার। রোম উপসাগর দিয়ে আসছিলাম আমরা। আচানক সাগরের এক দ্বীপে ওঁৎ পেতে থাকা জলদস্যুরা দুটি জাহাজ নিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হয়। কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি ওরা। আমরা ওদের একটি জাহাজে আগুন ধরিয়ে অন্য জাহাজটিতেও আগুন দিতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দস্যুদের আরও চারটি জাহাজ এসে মিলিত হয় ওদের সাথে। একটি জাহাজ নিয়ে পাঁচটি জাহাজের মোকাবেলা করা সম্ভব নয় দেখে আমি বাধ্য হয়ে কাপ্তানকে ফিরে চলার হুকুম দিলাম।

কেল্লা রক্ষার জন্য উপকূলে দুটি জাহাজ ছিল। আমি আশা করেছিলাম, ওখানে পৌঁছতে পারলে সহজেই দুশমনদের দমন করতে পারবো। ওখান থেকে কেল্লা বেশী

দূরে ছিল না। ফিরে এসে দেখি ডাকাতদের আরো কয়েকটি জাহাজ আমাদের আগেই এখানে এসে উপকূলের জাহাজ দুটি জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং উপকূলে নেমে উপকূল এলাকা দখল করে আমাদের কেল্লা অবরোধ করে ফেলেছে। আমাদের সামনে পেছনে দুদিকেই দুশমন। কোন দিকেই এগিয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না আমাদের। যারা আমাদের ধাওয়া করেছিল তারা বেশ কাছে চলে আসায় জয়-পরাজয়ের পরোয়া না করে আমি উপকূলের কাছে জমায়েত হওয়া ওদের জাহাজ আক্রমণ করলাম এবং শত্রুদের দুটি জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমরা চারদিক থেকে ওদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাই।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের একটি জাহাজে আগুন ধরে গেল। আমি অন্ধকারে নিজের জাহাজটিকে অন্য দিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু জ্বলন্ত জাহাজের অগ্নি শিখা দুশমনদের জন্য মশাল হয়ে গেল। তারা আমার জাহাজেও আগুন ধরিয়ে দিল। উপায়ান্তর না দেখে আমি আমার জ্বলন্ত জাহাজটি ঘুরিয়ে নিয়ে কাছের এক শত্রু জাহাজের উপর তুলে দেই। শত্রুরা চেষ্টা করেও ওদের জাহাজটিকে আগুনের কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না। এ সময় উভয় জাহাজের মাল্লারা সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। গোলমালের ভেতর আমি কয়েকজন সঙ্গীসহ অন্ধকারে একটি নৌকা নিয়ে উপকূল পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হই। কিন্তু শত্রুরা সেখানেও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

আমার সঙ্গীদের লাশ আপনি দেখেছেন। তাদের চারজনই ছিল দক্ষ নাবিক। যেহেতু দুশমন জল-স্থলে সর্বত্র সমান তৎপর ছিল, তাই আমার মনে হয়, আমাদের যেসব সঙ্গী সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল তারা কেউ বেঁচে নেই। যদি আল্লাহ আপনাকে না পাঠাতেন, তাহলে সম্ভবত আমিও এতক্ষণে প্রভুর দরবারে চলে যেতাম। আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, আপনি স্পেনের বাসিন্দা।'

'আপনার অনুমান ঠিক। আমি গ্রানাডা থেকে এসেছি। আমীর ইউসুফের সাথে দেখা করার নিয়তে বাড়ি ছেড়েছি আমি। সৌভাগ্যবশত সাবতা থেকে আপনাদের এক জাহাজে ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে যাই, নইলে স্থল পথেই আসতে হতো আমায়।'

সাদের সঙ্গী অনুভব করল, এ যুবক গ্রানাডার নয়নাভিরাম শহর ছেড়ে অহেতুক এ কষ্টকর পথে পা বাড়ায়নি। নিশ্চয়ই তার কোন মহান মাকসাদ আছে। কিন্তু সাদকে সে সরাসরি এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা সঙ্গত মনে করল না।

পড়ন্ত বিকেলে উটগুলোকে ওরা খুব দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে মাঝে মধ্যে মরুদ্যান পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এসব মরুদ্যানের বাসিন্দারা বন্ধু না শত্রু জানা ছিল না বলে মরুদ্যানের বেশ দূর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা।

সন্ধ্যার একটু আগে একটি মরুদ্যানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় সাদ সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ঠিক কোথায় আপনাদের ক্যাম্প জানেন?'

'না, তবে এটুকু জানি, আমরা যেদিকে যাচ্ছি ওদিকেই কোথাও আছে।'

সাদের সঙ্গী বেদুঈনদের ডেকে বলল, 'দেখো, তোমরা যদি আজ রাতেই আমাদের শিবিরে পৌছে দিতে পারো তাহলে তোমাদের পুরস্কৃত করবো।'

'যদি আপনাদের সৈন্যরা জায়গা বদল করে না থাকে, তাহলে আজ বেলা ডোবার একটু পরেই আমরা সেখানে পৌছে যাবো।'

সাদ সঙ্গীকে বলল, 'আমার মনে হয় হামলাকারীর সংখ্যা হাজারের বেশী হবে। আপনি কি বলেন?'

'আমি ওদের সংখ্যা নিয়ে চিন্তিত নই। তারা মনে করেছে, আমাদের সেনাবাহিনী অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় কোন সাহায্য পৌছার আগেই তারা কেল্লাটি দখল করে নিতে পারবে। যদি দুর্গরক্ষক মাত্র দুটো দিন আক্রমণকারীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তাহলে আমাদের কোন না কোন সেনাবাহিনী সেখানে পৌছে যাবেই। তখন তুফানের সামনে গাছের শুকনো পাতার যে অবস্থা হয় তাদেরও অবস্থা হবে সেইরকম।'

সাদ বলল, 'মরুচারী এই দস্যুরা এতগুলো জাহাজ কি করে সংগ্রহ করল তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

'আপনি এ কয়টা জাহাজ দেখেই ঘাবড়ে গেলেন? ওদের জাহাজ এরচে ঢের বেশী। ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রের নৌবহর ওদের সাহায্য করছে। অনেক খৃস্টান শাসনকর্তাও নানা উপায়ে তাদের সাহায্য করে। তারা সবাই আফ্রিকার মুসলিম জাগরণকে ভয়ের চোখে দেখছে। আমার আশংকা হচ্ছে, এসব এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হলে রোম, গ্রীস ও উত্তর স্পেনের খৃস্টান শাসনকর্তারা আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে প্রকাশ্য আক্রমণ করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। এ জন্যই আমরা দক্ষিণ পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ার আগে এতদঞ্চলে আমাদের অবস্থা সুদৃঢ় করতে চাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, স্থল ও নৌ-পথে একসঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে শত্রু পক্ষ আমাদের পরখ করে দেখল, আমরা উপকূল অঞ্চল রক্ষা করার মত শক্তিশালী কিনা। যদি ওরা দুর্গ দখল করে নিতে পারে, তাহলে উত্তরাঞ্চলের দেশগুলোর খৃস্টানদের পক্ষ থেকে তাদের রসদ ও সাহায্য আসার পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে।'

সাদ জিজ্ঞেস করল, 'এসব বিদ্রোহী গোত্রগুলোর মধ্যে কি মুসলমানও আছে?'

'হ্যাঁ, কিছু নামধারী মুসলমান গোত্রও এদের সঙ্গে আছে। এসব গোত্রের সর্দাররা আফ্রিকায় ইসলামী শক্তির উত্থানকে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে এসব মুসলমানরা অমুসলমান দুশমনদের চাইতে কম ক্ষতিকর নয়।'

দুই

রাতের প্রথম প্রহর শেষ হয়েছে। ক্লান্ত উটগুলো পা ফেলছে ধীরে ধীরে। ক্ষুধা ও

ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র কাফেলা। পেশীগুলো অসাড় হয়ে পড়েছে। চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে চাইছে ঘুমে। হঠাৎ করেই একটি বালিয়াড়ি পার হয়ে ওরা আলোর দেখা পেয়ে গেল। বেদুঈন বলল, 'নিন, আপনাদের মঞ্জিল এসে গেছে। ওই আলো এক ক্ষুদ্র বস্তির। আলোর ওপাশেই ফৌজি ছাউনি।'

বস্তির পাশ ঘেঁষে খেজুর বাগান পেরিয়ে ওরা পৌঁছে গেল গন্তব্যে। পৌঁছেই হতবাক হয়ে গেল সাদ ও নৌ অফিসার। সেনাছাউনি তো দূরের কথা, ক্ষুদ্র কোন কাফেলার তাঁবুরও চিহ্ন নেই। দ্বিধা জড়ানো চোখে অন্ধকারেই একে অপরের দিকে চাইতে লাগল। সে চাহনীতে সীমাহীন পেরেশানী ও জিজ্ঞাসা। সাদ ধনুকে তীর জুড়তে জুড়তে আরবী ভাষায় বলল, 'সাবধান হয়ে যান! এরা সম্ভবত আমাদের ধোকা দিয়েছে।'

অফিসার বেদুঈনদের দিকে রক্তচক্ষু মেলে ঝাঁঝের সাথে বলল, 'তোমরা আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছ? ছাউনি কোথায়?'

এক বেদুঈন পেরেশানী চেপে বলল, 'পাঁচ দিন আগেও এখানে ছাউনি ছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি। নীচে নেমে দেখুন, ছাউনির চিহ্ন অবশ্যই পাবেন। আর না হয় বস্তির লোকদের জিজ্ঞেস করুন, সৈন্যরা কোথায় গেছে তারা হয়তো বলতে পারবে।'

'আমাদের কোন বিপদ হলে তোমাদের কপালে দুর্ভোগ আছে।' সাদ সংগীর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি নেমে ওদের কথা যাচাই করুন, আমি এদের দেখছি।'

হঠাৎ এক দিক থেকে আওয়াজ ভেসে এল, 'কে?'

চমকে উঠল সবাই, কিন্তু কোন জবাব দিল না। আবার কেউ চিৎকার করে বলল, 'কে ওখানে? কথা বলছো না কেন?'

এবারও নিরব রইল ওরা। ওদিক থেকে ভেসে এল এবার সম্মিলিত কণ্ঠস্বর, 'ওখানে কারা দাঁড়িয়ে আছো? কথা বলো, জবাব দাও?'

সাদের সংগী বলল, 'হয়তো সৈন্যরা যাওয়ার সময় রোগী, আহত এবং পাহারাদারদের রেখে গেছে।'

বেদুঈন বলল, 'এখনো কি মনে করেন আমরা আপনাদের ধোকা দিয়েছি?'

'না।'

সাদের সংগী নিশ্চিন্ত হয়ে প্রশ্নকারীদের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে বলল, 'এটাই কি রাবাতের সেনা ছাউনি।' ওপাশ থেকে পাল্টা প্রশ্ন করল কেউ, 'তোমরা কারা?'

'আমরা জরুরী খবর নিয়ে এসেছি।'

মুহূর্তের মধ্যে আট দশজন লোক তাদের ঘিরে ফেলল। একজন প্রশ্ন করল, 'তোমরা কোত্থেকে এসেছ?'

সাদের সংগী ওদের কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'তোমরা কেউ সিয়ার বিন আবু বকরকে চেন?' এক পাহারাদার অবাক কণ্ঠে বলল, 'নৌ বাহিনী প্রধান সিয়ার বিন আবু বকর? খোদার কসম! আপনার কণ্ঠ শুনেই আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু এ সময় আপনি

এখানে আসবেন, কল্পনাও করতে পারিনি।'

'আমীর ইউসুফ কোথায়?'

'গত পরশু তিনি পূর্ব আফ্রিকায় রওনা হয়ে গেছেন। আজ খবর পেয়েছি, এখান থেকে মাইল বিশেক দূরে আমাদের বীর সিপাইদের হাতে দুশমনের বিশাল বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। পনরজন গোত্রীয় সর্দারকে বন্দী করা হয়েছে। খুব সম্ভব দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।'

'তোমরা এখানে কতজন আছো?'

'শ তিনেক জখমী এবং রুগী আছে ছাউনিতে।'

সাদ এবং নৌবাহিনী প্রধান উট থেকে নেমে ওদের অনুসরণ করে ক্যাম্পে গেলেন। ওখানে ঢুকতেই দুজন মশালবাহী নৌপ্রধানের দুপাশে এসে দাঁড়াল। তিনি ক্যাম্পের সেনাপতির সাথে কথা বলতে লাগলেন। সাদ ধারণাও করতে পারেনি তার সফর সংগী ইউসুফ বিন তাশফিনের চাচাতো ভাই। সে নিঃশব্দে মশালের আলোয় তার দিকে মুগ্ধ দুচোখ তুলে তাকিয়ে রইল।

সিয়ার বিন আবু বকর ক্যাম্পের সালারকে বললেন, 'এখুনি ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে পৌঁছতে হবে আমাকে। অত্যন্ত জরুরী। ঘোড়া তৈরী করুন। পথ ঘাট চেনে এমন চারজন লোক দিন আমার সাথে। আর এরই ফাঁকে খাবারের ব্যবস্থা করুন। যা আছে তাই দিন, নতুন করে চড়াবার দরকার নেই। আমাদের সময় অত্যন্ত মূল্যবান।'

এরপর সাদের দিকে ফিরলেন তিনি। বললেন, 'আপনি এখানে আরাম করুন। আমাকে আরো অনেক দূর যেতে হবে।'

সাদ বলল, 'আমিও আপনার সাথে যেতে চাই। আপনি আহত, আরাম তো আপনার দরকার। আপনি বরং থাকুন, আমি আমীরকে সংবাদ পৌঁছে দিয়ে আসি। বেশী সফর করলে আপনার জখম মারাত্মক হয়ে যেতে পারে বলে আশংকা হচ্ছে আমার।'

সিয়ার বিন আবু বকর হেসে বললেন, 'জখমের কথা তো আমার মনেই ছিল না।'

খেজুর ও যবের শুকনো রুটি খেয়ে তারা আবার সফরে নামল। ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার সময় সিয়ার বিন আবু বকর বেদুঈন কয়েদীদের সম্পর্কে সালারকে বললেন, 'এরা তিন দিন এখানে মেহমান থাকবেন। তিনদিন পর সসম্মানে তাদের বিদায় করবেন। উট ছাড়াও আমাদের পক্ষ থেকে একটি করে ঘোড়া এবং পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা এনাম দেবেন। তবে কিছুতেই তাদেরকে তিন দিনের আগে এখান থেকে যেতে দেবেন না।'

৪

পরদিন ভোর। সিয়ার বিন আবু বকর ছাউনিতে ঢুকেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলেন। তাকে অনুসরণ করল সাদ। সিপাইরা এসে জড়ো হল তাদের পাশে।

নৌ প্রধান তাদের সালামের জবাব দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আমীর ইউসুফ কোথায়?'

'আসুন! তিনি তাঁবুতে।' এক সিপাই বলল।

সিয়ার বিন আবু বকর সাদকে সাথে নিয়ে সিপাইয়ের পিছু নিলেন। সাদের হৃদয়ে চলছিল তুমুল আলোড়ন। আফ্রিকার মহামানবের বিভিন্ন ছবি তার বুকের ভেতর গাথা ছিল। সিপাইটি একটি প্রশস্ত তাঁবুর কাছে নিয়ে এল তাদের। তারা দুজন তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল।

আমীর ইউসুফ খেজুর পাতার বিছানায় বসে কাতেবকে দিয়ে কিছু লেখাচ্ছিলেন, সিয়ার সালাম দিলে মাথা তুললেন আমীর। চকিতে দৃষ্টি পড়ল চাচাতো ভাইয়ের দিকে। তাঁর চেহারায় সরলতা ও নম্রতার পাশাপাশি অসাধারণ গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্ব খেলা করছিল। কাঁচা ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা সিংহের মত ছিল তার দৃষ্টি।

'আমীর, আমি এক দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।'

'সাগরের পরিবর্তে তুমি জমিনে এরচে বড় দুঃসংবাদ আর কি হতে পারে? কি হয়েছে জলদি বলো।'

সিয়ার বিন আবু বকর সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনলেন আমীর ইউসুফ। তাঁর প্রশান্ত চেহারায় উদ্বেগের চিহ্নও ফুটল না। চাচাতো ভাইয়ের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছেন তিনি এই বিপর্যয়ের খুটিনাটি দিক। সাদের মনে হচ্ছিল, সাগরের শান্ত জলরাশির গভীরে ঘুরপাক খাওয়া পানির ঘূর্ণির প্রতিটি বাঁকের খবর নিচ্ছেন তিনি।

তাঁবুর বাইরে গম্ভীর কণ্ঠে সালার এবং সিপাইদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন আমীর ইউসুফ। সে অনুভব করল, জীবনের সব ব্যস্ততা এই দরবেশ শাসকের অস্তিত্ব দখল করে নিয়েছে। সুন্দর যে চোখে খানিক আগে স্নেহ প্রীতি আর ভালবাসার স্রোত বইছিল, সেখানে এখন বিদ্যুতের চমকিত তেজ।

একটু পর। সাদ দেখল, কয়েক হাজার সওয়ার তার হুকুমের অপেক্ষায় সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। পদাতিক বাহিনীকে সামনের তাঁবুতে গিয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হল। সিয়ারকে তিনি বললেন, 'তুমি আহত, এখানেই বিশ্রাম কর।'

'আমার জখম খুবই মামুলী। এখন টেরই পাই না।'

সিয়ার বিন আবু বকর আগেই আমীর ইউসুফের সাথে সাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমীর তাকে কিছু বলছেন না দেখে আবার বললেন, 'আমাদের জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য এ যুবক গ্রানাডা থেকে ছুটে এসেছে।'

আমীর ইউসুফ বললেন, 'যুবক, তুমি যে ময়দানে পা রাখতে এসেছ তা অনেক বিশাল। তোমার শক্তি পরীক্ষার জন্য অনেক সময় পাবে। কিন্তু এখন তোমার আরামের প্রয়োজন। চেহারা বলছে তুমি খুব ক্লান্ত।'

'আপনার হুকুম তামীল করা আমার জন্য ফরজ।' বলল সাদ, 'কিন্তু আপনার সাথে

যেতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। হায়! আমার চেহারায় যদি হৃদয়ের আবেগ ফুটে উঠতো।'

আমীর সালারকে ডেকে বললেন, 'এ যুবককে ভাল জাতের একটি ঘোড়া দাও।'

খানিক পর। বেজে উঠল নাকাড়া। পাঁচ হাজার আত্মত্যাগী সৈনিকের অশ্বক্ষুরাঘাতে উত্থিত ধুলিকণা ঢেকে দিল মেঘের চাদর। আত্মত্যাগী সৈনিকদের একজন ছিল সাদ বিন আবদুল মুনীম। প্রত্যাশারও আগে সে পেয়ে গেল ইউসুফ বিন তাশফিনকে। সফল হলো তার জিহাদের ময়দানে ঘোড়া ছোটাবার স্বপ্ন। সে শুনতে পাচ্ছিল ইউসুফ বিন তাশফিনের কণ্ঠ, 'তুমি যে ময়দানে পা রাখতে এসেছো তা অনেক বিশাল।'

অতীতের পর্দা ছিড়ে সে দেখতে পাচ্ছিল সেই শাহ সওয়ারদের, গোটা দুনিয়ার জালিম শাহীর বিরুদ্ধে যারা ছুটে চলছিল তুফান বেগে। খালিদ, তারিকের উত্তরসূরী এইসব বীরদের সাথে কদম মিলিয়ে সেও ছুটছিল দূরন্ত বেগে। আর মনে মনে বলছিল, আমি তোমাদেরই ভাই, তোমাদেরই ফৌজের এক নবীন সৈনিক। আমি এতসব সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম শুধু তোমাদের সঙ্গ দেয়ার জন্য।

ইউসুফ বিন তাশফিন চলন্ত ঘোড়ায় বসে সেনাদলকে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে সাদ মনে মনে ভাবল, এই কি সেই ঘোড়সওয়ার, যাকে দেখলে মনে পড়ে যায় তারিক বিন জিয়াদের কথা? এই কি সেই মুজাহিদ, যিনি স্পেনের মুসলমানদের মুক্তির দিশারী হবেন? তারিক যেমন রডারিকের বিরুদ্ধে তরবারি ধরেছিলেন ইনিও কি তেমনি আলফানসুর বিরুদ্ধে তরবারি উঠাবেন? ও বুঝতে পারছিল, আফ্রিকার এই শেরদিলকে আল্লাহ শুধু স্পেনই নয় বরং ক্রুশের নীচে সমবেত হওয়া ইউরোপকেও শায়েস্তা করার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।

৮.

জলদস্যুরা কেল্লায় অতর্কিত আক্রমণ চালাল। পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল কেল্লা দখলের জন্য। কেল্লার মুহাফিজ তিন তিনবার ওদেরকে কেল্লার চারদেয়াল থেকে হটিয়ে দিয়েছেন। চূড়ান্ত হামলা করল ওরা রাতের শেষ প্রহরে। সিঁড়ি বেয়ে কয়েকজন কেল্লায় ঢুকেও পড়ল, কিন্তু তখনো কেল্লা দখল করতে পারেনি। সৈন্যরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে ওদের হটিয়ে দিল। কেল্লায় সাকুল্যে সৈন্য ছিল একশো জন। এ হামলা মোকাবেলা করতে গিয়ে এদের মধ্যে চল্লিশ জনই শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। সূর্যোদয়ের সময় ওরা যখন আবারো হামলা করল, তখন এই ষাটজনের একজনও ভাবেনি আজকের সূর্যাস্ত তারা দেখতে পাবে। তুনীর তীর শূন্য হয়ে যাচ্ছে, বাহু শিথিল হয়ে যাচ্ছে, নিরাশার আঁধার ধেয়ে আসতে চাচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেকেই এই শপথে অটুট, এ দেহে প্রাণ থাকতে কিছুতেই কেল্লার দখল তারা দস্যু তস্করের হাতে তুলে দেবে না।

আচানক পূর্ব দিগন্তে দেখা দিল ধুলি ঝড়। কেল্লার মুহাফিজ বুরুজে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বললেন, 'মুজাহিদ ভাইয়েরা, আল্লাহ নেগাহবান! আমাদের ফৌজ এসে গেছে। ইউসুফ বিন তাসফিন ছুটে আসছেন ময়দানে। তোমাদের হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই করবেন তিনি। তোমরা জানবাজি রেখে লড়াই চালিয়ে যাও। আল্লাহর ফজলে পরাজয়ের কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারবে না তোমাদের।'

নতুন উদ্দীপনা নিয়ে সৈন্যরা লড়তে লাগল প্রাণপণে। নেজা, তরবারি আর পাথর দিয়ে হামলাকারীদের রুখতে লাগল।

ধুলোর আস্তরণ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেই মুজাহিদরা অর্ধ বৃত্তাকারে কেল্লার তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দস্যুদের পদাতিক আর সওয়াররা দক্ষিণের ঢালে যারা পাহারা দিচ্ছিল, ভয়ে ওরা সাগর পারের পাহাড় ও টিলার দিকে হটে যেতে লাগল। রাবাতের অর্ধেক ফৌজ ঘোড়া থেকে নেমে কেল্লার আশপাশের বালিয়াড়ি ও পাহাড়ের আড়ালে ব্যূহ রচনা করল। কজন রইল ঘোড়াগুলোর দেখাশুনায়, বাকীরা ছুটল পলায়নপর দুশমনের পিছু ধাওয়া করে। কেল্লা দখলের আশা ছেড়ে হামলাকারীরা এখন প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। পালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে তারা কখনো মুজাহিদদের তীরের আওতায় এসে পড়ছিল, আবার কখনো ছুটে যাচ্ছিল কেল্লার চার দেয়ালের কাছে। কেউ কেউ প্রাণ বাঁচানোর জন্য লাফিয়ে পড়ল সমুদ্র বক্ষে।

মাত্র দুই ঘন্টায় দেড় হাজার দুশমন নিহত হল। পরাজয় স্বীকার করে বাকীরা সরে যেতে চাচ্ছিল সাগরের দিকে। ওখানকার পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজ তাদের বাঁচার শেষ আশা ভরসা। সাগরে ঝাঁপিয়ে যারা জাহাজে যাওয়ার চেষ্টা করল তীরন্দাজদের সহজ তীরের নিশানা হল তারা। নাজুক অবস্থা দেখে সাথীদের ফেলেই তিনটি জাহাজ নোঙর তুলে পালাল। কয়েদীদের কাছ থেকে পরে জানা গেছে, এই তিন জাহাজের দুটো ছিল ইটালীর এবং একটি ফরাসীদের। অন্য জাহাজ দুটি কেল্লা থেকে দূরে সরে গিয়ে সাগরের মাঝে দাঁড়িয়েছিল বন্ধুদের আশায়। ওরা সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়া দস্যুদেরকে নৌকার সাহায্যে উদ্ধার করার চেষ্টা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইউসুফ বিন তাশফিনের মুজাহিদরা পুরো এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল। সূর্য ডোবার আগেই বাকি দস্যুরা হাতিয়ার সমর্পন করল। চার হাজার দস্যু বন্দী হল। জাহাজ দুটি বন্ধুদের আশা ত্যাগ করে খোলা সাগরের দিকে চলে গেল।

ইউসুফ বিন তাশফিন মাগরিবের নামাজ পড়লেন কেল্লায় ভেতরে। পাঁচশ সৈন্য কেল্লায় রেখে বাইরে এলেন তিনি। ছুটলেন দুশমনদের শূন্য ছাউনির দিকে। ওখান থেকে কয়েক হাজার ঘোড়া, উট এবং অঢেল রসদ এল মুজাহিদদের হাতে। বন্দীদের তুলে দেয়া হল পাহারাদারদের হাতে।

রাতের খানা খাচ্ছিলেন ইউসুফ বিন তাশফিন। পাশেই বসে আছেন সিয়ার বিন আব বকর। আমীর বললেন, 'তোমার গ্রানাডার বন্ধু কোথায়? ও তো এক চৌকস

যোদ্ধা। তার একটা তীরও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি। তার সাহস আর কৌশল দেখার মত। এখন কোথায় সে?'

'এখানে এসেই সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিল। এখন প্রশান্ত মনে ঘুমুচ্ছে, ক্লান্ত বলে জাগাইনি।'

'আহত হয়নি তো?'

'না, বোধ হয়! কিছু বলেনি তো আমাকে।'

একজন সালার বললেন, 'তাঁর আস্তিনে আমি রক্ত দেখেছি। জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'মামুলী জখম।'

'সিয়ার!' আমীর ইউসুফ বললেন, 'ওর প্রতি তোমার খেয়াল রাখা উচিত ছিল। এ ধরনের যুবকরা সব সময়ই নিজেদের জখমকে মামুলি ভাবে।'

খাওয়া শেষে উঠতে উঠতে সিয়ার বললেন, 'আমি দেখছি।'

৯.

কারো পরশে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠল সাদ। তাকিয়ে দেখল চারপাশে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। একজন ঝুঁকে তার জামার আস্তিন উপরে তোলার চেষ্টা করছে। সাদ ভীত চকিত হয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসল।

ইউসুফ বিন তাশফিন বললেন, 'আহা, উঠছো কেন, শুয়ে থাকো। আমি তোমার ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি।'

সাদ লজ্জিত স্বরে বলল, 'ও কিছু নয়, মামুলি জখম।'

আমীর ইউসুফ বললেন, 'জখম জখমই, তাকে অবহেলা করতে নেই। শোও, আমি দেখছি।' সাদের বাহুতে পট্টি বাঁধা শেষ করে আমীর ইউসুফ বললেন, 'সিয়ার! তুমি একে খেতে নিয়ে যাও। আমি অন্য জখমীদের দেখে আসি।'

পরদিন। সন্ধ্যার দিকে রাবাতের নৌঘাটিতে দশটি যুদ্ধ জাহাজ ফিরে এসে নোঙর করল। উপ-নৌবাহিনী প্রধান সুখবর শোনালেন, 'আমরা দুশমনের তিনটি জাহাজ অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দিয়েছি। এক জাহাজের ক্যাপ্টেনকে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছি।'

চতুর্থ দিন। ফজরের নামাজের পর ইউসুফ বিন তাশফিন নিজের খিমায় ডেকে পাঠালেন সাদ বিন আবদুল মুনীমকে। বললেন, 'নওজোয়ান, তোমার সাথে কথা বলার সুযোগই করতে পারিনি। কেন তুমি এসেছো তাই এখনো জানা হলো না। তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হবো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সাদ বলল, 'তওহীদের পতাকাবাহী ফৌজের একজন সৈনিক হবার সৌভাগ্য লাভ করার চাইতে বেশী কিছু আমি চাই না। আমি চাই, আমার

রক্ত ও ঘাম ইসলামী দুনিয়ার প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণে ব্যয় হোক, যার বুনিয়াদ আপনি গড়ে তুলেছেন। স্পেনের মুসলমানরা আজ জীবন মৃত্যুর সংগ্রামে লিপ্ত। আমি জানতে এসেছিলাম, সামনের সংকটময় দিনগুলোতে আফ্রিকার ভাইয়েরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন কিনা? এখানে এসে জানতে পারলাম, আফ্রিকার ময়দানেই এখন চলছে প্রতিরক্ষার লড়াই। যেসব মুজাহিদ আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের বিজয় নিশান উড়াতে চান, এই মহা অভিযান শেষ হলে স্পেনের অসহায় ও মজলুম মুসলমানদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরানোই আমার মাকসাদ। সেই অভিযানে আমি আপনার সাথে থাকতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।'

ইউসুফ বিন তাশফিন বললেন, 'কিন্তু স্পেনের মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কি সঙ্গত হবে?'

'আমার বিশ্বাস, আলফানসুর তলোয়ার তাদের কণ্ঠনালী স্পর্শ করলে আপনি তাদের সাহায্য না করে পারবেন না। স্পেনের মুসলমানরা আপনার কাছে সাহায্যের আবেদন জানালে, তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াকেও কি আপনি হস্তক্ষেপ মনে করবেন? আমি বলছি না, আফ্রিকায় নিজের কাজ অসমাপ্ত রেখে আপনি স্পেনে ছুটে যান। কিন্তু আফ্রিকায় আপনার কাজ শেষ হলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, স্পেনই হবে আপনার পরবর্তী মনজিল। সে সময় পর্যন্ত আমি একজন সৈনিক হিসাবে আপনার পাশে থাকতে চাই।'

ইউসুফ বিন তাশফিন বললেন, 'তুমি আমাকে নিয়ে অনেক বেশী আশা করে ফেলেছো যুবক। তোমার আশা আমি যতদূর পূরণ করতে পারবো জানি না, তবে তোমাকে এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি, যতদিন আলজেরিয়া থেকে সেনেগাল পর্যন্ত আফ্রিকার জনতা এক পতাকাতলে সমবেত না হবে, ততদিন আমি স্থির হয়ে বসবো না। আমি চাই না রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে আফ্রিকার মুসলমানরা একদিন ঠিক তেমনি বিপদের সম্মুখীন হোক যেমন হয়েছে আজ স্পেনের মুসলমানরা। এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য দরকার এমন সব মুজাহিদ, যারা পেটে পাথর বেঁধে লড়াই করতে পারে। দরকার এমন সব নিবেদিতপ্রাণ মুবাল্লিগের, যারা ইসলাম প্রচারের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে পারে।'

'জিহাদ ও তাবলীগ উভয়ের জন্য আপনি আমাকে তৈরী পাবেন।'

'আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আপাতত স্পেনের ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন ওয়াদা দিতে পারছি না। যদি কোনদিন এমন সময় আসে, আল্লাহ যেন আমাকে সঠিক ফায়সালা করার তওফিক দান করেন।'

সালার বলল, 'আপনার কাছে আমার কোন দাবী নেই। আমি কোন শর্ত সাপেক্ষে আপনার জিহাদী কাফেলায় শরীক হওয়ার জন্য আসিনি, আমি এসেছি ইসলামের কল্যাণ ও উন্নতির রাজপথে জীবন বিলাতে।'

'আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। আশা করি সঠিক জবাব দেবে। আমি জানতে চাই তুমি নিজের ইচ্ছায় এসেছো, না কেউ তোমাকে পাঠিয়েছে?'

সাদ জবাব দিল, 'এখানে আসার ব্যাপারে আমি গ্রানাডার কাজী আবু জাফরের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু যদি আপনি সন্দেহ করে থাকেন, কোন শাসকের ইংগিতে এসেছি, তাহলে আপনাকে আমার পিছনের ইতিহাস শুনতে হবে।'

ইউসুফ বিন তাশফিন বললেন, 'তোমার পিছনের ইতিহাস তোমার কপালেই লেখা আছে। তোমার শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে বাহাদুর বাপের রক্ত। তুমি পান করেছো কোন নেকবখত মায়ের দুধ। তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন কোন মুহতারাম উস্তাদ। এ বয়সের একজন নওজোয়ান গ্রানাডার আড়ম্বর ও জৌলুশ ত্যাগ করে কি কারণে এই বিরাণ এলাকায় চলে এসেছে সেই চমকপ্রদ কাহিনী শোনার জন্য আমি উদগ্রীব।'

সাদ কর্ডোভার বিপ্লব থেকে শুরু করে স্পেনের জাতীয় সমস্যার একটি পরিপূর্ণ চিত্র ও তার তৎপরতার একটি নিখুঁত ছবি আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের সামনে তুলে ধরল।

১০.

সাদ বিন মুনীম একজন মর্দে মুজাহিদ ও নিবেদিতপ্রাণ মুবাল্লিগ হিসাবে নিজেকে আল্লাহর রাহে সঁপে দিল। জেহাদের ময়দান থেকে ফিরেই সে আফ্রিকার উলামায়ে কেরামের সাথে চলে যেতো প্রত্যন্ত এলাকায়, ওখানকার অমুসলিম গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দিত দ্বীনের দাওয়াত। উপজাতীয়দের সামনে তাদেরই ভাষায় তুলে ধরতো ইসলামের সুমহান শিক্ষা। তার ভাষার সাবলীলতা ও আবেগময় কন্ঠের সুললিত বক্তৃতায় ওরা খুঁজে পেত জীবনের নতুন অর্থ, নতুন স্বাদ।

এভাবে সারাক্ষণ জিহাদী তৎপরতায় লিপ্ত থাকার পরও সাদের জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসতো যখন গ্রানাডার আকর্ষণ তাকে পেরেশান করে তুলতো। কখনো নির্জনে বসে বসে সে ভাবতো স্বজনদের কথা, কখনো বন্ধু-বান্ধব ও দ্বীনী কাফেলার সাথীরা এসে ভীড় করতো চোখের সামনে। কল্পনায় সে তাদের সাথে কথা বলতো, 'তোমরা মনে করছো আমি তোমাদের কথা ভুলে গেছি। না, আমি তোমাদের ভুলিনি। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি তোমাদের কাছে প্রত্যাবর্তনের।' কখনো মনে পড়তো মায়মুনার কথা। হৃদয় বীণায় শুনতে পেতো মিষ্টি মধুর গুঞ্জনধ্বনি। অজানা পুলকে আপ্লুত হতো, শিহরিত হতো। নিশুতি রাতে জোসনার চাদর গায়ে কোন বালুর টিবির ওপর বসে সে আকাশে তারকার খেলা দেখতো আর ভাবতো, মায়মুনা, তুমি কি ওই তারকার চাইতেও দূরে? এই চর্মচক্ষু ওদের দেখতে পায় কিন্তু তোমাকে তো পায় না! মনে মনেই সে ওকে প্রশ্ন করতো, এই মুহূর্তে তুমিও কি আমারই মত ওই তারকাদের জিজ্ঞেস করছো, হায়! কবে উঠবে স্পেনের আকাশে আজাদীর সূর্য? ভাবতো, মায়মুনা একা নয়, কওমের লাখো

যুবতী প্রতি রাতে এইসব তারকাদের এই একই প্রশ্ন করছে, কওমের যুবকেরা কবে এই আঁধারের রাজ্যে জ্বালাবে আজাদীর চেরাগ! কবে আঁধার পুরীতে জ্বলবে আশার প্রদীপ!

কখনো বাড়ি যাওয়ার কথা মনে হতো তার। ভাবতো, সরকার এখনো গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি রাখলে ছদ্মবেশে গেলে নিশ্চয়ই ধরতে পারবে না আমাকে। তবে বেশী দিন থাকা ঠিক হবে না। আমীর ইউসুফ সানন্দেই আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। একথা ভেবে সে আমীর ইউসুফের খিমায় চলে আসতো। কিন্তু এসে সেনাপতিদেরকে নতুন যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং আলেমদেরকে তাবলীগী অভিযানের আলোচনা করতে শুনে তার চিন্তার মোড় ঘুরে যেতো এবং কানে বাজতো পিতার অন্তিম কথাঃ 'আমাদের মাকসাদ আমাদের জীবনের চেয়েও বড়।'

রমজান মাস। সাদ মাসটি কাটিয়ে দিল সাবতায়। আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কয়েকটি মাস কাটিয়ে আসার কারণে অনেকদিন ঘরের কোন খবর পায়নি সে। মনের পেরেশানী দূর করার জন্য সাদ আহমদের নামে একটি পত্র লিখল এবং দূত মারফত গ্রানাডায় পাঠিয়ে দিল। ঈদের দুদিন পর ফিরে এলো দূত। আসার পথে গ্রানাডা থেকে নিয়ে এল দুটি পত্র। একটি ছিল মায়মুনার, অন্যটি শায়খ আবু সালেহ-এর। মায়মুনা লিখেছিলঃ

'মুহতারাম! আহমদ, হাসান ও আমার ভাই ইদ্রিস এখন বাড়ি নেই। কাজেই আপনার মুহতারাম আম্মাজানের হুকুমে আমি এ পত্র লিখছি। স্পেনের উলামায়ে কেরামের মিশন ব্যর্থ হয়েছে। কাজী আবু জাফর মুজাহিদদের গোটা স্পেনে ছড়িয়ে দিয়েছেন। হাসান সারকাস্তা ও আহমদ টলেডো গেছে। আপনার অন্যান্য বন্ধুরাও বিভিন্ন শহরে চলে গেছেন। যতটুকু জানতে পেরেছি, ইসলামের পক্ষে জনমত গঠন ও কর্মী সংগ্রহই তাদের এ অভিযানের মূল লক্ষ্য। প্রশাসনের কুকীর্তিও তুলে ধরবেন তারা। ভাইয়া ব্যবসার কাজে মালাগা গেছেন। আপনার আম্মাজানের একাকীত্ব অনুভব করে খালাজান আমাকে তাঁর কাছে থাকতে বলেছেন। তিনি প্রত্যেক নামাজের পরে এ দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! আমার ছেলেদেরকে ইসলামের পতাকা বুলন্দ করার হিম্মত দাও।' আমিও সবসময় আপনার কামিয়াবীর জন্য দোয়া করছি। আমার মাত্র একটি অনুযোগ, আপনি নিজের জন্য যে যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন তা আমাদের নাগালের অনেক দূরে। আল্লাহ জানেন, আঁধার রাতের এ মুসাফির কবে সুবহে সাদিকের পয়গাম নিয়ে ফিরবেন! আমরা সবাই সেই সুহাসিনী ভোরের ইন্তেজার করছি।'

ইতি— মায়মুনা।

শেখ আবু সালেহ তার চিঠিতে গ্রানাডা ও স্পেনের অন্যান্য এলাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'মুতামিদের হাতে ইবনে আম্মার নিহত হয়েছে। টলেডোর অধিবাসীরা তাদের শাসক ইয়াহইয়া জান্নুনের ওপর ক্ষীপ্ত হয়ে আছে। সেখানে গণবিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আলফানসুর সেনাবাহিনী সারকাস্তা,

ভ্যালেন্সিয়া ও সেভিলের সীমান্তে জড়ো হচ্ছে। স্পেনের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও হাতাশা বাড়ছে। কাজী আবু জাফরের মিশন খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। জনগণ এখন একমাত্র আফ্রিকার ইসলামী সালতানাতকেই তাদের সর্বশেষ ভরসা বলে মনে করছে। কাজী আবু জাফর কয়েকদিন গ্রানাডা থাকার পর টলেডো গেছেন। সম্ভবত এক মাস পর ফিরে আসবেন। তিনি তোমার খবরাখবর জানার জন্য পেরেশান হয়ে আছেন। আহমদের কাছে লেখা তোমার চিঠি কাজী আবু জাফর দেখেছেন, কিন্তু তাতে তার পেরেশানী বাড়া বৈ কমেনি।'

টলেডোর পথে আহমদ

সাদ ইবনে আবদুল মুনীমকে আফ্রিকার প্রান্তরে ছেড়ে দিয়ে আমরা এখন স্পেনের ইতিহাসের আর একটি পাতা ওলটাচ্ছি। ইবনে আম্মারের স্বেচ্ছাচারিতা সীমা লংঘন করেছিল। তোষামোদকারীরা উজিরের পরিবর্তে তাকে বাদশাহ নামদার বলে ডাকতো। তার প্রশংসা করে যারা কবিতা লিখতো তাদেরকে সে মুতামিদের সভাকবিদের চেয়ে বেশী ইনাম দিতো। মুতামিদের নায়েবে সালতানাত হিসাবে যখন সে মর্সিয়া রওনা হয় তখন চাটুকারদের এক বিরাট বাহিনী তার সংগ নেয়। তার বিলাস দ্রব্য বহন করে দুশ খচ্চর। পথে প্রতিটি শহরে শাহী অনুষ্ঠান করে। দুহাতে লোকদের দান করে অর্থ সম্পদ। অনুষ্ঠানে সে মুতামিদের মতোই মূল্যবান শাহী পোশাক ও মনিমুক্তা খচিত মুকুট পরতো।

সেভিলে তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ লোকের অভাব ছিল না। মুতামিদের আরেক দরবারী কবি ইবনে জায়দুন তাকে নিজের উন্নতির পথের সবচেয়ে বড় বাধা মনে করতো। ইবনে আম্মারের অনুপস্থিতির সুযোগ সে পুর্ণ সদ্ব্যবহার করে। ইবনে আম্মারের প্রতি ঈর্ষাকাতর সবাইকে সে হাত করে নেয়। মুতামিদের মতো আবেগপ্রবণ বাদশাহর মন ভারী করতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। মর্সিয়া থেকে এমন সব খবর আসছিল যা ইবনে আম্মারের কাল হল। গোয়েন্দারা জানাল, ইবনে আম্মার প্রভূর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মর্সিয়ায় এখন বলতে গেলে তারই শাসন চলছে।

মর্সিয়ার সাবেক শাসক ইবনে তাহের ছিল ইবনে আম্মারের হাতে বন্দী। তাকে অনুগত করার জন্য ইবনে আম্মার সব রকমের চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত ইবনে আম্মার ইবনে তাহেরকে তার পদচুম্বন না করা পর্যন্ত মুক্তি দেবে না বলে কসম খায়।

ভ্যালেন্সিয়ার শাসক ইবনে আবদুল আযীয ইবনে তাহেরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। মুতামিদের সাথেও তার সম্পর্ক ছিল ভাল। সে মুতামিদের কাছে ইবনে তাহেরের মুক্তির জন্য সুপারিশ করে। ফলে মুতামিদ ইবনে তাহেরকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য ইবনে আম্মারকে হুকুম দেয়। ইবনে আম্মার মুতামিদের এ হুকুমের পরোয়া করল না। কিন্তু ইবনে তাহের একদিন কয়েদখানা থেকে পালিয়ে ইবনে আবদুল আযীযের কাছে আশ্রয় নেয়। ইবনে আম্মার রাগে অন্ধ হয়ে ইবনে আবদুল আযীযের কুৎসা গীতি রচনা করল। ইবনে আবদুল আযীযের কাছে এ কবিতা পৌঁছলে সে মুতামিদের কাছে অভিযোগ করে। মুতামিদ রাগে ইবনে আম্মারের বিরুদ্ধে কবিতা লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। মুতামিদ লিখেছিলঃ

'ইবনে আম্মারকে চেনো?
গতকালও সে ছিল এক ভিখারী
দুটো পয়সার জন্য ধনীদের পায়ে মাথা ঠুকতো।
দয়া করে কেউ দুটো রুটির টুকরো দিলে
তার ঘরে চলতো ঈদের উৎসব।
তার সেই লাঞ্ছিত ও অবমাননাকর অবস্থা থেকে
তাকে যখন বড় পদে বসিয়ে দেয়া হলো
তখন সে বনে গেল বেকুব ও বেঈমান।'

এর জবাবে ইবনে আম্মার যে কবিতা লেখে সে কবিতাই তার পতন এবং মৃত্যু ডেকে আনে।

ইবনে আম্মার লিখেছিলঃ

'হে মুতামিদ!
তুমি এমন এক মেয়েকে পছন্দ করলে
যে ছিল এক বাঁদী। আর সে এমন হীন বাঁদী
যার মালিক এক বছরের উটের বাচ্চার বিনিময়ে
বিক্রি করে দিল তাকে। তোমাকে লজ্জা দেবার জন্য
তার পেট থেকে বেরিয়ে আসে তিন
ব্যভিচারিণী কন্যা ও দুই বদমাশ পুত্র।
হে মুতামিদ!
তোমার বংশজাতির দুর্গন্ধে সারা দুনিয়ার মানুষ
নাকে রুমাল দিচ্ছে, আর তোমার পাপ
সাগরের সব পানি ও পৃথিবীর
সব বাতাসকে কলুষিত করে ফেলেছে।'

ইবনে আম্মার এ কবিতাটি লিখেছিল ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে। ইবনে আ নল

আযীযের চর সে কবিতা উদ্ধার করে। কবিতাটি ইবনে আবদুল আযীয মুতামিদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তোশামোদকারী বন্ধুরা তার পতনের আলামত দেখে তার সংগ ত্যাগ করল। ইবনে আম্মারের লোক দেখানো বিরাট বিরাট ভোজ সভা ও আয়েশী জীবন যাপনের কারণে মর্সিয়ার অর্থভাণ্ডার খালি হয়ে গিয়েছিল। সৈনিকরা কয়েক মাস থেকে বেতন বঞ্চিত। তারা নিরুপায় হয়ে ইবনে আম্মারকে হুমকি দিল। জনসাধারণ তাকে কর দিতে অস্বীকার করল। তার প্রশংসাকারীরা তার কুৎসা গাইতে শুরু করল।

ইবনে আম্মারের কর্তৃত্বের নেশা ছুটে গেল। সে মর্সিয়া ত্যাগ করে আলফানসুর কাছে গিয়ে সাহায্যের আবেদন করল। কিন্তু পতনোন্মুখ প্রাসাদের নূতন ঠিকানোর দায় আলফানসু নিতে রাজি হলো না। নিরাশ হয়ে ইবনে আম্মার স্পেনের তামাম খৃস্টান শাসকদের কাছে ছুটে বেড়াল। অবশেষে বনি সাহ্‌ল তাকে গ্রেফতার করে তুলে দিল মুতামিদের হাতে।

এক সময় ছিল যখন ইবনে আম্মার সেভিলে প্রবেশ করতো বাদশাহী জৌলুশ নিয়ে। কিন্তু এবার প্রবেশ করল বন্দী রূপে। তার পোশাক ছিল ছিন্ন ভিন্ন। শিকলের বোঝা বহন করতে করতে তার হাত পা জখম হয়ে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। এক সময় যে সব ভক্তের দল আবেগাপ্লুত হয়ে তার হাতে চুমো দিতো তারাই তাকে বিদ্রুপ করছিল। যে মস্তকে সে একদিন এক বিঘত উঁচু মনিমুক্তা ও কারুকার্য খচিত মুকুট পরতো সে মস্তক এখন লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিল।

মুতামিদ তার বাপের মতো চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল না। সম্ভবত ইবনে আম্মারের অতীতের কথা স্মরণ করে সে তাকে মাফ করে দিত। কিন্তু রেমিকা ও তার ছেলেরা ছিল তার খুন পিয়াসী। অবশেষে তাদেরই চাপে একদিন মুতামিদ নিজ হাতে তাকে হত্যা করল।

২.

মামুন জান্নুনের মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াহইয়া আল কাদির টলেডোর মসনদে বসল। ইয়াহইয়া আল কাদির ছিল দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির। মহলের খোজাদের ইশারায় চলতো সে। কর্ডোভা জয়ের চেষ্টায় মৃত্যুর আগে তার পিতা টলেডোর অর্থভাণ্ডার খালি করে দিয়েছিল। ফলে আলফানসুর বার্ষিক খাজনা পরিশোধের অর্থ সংগ্রহ করা তার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। বাধ্য হলো সে প্রজাদের ওপর কর বাড়াতে। আলফানসুর সাথে তাল রেখে ইয়াহইয়াও প্রতি বছর নিজের প্রজাদের ওপর কর বাড়াতেই লাগল। জনগণকে নিঃস্ব করে নজর দিল আমীর ওমরাদের দিকে। হুমকি দিয়ে বলল, 'নইলে আমি তোমাদের সন্তানদেরকেই আলফানসুর হাতে তুলে দেবো।'

টলেডোর জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে পুলিশ বিদ্রোহী নেতাদের গ্রেফতার করতে

শুরু করল। বন্দী দিয়ে টলেডোর কয়েদখানা ভরে তোলার পরও জনতার বিক্ষোভ প্রশমিত হলোনা। নতুন কয়েদী রাখার জন্য ইয়াহইয়া পুরাতন কয়েদীদেরকে সীমান্তবর্তী কেল্লায় পাঠিয়ে দিতে লাগল। এভাবেই আবদুল মুনীম ও তার দুই সংগীকে টলেডোর বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ইবনে আক্কাশা ও মামুন কর্ডোভা দখল করে তাদের পাঠিয়েছিল টলেডো, এবার সেখান থেকে তাদের পাঠানো হল সীমান্তবর্তী কারাকক্ষে। টলেডোয় তাদের রাখা হয়েছিল এমন এক ভূগর্ভস্থ কক্ষে, যেখান থেকে কারো ফরিয়াদ বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। এখানকার কয়েদীরা মুক্তির পরিবর্তে অপেক্ষা করতো মৃত্যুর জন্য। তাদের পাহারা দিত বোবা ও বধির সৈনিকরা। যারা কথা বলতে বা শুনতে পারে এমন কারো অনুমতি ছিল না এ কক্ষের আশপাশে আসার।

টলেডোর কারাগার থেকে আবদুল মুনীমদের সাথে তারা প্রায় নব্বুই জনকে সীমান্তে পাঠানোর মাত্র দু সপ্তাহের মধ্যেই নতুন কয়েদীতে ভরে গেল টলেডোর কয়েদখানা। ফলে এদের মধ্য থেকেও আবার দেড়শ কয়েদীকে পাঠানো হল সীমান্ত কেল্লায়। এই কয়েদীদের মুখেই আবদুল মুনীমরা জানতে পারে ইয়াহইয়া আলফানসুর কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। ফলে আলফানসু তার কিছু সৈন্য পাঠিয়ে টলেডোয় ব্যাপক জুলুম নিপীড়ন ও অত্যাচারের সয়লাব বইয়ে দিচ্ছে।

৩.

কাজী আবু জাফরের নির্দেশ পেয়ে আহমদ ইবনে আবদুল মুনীম টলেডোর পথে রওনা হয়েছিল। টলেডোর সীমানায় পা দিয়েই সে জানতে পারল, আলফানসুর খেই মেটাতে গিয়ে ইয়াহইয়া এবার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এমনকি আমীরদের ওপরও চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এতদিন যে ধনিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কোন আগ্রহ ছিল না তারাও জনগণের কাতারে এসে শামিল হল। কাজেই শহরের অলিতে গলিতে ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ চলছিল। পুলিশ বিদ্রোহ দমনের জন্য যতই কঠোর হচ্ছিল, 'স্বৈরাচারের পতন চাই' বলে জনতার শ্লোগানও ততই সোচ্চার হচ্ছিল। শহরের শত শত প্রভাবশালী লোক কারাগারে বন্দী হল, কিন্তু তাতে বরং উত্তাল গণজোয়ার কিছুমাত্র কমল না।

আহমদ আরো জানতে পারল, ইয়াহইয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে আলফানসু সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে টলেডোয়। এই খৃস্টান সৈনিকরা অত্যাচারের তুফান নিয়ে এসেছে সাথে করে। গণজোয়ার রোধের জন্য তারা নির্বিচারে গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা চালাতে লাগল।

আহমদের কাছে কাজী আবু জাফর টলেডোর আলেম আবু ইয়াকুবের নামে একটি পত্র দিয়েছিলেন। আবু ইয়াকুব থাকতেন শহরতলীর এক গ্রামে।

একদিন সন্ধ্যা।

আহমদ শহরতলীর ছোট এক সরাইখানার দরজায় এসে ঘোড়া থেকে নামল। তের চৌদ্দ বছরের এক কিশোর এসে লাগাম ধরল ঘোড়ার। আহমদ জিজ্ঞেস করল, 'এখানে আজ রাতে থাকা যাবে?'

কিশোরটি জবাব দিল, 'থাকতে তো পারবেন কিন্তু ....!'

ছেলেটির ইতস্তত ভাব দেখে আহমদ বলল, 'কিন্তু কি?'

'কিছু না। আপনি সরকারী লোক হলে এখানে থাকতে চান কেন?'

'আমি একজন মুসাফির।'

'শহরে পরিচিত কেউ নেই?'

'থাকলেও তাদের বাসা চিনি না। সন্ধ্যা হয়ে এলো [illegible], তাই আজ আর খুঁজতে চাচ্ছি না। মালিক কোথায়?'

'আমি তার ছেলে।'

'বেশ, তাহলে তুমি ঘোড়াকে পানি ও ঘাস দাও। আমি নামাজ পড়ে আসছি।'

কিশোর ঘোড়ার গর্দানে হাত বুলিয়ে বলল, 'বাঃ! ঘোড়াটি তো বেশ সুন্দর।'

আহমদ বলল, 'তা বটে, তবে এখন তার আদরের চাইতে বেশী দরকার খাবার।'

কিশোর ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে বলল, 'ঠিক, মসজিদ ওদিকে, আপনি নামাজ পড়ে আসুন।'

আহমদ মসজিদে ঢুকে দেখল মাত্র কয়েকজন মুসল্লি নামাজে দাঁড়িয়েছে। সে এর কারণ জানতে চাইলে এক মুসল্লি বলল, 'মনে হচ্ছে এ এলাকায় আপনি নতুন। এ কয়জন যে আসতে পেরেছে এই তো ঢের। কার্ডিজের খৃস্টান সিপাইদের ভয়ে মুসলমানরা এখন সহজে ঘরের বাইরে আসে না। সন্ধ্যার পরপরই দেখবেন এলাকা নিঝুম পুরীতে পরিণত হয়েছে।'

আহমদ নামাজ পড়ে বেরোতেই দেখল সরাইখানার ছেলেটি দৌড়ে তার দিকেই আসছে। আহমদকে দেখেই সে ছুটে তার কাছে এসে বলল, 'এদিকে আসুন।'

আহমদ তাকে নিয়ে রাস্তার এক পাশে সরে দাঁড়াল। মুসুল্লিরা তাদের খেয়াল করছে না দেখে সে বলল, 'আপনি যদি সত্যিই এ শহরে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আর সরাইখানায় যাবেন না।'

'কেন?'

'সিপাইরা আপনার ঘোড়া নিয়ে গেছে। তারা আপনার কথা জিজ্ঞেস করলে আমি বলেছি, আপনি কোন আত্মীয়ের সাথে দেখা করার জন্য শহরে গেছেন। সিপাইরা ওখানে আপনার অপেক্ষায় বসে আছে।'

'কিন্তু কেন? আমি তো কোন অপরাধ করিনি।'

'কে বলেছে অপরাধ করেন নি, বিস্তর করেছেন। এত সুন্দর ঘোড়া সাথে রাখা কি কম অপরাধ? এখানে একটি সুন্দর ঘোড়া রাখার জন্য তার দামের চাইতে বেশী ট্যাক্স দিতে হয়। ট্যাক্স হিসাবেই ঘোড়াটি তারা নিয়ে গেছে। নিজেকে একজন সরকারী কর্মচারী প্রমাণ করতে না পারলে আপনার ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করা হবে। আপনি সরাইখানায় গেলেই তারা আপনার দেহ তল্লাশী করবে। আপনার কাছে যা কিছু পাওয়া যাবে তা সবই সরকারী কোষাগারে চলে যাবে। আর সশস্ত্র অবস্থায় বের হওয়ার অপরাধে আপনাকে বন্দী করা হবে। পুলিশের প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলে সরাইখানায় যান নইলে এখান থেকেই কোন পরিচিত জনের কাছে চলে যান। কিছুক্ষণ পরেই শহরের প্রবেশ দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। তখন রাস্তায় কার্ডিজের রক্ত পিপাসু সিপাইদের ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাবেন না।'

আহমদ বলল, 'ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে খাটো করতে চাই না। শহরে আমার পরিচিত কেউ নেই। শহরের পূর্ব দিকের এক গাঁয়ে এক জনের কাছে আমার যেতে হবে। তুমি আমাকে শহরতলীর সে গাঁয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিতে পারো।'

ছেলেটি বলল, 'আসুন।'

আহমদ ছেলেটির সাথে চলতে লাগল।

৪.

চাঁদনী রাত। শহরতলীর সমস্ত সড়ক ও অলিগলি নির্জন ও বিরাণ দেখাচ্ছিল। কোথাও টলেডো বা কার্ডিজের কোন সিপাইকে দেখতে পেলে ছেলেটি আহমদকে নিয়ে অন্য পথ ধরতো। এক চৌরাস্তায় এসে ছেলেটি নিজের বাঁদিকে ইশারা করে বলল, 'দেখুন, এ রাস্তা সোজা নাহেল পল্লী পর্যন্ত গেছে। কিন্তু খুবই সতর্ক থাকবেন। ঐ গাঁয়ের কয়েকজন এরই মধ্যে গ্রেফতার হয়ে গেছে এবং কয়েকজনের ফাঁসিও হয়েছে। কার্ডিজের সিপাইরা এ সময় কোন সশস্ত্র ব্যক্তিকে দেখলে কোন জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই তাকে হত্যা করে ফেলবে। আপনি চাইলে বিপদ মাথায় নিয়েও আমি আপনাকে পৌঁছে দিতে প্রস্তুত আছি।'

আহমদ বলল, 'ধন্যবাদ, অনেক করেছো তুমি, এবার ফিরে যাও।'

কিশোরটি বলল, 'পথে একটি মসজিদ দেখতে পাবেন। ওখানে আপনাকে সাহায্য করার মত কাউকে পেয়ে যেতে পারেন।'

আহমদ বলল, 'তুমি একা ফিরতে ভয় পাবে না তো?'

'না, আপনার সাথে চলার চাইতে একা চলা অনেক নিরাপদ।'

আহমদ মসজিদের কাছে পৌঁছে চারজন সিপাইকে দেখতে পেল। সে দ্রুত রাস্তার পাশে এক গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। সিপাইরা মসজিদের কাছে কিছুক্ষণ কথা বলে চলে গেল। আহমদ গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে মসজিদে ঢুকে পড়ল। ভিতরে মোমবাতি জ্বালিয়ে এক বৃদ্ধ নামাজ পড়ছিলেন। আহমদও এশার নামাজ পড়ে নিল। তার নামাজ শেষ হলে দেখতে পেল বৃদ্ধ গভীর ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আহমদ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এ মসজিদের ইমাম?'

বৃদ্ধ পেরেশান হয়ে জবাব দিলেন, 'না, এ মসজিদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। নদীর ওপারে আমার গ্রাম। একটি জরুরী কাজে শহরে গিয়েছিলাম। ফিরতে দেরী হওয়ায় আটকে গেলাম। কাছেই আমার দূর্সম্পকের এক আত্মীয়ের বাসা আছে। তার বাড়ি গিয়েছিলাম থাকতে। কিন্তু ওরা আমাকে থাকতে দিতে রাজি হলো না। কাজেই বাধ্য হয়ে মসজিদে চলে এসেছি।'

আহমদ বলল, 'আমি এ এলাকায় একেবারে নতুন। আজই সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছেছি। যদি কষ্ট করে আমাকে শেখ আবু ইয়াকুবের বাড়ি যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেন, আমার খুব উপকার হয়।'

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আহমদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ সময় তাঁর বাড়ি পর্যন্ত আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারবো না। তবে খুবই জরুরী হলে মসজিদ থেকে বের হয়ে ডান দিকে সোজা চারশ কদম এগিয়ে যাবেন। ওখানেই তার মাদ্রাসার গেট। গেটের পাশে গাছের আগায় দেখতে পাবেন পাঁচটি লাশ ঝুলছে। মাদ্রাসার পাশ ঘেঁষে যে সরু গলি ঢুকে গেছে সেই গলি ধরে পনের বিশ কদম এগুলেই বাঁদিকে একটি তিন তলা বাড়ি দেখতে পাবেন। এটিই শেখ আবু ইয়াকুবের বাড়ি। কিন্তু তিনি .... !' বৃদ্ধ আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে খামুশ হয়ে গেলেন।

আহমদ জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কি?'

'না, কিছু নয়। যদি আপনি মনে করেন, সশস্ত্র থাকার পরও কার্ডিজের সিপাইরা আপনাকে কিছু বলবে না, তাহলে আপনি যেতে পারেন।'

আহমদ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ওখানে। তারপর আর কোন কথা না বলে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলো। মাদ্রাসার সামনে গাছের উঁচু ডালে ঝুলছিল পাঁচটি লাশ। এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে কেঁদে উঠল তার অন্তর। ভয়ের পরিবর্তে সেখানে জন্ম নিল ক্রোধ ও শপথের দৃঢ়তা। আহমদ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'টলেডোর স্বাধীনতাকামী ভাইয়েরা! আমি তোমাদের সালাম জানাই। কত মহীয়ান তোমাদের মৃত্যু! মরেও অমর তোমরা। আমরা কোনদিন ভুলবো না তোমাদের এ আত্মদানের কথা।'

গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল আহমদ।

৫.

শেখ আবু ইয়াকুবের বাড়ি। আহমদ এসে দাঁড়াল বাড়ির দরজায়। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিল আহমদ। কিন্তু কোন জাবাব পেলোনা। হঠাৎ গলিতে দুজন সিপাই ঢুকল। তারা কার্ডিজের ভাষায় কথা বলতে বলতে গলি পথে এগিয়ে আসছে। আহমদ তলোয়ার বের করে সিঁড়ির ছায়ায় সিটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক সিপাই তার সাথীকে বলছিল, 'আজ তো কোন শিকার পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা হতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে সব। কারোর নিঃশ্বাসের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না।'

অন্যজন বলল, 'গতকাল যে পাঁচজনকে ফাঁসিতে লটকেছি তার প্রভাব পড়েছে।'

'কিন্তু দোস্ত, সবাই তো এলাকা খালি করে পালিয়ে যাচ্ছে। শহর খালি হয়ে গেলে শিকার মিলবে কোত্থেকে?'

'শিকারের দরকার কি? তখন শহরের সব বাড়িঘর হবে আমাদের। আমি তো এ তিনতলা বাড়িটি নিজের জন্য বাছাই করে রেখেছি।'

কথা বলতে বলতে ওরা দরজার কাছাকাছি চলে এল। আহমদের বুক ধুকপুক করছিল।

এক সিপাই সিঁড়িতে বসতে বসতে বলল, 'আরে ইয়ার! একটু বসো, জিরিয়ে নাও। আমি একবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

দ্বিতীয় সিপাইটিও তার পাশে বসে পড়ল। তাদের দুজনের পিঠই ছিল আহমদের দিকে। একজন বলল, 'শুনেছো, শহরে আরো তিন জনকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে।'

দ্বিতীয় জন বলল, 'সেখানে আমাদের সাথীরা বেশ মজায় আছে। তারা স্থানীয় পুলিশকে কোন না কোন ভাবে এদিকে ওদিকে সরিয়ে দিয়ে কোন ঘরের দরজা ভেঙ্গে মৌজ করছে আর আমাদের এখানে মদ খেয়ে চলাফেরা করারও অনুমতি নেই।'

প্রথম জন বলল, 'শহরে আমাদের সিপাইদের সংখ্যা টলেডোর চাইতে কমতো, তাই। কার্ডিজ থেকে আমাদের আরো সিপাই এসে গেলে তখন আমাদের স্বাধীনতায় আর কেউ বাদ সাধতে পারবে না। তখন শহরের সব সহায়, সম্পদ, অট্টালিকাই আমাদের হয়ে যাবে। চলো এবার যাওয়া যাক।'

এক সিপাই উঠে সাথীর হাত ধরে তুলতে গেল, হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল দরজার ওপর। 'কে ওখানে?' সে নিজের তলোয়ার কোষ মুক্ত করতে করতে চিৎকার করে উঠল।

আহমদ বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে এসে তার তলোয়ার সোজা সৈনিকটির বুকে ঢুকিয়ে দিল। দ্বিতীয় জন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল, আহমদ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কার্ডিজের সিপাই নিজের তলোয়ার দিয়ে আহমদের আঘাত ঠেকাতে ঠেকাতে পিছে হটছিল আর সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল। আচানক আহমদের তলোয়ার তার গর্দানে

আঘাত করল এবং সে হৃদয় বিদারক চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল। আহমদ আবারো তার তলোয়ার উঠাল এবং এক কোপে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিল। মহল্লার লোকেরা ঘরের জানালা খুলে গলির মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল। আহমদ আবার দ্রুত দরজার সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

হঠাৎ সে অনুভব করল দরজা ভেতরের দিকে সরে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর সে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

অন্ধকার ঘরের কোণ থেকে নারী কণ্ঠের আওয়াজ এলো, 'কে তুমি?'

আহমদ জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল, 'এটা কি শেখ আবু ইসহাকের বাড়ি?'

অন্ধকার থেকে সরে এসে সেই যুবতী দরজা পথে বাইরে উঁকি দিল। বলল, 'তোমার এই বাহাদুরীর জন্য অনেক চড়া মূল্য দিতে হবে মহল্লাবাসীকে। তারা কাউকে জীবিত ছাড়বে না। যা বলছি দ্রুত করো, লাশগুলো ভেতরে আনো। ওদের সাথীরা এসে পড়লে উপায় নেই। আলী! দাঁড়িয়ে কি দেখছো?'

আহমদ দ্রুত বাইরে এসে একটি লাশের ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এলো। দেউড়ি থেকে এক বৃদ্ধ ভয়ে ভয়ে বাইরে বেরিয়ে দ্বিতীয় লাশটি টেনে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। আহমদ ফিরে এসে বলল, 'ছাড়ুন, আমি নিচ্ছি, আপনি তলোয়ারগুলো নিন।'

আহমদ দ্বিতীয় লাশটি ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় সামনের বাড়ির ছাদ থেকে এক লোক বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আলী! জলদি ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও। সড়কের সিপাইরা প্রায় গলির মুখে এসে গেছে। চাঁদ আরেকটু নীচে নামলে আমি তোমাদের ডাকবো। ভোর হওয়ার আগেই রক্তের চিহ্ন ধুয়ে ফেলতে হবে। লাশগুলোকে কোথাও ভালোভাবে লুকিয়ে ফেলো। দ্রুত করো।'

আলী ভিতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিল। আহমদ কিছুক্ষণ খামুশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধকারে সে কেবল অনুভব করছিল এক বুড়ো ও একটি মেয়ে তার ধারে কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

বৃদ্ধ ফিসফিস করে বলল, 'এখন এই লাশ দুটি নিয়ে কি করবো?'

মেয়েটি বলল, 'আপাতত কুতুবখানার পাশের কামরায় রাখো। না, দাঁড়াও, সম্ভবত ওরা আসছে।'

আহমদ কপাটের গায়ে কান লাগাল। গলিতে সৈনিকদের বুটের আওয়াজ শোনা গেল। মেয়েটিও আহমদের পাশে দাঁড়িয়ে কপাটে কান লাগাল। বলল, 'ওরা এদিকেই আসছে।'

আহমদ পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কার্ডিজের ভাষায় বলল, 'এদিকে তো কেউ নেই। তুমি খামোখা আমাকে পেরেশান করলে।'

'সত্যি বলছি, আমি কারো চিৎকার শুনেছি। এই গলিতে না পেলে পাশেরটায়

চলুন।'

সৈনিকরা দ্রুত গলি পথে সামনের দিকে এগিয়ে গেল এবং একটু পরে একই গতিতে সড়কের দিকে ফিরে গেল। যাওয়ার সময় একজন বলছিল, 'হতে পারে আমার ভুল। তবুও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কাল থেকে আমি একটি বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করছি, সকালে যারা কাজ করতে বাইরে যায় তাদের অধিকাংশই আর সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে না। এখানে এখন বুড়োরা ছাড়া আর কেউ নেই।'

দ্বিতীয় জন বলল, 'ঠিকই বলেছো। জোয়ানরা পালাতে পারে, বুড়োরা পারে না।'

সৈনিকরা চলে গেলে যুবতী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আলী, ওকে সাথে নিয়ে তুমি লাশ দুটো সরাও, আমি বাতি জ্বালছি।'

উঠোন পেরিয়ে যুবতী অন্দরে চলে গেল। আহমদ একটি লাশ কাঁধে তুলে আলীকে বলল, 'পথ দেখান।'

যেতে যেতে আহমদ আবার মুখ খুলল, 'আপনি শেখ আবু ইয়াকুবের ......'

'আমি তার নওকর।'

'উনি কি বাড়ি আছেন?'

'না, উনি গ্রেফতার হয়ে গেছেন।'

আহমদ আর কোন কথা না বলে লাশ নিয়ে কুতুবখানার পাশের কামরায় ঢুকল।

৬.

লাশ নিয়ে আহমদ কুতুবখানায় প্রবেশ করল। দেখতে পেল এক যুবতী বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। প্রথম দৃষ্টিতেই আহমদ অনুভব করল, একটু আগে অন্ধকারে এ যুবতী সম্পর্কে ওর মনে যে ধারণা কাজ করছিল তার সবই ভুল। শত উদ্বেগ আর নিরাশার ঝাপটাও তার কমনীয় চেহারা থেকে মাধুর্য ও মায়া মমতা কেড়ে নিতে পারেনি। বরং অন্ধকারে মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এলে যেমন তা আরো উজ্জ্বল ও মোহময় হয়, তেমনি তার চেহারায় ও চাহনিতে লেপ্টে আছে হৃদয়ে শিহর তোলা স্নিগ্ধতা ও কোমলতা।

আহমদকে দেখা মাত্রই যুবতী অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আহমদ আলীকে লক্ষ্য করে বলল, 'লাশগুলো কোথাও দাফন করে ফেললে ভাল হতো না?'

আলী জবাবের আশায় যুবতীর দিকে তাকাল। যুবতী বলল, 'না, এত সময় আমাদের হাতে নেই। আপনি জলদি করুন।'

আলী কুতুবখানার পাশে এক খুপরির পাল্লা খুললে আহমদ লাশগুলো সেখানে রেখে ফিরে এল কুতুবখানায়। বলল 'লাশগুলো এখানে বেশীক্ষণ রাখা বিপজ্জনক হতে পারে। কাল এগুলো থেকে এত দুর্গন্ধ বেরোবে যে, বাড়িতে থাকাই দায় হয়ে যাবে।

আর কার্ডিজের সিপাইরা দুর্গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলে আসবে এখানে। দাফনে আপত্তি থাকলে একটু পর চাঁদ ডুবে গেলে আমি এগুলো কাঁধে করে চৌরাস্তায় নিয়ে ফেলে আসতে চাই।'

যুবতী বলল, 'কাল পর্যন্ত আমরা এখানে থাকবো না, ফলে এগুলো আমাদের কোন বিপদের কারণও হবে না।'

'আপনারা কোথায় যাবেন?'

'এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে আমি জানতে চাই, এই দুঃসময়ে আপনি কোথেকে এবং কেন এখানে এসেছেন?'

আহমদ বলল, 'আমাকে গ্রানাডা থেকে কাজী আবু জাফর পাঠিয়েছেন। শেখ আবু ইয়াকুবের নামে তিনি আমার কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন। আপনাদের নওকরের কাছে শোনলাম তিনি বন্দী হয়ে গেছেন। আজ সন্ধ্যায়ই আমি এখানে পৌঁছেছি। শহরের বাইরে একটি সরাইখানায় উঠেছিলাম। ওখানে রাত কাটিয়ে সকালে এখানে আসবো মনে করেছিলাম। কিন্তু সরাইখানার কাছে এক মসজিদে আমি যখন মাগরিবের নামাজ পড়ছি তখন পুলিশ এসে আমার ঘোড়াটি নিয়ে যায় এবং আমাকে পাকড়াও করার জন্য দুজনকে রেখে যায় ওখানে। সরাইখানার মালিকের ছেলে ছুটে এসে আমাকে এ খবর দিলে বন্দী হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাই আমি। ছেলেটিই আমাকে আপনাদের গাঁয়ের পথ দেখিয়ে এগিয়ে দিয়ে গেছে।'

যুবতী চমকে উঠে বলল, 'আব্বার সাথে দেখা করতে এসেছেন, এ কথা কি তাকে বলেছেন?'

'না এসব তাকে কিছু বলিনি। ছেলেটির দেখানো পথে আপনাদের গাঁয়ে এসে আমি প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করি। সেখানেই একজনকে আপনার আব্বার নাম বললে তিনি আমাকে এ বাড়ির পথ দেখিয়ে দেন।'

'যদি উনি সরকারের গোয়েন্দা হন?'

'না, বরং তিনিই আমাকে সরকারের চর বলে সন্দেহ করছিলেন। এ জন্যই তিনি আপনার আব্বার গ্রেফতারীর খবর আমাকে দেননি। আফসোস, আপনাদের এ অবস্থার কথা আমার জানা ছিল না। জানলে এ সময় আপনাদের বিরক্ত করতাম না।'

যুবতী বলল, 'কাজী আবু জাফর আব্বাজানের দোস্ত। তিনি টলেডো এলে সবসময় আমাদের বাড়িতেই উঠতেন। আপনাকে কেন তিনি পাঠিয়েছেন আমাকে খুলে বলতে পারেন।'

'স্বৈরাচার ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সারা দেশে যে আন্দোলন চলছে আমি সে আন্দোলনের একজন নগন্য কর্মী। আপনার আব্বার মাধ্যমে আমি এখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। আপনার আব্বা বন্দী। এখন আপনিই আমার ভরসা। আপনি কি আমাকে এ ব্যাপারে একটু সাহায্য করবেন?'

যুবতী দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলল, 'ভিনদেশী এক যুবককে আমি আমাদের সমস্যা ও দুঃখ দুর্দশার মধ্যে টেনে আনতে চাই না। এখানকার অবস্থা খুবই নাজুক। এ অবস্থায় আমাদের সাথে নিজেকে জড়ালে আপনি অহেতুক বিপদে পড়বেন।'

'কিন্তু এখন তো আমার কারণে আপনারা এবং সেই সাথে পুরো মহল্লাবাসী মুসিবতে পড়ে গেলেন। আপনাদের এভাবে মুসিবতে ফেলে আমিই বা সরে পড়ি কি করে?'

'আপনি জানেন না, ওরা বিদ্রোহীদের সাথে কি নিষ্ঠুর আচরণ করে।'

'আমি জানি। মাদ্রাসার সামনে ঝুলন্ত লাশগুলো আমি দেখেছি। এখানকার পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ সে উপলব্ধি আমার আছে। কিন্তু নির্বিচারে এ জুলুম তো মুখ বুঁজে সহ্য করা যায় না। এর একটা বিহিত আমাদের করতেই হবে।'

'ওই লাশগুলো?' যুবতী বেদনা ভরা কণ্ঠে বলল, 'দুসপ্তাহ আগে আমার ভাই ও চাচাকে ঐ একই জায়গায় ফাঁসি দেয়া হয়েছে।'

যুবতীর চোখে ছিল অশ্রুর সাথে প্রতিহিংসার আগুন। আহমদের মনের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। সে মাথা নত করে আবেগ সামলাতে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে ছিল। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর যুবতী আলীকে বলল, 'আলী, আজই আমরা ওখানে চলে যাবো। চাঁদ ডুবে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা যাত্রা করবো। অন্ধকারে তুমি পথ চিনতে পারবে তো?'

আলী বলল, 'আপনি কি আবদুল ওয়াহিদের কাছে যেতে চান?'

'হ্যাঁ।'

আহমদ জিজ্ঞেস করল, 'আবদুল ওয়াহিদ কে?'

'এখন তিনিই আমাদের পরিচালক। যদি আপনি আমাদের মুসীবতে শরীক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনিও আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য তৈরী হোন।'

আহমদ শান্ত স্বরে বলল, 'আপনাদের মুসীবতে শরীক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই তো আমি গ্রানাডা থেকে যাত্রা করেছিলাম।'

যুবতী আলীকে লক্ষ্য করে বলল, 'আলী, তুমি একটু তালহাদের বাড়ি যাও। তার চাকর সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে বলবে, আমরা যাচ্ছি। সে যেন বেলা উঠার আগেই সিঁড়ি থেকে রক্তের দাগ মুছে ফেলে। গলি পার হওয়ার আগে ভাল করে এদিক ওদিক দেখে নিও। আমি ততক্ষণে যাওয়ার জন্য গুছিয়ে নিচ্ছি।'

আহমদ আলীকে বলল, 'চলো, আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি।'

আলী ও আহমদ বেরিয়ে গেল। যুবতী বাতি নিয়ে চলে গেল ওপর তলায়। একটু পরেই আলী ও আহমদ ফিরে এল। চেয়ারে বসতে বসতে আহমদ বলল, 'আমার তীর ধনুক সরাইখানায় ফেলে এসেছি। এখান থেকে ধনুক এবং যতগুলো সম্ভব তীর নিয়ে নাও। পথে দরকার হতে পারে।'

'এখনই আনছি।' বলে আলী পাশের কামরা থেকে একটি ধনুক এবং তীর ভর্তি তূন নিয়ে এলো।

আলীর সাথে কথা বলতে বলতে আহমদ এক সময় চিন্তার সাগরে ডুবে গেল। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে অনুভব করল জীবন কোন কবিতা নয়, কোন কুসুম কোরক নয়। খুন-খারাবী কখনোই তার পছন্দনীয় ছিল না, কিন্তু জীবনে এই প্রথম দুই দুশমনকে হত্যা করে সে অনুভব করল, নরপশুদের খতম না করলে মানবতাকে বাঁচানো যায় না। ফুলের মিষ্টি হাসির মধ্যে যে শিশু দুনিয়ায় চোখ মেলেছিল, পরিস্থিতি আজ তাকে তরবারী ধরতে বাধ্য করছে। যে সমাজ ব্যবস্থা লাখো মানুষের মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে আহমদের অন্তরে জমা হচ্ছিল ক্ষোভ, ঘৃণা ও সোচ্চার প্রতিবাদ।

সে মনে মনে বলছিল, স্পেন এক সময় জান্নাত ছিল। কিন্তু কতিপয় স্বার্থান্ধ লোক এ জান্নাতকে জাহান্নামে পরিণত করেছে। কুচক্রী শাসকদের শয়তানের কারণে পৃথিবী নামক আল্লাহর বাগান আজ কন্টকাকীর্ণ জংগলে পরিণত হয়েছে। কয়েকজন লোকের বে-দ্বীনি ও গুমরাহীর কারণে লক্ষ লক্ষ লোক ভোগ করছে দুঃখময় সাজা। আল্লাহ দুনিয়াকে কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু মানুষ তাকে বিকৃত ও বিভৎস করে ফেলেছে।

আহমদের মন বার বার ছুটে যাচ্ছিল সেই যুবতীর কাছে, যার পিতা আজ জিন্দানখানায় বন্দী, যার ভাই ও চাচাকে বাড়ির কাছের চৌরাস্তায় ফাঁসি দেয়া হয়েছে, যার মোমের মত কোমল বুকে এখন জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। আহমদ ভাবছিল, এক যুবতীর মুসীবত ও পেরেশানী দেখে আমি এতো অস্থির, চঞ্চল, পাগলপারা। অথচ এ পশুর দল স্পেনে এমন হাজার হাজার কন্যা ও বোনের জীবনের আনন্দ হরণ করে নিয়েছে। তার বিবেক তাকে ডেকে বলছিল, আহমদ, সুললিত কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করে আসর মাত করার জন্য নয়, বরং মর্মভেদী চিৎকারে দুনিয়াকে জাগিয়ে তোলার জন্যই তুমি জন্মগ্রহণ করেছ।' তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল পিতার মুখের ছবি। সে ছবি যেন তাকে ডেকে বলছে, 'আহমদ, উঠো, দাঁড়াও। যুগের নমরূদ ও ফেরাউনদের কলিজা বিদীর্ণ করে দাও। আল্লাহর আলম থেকে বিতাড়িত করে দাও ইবলিস শয়তানদের। পৃথিবীর বাগান আবাদ করে দাও ফুলে ফলে। যেখানে নিরাপদে বাস করতে পারবে তোমার মা, তোমার বোন এবং আগামী প্রজন্ম।

কারো পায়ের শব্দে আহমদ ফিরে তাকাল এবং এক লাফে চেয়ার ছেড়ে তরবারি হাতে উঠে দাঁড়াল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লৌহবর্ম পরা এক সৈনিক। সৈনিককে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আহমদ আলীর দিকে তাকাল। আলী বলল, 'আরে, আপনি ভয় পেয়েছেন? ইনি তো সেই।'

আহমদ যুবতীকে চিনতে পেরে লজ্জিত হয়ে তরবারি খাপে রেখে দিল। যুবতী বলল, 'মাফ করবেন, আমাকে এ বেশে দেখে আপনি পেরেশান হবেন বুঝতে পারিনি।

এটা আমার শহীদ ভাইয়ের পোশাক। চলুন, এবার আমাদের যাত্রা করা উচিত।'

আহমদ বলল, 'বাড়ির সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ রেখে অন্য কোন পথে বের হওয়ার উপায় নেই? দরজা খোলা রাখা অথবা বাইরে দিয়ে তালা লাগানো ঠিক হবে না।'

'আমি সব ব্যবস্থা করেছি। আমরা পাশের বাড়ি দিয়ে বের হয়ে যাব। আলী তুমি বাতি নিভিয়ে উনাকে নিয়ে আমার পেছনে এসো।'

আলী বাতি নিভিয়ে আহমদকে নিয়ে যুবতীর পেছনে হাঁটা দিল। বাড়ির এক কোণে সিঁড়ি ছিল, সে সিঁড়ি বেয়ে তারা ওপরের তলায় উঠে গেল। যুবতী প্রদীপ হাতে একদম কোণার দিকে এক কামরায় গিয়ে ঢুকল। বাতি নিভিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল, 'খালা, আমরা আসতে পারি?'

জানালার অপর পাশ থেকে নারী কণ্ঠের জবাব এল, 'জলদি কর।'

জানালা থেকে প্রায় পাঁচ ফুট নীচে পাশের বাড়ির ছাদ। একের পর এক তিনজনই ছাদে লাফিয়ে পড়ল। সেখানে দুজন মহিলা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা মহিলা দুজনসহ সকলে নীচে নেমে উঠোন পেরিয়ে গলি লাগোয়া দরজায় চলে এল।

আগে থেকেই দরজায় এক লোক দাঁড়িয়েছিল। সে দরজা খুলে দিতে দিতে বলল, 'আমি গলি ও সড়কে নজর বুলিয়ে এসেছি। আশে পাশে কোথাও কোন সিপাই নেই। তবু আপনারা সতর্ক হয়ে চলবেন। আলী, তুমি বড় রাস্তার দিকে না গিয়ে এদের নিয়ে উল্টো দিকে চলে যাও। ক্ষেতখামারের মধ্য দিয়ে যে পায়ে চলা পথটি নদীর দিকে গেছে সেটাই বেশী নিরাপদ হবে।'

যুবতী বলল, 'কুতুবখানার পাশের কামরায় লাশগুলো আছে। ওগুলো অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলতে হবে।'

'মা! তুমি কোন চিন্তা করো না। তাকে বলো, আমি শুধু তার হুকুমের অপেক্ষায় আছি। সাবধানে যাবে। খোদা হাফেজ।'

বাড়ি থেকে বের হয়ে পথে নামল ওরা। পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গিয়েছিল। গলিটি অন্ধকার ও জনমানব শূন্য। আলী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। প্রায় পাঁচশ গজ চলার পর ডান দিকে অন্য একটা গলিতে ঢুকল ওরা। গলি পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল আলী। তার একটু পেছনে আহমদ ও সব শেষে যুবতী কিছুটা দূরত্ব রেখে

চলছিল। আলী থামতেই ওরা দ্রুত পায়ে তার কাছে এগিয়ে এল।

আলী চাপা স্বরে বলল, 'কে যেন এদিকে আসছে।'

আহমদ উৎকর্ণ হয়ে কারো পদধ্বনি শুনে বলল, 'ওরা এদিকেই আসছে।'

আলী বলল, 'ফিরে চলুন, এ গলি ছেড়ে আমরা আগের গলিতেই ফিরে যাই।'

তারা দ্রুত পিছিয়ে দুই গলির মুখে চলে এসেছে এমন সময় সামনে বেশ কয়েক জোড়া বুটের শব্দ শুনে আলী ওদের দিকে ফিরে বলল, 'হায় হায়, এখন কি হবে?'

আহমদ এক মুহূর্ত আগন্তুকদের কথাবার্তা শুনে বলল, 'এরা এ দিকেই আসছে। এদের সংখ্যাও বেশী মনে হয়। দ্রুত আসুন, আমাদের আবার পিছিয়ে যেতে হবে।'

উল্টো মুখো হয়ে তারা আবার ছুটল। এবার আলীর পরিবর্তে পথ দেখাচ্ছিল আহমদ। আগের তুলনায় চলার গতি ছিল দ্রুত। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে আহমদ পিছন ফিরে তাকাল এবং ফিসফিস করে বলল, 'আপনারা এখানেই দাঁড়ান, আমি আসছি।'

অন্ধকারে দেয়ালের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে গেল আলী ও যুবতী। আহমদ একা সামনে এগুতে গেল। মাত্র কয়েক গজ দূরে সিপাইদের পায়ের শব্দ শুনে আলী ফিসফিস করে বলল, 'একজন নয়, কয়েকজন আসছে। আপনি একা ওদিকে যাবেন না।'

আহমদ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে তাকে দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল এবং তলোয়ার উন্মুক্ত করে গলির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে তিনজন সিপাই কথা বলতে বলতে আসছিল। হঠাৎ তাদের একজন আহমদকে একদম নাকের সামনে খাঁড়া দেখে আৎকে উঠে বলল, 'কে?'

কোন আকস্মিক হামলার মুখে পড়তে হবে সিপাইরা এমনটি ধারনাও করেনি। ওরা কিছু বুঝে উঠার আগেই কাউকে কোন সুযোগ না দিয়ে আহমদ একজনকে মরণের দেশে পাঠিয়ে দিল। সাথের দুজন তলোয়ার বের করে আঘাত করল আহমদকে। আহমদ নিজের তরবারি দিয়ে দুজনের আঘাত প্রতিরোধ করে পাশ কাটিয়ে ওপাশে চলে গেল। তারপর আত্মরক্ষামূলক লড়াই করতে করতে পিছনে হটতে শুরু করল।

হঠাৎ যুবতী পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে একজন পাহারাদারের কাঁধে আঘাত করল। সিপাইটি চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়ল। অপর সিপাইটি পিছনে ফিরে ছুটে পালাতে গেল, কিন্তু আলী তার পথরোধ করে দাঁড়াল।

সিপাই আলীকে আঘাত করার সাথে সাথে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে। আলী সম্ভবত জীবনে প্রথম তরবারি হাতে নিয়েছিল। সে সিপাইয়ের আঘাত ঠেকিয়ে পিছনে হটতে শুরু করে। কিন্তু মৃত সিপাইয়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে যায়। ততক্ষণে আহমদ এগিয়ে এসে এ সিপাইটিকেও জীবনের পরপারে পাঠিয়ে দেয়। এ সময় দূরে কার্ডিজের সিপাইদের গোলমাল শোনা গেল। শেষ পাহারাদার মরার আগে যে চিৎকার করেছিল তা শুনেই ছুটে আসছিল তারা।

এদিকে আহমদ, আলী ও যুবতী প্রাণপণ শক্তিতে দৌড় দিল। সঙ্গীদের জন্য

আহমদ কখনো থমকে দাঁড়াতো এবং তারা এসে পৌঁছলেই আবার ছুটতে শুরু করতো। যুবতী আহমদের ধারনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে প্রায় আহমদের সাথে সাথেই ছুটছিল। কিন্তু আলীর গতি ক্রমেই কমে আসছিল। আহমদ অনুভব করল, ধাওয়াকারী সিপাইরা ক্রমেই কাছে এসে যাচ্ছে। সে আলীর হাত ধরে বলল, 'কি ব্যাপার আলী? তুমি কি আহত?'

আলী বলল, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমার চিন্তা ছেড়ে দিন। আপনি তাহেরাকে বাঁচাতে চেষ্টা করুন।'

আহমদ বলল, 'আরেকটু হিম্মত করো। সামনেই বাগান। বাগানে ঢুকতে পারলেই আমরা নিরাপদ হয়ে যাবো।'

আলী আহমদের একটা হাত টেনে নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে বলল, 'দেখুন, আমার সময় শেষ। আপনারা নদী পার হয়ে তীর ধরে উজান দিকে যাবেন। এক বাগানের ভেতর দেখতে পাবেন একটি বাড়ি। তারা সবাই সে বাড়িতেই আছে। নদী পার হওয়ার জন্য আশেপাশে নৌকা তালাশ করবেন, খবরদার, পুলের দিকে যাবেন না, বিপদ হতে পারে। তাড়াতাড়ি যান, ওরা এসে যাচ্ছে।'

আহমদ তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিল। কিন্তু ধাওয়াকারীরা খুবই কাছে এসে পড়েছিল। আলী চিৎকার করে বলল, 'এভাবে দেরী করলে আমরা সবাই মারা পড়ব। আমাকে নামিয়ে দিন, আমি চলতে পারবো।'

আহমদ তাকে নামিয়ে দিল। বলল, 'অন্ধকারে গলির পাশ ঘেঁষে শুয়ে পড়ো। আমি একাই ওদের রুখতে চেষ্টা করছি।'

আহমদ তাড়াতাড়ি তীর ধনুক নিয়ে দেয়ালের ওপর উঠে গেল। আলী এক কদমও নড়ল না, ওখানেই শুয়ে পড়ল। তাহেরা রাজ্যের পেরেশানী ও বিস্ময় নিয়ে দেখছিল আহমদের তৎপরতা। আহমদ পরপর কয়েকটা তীর নিক্ষেপ করল। ধাওয়াকারীদের একজন চেঁচিয়ে বলল, 'সাবধান! দুশমন তীর ছুঁড়ে মারছে।'

আহমদ আবারো তীর তাক করতে করতে বলল, 'আলী, আল্লাহর ওয়াস্তে তাহেরাকে নিয়ে চলে যাও। এটা তোমাদের জন্য শেষ সুযোগ।'

আলী উঠে এগিয়ে এসে বলল, 'ভাই! আমি কয়েক মুহূর্ত বেঁচে থাকার জন্য আপনার জীবন বিপন্ন করতে পারবো না।'

যেদিক থেকে ধাওয়াকারীরা আসছিল টলতে টলতে আলী সেদিকে এগিয়ে যেতে লাগল। আহমদ তখন ডাকছিল তাকে, 'আলী! আলী! দাঁড়াও! যেয়ো না।'

কিন্তু আলী টলতে টলতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছু দূরে শোনা গেল তার গলার স্বর, 'শেয়ালের দল! তোমাদের হিসাবের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমি তোমাদের সঙ্গীদের হত্যা করেছি, তোমাদেরও রেহাই দেবো না।'

তাহেরা আহমদের কাছে এসে বলল, 'আসুন! আলী তার মঞ্জিলের পথ ধরেছে।

আখেরাতের পাল তোলা নৌকায় উঠে পড়েছে সে। এখন প্রাণ ভরে শাহাদাতের শরাব পান করবে, আপনার মিনতি তাকে ফেরাতে পারবে না।'

আহমদ তাহেরাকে নিয়ে বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। পেছনে তখনো হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিল, 'মার, ঘিরে ফেল' ইত্যাদি।

গলি পার হয়ে একটি ছোট মাঠে নেমে গেল ওরা। বিপদ তখনো কাটেনি, কার্ডিজের সৈনিকরা আলীকে শহীদ করে আবার তাদের পিছু নিয়েছে। আহমদ একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। মাঠের তিনদিকেই বাড়িঘর। অন্য দিকে একটি দেয়ালের ওপারে ঘন গাছপালা ও জঙ্গল। আহমদ তাহেরাকে বলল, 'আপনি দেয়ালের কাছে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করুন।'

আহমদ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গলির মুখের দিকে সতর্ক চোখে তাকিয়ে থাকল। সৈনিকরা গলি থেকে বের হয়েই আহমদের তীরের আওতায় পড়ে গেল। দুটি তীর দুজনকে ধরাশায়ী করল। ধাওয়াকারীরা অদৃশ্য তীরের কোন হদিস করতে না পেরে দৌড়ে গলির ভেতর ঢুকে গেল।

গলির দিক থেকে হঠাৎ 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উঠল। আহমদ একটু বিস্মিত হলো। পা বাড়াতে গিয়েও সে আবার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কার্ডিজের পাঁচ ছয় জন সিপাই গলি থেকে বের হয়ে মাঠের দিকে দৌড়াচ্ছিল আর পনের বিশ জন যুবক তাদের পিছনে তাড়া করছিল। এক সিপাই দিশেহারা হয়ে আহমদের কাছে চলে এলে আহমদ তাকে তীরের নিশানা বানাল।

আহমদ আর দেরী না করে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দেয়ালের কাছে এসে পৌঁছল। দেয়াল টপকাবার আগে সে আবার পিছনে ফিরে তাকাল। দেখল, মাঠের তিন দিক থেকেই অনেক মানুষ ছোট ছোট দলে হাকডাক করতে করতে ছুটে আসছে। তাহেরা দেয়ালের ওপাশ থেকে মাথা উঁচু করে বলল, 'আমি এখানে আছি।'

আহমদ দেয়াল টপকে তার কাছে গেল। তাহেরা জিজ্ঞেস করল, 'এসব কি হচ্ছে?'

আহমদ জবাবে বলল, 'টলেডোর মুসলমানরা জেগে উঠেছে। শহীদের রক্ত বৃথা যায় না। জালিমের হিসাবের দিন এসে গেছে।'

লোকজন দলে দলে এসে মাঠ ভরে ফেলছিল। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কে একজন বলছিল, 'মুসলমান ভাইয়েরা! আমাদের পিঠ এখন দেয়ালে ঠেকে গেছে। আর পিছাবার সুযোগ নেই আমাদের। এবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে। কাল সকাল পর্যন্ত এ মহল্লায় একজন কার্ডিজের সৈন্যকেও আর বাঁচিয়ে রাখতে চাই না। যেখানেই ওদের পাও, হত্যা করো।'

তাহেরা বলল, 'আল্লাহই জানেন এর পরিণতি কি হবে? আমাদের পরিচালক বলেছিলেন, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মোকাবেলায় যাওয়া ঠিক হবে না।

এত নির্যাতনের পরও তাই কোন প্রতিরোধ এখনো শুরু হয়নি। কিন্তু কাল ভোরে কার্ডিজের সব সৈন্য, ইয়াহইয়ার পুলিশ ও সেনাবাহিনী এ মহল্লায় কেয়ামতের তাণ্ডব বইয়ে দেবে।'

আহমদ বলল, 'নদীর ওপারে আমাদের নেতার কাছে কতজন মুজাহিদ আছে?'

'সেখানে শুধু শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন মহল্লার নেতৃবৃন্দকে ডাকা হয়েছে পরামর্শের জন্য। আক্রমণের পদ্ধতি ও সময় নির্ধারণ করে তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় পাঠানোর পর প্রতিরোধের কাজ শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু প্রতিরোধ তো শুরুই হয়ে গেল।'

'গণবিপ্লবের ধারাই এই। নেতৃবৃন্দকে সাত-পাঁচ ভেবে মাঠে নামতে হয়, কিন্তু জনগণের অত হিসাবের সময় কোথায়? যখন তারা মনে করে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তখন কারো নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে না তারা। এ নিয়ে এখন পেরেশান হয়ে লাভ নেই। ধনুক থেকে তীর একবার বেরিয়ে গেলে তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। যেভাবেই হোক প্রতিরোধ যখন শুরু হয়েছে তখন বিজয় পর্যন্ত না গিয়ে উপায় নেই। এসব ভাবনা থাক, আগে চলুন তাঁর কাছে যাই।'

তাহেরা বলল, 'চলুন, নদী এদিকে।'

বাগিচা থেকে বের হয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে একটি পায়ে চলার পথ ধরে তারা চলতে শুরু করল।

২.

নদী তীরে এক টিলার ওপর কয়েকটি ঘর দেখা গেল। টিলার কাছে পৌঁছে নদী তীরে তারা তিনটি নৌকা দেখতে পেল। তাহেরা বলল, 'আপনি টিলায় উঠে মাঝিদের খোঁজ নিন।'

আহমদ বলল, 'এ সময় ডাকাডাকি করা উচিত হবে না। আমি নিজেই নৌকা চালাতে পারি।'

তারা উভয়ে একটি নৌকায় উঠে বসল। রাতের অন্ধকার ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পূর্বাকাশে দেখা দিয়েছে মেহেদীর রঙ। ভোরের আলো এসে সরিয়ে দিচ্ছে অন্ধকারের নেকাব। নদীতে সকালের পবিত্র বাতাস। যে বাতাস সহজেই মানুষের মনকে দ্রবীভূত করে ফেলে। নদীর পানির মতই ঢেউ তোলে হৃদয় নদীতে। আবেগের পানিতে তিরতির কাঁপন জাগে। ভোরের সেই ফুরফুরে হাওয়ায় ও অস্পষ্ট আলোতে তারা একে অন্যের দিকে তাকাল। উভয়ের চোখেই মুগ্ধতার আমেজ। পলকের জন্য চোখাচোখি হলো দুজনের। দুজনেই আবার চোখ নামিয়ে নিল। লজ্জা ও সংকোচ ঘিরে ধরল তাদের।

আহমদ বলল, 'আপনার খুব তকলিফ হলো।'

যুবতী বলল, 'না, আমার কোন কষ্ট হয়নি। কষ্ট বরং হলো আপনার, দীর্ঘ সফর শেষে বিশ্রামের বদলে পেলেন অনাহুত পেরেশানী ও দুশমনের আঘাত।'

'আপনার নাম তাহেরা?'

'হ্যাঁ।' পায়ের নখের দিকে নজর রেখে জবাব দিল যুবতী।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ। এক সময় মুখ খুলল তাহেরা, 'যখন আমি দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আপনার অপেক্ষা করছিলাম, তখন বড় আফসোস হচ্ছিল আমার। ভাবছিলাম, দুশমনরা সংখ্যায় অনেক। একা আপনি কতক্ষণ লড়বেন এত জনের সাথে? ভাবছিলাম, হয়তো এ জীবনে আর আপনার সাথে দেখা করার সুযোগ হবে না আমার। জাতির এক অচেনা বোনের জন্য যে যুবক অকাতরে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে গেল, আমি এমনি এক বেখেয়াল মেয়ে, তার নামটি পর্যন্ত জিজ্ঞেস করিনি। ভাবছিলাম, স্পেন হয়তো একদিন এসব দুঃখ-মুসিবত থেকে মুক্তি পাবে। উন্দুলুসের অধিবাসীরা প্রতি বছরেই শহীদদের স্মৃতি স্মরণ করে দোয়া করবে তাদের জন্য। আমি সেদিন এমন একজনকে স্মরণ করবো, যাকে আর কেউ চিনতো না। সেদিন আমি আফসোস করে বলবো, হায়, আমি এমন এক যুবরাজের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম, এ হতভাগী যার নামটাও জেনে রাখতে পারেনি।'

আহমদ বলল, 'আমার নাম আহমদ।'

নৌকা ওপারে পৌঁছে গেল। আহমদ ও তাহেরা তীরে উঠে ফজরের নামাজ আদায় করল। নামাজ পড়ে নদীর তীর ধরে উজানের দিক চলতে শুরু করল তারা। হাঁটতে হাঁটতে তাহেরা শোনাচ্ছিল ভাই ও চাচার শাহাদাতের কাহিনী ও পিতার গ্রেফতারীর বিবরণ। আর আহমদ তাহেরাকে শোনাচ্ছিল নিজের বাপ, ভাই ও পরিবারের ত্যাগের কাহিনী। উভয়েই অনুভব করছিল, দুই ভিন্ন ভূখণ্ডে বাস করলেও তাদের মনজিল এক ও অভিন্ন। আলাদা ভাবে বছরের পর বছর সেই মনজিলের দিকে ছুটতে ছুটতে অপ্রত্যাশিতভাবেই তারা আজ এক মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছে। জীবন নদীর দুটি স্রোত এই মোহনা থেকে আবার যখন যাত্রা করবে তখন সেই স্রোত দুটোকে আর আলাদাভাবে চেনার কোনই সুযোগ থাকবে না। এক সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে দ্বিগুণ বেগে ছুটে যাবে ইপ্সিত গন্তব্যের দিকে।

একসময় তাহেরা বলল, 'গতকাল আমি ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু এখন আর আমার কোন ভয় ডর নেই।'

আহমদ বলল, 'বাস্তবতার ঘূর্ণিঝড়ে পড়লেই কেবল মানুষ সুপ্ত ক্ষমতার সন্ধান পায়। গতকালও আমার জানা ছিল না আমি একজন সৈনিক, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, আগুন ও রক্ত নিয়ে খেলা করার জন্যই জন্ম হয়েছে আমার।'

নদী তীর ধরে চলতে চলতে ওরা এক সময় একটি বাগানে প্রবেশ করল। আচানক কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তি এসে ঘিরে ধরল তাদের।

'তোমরা কে? কোত্থেকে এসেছো? প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগেই অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

তাহেরা বলল, 'আমি নয়া মহল্লা থেকে এসেছি। আমাকে আবদুল ওয়াহিদের কাছে নিয়ে চল। তিনি আমাকে চেনেন।'

'আপনার নাম?'

তাহেরা শান্ত স্বরে জবাব দিল, 'আমি ইউনুসের বোন, আবু ইয়াকুবের কন্যা।'

সকলেই উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে চাইল। তাহেরা সসম্ভ্রমে মুখের নেকাব আরো ভাল করে টেনে দিল।

এক যুবক বলল, 'বোন! মাফ করুন, আপনি কি করে এখানে পৌঁছলেন? আপনার সাথে ইনি কে?'

তাহেরা বলল, 'সময় নষ্ট না করে জলদি আমাদের আবদুল ওয়াহিদের কাছে নিয়ে চলো। টলেডোর সর্বশেষ পরিস্থিতি এখনই তার জানা দরকার।'

'আসুন আমার সাথে।' আর কথা না বাড়িয়ে হাঁটা ধরল যুবক।

৩.

ঘন গাছপালার ভিতর দিয়ে হেঁটে তারা দুর্গ মত এক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ওখানে পৌঁছেই তারা দেখতে পেল পঞ্চাশ ষাটজন সশস্ত্র মুজাহিদ চত্বরে অপেক্ষমান। আবদুল ওয়াহিদ তাদের আগমনের খবর পেয়েই বাইরে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'কোথায় শেখ আবু ইয়াকুবের কন্যা?'

তাহেরা এগিয়ে বলল, 'আমি।'

আবদুল ওয়াহিদ বললেন, 'ইউনুসের বোনকে এ বেশে দেখা আশ্চর্যের নয়। কিন্তু তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি। যদি বিশেষ কোন জরুরী খবর থাকে তবে আলী অথবা অন্য কাউকে দিয়ে খবর পাঠালেই হতো।'

তাহেরা বলল, 'আলী শহীদ হয়ে গেছে।'

আবদুল ওয়াহিদ ওদের নিয়ে গেলেন বাড়ির এক প্রশস্ত কামরায়। মুজাহিদরা ঘিরে ধরল তাদের। আবদুল ওয়াহিদের প্রশ্নের জবাবে তাহেরা সংক্ষেপে সকল ঘটনা খুলে বলল। সে যখন গলিতে খৃষ্টান সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষের কথা বলছিল তখন এক প্রবীণ নেতা হায় হায় করে উঠলেন। বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে। কার্ডিজের কয়েকজন সৈনিকের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তারা এখন শত শত মুসলমানকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাবে। শহরে পাইকারী হত্যাকাণ্ড শুরু করে দেবে।'

প্রবীণ নেতার কথার জবাব দিল আহমদ। বলল, 'আমরা সেখান থেকে বের হয়ে আসার আগেই শহরের অনেক লোক মাঠে নেমে এসেছিল। আমার বিশ্বাস, এতক্ষণে

তারা কার্ডিজের সিপাইদের নিকেশ করে দিয়েছে। মহল্লায় কার্ডিজ সৈন্যদের যে ঘাটি ছিল তাও সম্ভবত পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

আবদুল ওয়াহিদ সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাকাড়া বাজাও, তৈরী হয়ে যাও। আল্লাহর ফয়সালা এসে গেছে। প্রতীক্ষার মুহূর্ত শেষ হয়েছে। মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে এবার মুজাহিদদের ময়দানের ঝাপিয়ে পড়ার পালা।'

একজন নাকাড়ায় ঘা দিলে বাগানের বিভিন্ন জায়গা থেকে সাড়া দিল অন্যরা। নাকাড়ার আওয়াজে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

আবদুল ওয়াহিদ আহমদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নওজোয়ান, কার্ডিজের কয়েকজন সিপাইকে হত্যা করে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের শুভ উদ্বোধন করার পর তুমি আর আমাদের কাছে অপরিচিত কেউ নও। আমাদের পরিকল্পনার অনেক আগেই তুমি সংঘর্ষ শুরু করে দিয়েছ। হয়তো এটাই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ছিল। আল্লাহ তোমার হাত দিয়ে এ জেহাদের শুভ সূচনা ঘটিয়েছেন। তিনি যদি তোমাকে আমাদের নেতৃত্ব দান করার জন্যই পাঠিয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। এ জিহাদ কখন শুরু করবো এ সিদ্ধান্ত যখন আমাদের নিতে হয়নি তখন এ জিহাদ কিভাবে সফল হবে এ নিয়েও আমি চিন্তা করতে চাই না। আমি শুধু বুঝেছি, সময় ক্ষেপন করার কোন অবকাশ আমাদের নেই। পূর্ণ শক্তি নিয়ে দৃঢ়তা ও একীনের সাথে ময়দানে নেমে পড়া আমাদের দায়িত্ব। জান কবুল করে ময়দানে একবার দাঁড়াতে পারলে বিজয়ের জিম্মাদার হবেন স্বয়ং আল্লাহ।

আশপাশের গ্রামগুলোতে যে সব মুজাহিদরা সমবেত হয়েছে, তারা এখুনি এখানে চলে আসবে। সামরিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমাদের সকল নেতাই কারাগারে। আমি মাদ্রাসা ত্যাগ করে এখানে এসেছি, যুদ্ধের কিছুই বুঝি না। ঈমানের বলে বলীয়ান একদল মুজাহিদ ছাড়া তুমি আমাদের কাছে আর কিছুই পাবে না। এবার বলো কিভাবে তুমি এ যুদ্ধ পরিচালনা করবে?'

আহমদ বলল, 'আমি টলেডোর হাল অবস্থা কিছুই জানি না। প্রথমবারের মত আমি এ শহরে এসেছি এবং মাত্র কয়েকটি সড়ক ও গলি দেখেছি। তাও আবার রাতের বেলা। এ জন্য সম্ভবত এ সময় আমি খুব ভাল পরামর্শ দিতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, সময় নষ্ট করা মোটেই সংগত নয়। টলেডোতে কার্ডিজের সৈন্য সংখ্যা কত, তাও আমি জানতে চাই।'

'প্রায় আটশো হবে। ইয়াহইয়ার সৈন্যদের সম্পর্কে আমি বেশী চিন্তিত নই। প্রয়োজনের সময় তাদের অনেকেই আমাদের সাথে চলে আসবে। কিছু চুপচাপও থাকতে পারে, তবে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার মত বেশী সৈন্য তার হাতে থাকবে না।'

'এখানে আপনার কাছে কত মুজাহিদ আছে?'

'এখানে মাত্র দেড়শো সশস্ত্র মুজাহিদ রয়েছে। আশপাশের গ্রাম থেকে যাদের

একত্রিত হওয়ার কথা বলছি তাদের সংখ্যা তিনশোর মত।'

আহমদ বলল, 'টলেডোর যে সব মুজাহিদ এখানে রয়েছে, তাদের এক্ষুণি রওয়ানা করিয়ে দিন। তারা গিয়ে শহরের লোকদেরকে সংগঠিত করুক। তারা যেন প্রথমে জেলখানায় আক্রমণ চালায়। আমি বাকী লোকদের নিয়ে সেনা ছাউনিতে আক্রমণ করব।'

আবদুল ওয়াহিদ ও শহরের কয়েকজন মুজাহিদ আহমদের সাথে বসে আক্রমণের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করছিল। বাকী মুজাহিদরা তাহেরার কাছে নিজ নিজ বাড়ি ঘরের খবর ও শহরের অবস্থা জিজ্ঞেস করছিল।

ঠিক এ সময় একজন ঘোড়সওয়ার ছুটে এসে বলল, 'বেলা উঠার আগেই নয়া মহল্লার লোকেরা ওখানকার কার্ডিজের সিপাইদের হত্যা করে ফেলেছে। এ খবর পেয়ে শহর থেকে তাদের কয়েকটি দল মহল্লায় পৌছে গেছে। মহল্লার অধিবাসীদের সাথে তাদের সংঘর্ষ চলছে, তবে সম্ভবত দীর্ঘ সময় ওরা তাদের প্রতিরোধ করতে পারবে না।'

৪.

আগের রাতে মহল্লার লোকজন যে মাঠে কার্ডিজের সিপাইদের হত্যা করেছিল সে মাঠেই দুপুর বেলা এক নিষ্ঠুর খেলা শুরু হল। কার্ডিজের দুশো সশস্ত্র সৈন্য মহল্লার স্ত্রী পুরুষ ও শিশুদের ঘেরাও করে তাদের মাঠে এনে জড়ো করল। এক অফিসারের হুকুমে দশজন পুরুষ ও সাতজন মহিলাকে আলাদা করে দেয়ালের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হল।

তাদের পনের বিশগজ দূরে কার্ডিজের তীরন্দাজ সিপাইরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে ভ্রাম্যমান আদালতের রায় পড়ে শোনাল, 'টলেডোর ন্যায়পরায়ণ শাসক ইয়াহইয়াহ আল কাদিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কার্ডিজের বীর সৈন্যদের হত্যা করার অপরাধে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।'

সৈনিকটি দেয়ালের পাশে দাঁড় করানো মহল্লার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামগুলো পড়ে শোনাল। কার্ডিজের এক অশ্বারোহী অফিসার তীরন্দাজদের কাছে গেল এবং তাদেরকে ধনুকে তীর সংযোজন করতে হুকুম করল। মহল্লার সমবেত লোকদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। এদের এবং সেই সাথে নিজেদের কপালে কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে আর বাকী রইল না কারো। মহিলা ও শিশুরা চিৎকার জুড়ে দিল। তাদের আহাজারি ও বিলাপ থামানোর জন্য সিপাইরা তরবারি ও বর্শা দিয়ে ভয় দেখাতে লাগল। হঠাৎ সমবেত জনতার মধ্য থেকে এক যুবতী চিৎকার করতে করতে ছুটে গিয়ে দেয়ালের পাশে দাঁড়ানো এক যুবককে জড়িয়ে ধরল। সিপাইরা তাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে এক অফিসার ওদের নিষেধ করে বলল, 'থাক, ওকে ওখানেই থাকতে দাও।'

যুবতী কান্না থামিয়ে যুবকের মুখের দিকে তাকাল এবং তাকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে হাত ধরে তার পাশে সারিতে দাঁড়িয়ে গেল। তীরন্দাজরা তাদের ধনুক সোজা করল। হঠাৎ বাগান থেকে ছুটে এল এক ঝাঁক তীর। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই অর্ধেকের মত তীরন্দাজ আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

একটি তীর এসে বিদ্ধ হল অফিসারের ঘাড়ে। সে একদিকে কাত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। আবার ছুটে এল এক পশলা তীর। কার্ডিজের সিপাইদের হতচকিত ভাব কেটে উঠার আগেই আরো বিশ পঁচিশ জন পলকে লুটিয়ে পড়ল। কার্ডিজের সৈনিকরা জনতাকে ছেড়ে দিয়ে ধেয়ে গেল বাগানের দিকে। সাথে সাথে সমবেত জনগণ দেয়াল টপকে মহল্লার দিকে ছুটে গেল এবং চোখের পলকে তীর, তলোয়ার, নেজা, বল্লম যে যা পারল নিয়ে ছুটে এল ময়দানে এবং কার্ডিজের সৈন্যদের আক্রমণ করল। নিরস্ত্র জনতার এই প্রাণ-চাঞ্চল্য ও মারমুখী ভাব দেখে প্রমাদ গুনল কার্ডিজের সৈন্যরা। তীরন্দাজদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তারা জনতার সাথে হাতাহাতি লড়াই শুরু করল।

আহমদ ইবনে আবদুল মুনীম মাঠে প্রবেশ করে চিৎকার দিয়ে বলল, 'ভাইয়েরা আমার! সমস্ত গলির প্রবেশ মুখ বন্ধ করে দাও। কার্ডিজের একটি শেয়ালও যেন জ্যান্ত ফিরে যেতে না পারে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্ডিজ সৈনিকদের লাশে মাঠ ভরে গেল। লড়াইয়ের শুরুতেই কার্ডিজের দশ পনের জন অশ্বারোহী প্রাণ ভয়ে ছুটে পালিয়েছিল। কিন্তু যারা একবার জনতার ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেল তাদের কেউ আর জীবিত ফিরে যেতে পারল না।

আহমদ যখন শহরের দিকে যাচ্ছিল তখন তার সাথে আসা তিনশো মুজাহিদ ছাড়াও প্রায় দেড় হাজার মহল্লাবাসী তার সঙ্গ নিল। তাদের অনেকেই কার্ডিজের সৈনিকদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল, কেউ কেউ বাড়ি থেকে বর্শা, তলোয়ার, কুঠার, খুন্তি, লাঠি হাতে তুলে নিয়েছিল।

আহমদ রাজপথে উঠে তাহেরার দিকে তাকাল। রক্তমাখা তলোয়ার হাতে তাহেরা আহমদের সাথে সাথেই চলছিল।

আহমদ বলল, 'তাহেরা, তুমি এখন বাড়ি ফিরে যাও।'

তাহেরা বলল, 'না, টলেডোর শাহী প্রাসাদে কালেমার ঝাণ্ডা না দেখে আমি ঘরে ফিরবো না।'

শহরের ফটকে পৌঁছার আগেই শহরতলী থেকে আরও পাঁচ হাজার যুবক ও তরুণ এই জঙ্গী কাফেলার সাথে শামিল হল।

মুজাহিদদের অন্য দলটি শহরের বিভিন্ন ফটক দিয়ে অসংগঠিত অবস্থায় নিরীহ জনগণের বেশে আগেই শহরে ঢুকে পড়েছিল। শহরে ঢুকেই তারা বিভিন্ন মহল্লায় ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণকে সংগঠিত করতে লেগে যায়। আহমদরা ফটকে এসে পৌঁছলে

কার্ডিজের একটি সেনাদল তাদের বাঁধা দেয়া ও ফটক রক্ষা করার জন্য ছুটে আসে। বন্ধ ফটকের বাইরে সম্মিলিত মুজাহিদরা আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখর করে তোলে আকাশ বাতাস। মুজাহিদদের আল্লাহু আকবার ধ্বনি শোনার সাথে সাথে শহরের প্রতিটি মহল্লা থেকে নানা রকম অস্ত্রসজ্জিত হয়ে মারমার কাটকাট রবে ছুটে আসে বিক্ষুব্ধ শহরবাসী। মুহূর্তের মধ্যে ফটকের সিপাইদের হত্যা করে ফটক খুলে দেয় তারা।

টলেডোর সাধারণ জনগণ তাদের ঘরবাড়ি, মসজিদ-মাদ্রাসা, দোকানপাট সব কিছু ছেড়ে এসে যোগ দেয় এদের সাথে। ছেলে-বুড়ো, শিশু-নারী, ধনী-গরীব কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই এসে শামিল হয়েছে আজ একই মিছিলে। ছাত্রের সাথে শ্লোগান ধরেছে শিক্ষক, মালিকের সাথে ময়দানে এসেছে কর্মচারী। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে নেমে এসেছে অফিসার ও কেরানী। শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ কেউ আজ ঘরে বসে নেই। এতদিনের পুঞ্জীভূত রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা সব আজ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশেরও অনেক সদস্য হাতিয়ার নিয়ে এসে মিশে গেছে জনতার কাতারে।

আহমদরা পৌঁছার আগেই বিক্ষুব্ধ জনগণ সহযোগী পুলিশ ও সেনা অফিসারদের সহায়তায় খুলে দিল কারাগারের দরজা। সেনা ছাউনি ও বিভিন্ন চৌকিতে অবস্থানকারী কার্ডিজের সৈন্যরা সকল ঘাটিতে মার খেয়ে এসে আশ্রয় নিল ইয়াহইয়ার বাসভবনে।

৫.

সূর্যাস্তের একটু আগে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক ইয়াহইয়ার মহল আক্রমণ করল। এরা সবাই ছিল ইয়াহইয়ার ওপর বিক্ষুব্ধ জনগণ। এরা কোন সুশৃংখল বাহিনীর অধীন ছিল না এবং এদের কোন নেতাও ছিল না। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে এবং ইচ্ছেমত নিজের রাগ ও ক্ষোভ দমন করার জন্য এই হামলায় অংশ নিয়েছিল।

মহল রক্ষীরা প্রাচীরের ওপর থেকে তীর বর্ষণ করে হামলা প্রতিহত করে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে তারা তীরবর্ষণ বন্ধ করে দিল। জনতা কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল এবং নতুন করে তীর ছুটে আসছে না দেখে সদর দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারা দরজা ভাঙতে চেষ্টা করছে দেখে এক বৃদ্ধ ছুটে এসে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা সবাই নির্বোধ। ওরা সবাই পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেছে। তোমরা সব পাগল হলে নাকি। ইয়াহইয়া পালিয়ে গেছে।'

বৃদ্ধের কথায় জনতা আবার থমকে দাঁড়াল এবং ঘুরে পেছনের ফটকের দিকে ছুটে চলল। পেছনের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে জনতা দেখতে পেল ইয়াহইয়া তার মন্ত্রীবর্গ ও কার্ডিজের সৈন্যদের নিয়ে পালিয়ে গেছে।

জনতা মহল দখলের আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে মহল সরগম করে তুলল। একজন

চেঁচিয়ে বলল, 'গ্রানাডার মুজাহিদকে দেখছি না যে। তিনি কোথায়?'

সাথে সাথে সকলে উচ্চস্বরে বলল, 'তাই তো! তিনি কোথায়?'

গ্রানাডার মুজাহিদ তখন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। মহল জয়ের চাইতে ইয়াহইয়ার পলায়ন তাকে অধিক পীড়া দিচ্ছিল।

তাহেরা আহমদের কাছে এসে বলল, 'আব্বাজানকে কোথাও দেখা যায়নি। আবদুল ওয়াহিদ আপনাকে খুঁজছেন। বহু লোক আপনাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছে। মহলের ভেতরে চলুন।'

আহমদ ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আজ নয়, কাল ভোরে আমি ওদের সাথে দেখা করব।'

তাহেরা বলল, 'ঠিক আছে। আপনি ক্লান্ত, চলুন বাড়ি যাই। আব্বাজান নিশ্চয় বাড়ি চলে গেছেন।'

আহমদ বলল, 'আপনি যদি মহল্লার লোকদের সাথে বাড়ি যেতে পারেন তাহলে আমাকে ছুটি দিন। আমি কাছের কোন সরাইখানায় রাত কাটিয়ে সকালে আপনাদের বাড়ি যাব।'

তাহেরা অনুনয় করে বলল, 'আমাদের খালি বাড়ি ফেলে রেখে আপনি কেন সরাইখানায় উঠবেন? আমার সাথে চলুন।'

আহমদ তাহেরার চোখে আকুল আকুতি লক্ষ্য করে বলল, 'ঠিক আছে, চলুন।'

৬.

মাত্র কয়েক ঘন্টায় শহরের পরিবেশ আমূল পাল্টে গেল। ইয়াহইয়ার স্বেচ্ছাচারিতায় যাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তার পতনে তারা উল্লাসে ফেটে পড়ল। অলিগলি, রাজপথ সর্বত্র আনন্দ মিছিলের বন্যা বয়ে গেল। লোকজন ইয়াহইয়ার দুশ্চরিত্র অফিসারদের ধরে ধরে ঘর থেকে টেনে বের করতে লাগল। হঠাৎ তাদের হাতে পড়ল এক মন্ত্রী। উত্তেজিত জনতা তাকে গাধার পিঠে বসিয়ে ঘুরিয়ে মারল সারা শহর। এক কবি এ ঘটনা দেখে কবিতায় লিখে ফেললঃ

'আল্লাহ জালিমদের হাত থেকে
ছিনিয়ে নিয়েছেন তরবারী।
এখন আমরা গুণে গুণে প্রতিশোধ নেবো।
ওদের শরীর থেকে চামড়া তুলে নিয়ে
সেখানে আয়েশ করে লবণ লাগাবো। ......'

সেই কবিতা শোনার জন্য যুবকরা তার চারপাশে ভীড় করে দাঁড়াল। তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাহেরা বলল, 'এখন ওরা মজলুমদের চোখ থেকে ঝরে পড়া প্রতি ফোঁটা অশ্রুর হিসাব দিতে বাধ্য হবে।'

আহমদ বলল, 'গণবিপ্লব অনেক সময় মজলুমকে জালিম বানিয়ে ফেলে। বিপ্লবের পর জনগণের হাতে প্রতিশোধের তলোয়ার তুলে দিলে তার পরিণতি অনেক সময় ভয়াবহ হয়। আল্লাহ না করুন, টলেডোর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেন ইয়াহইয়াকে তাড়িয়ে নিজেরাই ইয়াহইয়া হয়ে না বসে। জুলুমের প্রাসাদ ধূলিস্মাত করে সেখানে ন্যায় ও সত্যের ইমারত গড়ার পরিবর্তে যেন আরেকটি জুলুমের প্রাসাদ বানিয়ে না নেয়।'

মহল্লার মসজিদের কাছে পৌঁছে তারা আর একদল লোকের সাক্ষাত পেল। তারা শহীদদের লাশ দাফন করে ফিরে আসছিল। তাহেরা তার পিতার খবর জিজ্ঞেস করায় তাদের গলিরই এক লোক বললল, 'শেখ আবু ইয়াকুবের পর আমাদের মহল্লার যারা গ্রেফতার হয়েছিল, তারা বলেছে, শেখ আবু ইয়াকুবকে তারা কারাগারে দেখেননি। তারা ভেবেছে, হয়তো তাকে নেতৃস্থানীয় কয়েদীদের সাথে আলাদা কোথাও রেখেছে। কিন্তু কয়েদখানার দরজা খোলার পর তারা শেখ আবু ইয়াকুবকে অনেক খুঁজেছে, কিন্তু তাকে পায়নি। কিছুসংখ্যক কয়েদীকে নাকি টলেডোর বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। হয়তো তাদের সাথে তাকেও বাইরেই পাঠানো হয়েছে। অবশ্য এমনও হতে পারে, তিনি কয়েদখানা থেকে বের হয়ে জনতার সাথে মিশে গেছেন, মহল্লার ওরা এ জন্য তাঁকে দেখতে পাননি।'

মহল্লার মসজিদের কাছে গিয়ে আহমদ তাহেরাকে বলল, 'আপনি বাড়ি যান, আমি নামাজ পড়ে আসছি।'

আহমদ ওজু করে মসজিদে প্রবেশ করতেই দেখতে পেল, গতরাতে যার সাথে তার দেখা হয়েছিল তিনি আজও সেখানে বসে রয়েছেন।

বৃদ্ধ উঠে আহমদকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাবা, আমি কাল তোমার কপালে নূরের ঝলক দেখেছিলাম। আজ সে নূরে টলেডো ঝলমল করছে। কাল তুমি ছিলে অপরিচিত, আজ তুমি আমাদের ত্রাণকর্তা। আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, গ্রানাডার মুজাহিদ তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।'

আহমদ মৃদু হেসে বলল, 'আপনি তাহলে এখনো আপনার গাঁয়ে যাননি?'

বৃদ্ধ বলল, 'কাল মাগরিবের সময় মসজিদটিকে জনশূন্য দেখে মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি আযান দিলাম কিন্তু কেউ জামাতে এলো না। এক সময় ছিল, যখন এ মসজিদে শেখ আবু ইয়াকুব ইমামতি করতেন। তখন মসজিদে দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়া যেতো না। এ অবস্থা দেখে আমি শপথ নিয়েছিলাম, মসজিদে আগের অবস্থা ফিরে না এলে আমি বাড়ি যাব না। তুমি যখন এলে তখন আমার মনে দুটি পরস্পর বিরোধী ধারণা জন্মেছিল। একবার মনে হলো তুমি সরকারী গোয়েন্দা, আমাকে সরকার বিরোধী মনে করে গ্রেফতার করতে এসেছো। কিন্তু তোমার চেহারা বলছিল, এ লোক নেকদীল না হয়েই যায় না, এ জন্যই অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরও তোমাকে ইয়াকুবের বাড়ির পথ দেখিয়েছিলাম।'

'আপনি জানতেন, শেখ আবু ইয়াকুব বন্দী ও তার ছেলের ফাঁসি হয়েছে?'

'জানতাম, তবে অপরিচিত বলে তোমাকে সে সব বলিনি।'

আহমদ বলল, 'টলেডোতে আজ যা ঘটে গেল তাতে আপনার অবদান অপরিসীম। আপনি যদি বলতেন, আবু ইয়াকুবের বাড়িতে তার মেয়ে ছাড়া কেউ নেই তাহলে আমি ও বাড়িতে যেতাম না। সে অবস্থায় এ বিপ্লব এত তাড়াতাড়ি আসতো না এবং আপনাকে মুসল্লির অপেক্ষায় আরো কিছুদিন বসে থাকতে হতো।'

নামাজের পর আহমদ গলিতে ঢুকে দেখল, আবু ইয়াকুবের বাড়ির সদর দরজা খোলা। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল তাহেরা কয়েকজন মহিলার সাথে কথা বলছে। আহমদ দরজায় পা দিতেই তাহেরা এগিয়ে এসে তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। কামরায় বসিয়ে বলল, 'আপনি বসুন। আমি খানা নিয়ে আসছি।'

আহমদ জিজ্ঞেস করল, 'আপনার আব্বা আসেননি?'

'না।'

খাবার এলে আহমদ খেতে শুরু করল। মহল্লার লোকজন এসে জড়ো হতে লাগল সেখানে। যুবক শিশু বৃদ্ধ সবাই তাকে একনজর দেখতে চায়। উজাড় করা ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাতে চায় তারা। খাওয়া শেষ হতে বহু লোক এসে জড়ো হলো সেখানে। কিন্তু এদের সাথে আলাপ করার মত অবস্থা ছিল না আহমদের। রাজ্যের ক্লান্তি ও ঘুম এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। এ দেখে এক বৃদ্ধ বলল, 'এখন চলে যাও সবাই। আরাম করতে দাও ওকে। দেখছো না ওর অবস্থা?'

বৃদ্ধের কথায় কাজ হলো। লোকজন সরে গেল সেখান থেকে। আহমদ গালিচায় বসে খাচ্ছিল, সেখানেই দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমে ঢলে পড়ল।

তাহেরা পাশের কামরায় বিছানা পেতে তাকে ডাকতে এসে দেখল আহমদ ঘুমিয়ে পড়েছে। তাহেরা আস্তে করে ডাকল, 'উঠুন, আপনার বিছানা ঠিক করা হয়ে গেছে।'

আহমদ কোন জবাব দিল না। তাহেরা কি করবে বুঝতে না পেরে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এক বৃদ্ধা বাসনপত্র নিতে এসে তাকে এ অবস্থায় দেখে বলল, 'ইয়া আল্লাহ! তিনি তো ঘুমিয়ে পড়েছেন!'

তাহেরা বলল, 'ওকে জাগাও, বলো বিছানায় গিয়ে শুতে।'

বৃদ্ধা আহমদকে বহু ডাকাডাকি করল, কিন্তু তার ঘুম ভাঙল না। শেষে তার গায়ে ঝাকুনি দিলে আহমদ পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'ভাইজান! আম্মা! হাসান আমাকে বিরক্ত করছে, ঘুমুতে দিচ্ছে না।'

তাহেরা বলল, 'আচ্ছা থাক, এভাবেই ঘুমুতে দাও ওকে। ক্লান্ত মুজাহিদের ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার দরকার নেই।'

বাসন কোসন নিয়ে চলে গেল বৃদ্ধা। তাহেরা অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। আহমদের 'ভাইজান,' 'আম্মাজান' শব্দগুলো তার কানে বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

তাহেরা ভাবছিল, একদিন আগেও এ যুবক তার কাছে ছিল অপরিচিত, আর আজ? আজ ঘুমের ঘোরে যাদের ও ডাকছে, তাহেরার মনে হচ্ছিল, তারাও তার কত জনমের পরিচিত। কল্পনায় সে ওর মা ভাইকে দেখতে পাচ্ছিল।

এক সময় তাহেরা পাশের কামরা থেকে একটি চাদর এনে আহমদের গায়ের ওপর দিয়ে দিল। তারপর ওপরে উঠে যেতে যেতে বলল, 'ভারী দুষ্ট তো, ঘুমের মাঝেও কথা বলে!'

৭

আহমদের যখন ঘুম ভাঙল তখন দুপুর। সূর্য উঠে এসেছে মাথা বরাবর। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়ছে ওর গায়ে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক বয়স্ক ব্যক্তি তার সামনে এক চেয়ারে বসেছিলেন। আহমদ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে বসল। বৃদ্ধ বললেন, 'ভালই ঘুম হলো, কি বলো?'

আহমদ লজ্জিত স্বরে বলল, 'অনেক ঘুমিয়ে ফেলেছি।'

'আমি আবু ইয়াকুব।'

আহমদ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। ইয়াকুবও দাঁড়িয়ে করমর্দন করে তাকে পাশের চেয়ারে বসালেন।

আহমদ বসতে বসতে প্রশ্ন করল, 'আপনি কখন এলেন?'

'শেষ রাতে এসে পৌঁছেছি।'

'অনেক দেরি করে ফিরলেন।'

আবু ইয়াকুব বললেন, 'মাঝ রাত পর্যন্ত শাহী মহলে হাংগামা চলছিল। লোকজন সরলে নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বৈঠকে বসতে হলো। এ বিপ্লবের ভবিষ্যত নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে করতে অনেক সময় চলে গেল।'

'আপনি কয়েদখানায় ছিলেন না?'

'আমি ও আমার পাঁচজন সঙ্গীকে ভূগর্ভস্থ এক কামরায় রাখা হয়েছিল। ফলে কেউ আমাদের কথা জানতে পারেনি। সূর্যাস্তের পর আমার এক সঙ্গীর আত্মীয় তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে না গেলে আরও যে কয়দিন থাকতে হতো কে জানে।'

আহমদ বলল, 'আমার নাম আহমদ।'

'জানি। তাহেরা আমাকে সব কথাই বলেছে।'

আহমদ জিজ্ঞেস করল, 'ইয়াহইয়ার কোন খবর পেলেন?'

'সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আমার বিশ্বাস, আলফানসুর সাহায্য নিয়ে সে পুনরায় ফিরে আসবে। আলফানসুর বাহিনী সীমান্ত থেকে মাত্র তিন চার মঞ্জিল দূরে অবস্থান করছে। মনে হয় ছোট বিপদ কাটিয়ে আমরা এখন মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছি।'

এখন আমাদের কি করণীয় এ নিয়ে গতরাতে বিস্তর আলাপ হলেও আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। একদল বলেছে, জনতার এই স্বতস্ফূর্ত আবেগের ওপর আমাদের ভরসা করা উচিত। অন্য দলের মতে, টলেডোর অসংগঠিত জনগণ আলফানসুর বিরুদ্ধে লড়ে সুবিধে করতে পারবে না। এ জন্য আমাদের ওমর মুতাওয়াক্কিলের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। আমাদের অনেক নেতাই গ্রেফতার হওয়ার আগে ওমর মুতাওয়াক্কিলের সাথে টলেডোর পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন।'

'আপনার অভিমত কি?'

'আমি ওমর মুতাওয়াক্কিলের আনুগত্যের বিরোধী। তবে আমার মত খুব বেশী গুরুত্ব পাবে বলে মনে হয় না। আমাদের অধিকাংশ নেতাই ওমর মুতাওয়াক্কিলকে ডাকার পক্ষপাতি। আলফানসু হঠাৎ আক্রমণ করে বসলে, জনমতও ওমর মুতায়াক্কিলকে ডাকার পক্ষেই রায় দেবে।'

আহমদ বলল, 'তার মানে যে ভুল একবার বাদাজোবাসী করেছে, টলেডোর অধিবাসীরা তারই পুনরাবৃত্তি করবে?'

আবু ইয়াকুব বললেন, 'আমরা ওমর মুতাওয়াক্কিলের সাথে আগেই শর্তাবলী ঠিক করে নেব। তাছাড়া, সে মুতামিদের মত বাজে লোক নয়। তিনি আলফানসুকে দুচোখে দেখতে পারেন না। শাসক হিসাবেও তিনি শরীয়তের অনুসারী। একটু পরেই এ নিয়ে শাহী মহলে বৈঠক বসবে। তুমিও আমার সাথে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যাও।'

একটু পর। আবু ইয়াকুব ও আহমদ বৈঠকে যোগদানের জন্য শহরের দিকে রওনা হল।

পিতা-পুত্র

আবদুল মুনীমকে টলেডো থেকে সীমান্তের এই দুর্গে পাঠানো হয়েছে আজ পাঁচ সপ্তাহ। দুর্গ রক্ষীদের তুলনায় এখানে কয়েদীর পরিমান দেড়গুণ। এদের সালার এক অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তি। সীমান্তের এই গুরুত্বপূর্ণ দুর্গকে কারাগারে রূপান্তরিত করায় তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

এক সন্ধ্যা। চারজন প্রহরী আবদুল মুনীমকে তার কামরা থেকে বের করে সালারের কাছে নিয়ে গেল। সালারের সামনে টেবিলে কিছু কাগজপত্র, পাশে এক চেয়ারে একজন পুলিশ অফিসার বসা। আবদুল মুনীম কামরায় প্রবেশ করলে সালার পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনিই কি তিনি?'

যুবক অফিসার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সালারের ইশারায় প্রহরীরা বের হয়ে গেলে তিনি আবদুল মুনীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার নাম কি আবদুল মুনীম?'

'হ্যাঁ।' আবদুল মুনীম সংক্ষেপে জবাব দিলেন।

'আপনাকে কি কর্ডোভা থেকে টলেডো এবং সেখান থেকে এ দুর্গে আনা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? সবই তো ফাইলে লেখা থাকার কথা।'

সালার মুখে এক বিষাদক্লিষ্ট হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, 'যদি আগে জানতাম, আমাকে দুর্গ রক্ষকের পরিবর্তে জেলারের কাজ করতে হবে তাহলে আমি এ চাকুরী ছেড়ে দিতাম। তবু আমি চেষ্টা করছি, কয়েদীদের যেন কোন রকম কষ্ট না হয়। জানিনা আমার যা ইচ্ছা তা আমি পালন করতে পারবো কিনা। শুনেছেন নিশ্চয়, ইয়াহইয়া পলাতক। টলেডোর অধিবাসীরা আলফানসুর আক্রমণের আশঙ্কায় ওমর মুতাওয়াক্কিলের সাহায্য চাইতে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে। সবাই আশা করছে, টলেডোর প্রতিরক্ষায় অচিরেই ওমর মুতাওয়াক্কিলের সৈন্য বাহিনী এসে পৌঁছবে।

আমি এখানকার রাজবন্দীদের মুক্ত করে দেয়ার পক্ষপাতি। টলেডোর নতুন সরকারের কাছে অনুমতির জন্য লিখেছি, তবে এখনও কোন জবাব পাইনি।

একটু আগে খবর পেয়েছি, আলফানসুর সেনাবাহিনী আমাদের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের কয়েকটি দল এরই মধ্যে আমাদের দুর্গ থেকে চার মাইল দূরে এসে পৌঁছেছে। আজ রাত কিংবা কাল সকালে তারা এখানে পৌঁছে যাবে। এজন্য আমি সকল বন্দীকে এখনই মুক্ত করে দিতে চাই। ইনি টলেডোর পুলিশ প্রধান। একটু আগে এখানে এসেছেন এবং আমাকে জানিয়েছেন, এ দুর্গে এমন কয়েকজন কয়েদী আছে যাদের নিয়ে গোটা স্পেন গর্ব করতে পারে।'

পুলিশ প্রধান বলল, 'আপনি বসুন। সম্ভবত আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। যে পুলিশী বাহিনী আপনাকে কর্ডোভা থেকে টলেডো নিয়ে গিয়েছিল সে দলের নেতৃত্বে ছিলাম আমি। তখন বুঝতে পারিনি আমাদের পরিণতি কি হবে। টলেডোর হাজার হাজার মানুষের মত আমিও ছিলাম শাহী খান্দানের এক বিশ্বস্ত গোলাম মাত্র।

এখন আমি অনুভব করছি, যে আগুনে এতদিন আমরা ঘি ঢেলেছি, সে আগুন আজ আমাদেরই বাড়িঘর গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। পালানোর সময় আমি ইয়াহইয়ার সঙ্গে ছিলাম। আলফানসুর কাছে পৌঁছেই সে তার সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তিতে সে টলেডোর কয়েকটি দুর্গ আলফানসুকে ছেড়ে দিয়েছে। ইয়াহইয়াকে টলেডোর সিংহাসনে বসানোর আগেই আলফানসু সে সব দুর্গ দখলে নিতে ইচ্ছুক। আলফানসুর ইচ্ছানুসারে ইয়াহইয়া এ সব দুর্গের সালারদের নামে লিখিত পত্রে তাদেরকে খৃষ্টান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিষেধ করেছে। এ দুর্গটিও আলফানসুর হাতে তুলে দেয়ার জন্য ইয়াহইয়া আমাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি এখন আমার অতীত পাপের কাফফারা আদায় করতে

চাই।'

আবদুল মুনীম তার কথার মাঝখানেই বললেন, 'আমার মনে হয়, আলোচনা দীর্ঘ করার সময় এটা নয়। আমি শুধু জানতে চাই, কি শর্তে আপনারা আমাদের মুক্তি দিতে চান?'

এ প্রশ্নের জবাব দিলেন দুর্গ রক্ষক, 'আমরা বাধ্য হয়েই আপনাদের মুক্তি দিচ্ছি। এর মধ্যে কোন দয়া দাক্ষিণ্যের ব্যাপার নেই। আলফানসুর সৈন্যরা এ দরজায় করাঘাত করার জন্য দ্রুত ছুটে আসছে। তারা এসে গেলে কয়েদীদের হেফাজত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমরা অক্ষম হওয়ার আগেই আপনাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে যতটুকু যা করার করতে চাই। আমরা চাই, আপনি আপনার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গ ত্যাগ করবেন। যারা পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না, তাদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

আবদুল মুনীম ভাবছিলেন তখন অন্য কথা। স্মৃতির ভেলায় চড়ে চলে গিয়েছিলেন কর্ডোভায় তার নিজের শহরে। তিনি নিজেকে দেখতে পেলেন, নিজের বিশাল বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। হাসান তাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, 'আব্বাজান, আমাকেও সাথে নিয়ে চলুন। আপনি ওয়াদা করেছিলেন, যুদ্ধ শেষ হলে আমাকে সাথে নিয়ে বেড়াতে যাবেন।'

আবদুল মুনীম তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছিলেন, 'যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি বাবা।'

আবার তিনি তার বিবিকে বলছিলেন, 'হয়তো আমি আজই ফিরে আসবো, হয়তো কারাগারে থাকতে হবে বেশ কিছুকাল। আবার এমনও হতে পারে, এটাই আমাদের জীবনের শেষ দেখা। যদি এমন হয়, তোমার কাছে আমার একটাই প্রত্যাশা থাকবে, তুমি আমার সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তোলো, 'তারা যেন সাচ্চা মুসলমান হয়, জীবনের চেয়ে যেন জীবনের উদ্দেশ্যকে মূল্য দেয় বেশী।'

দুর্গ রক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি সঙ্গীদের নিয়ে টলেডো যাবেন, না সোজা বাড়ি চলে যাবেন?'

আবদুল মুনীম সাথীদের দিকে তাকালেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'না না, আমি যাবো না।'

'কি বলছেন আপনি!'

'যদি আপনি নিশ্চিত থাকেন, আলফানসুর সৈন্যরা এ দুর্গ আক্রমণ করবেই, তাহলে আমি এ দুর্গ ছেড়ে যাব না। বন্দী অবস্থায় আমি আল্লাহর দরবারে বারবার শাহাদাতের মউত চেয়ে কান্নাকাটি করেছি। মনে হচ্ছে, আমার দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন। আমার সঙ্গীরা আমাকে সাহায্য করবে এবং আমার বিশ্বাস, টলেডোর অন্যান্য কয়েদীরাও দুর্গটির অবস্থান ছাড়তে রাজি হবে না। আমাদের শুধু অস্ত্র দরকার। আপনি কতজনকে অস্ত্র দিতে পারবেন?'

'আমাদের কাছে হাতিয়ারের অভাব নেই। তবে খাদ্যের মজুদ কম। সম্ভবত এ মাসের বেশী চলবে না।'

'খাদ্য দুশমনদের কাছেই পাওয়া যাবে।'

'এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসার আগে অন্যান্য কয়েদীদের মতামত জেনে নিলে ভাল হতো না?'

আবদুল মুনীম বললেন, 'তাদের মতামত আমি জানি। আপোষ করতে যদি তারা রাজি হতো তবে কারাগারের অন্তরালে জীবন কাটাতে হতো না তাদের। এক মহান উদ্দেশ্যের কাছে তারা জীবন মরণ সঁপে দিয়েছে। সেই উদ্দেশ্যের জন্যেই তারা বাঁচতে চায়, আবার সে উদ্দেশ্যের জন্য মরতেও তাদের কারো কোন আপত্তি ও দ্বিধা নেই।'

এশার নামাজের সময়। কারাগারের ভেতরে কয়েদী ও প্রহরীরা একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করল। ইমামতি করলেন আবদুল মুনীম। নামাজের পর সবার উদ্দেশ্যে তিনি এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দিলেন। বললেনঃ

'ভাইয়েরা আমার!

আপনাদের পা থেকে বেড়ী খুলে দেয়া হয়েছে, কারাগারের দরজা খোলা রয়েছে। কিন্তু তাতে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, আপনারা স্বাধীন হয়ে গেছেন। উত্তর দিক থেকে আলফানসু ভয়ানক বিপদের যে তুফান নিয়ে ছুটে আসছে তা ব্যর্থ করতে না পারলে আমরা এ ক্ষুদ্র কারাগার থেকে বেরিয়ে নিজেদেরকে দেখতে পাবো বিশাল এক কারাগারে বন্দী। শুধু আমরা নই, স্পেনের প্রতিটি মুসলমান খৃষ্টানদের গোলাম হয়ে যাবে।

দুর্গ প্রধান আমাদের মুক্তির আদেশ জারী করেছেন। কিন্তু আমরা কি আমাদের মা বোনদের কাছে এ খবর পৌঁছে দিতে যাব যে, আলফানসুর সৈন্য বাহিনী প্রবল বন্যার মত আমাদের পেছনে ছুটে আসছে? আলফানসু টলেডো দখল করে নিয়েছে? এরপর স্পেনের অন্যান্য শহরের দিকে ছুটবে তার ঘোড়া?

শহীদী কাফেলার সাথীরা আমার!

যদি আমরা মুসলমান হয়ে থাকি, যদি এদেশে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়াতে চাই, যদি ইসলামের দুশমনের প্রভুত্ব মেনে নিতে রাজী না থাকি, তাহলে আমাদের জন্য একটি পথই খোলা রয়েছে। আর তা হচ্ছে, এ তুফানের ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেয়াল তুলে দাঁড়ানো। আলফানসু যদি শুধু শাসকদের গদীর জন্য হুমকি হতো, তাহলে আমি এখানে বক্তৃতা করার পরিবর্তে সেখানে চলে যেতাম, যেখানে বছরের পর বছর আমার স্ত্রী পুত্ররা আমার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। কিন্তু আলফানসু হুমকির কারণ হচ্ছে তাদের জন্য, যারা এদেশে ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, যারা মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকাকেই জীবন মরণের প্রশ্ন বলে মনে করে।

আমাদের দুশমন শুধু টলেডো দখল করতে আসছে না, তারা আসছে জিব্রাল্টার

পর্যন্ত ক্রুশের পতাকা উড্ডীন করতে। আমি আপনাদের এ দুর্গ রক্ষায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোর জন্য আহবান জানাচ্ছি। আমি স্পেনের কোন শাসককে নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন নই, আমি আমার নিজের ও আপনাদের জন্য উদ্বিগ্ন।

এ যুদ্ধ স্পেনকে বাঁচানোর যুদ্ধ। এ যুদ্ধ কর্ডোভা, সেভিল ও টলেডোর ইজ্জত ও আজাদী রক্ষার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ তারিক, মুসা ও আল জাগলের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ। আমাদের লড়াই ঈমানকে টিকিয়ে রাখার লড়াই। আমাদের লড়াই আমাদের অস্তিত্বের লড়াই।

ভাইয়েরা আমার!

যদি আমরা গাজী হতে না পারি, তবে শহীদের মৃত্যুর মর্যাদা থেকে কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারবে না। আমাদের ত্যাগ বৃথা যাবে না। আমাদের রক্তের স্রোতে ভেসে যাবে খৃষ্টানদের অগ্রযাত্রা। টলেডোতে আমাদের যে বীর ভাই ও সন্তানেরা এ বিপ্লবের উদ্বোধন করেছে, তারা আরো অধিক শক্তি ও সাহস সঞ্চয়ের সুযোগ পাবে।'

কিছুদিনের মধ্যে টলেডোতে খবর পৌঁছল, আলফানসুর ফৌজ হঠাৎ আক্রমণ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের অনেকগুলো ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে, কিন্তু একটি দুর্গে একদল নির্ভীক মুজাহিদ তাদের অপ্রতিহত অগ্রযাত্রার গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে। এখনো সেখানে মরণপণ সংঘর্ষ চলছে তুমুল বেগে।

২

আলফানসু ইয়াহইয়া আল-কাদিরের অদূরদর্শিতার সুযোগ নিয়ে উত্তর সীমান্তের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করে নিল। যে সব দুর্গের সালাররা ইয়াহইয়ার আদেশ অমান্য করল সেসব দুর্গ আলফানসু অতর্কিত আক্রমণ করে দখল করল। টলেডোর দিকে অগ্রসর হওয়ার আগে উত্তর সীমান্তের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করে টলেডোর পথ নিষ্কন্টক করাই ছিল আলফানসুর লক্ষ্য।

এদিকে টলেডোবাসীরা অধীর আগ্রহে ওমর মুতাওয়াক্কিলের পথপানে তাকিয়েছিল। ইয়াহইয়া পালিয়ে যাওয়ায় বিপ্লবপন্থী আলেমদের পরামর্শ ও সমর্থনে অস্থায়ীভাবে একজনকে আমীর নির্বাচিত করা হল। আসন্ন মহা দুর্যোগের আশংকায় জনগণ যাতে ভীত শংকিত না হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলায় এগিয়ে আসে সে জন্য মাদ্রাসার ছাত্ররা মহল্লায় মহল্লায় সভার পর সভা করে চলল।

মুজাহিদরা জোরেশোরে প্রশিক্ষণ নিতে থাকল। টলেডোর নুতন সিপাহসালারের অনুরোধে আহমদ শহরতলী এলাকা থেকে মুজাহিদদের আরো বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব নিল। শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আহমদের ওপর ছিল গভীর আস্থাশীল। সামরিক বিষয়ে তারা সিপাহসালার ছাড়াও আহমদ ইবনে আবদুল মুনীমের মতামত গ্রহণ করাকে

জরুরী বিবেচনা করতো।

আহমদ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতো মুজাহিদ সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের কাজে। শেখ আবু ইয়াকুবকে টলেডোর নতুন পরামর্শ সভার সদস্য করা হলো। তিনিও ভোরেই আহমদের সাথে বের হয়ে যেতেন এবং সাধারণত উভয়েই মাগরিবের নামাজ মহল্লার মসজিদে এসে পড়তেন। নামাজের পর আহমদ আবু ইয়াকুবের সাথেই বাড়িতে প্রবেশ করত। কখনো একজনের বাড়ি ফিরতে দেরী হলে অন্য জন বাড়ি ফিরে একসাথে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করত।

জীবন সমুদ্রের এক উত্তাল ঢেউ আহমদ ও তাহেরাকে এক মোহনায় এনে ফেলেছিল। সে ঢেউ সরে পড়ায় তাদের মাঝখানে স্বাভাবিক লজ্জা ও সম্ভ্রম দেখা দিল। পর্দার দেয়াল এসে আড়াল করে দাঁড়াল ওদের। আর দেয়ালের দুই পাশে দুজন দাঁড়িয়ে একে অন্যকে নিয়ে রঙ্গিন স্বপ্নের জাল বুনতে লাগল আপন মনে।

এক রাতে আবু ইয়াকুব বেশ দেরী করে বাড়ি ফিরলেন। ফিরেই পরিচারিকাকে খাবার আনার জন্য হাঁক দিলেন তিনি।

তাহেরা কামরায় ঢুকে বলল, 'আব্বাজান! মেহমান আসেননি?'

'সে এক জরুরী অভিযানে গেছে, মা।'

তাহেরার মুখমণ্ডল হঠাৎ ফ্যাকাশ হয়ে গেল। সে এক মুহূর্ত বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বুকের ভেতর গুমরে উঠল ব্যথার ঢেউ। তার হৃদয় তখন বলছিল, 'আপনি এভাবে চলে গেলেন! কিন্তু এখানে একজন আপনার জন্য সারা জীবন প্রতীক্ষা করবে, যাওয়ার আগে এ কথাটি আপনাকে বলার কোন সুযোগই যে পেলাম না।'

বাপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল তাহেরার। ধীরে ধীরে সে অন্য কামরার দিকে রওয়ানা হল। আবু ইয়াকুব ডেকে বললেন, 'দাঁড়াও মা। যাচ্ছো কই?'

থতমত খেয়ে তাহেরা বলল, 'আমি আপনার হাত ধোয়ার পানি আনতে যাচ্ছি।'

তাহেরা পানি এনে পিতার হাতে দিল। পরিচারিকা এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপা, আপনার খানাও কি এখানে নিয়ে আসবো?'

আবু ইয়াকুব বললেন, 'তাহেরা এখনো খায়নি! নিয়ে এসো একসাথেই খাবো।'

পরিচারিকা খাবার নিয়ে এলো। বাপ-বেটি খেতে বসল এক সাথে। কিন্তু তাহেরার ক্ষুধা মরে গিয়েছিল। সে নিতান্ত অনিচ্ছায় দু এক লোকমা মুখে দিল। আবু ইয়াকুব আড়চোখে দেখছিলেন সবকিছু। বললেন, 'আহমদ কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।'

তাহেরার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সাহস করে জিজ্ঞেস করল, 'আব্বাজান, ও কোথায় গেছে?'

'বিপ্লবের আগে ইয়াহইয়া যেসব কয়েদীকে সীমান্তবর্তী দুর্গে স্থানান্তরিত করেছিল

সেই দুর্গের সালার ইয়াহইয়ার হুকুম মত খৃষ্টানদের হাতে দুর্গ তুলে না দিয়ে সিপাই ও কয়েদীদের সাথে নিয়ে খৃষ্টানদের সাথে মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নেয়। চারদিন আগে খবর এসেছে, আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে দুর্গের সালার শহীদ হয়েছেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন একজন কয়েদী।

আমাদের ধারনা ছিল, ওমর মুতাওয়াক্কিলের অগ্রসর হওয়ার খবর পেয়ে আলফানসুর মনোযোগ উত্তর পশ্চিম রণাঙ্গনের দিকে নিবদ্ধ হবে এবং সে ঐ দুর্গের ওপর বেশী চাপ দেবে না। আর এখানে ওমর মুতাওয়াক্কিলের সৈন্য বাহিনী এসে গেলে আমরা সে দুর্গের সাহায্যে কিছু মুজাহিদ পাঠিয়ে দিতে পারবো।

কিন্তু আজ খবর এসেছে, দুর্গরক্ষকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। আলফানসু আরও নতুন সৈন্য প্রেরণ করে দুর্গের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। দুদিনের মধ্যে সেখানে কোন সাহায্য না পৌঁছলে তাদের বাঁচার আশা নেই। জানা গেছে কয়েদীদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও রয়েছেন যাদের নিয়ে গোটা স্পেন জয় করতে পারে। এ জন্য মজলিশে শুরা তাৎক্ষণিকভাবে তিনশ ঘোড় সওয়ারকে সেখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এই অশ্বারোহী দলের সালার নির্বাচনের প্রশ্ন দেখা দিলে সবাই আহমদকেই পছন্দ করে। বৈঠকে আহমদও উপস্থিত ছিল, সে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তখনই রওনা হয়ে যাওয়ার অনুমতি চায়।'

'কিন্তু মাত্র তিনশ মুজাহিদ আলফান্সুর বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় কতক্ষণ টিকতে পারবে?'

আবু ইয়াকুব বললেন, 'সিপাহসালার দুর্গের দখল ছেড়ে দিয়ে লড়াইরত সিপাই ও কয়েদীদের বের করে নিয়ে আসার জন্য আহমদকে দায়িত্ব দিয়েছেন। সীমান্তবর্তী একটি দুর্গ রক্ষায় বেশী শক্তি ব্যয় না করে টলেডো রক্ষায় অধিক শক্তি মজুত করা দরকার।'

'আব্বাজান! আপনি কি মনে করেন এটা খুব বিপজ্জনক অভিযান?'

'মা! সৈনিকদের যে কোন অভিযানই বিপজ্জনক।'

'আর তিনি এমন সৈনিক, যিনি বিপদের সময় সবার আগে থাকেন।'

আবু ইয়াকুব কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, 'আহমদ এক বীর ও বাহাদুর যুবক। তাকে বিদায় দেয়ার আগে তোমার ভবিষ্যত নিয়ে তার সাথে আমার কথা হয়েছে।' ৩১

তাহেরা হতবিহবল হয়ে পড়ল। অজানা শিহরণে কেঁপে উঠল বুক। খুশীর বন্যা বয়ে গেল দেহের অণু পরমাণুতে। তার শরীর দিয়ে ঘাম ছুটল। শরীর কাঁপতে লাগল একটু একটু। আবু ইয়াকুব মৃদু হেসে বললেন, 'মা! আল্লাহর কাছে এরচে অধিক কিছু আমার চাওয়ার ছিল না। কুদরতের হাজার শোকর, বীরত্ব ও সততায় স্পেনের যুবরাজ তোমাকে তার হৃদয়ে ঠাঁই দিতে সম্মত হয়েছে। আমি কোন ভুল করিনি তো মা?'

তাহেরা তখন আনন্দ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছিল তার অনিন্দ্য সুন্দর চেহারা। সে চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়েছিল আর মনে মনে

শোকরিয়া জানাচ্ছিল বাপকে।

'তুমি কিছু খাচ্ছো না যে?'

'আমি খেয়েছি, আব্বাজান।'

তাহেরা তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে উঠে পড়ল এবং দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। নিজের কামরায় ঢুকে কোন রকমে শরীরটাকে বিছানায় আছড়ে ফেলে বালিশ আঁকড়ে ধরে বলতে লাগল, 'আহমদ! আমার জান! আমার প্রাণ!'

৩.

সীমান্তবর্তী কেল্লা। চারপাশে পাহাড়ের দেয়াল। মাঝখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সমতল ভূমি। কেল্লার সদর ফটক বরাবর এসে ঠেকেছে একটি গিরিপথ। কেল্লায় ঢুকার এটাই একমাত্র রাস্তা। কার্ডিজের শত শত সৈনিক দুর্গটির ওপর হামলে পড়ল। দুর্গের ছাদে দাঁড়িয়ে তীর মেরে সে প্রবল আক্রমণ মোকাবিলা করছিল দুর্গরক্ষক, সিপাই ও কয়েদীরা। কয়েকদিন ধরে বিরামহীন চেষ্টার পরও কিছুতেই ওরা দুর্গের কাছে ঘেঁষতে পারল না। গুটিকয় টলেডো ফৌজের কাছে এভাবে মার খাবে কার্ডিজের সিপাইরা তা ভাবতেও পারেনি।

একদিন ভোর। কার্ডিজ বাহিনীর অধিনায়ক নিজের সৈনিকদের জড়ো করল। ধিক্কার দিল তাদের। বলল, 'চরম আঘাত হানতে হবে আজ। মা মেরীর কসম, দুর্গ দখল না করতে পারলে কারো আজ রেহাই নেই। লাশের ঢাল বানিয়ে হলেও আজ তোমাদের দুর্গে প্রবেশ করতে হবে।'

শুরু হলো লড়াই। কেল্লা থেকে তীর বৃষ্টির কারণে লাশের স্তূপ হয়ে গেল ময়দানে। কার্ডিজের সিপাইরা সাথীদের লাশ ডিঙিয়ে প্রবল বন্যার মত ছুটে এল কেল্লার দিকে। প্রায় দুশো সৈন্য সিঁড়ি লাগিয়ে প্রাচীরের ওপর উঠে পড়ল। দুর্গের সালার মাত্র শখানেক মুজাহিদ নিয়ে প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে গেলেন। কার্ডিজ সৈন্যরা তরবারী নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল মুজাহিদদের ওপর। কিন্তু মরণ কবুল করা মুজাহিদদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারল না তারা। প্রচণ্ড লড়াই শেষে পিছু হটতে বাধ্য হলো খৃষ্টানরা। দুর্গ রক্ষা পেল ঠিকই, কিন্তু এ লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করলেন দুর্গের অধিনায়ক ও বেশ কিছু মুজাহিদ।

আবদুল করীম অবশিষ্ট লোকদের জীবন সম্পর্কে বেপরোয়া করে তোললেন। শপথ নিলেন, প্রাণ থাকতে দুর্গের দখল তারা শত্রুর হাতে তুলে দেবেন না। নতুন সালারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি।

এ ঘটনার পর কয়েক দিন শত্রুপক্ষ মামুলী আক্রমণ করে সময় কাটাতে লাগল। একদিন দুশো নতুন সৈন্য এসে যোগ দিল তাদের সাথে। নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে

উঠল কার্ডিজ ফৌজ। পরদিন ভোরে আবার তারা প্রচণ্ড আঘাত হানল দুর্গে। কার্ডিজের সালার শপথ করল, দুর্গ জয় না করে সে তাঁবুতে ফিরবে না।

আবদুল মুনীমের সঙ্গীদের তীর শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন তারা প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে ইট-পাথর নিক্ষেপ করে দুশমনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করছে। রসদ ফুরিয়ে আসার দরুণ গত চারদিন থেকে প্রত্যেকে প্রতিদিন মাত্র একটা করে যবের রুটি পাচ্ছিল।

দুপুর ঘনিয়ে এল। ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত মুজাহিদরা দুশমনের অবিরাম আক্রমণের মুখে নেতিয়ে পড়ল। দুশমনদের কয়েকজন সিঁড়ির সাহায্যে পাঁচিল টপকে ভিতরে প্রবেশ করল। ফলে শুরু হল হাতাহাতি লড়াই। মুজাহিদরা তবু পরাজয় স্বীকার করল না। মনে হচ্ছিল, শাহাদাতের পেয়ালা পান করার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে।

হঠাৎ গিরিপথে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ও আল্লাহু আকবার ধ্বনি শোনা গেল। দেখতে দেখতে তিনশ অশ্বারোহী কার্ডিজের সৈন্যদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। ঘন্টাখানেকের মধ্যে ময়দান খালি হয়ে গেল। দুর্গের চারপাশে তখন শত্রু সৈন্যের লাশ আর লাশ। খৃষ্টান অধিপতি অবরোধ তুলে পালিয়ে গেল, তাদের ধাওয়া করল মুজাহিদরা। অল্প কয়জন সৈন্য ছাড়া প্রাণ নিয়ে পালাতে পারল না কেউ।

সন্ধ্যাবেলা ধাওয়াকারীরা দুর্গে ফিরে এলো। ইতিমধ্যে দুর্গের সালার খৃষ্টানদের পরিত্যক্ত তাঁবুগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্য ও সমরাস্ত্র দুর্গের ভিতর নিয়ে এসেছিল। কয়েক মাসের খোরাক, বিপুল পরিমান সামরিক সরঞ্জাম ছাড়াও আড়াইশো ঘোড়া ও পঞ্চাশটি খচ্চর তাদের দখলে এল।

অশ্বারোহীদের ফিরে আসতে দেখে আবদুল মুনীমের সঙ্গীরা আনন্দধ্বনি করল। অশ্বারোহীদের সালার ঘোড়া থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের অধিনায়ক কে?'

এক বৃদ্ধ মুজাহিদ বলল, 'তিনি আহত, ভিতরে আছেন।'

'আঘাত মারাত্মক নয় তো?'

'না, মামুলী। তবে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত।'

আহমদ বৃদ্ধ মুজাহিদের সাথে কথা বলতে বলতে দুর্গের ভিতর একটি কামরায় প্রবেশ করল। আবদুল মুনীম কাঠের এক চৌকিতে শুয়েছিলেন। পায়ের শব্দ শুনেই তাকালেন তিনি এবং দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। যুবক এগিয়ে তার সাথে করমর্দন করল।

'আপনার জখম মারাত্মক নয়তো?'

'না, সাহেবাই। বসুন।'

যুবক বসল। আবদুল মুনীম চৌকিতে বসতে বসতে বললেন, 'আপনি কি টলেডো থেকে এসেছেন?'

'জি।'

'সেখানকার হাল অবস্থা কেমন?'

'অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। আলফানসুর সৈন্য তিন দিক থেকে এগিয়ে আসছে। কাজেই এ দুর্গ অনতিবিলম্বে ত্যাগ করে আমাদের টলেডোর ময়দানে ছুটে যাওয়া দরকার।'

আবদুল মুনীম গভীর মনযোগ নিয়ে যুবকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি টলেডোর বাসিন্দা?'

'জ্বি না, আমি গ্রানাডা থেকে এসেছি।'

'আমি জানতে চাচ্ছি আপনার জন্মস্থান কোথায়?'

'কর্ডোভা।'

'তোমার নাম আহমদ?'

যুবক চমকে উঠে আবদুল মুনীমের দিকে তাকাল। বলল, 'জ্বি, কিন্তু আপনি তা কেমন করে জানেন?'

আবদুল মুনীম জবাব দেওয়ার পরিবর্তে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না রোধ করার চেষ্টা করলেন। তার চোখে উথলে উঠল অশ্রু। আহমদ পেরেশান হয়ে সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আবদুল মুনীমের এক সাথী বলল, 'আপনার নাম আহমদ ইবনে আবদুল মুনীম?'

আহমদ অবাক হয়ে জবাব দিল, 'জ্বি।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তোমার আব্বাকে দেখলে চিনতে পারবে?'

'আপনি তার সম্পর্কে ......'

আহমদ কথা শেষ না করে আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবদুল মুনীমের দিকে তাকাল। সাথে সাথে তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠল অতীতের এক দৃশ্য। সে বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ও গাম্ভীর্যের প্রতীক তার বাবার সাথে সামনে বসা সাদা চুলদাড়ি বিশিষ্ট এক বৃদ্ধের তুলনা করছিল।

হঠাৎ আহমদ 'আব্বাজান' বলে চিৎকার দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল পিতার বুকে। পিতা পুত্র উভয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল গভীরভাবে। উভয়ের চোখেই আনন্দের অশ্রু। উপস্থিত মুজাহিদদের চোখগুলোও ঝাপসা হয়ে এল। এ মধুর মিলনানন্দে কেউ চোখের পানি আটকে রাখতে পারল না। আবদুল মুনীম ছেলের মাথায়, মুখে হাত বুলাচ্ছিল আর বলছিল, 'বাপ তুই এসেছিস!'

গভীর রাত।

ক্লান্ত মুজাহিদরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আহমদ ও আবদুল মুনীম এক কামরায় বসে পরস্পরকে শোনাচ্ছিল তাদের নিজ নিজ কাহিনী।

পরদিন। কেল্লা ত্যাগ করে মুজাহিদরা রওনা হল টলেডোর পথে। আহমদ বাপের কাছে গিয়ে বলল, 'আব্বাজান, আপনি বাড়ি চলে যান। আপনার বেশ কিছুদিন বিশ্রাম দরকার।'

'আমি সোজা বাড়িতেই যাবো বাপ! তবে বিশ্রামের জন্য নয়, অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য।'

আহমদ বলল, 'আব্বাজান, এক সর্বগ্রাসী বন্যা প্রতিরোধের জন্য আমরা নানা জায়গায় বাঁধ দিচ্ছি। কিন্তু স্পেনের সর্বস্তরের জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে না দাঁড়ালে এ সয়লাব রোধ করা যাবে না। কাজী আবু জাফর ও তার সঙ্গীরা জনগণকে জাগিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আপনার কারাজীবন দেখে শিখেছি, মুমীনের কুরবানী বৃথা যাবার নয়। কয়েক বছর আগে কর্ডোভায় আপনি যে আওয়াজ তুলেছিলেন, আজ তা লাখো মানুষের কণ্ঠে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। খণ্ডরাজ্যের শাসকরা যাদের হাতে শিকল পরিয়েছিল, সে সব হাত থেকে খসে পড়ছে শৃংখল। বনি জাহুর ধ্বংস হয়ে গেছে। সেভিলে ঘনিয়ে এসেছে মুতামিদের দিন। অন্যান্য খণ্ডরাজ্যের শাসকরা এখনো যদি সোজা পথে না আসে তাহলে তাদের দিনও ফুরিয়ে আসতে আর বেশী বাকী নেই।

এখন শুধু দরকার একটি গণজাগরণের, একটি গণবিপ্লবের। জনগণকে সুসংগঠিত করে একই পতাকার তলে সমবেত করার জন্য আপনি গ্রানাডায় পৌছেই কাজী আবু জাফরের সাথে দেখা করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হকের যে পতাকা আপনি স্পেনের আকাশে উড়াতে চেয়েছিলেন, আমরা নিশ্চয় তা উড়াতে পারবো। আপনি আবু জাফরকে চেনেন তো?'

আবদুল মুনীম নিরবে পুত্রের কথা শুনছিলেন। তার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছিল মৃদু হাসির আভাস। অবস্থা দেখে আহমদ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আব্বাজান মাফ করবেন। আপনি কি করবেন সে বিষয়ে পরামর্শ দেবার আমার হক নেই। আমি একটু বেশী কথা বলি।'

আবদুল মুনীম মুখে হাসি টেনে বললেন, 'তোমাদের মা তোমাদের তিন ভাইকে এতটা জিহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে জানলে জীবনের আরো কয়েকটা বছর কারাগারে থাকলেও আমার কোন কষ্ট হতো না। মামুনের হুকুমে আমাকে যখন দ্বিতীয়বার কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, তখন কে জানতো, সেই মামুনের কারাগার ভেঙে আমার সন্তান আমাকে মুক্ত করে আনবে?

তোমাদেরকে নিয়ে আমি গর্বিত। স্পেনের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি এখন হতাশ নই। কিন্তু মনে রেখো, এখনো তোমাদের সামনে রয়েছে বাঁধার পাহাড়, সে পাহাড়কে গুড়িয়ে দিতে হবে। চলার পথে পড়বে অসংখ্য খানাখন্দ, দুশমনের লাশ দিয়ে ভরতে হবে তা। একদিন আমরা যে ভুল করেছিলাম, টলেডোর অধিবাসীরা তারই পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছে। ওমর মুতাওয়াক্কিলের ওপর ভরসা না করে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো উচিত ছিল তাদের। কর্ডোভা বিপর্যয়ের সময়, আমাদেরকে দুশমনের মুখে ফেলে জেবর সে সরে পড়েছিল। আমার ভয় হয়, হয়তো সে টলেডোর সাথেও একই ব্যবহার করবে।'

'শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাকে দাওয়াত করে এনেছে। তাদের ধারনা, অন্যান্য শাসকদের মত সে পিঠটান দেবে না।'

'এটা সময় এলেই বুঝা যাবে। তবু আমি দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাদের মজবুত ঈমান দান করেন। কয়েকদিন বাড়িতে বিশ্রাম করে আমিও হয়তো ময়দানে চলে আসতে পারি।'

দুপুর। পিতা পুত্র এসে এক চৌরাস্তায় দাঁড়াল। ওখান থেকে আহমদ টলেডো ও আবদুল মুনীম গ্রানাডার পথ ধরল। বিদায়ের সময় আহমদ বলল, 'আব্বাজান! আপনাকে নিয়ে আম্মা পেরেশান না হলে আপনাকে গ্রানাডার পরিবর্তে টলেডো যাবার অনুরোধ করতাম। আমি একটি জরুরী কথা আপনাকে বলার সাহস পাইনি।'

আবদুল মুনীম আহমদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহমদ, তুমি কি ঐ যুবতীর কথা বলতে চাও?'

আহমদ জবাব না দিয়ে মাথা নত করল। আবদুল মুনীমই আবার বললেন, 'আহমদ, তুমি শাদী করেছো, আমি কি তোমার মাকে এ সুসংবাদ পৌঁছে দেবো?'

আহমদ চমকে উঠে বলল, 'জ্বি, না আব্বাজান! একথা আপনাকে কে বললো? আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আমি এখানে আসার আগে আবু ইয়াকুব আমার কাছে এ ধরণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।'

আবদুল মুনীম বললেন, 'বাবা, তোমার জন্য আমার দোয়া রইল। কালের ঝড়-তুফানের সাথে লড়বে বলে জীবনের দাবীকে অগ্রাহ্য করার দরকার নেই। তুফানের মাঝে থেকে যতটুকু আনন্দ আহরণ করা যায়, করবে। তুমি টলেডো গিয়েই তাকে বিয়ে করে ফেলবে। আমি খুব শীঘ্রই টলেডো আসতে চেষ্টা করব, কিন্তু আমার জন্য অপেক্ষা করবে না। আমি রণাঙ্গনেও চলে যেতে পারি।'

আহমদের সাথীরা এগিয়ে গিয়েছিল। পিতা পুত্র পরস্পরকে খোদা হাফিজ বলে নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেল।

৪.

আলমাস কারো গলার স্বর শুনে বাইরে এল। সদর দরজায় এক অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে। আলমাস কিছুক্ষণ অবিচল তাকিয়ে রইল আগন্তুকের দিকে। হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার বাগ ধরে বলল, 'মনিব! আমার মনিব!'

অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নেমে আলমাসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

'মনিব! আপনি এসেছেন! আমার স্বপ্ন তাহলে সত্য হল! আসুন, ভিতরে চলুন।'

পরিচারিকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আলমাস! কে এসেছেন?'

আলমাস উচ্চস্বরে বলল, 'মনিব এসেছেন! মনিব!'

আবদুল মুনীম ভেতরে ঢুকলেন। সকিনা বেরিয়ে এসেছিলেন বারান্দায়। অপলক চোখে তাকিয়েছিলেন আগন্তুকের দিকে। অকুল সমুদ্রে পথহারা নাবিক হঠাৎ আলো দেখে যেমন আনন্দিত হয়, সকিনার অবস্থা ছিল তাই। ক্লান্ত পথিক দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যেমন অবসন্ন হয়ে পড়ে, সকিনাও তেমনি অসাড়, ক্লান্তিতে ম্রিয়মান।

আবদুল মুনীম ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। সকিনার চোখ ঝাঁপসা হয়ে এল। ক্রমে সব কিছু যেন অস্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে। আবদুল মুনীমের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। তার মাথা ঘুরে উঠল। বারান্দার পিলার ধরে পতন ঠেকালেন তিনি।

আবদুল মুনীম আবেগাকুল কণ্ঠে বললেন, 'সকিনা! আমি এসেছি।'

সকিনার ঠোঁট কেঁপে উঠল। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। চোখের দুপাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল নোনা পানি। এতটা বছরের পুঞ্জীভূত ব্যথা ও প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে এ তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আবদুল মুনীম বারান্দায় উঠে এসে ডাকলেন, 'সকিনা!'

সকিনা এগিয়ে এসে স্বামীর বুকে লুটিয়ে পড়লেন। অতি কষ্টে বললেন, 'আমি বহুবার এ স্বপ্ন দেখেছি। এখন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। সত্যি করে বলুন, এটাও স্বপ্ন নয় তো?'

'না সকিনা! এ স্বপ্ন নয়, বাস্তব! তুমি এখন স্বপ্নের তাবীর দেখতে পাচ্ছ।'

অশ্রুসিক্ত চোখে উভয়েই উভয়ের দিকে তাকিয়েছিল। যেন অনন্তকাল ধরে তারা এভাবেই বসে আছে। যেন কোন যাদুমন্ত্র বলে কেউ তাদের পাষাণ করে দিয়েছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। চোখের ভাষায় এতদিনের জমানো কথা একে অন্যকে বলে যাচ্ছিল। এক সময় সকিনা ডাকলেন, 'মায়মুনা! মায়মুনা?'

'জি, আম্মাজান?' ভেতরের কামরা থেকে সাড়া দিল মায়মুনা।

'মায়মুনা জলদি এদিকে এসো। দেখোতো আমি আবারো স্বপ্ন দেখছি কিনা, ইনি সাদের আব্বাজান! আমাকে বলতো, একি সত্যি?'

মায়মুনা লজ্জায় জড়সড় হয়ে এগিয়ে এসে আবদুল মুনীমকে সালাম করল। সকিনা বললেন, 'আপনি জানেন, মেয়েটি কে?'

'জানি। আহমদ আমাকে সব বলেছে।'

'আহমদ! আপনার সাথে কোথায় তার দেখা হল? আপনি তাকে সাথে নিয়ে এলেন না কেন? ও তো টলেডো গিয়েছিল। এখন কোথায়?'

আবদুল মুনীম বললেন, 'আগে যাচাই করে নাও এটা স্বপ্ন না বাস্তব। তারপর অন্য কথা।'

সকিনা বললেন, 'আমার পাগলামীতে রাগ করলে! ভাবী পুত্র বধুর সামনে আর ফাজলামো করো নাতো!'

মায়মুনা বলল, 'আম্মা, আমি খালাজানকে খবর দিয়ে আসি?'

সাকিনা বললেন, 'যাও।'

মায়মুনা চাকরাণীকে সাথে নিয়ে খালার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

৫.

টলেডো ফিরে এল আহমদ। ওমর মুতাওয়াক্কিলের সৈন্য বাহিনী ততদিনে শহরে প্রবেশ করেছে। এক সপ্তাহ পর ওমর মুতাওয়াক্কিলও বাকী সৈন্য নিয়ে টলেডো পৌছলেন। টলেডোর অস্থায়ী সরকার তাঁকে বরণ করে নিল।

আহমদ ফিরে এসে আবার মুজাহিদদের সংগঠিত করার কাজে লেগে গেল। মাসখানেক পর আবদুল মুনীমের চিঠি নিয়ে এল এক পত্রবাহক। চিঠিতে আবদুল মুনীম আহমদকে লিখলেন, 'আমি কাজী আবু জাফরের সাথে মসিনা যাচ্ছি। বিয়ের ব্যাপারে আমার জন্য অপেক্ষা করো না।'

আবদুল মুনীম আবু ইয়াকুবের নামে আলাদা পত্র দিলেন। সে চিঠিতে তার ব্যস্ততার উল্লেখ করে অবিলম্বে আহমদ ও তাহেরার শাদী মোবারক সম্পন্ন করার জন্য তাকে অনুরোধ করলেন। আবু ইয়াকুব চিঠি পাওয়ার এক সপ্তাহ পরে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আহমদের সাথে তার কন্যার বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন করলেন।

জীবন সমুদ্রের যে ঝড় ও উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে দুই মুসাফির স্বপ্নের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়েছিল; তারা আজ একই নৌকায় আরোহণ করে সুখের সাগরে ভেলা ভাসাল। ঝড় থেমে গিয়েছিল ঠিক কিন্তু ঈশান কোণের আকাশ কাল করা মেঘ প্রবল ঝড়ের সংকেত দিচ্ছিল প্রবলভাবে।

হঠাৎ ঝলসে ওঠা বিপ্লবের আগুনে টলেডোর দিগন্তে যে আশার আলো দেখা গিয়েছিল, তা ঢেকে দিতে ছুটে এল অন্ধকার মেঘমালা। ওমর মুতাওয়াক্কিল টলেডো ছুটে আসায় আলফানসু টলেডো আক্রমণের ইচ্ছা পরিবর্তন করতে বাধ্য হল। টলেডো দখল করার চাইতে সে বেশী ব্যগ্র ছিল মুসলমানদের সাথে একটি জীবন মরণ যুদ্ধের জন্য। তাই সে রাজধানীর দিকে অগ্রসর না হয়ে সীমান্ত এলাকায় উৎপাত বাড়িয়ে দিল। সেখানকার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে, লোকজন হত্যা করে, বেপরোয়া লুটতরাজ চালিয়ে সেখানে কেয়ামতের বিভীষিকা সৃষ্টি করল।

এমতাবস্থায় ওমর মুতাওয়াক্কিল তার সৈন্য বাহিনী ও টলেডোর মুজাহিদদের এক বিরাট দলকে সীমান্ত এলাকায় পাঠাতে বাধ্য হল।

গভীর রাত। আহমদ এখনো বাড়ি ফিরেনি। আবু ইয়াকুব অনেকক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করে এক সময় নিজের কামরায় চলে গেল। তাহেরা ওপর তলায় আহমদের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। হঠাৎ গলিতে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। ঘোড়ায় চড়ে ঘরে ফেরা আহমদের স্বভাব নয়, তবু তাহেরা বেলকনিতে দাঁড়িয়ে গলিতে উঁকি দিল।

আহমদকে দেখতে পেয়ে সাথে সাথে নীচে নেমে দরজা খুলে দাঁড়াল।

'তাহেরা! তুমি এখনও ঘুমাওনি?' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বলল আহমদ।

তাহেরা জবাব দিল, 'আপনি কি করে মনে করলেন, আপনাকে বাইরে রেখে আমার চোখে ঘুম আসবে?'

আহমদ ঘোড়ার বাগ ধরে বাড়িতে প্রবেশ করতে করতে বলল, 'দেখ, নতুন মেহমান নিয়ে এসেছি।'

'খুবই অসময়ে এসেছে এ মেহমান। আগে জানলে এর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতাম।'

'এতে ওর অসুবিধা হবে না।' এ কথা বলে আহমদ জ্বিনের সাথে বাঁধা বস্তা খুলে কিছু ঘাস ঘোড়ার সামনে দিল। তাহেরা বলল, 'ঘোড়ার পিঠ থেকে জ্বিন খুলবেন না?'

'না।'

তাহেরার মনে খটকা লাগল, কিন্তু কিছু বলল না। দুজনেই মুখোমুখি বসে খেতে শুরু করল। আহমদ তেমন কিছু খাচ্ছে না দেখে তাহেরা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি খাচ্ছেন না যে?'

'তাহেরা! সিপাহসালারের অনুরোধে তার বাড়িতে কিছু খেতে হয়েছে। অবশ্য তোমার কথা ভেবে আধা পেটেই উঠে পড়েছিলাম।'

তাহেরার ক্ষুধা আগেই চলে গিয়েছিল। ওরা খাওয়া শেষ করে ওপরে গেলে আহমদ তাহেরার পাশে বসে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তাহেরা বললো, 'কি দেখছেন অমন করে? আপনাকে এত গম্ভীর ও পেরেশান মনে হচ্ছে কেন? আপনি কি কোন অভিযানে যাচ্ছেন? আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। এ খবর শোনার জন্য আমার মানসিক প্রস্তুতি আছে। আপনি যখন ঘোড়া নিয়ে এলেন, তখনই তা বুঝেছি।'

তাহেরা যখন কথা বলছিল তখন তার মুখে ছিল হাসি। কিন্তু আহমদের মনে হল, ঐ হাসি কান্নার চেয়েও করুণ।

'উত্তর সীমান্তে দুশমন উপর্যুপরি হামলা চালাচ্ছে। ওদের মোকাবেলার জন্য মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

'কখন যাবেন?'

'শেষ রাতে রওনা হবো আমরা। কিন্তু বাহিনী সাজানোর জন্য এখনই আমাকে শিবিরে চলে যেতে হবে।'

কিছুক্ষণ কারো মুখে আর কথা ফুটল না। চুপচাপ সময় গড়িয়ে চলল। অনেকক্ষণ পরে আহমদ বলল, 'তাহেরা, ঝড় তুফানের মাঝেই আমি চোখ খুলেছি। আমি উত্তরাধিকার সূত্রেই তুফানের ঢেউ ও আঘাতের সাথে পরিচিত। তাই, মুসিবতের ঝড় ঝাপটার সাথে খাপ খাইয়ে চলার অভ্যাস তৈরী করে নিতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু একদিনের জন্যও হতাশা কাবু করতে পারেনি। শত বিপদ মুসিবতও আমার মুখের হাসি-

আনন্দ কেড়ে নিতে পারেনি। আমার আনন্দ, আমি ঈমানের পথে লড়ছি, আল্লাহর দ্বীনের জন্য লড়ছি, অসহায় মানুষের জন্য লড়ছি, আজাদীর জন্য লড়ছি, মুক্তির জন্য লড়ছি। এক মহান আদর্শের জন্য, এক মহৎ স্বপ্নের জন্য আমাদের এ চেষ্টা ও সংগ্রাম। ধৈর্য ও মনোবল আমাদের সম্পদ।

আমার পিতা বছরের পর বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন এক সোনালী ভোরের প্রত্যাশায়। আমার বড় ভাই আফ্রিকার অরণ্যে ও সাহারার খৈ ফোটা তপ্ত মরুভূমিতে এই শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার ছোট ভাই এ সুহাসিনী ভোরের জন্যই বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে দুর্গ পাহারায়।

তাহেরা, আমি তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমার অন্তরে তুমি সর্বদা জেগে থাকবে পূর্ণিমা চাঁদের মত। তোমার প্রেমের ছোঁয়ায় আমার হৃদয়ে যে প্রেম-প্রদীপ জ্বলে উঠেছে তা জ্বলতে থাকবে নিশিদিন। তাহেরা, তুমি কেবল একজন কবির কল্পনার মাধুরী মেশানো মানসী নও বরং সারা দুনিয়ায় হাজার হাজার বছর ধরে কবি ও শিল্পীরা যে স্বপ্নের কল্পনা-রাণীর ছবি এঁকেছেন, তুমি তারই মূর্ত প্রতীক। স্পেন যদি কোন এক দ্বীপ হত আর তুমি হতে তার বাসিন্দা, তাহলে আমি শত ঝড় ঝাপটার মুখে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বলতাম, এটা তাহেরার স্পেন, আর আমি তার মুহাফিজ।

তাহেরা! আজ আমার মত হাজার হাজার যুবক অনুভব করছে, তাদের স্বপ্নের তাহেরাদের ইজ্জত ও আজাদী বিপন্ন। যে ক্ষুদ্র শহরটি খৃষ্টানরা অবরোধ করে রেখেছে তার ভেতর কত আহমদ ও কত তাহেরা রয়েছে তা আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি।

তাহেরা! আমি যাচ্ছি, তুমি শুধু দোয়া করো, আমি যেন স্পেনের সকল তাহেরা ও আহমদকে আজাদীর খোশখবর শোনাতে পারি। তাদের বলতে পারি, কোন জালিম আর তোমাদের বিরক্ত করতে আসবে না। তোমরা নিজেদের রাঙিয়ে তোল আল্লাহর রঙে, এ পৃথিবীই হয়ে যাবে জান্নাতের বাগান। সেইদিন, তাহেরা, সেইদিন বিপদ মুসিবতের কোন উত্তাল তরঙ্গই আমাদের আলাদা করে রাখতে পারবে না।'

আহমদ কথা বলছিল আর তাহেরা তন্ময় হয়ে শুনছিল তার কথা। ধীরে ধীরে তার দুচোখ পানিতে ভরে গেল। আহমদ বলল 'তাহেরা, কাঁদছো!'

'প্রিয়তম! এ আমার কান্না নয়, তোমার চলার পথে এ তোমার তাহেরার নগন্য নজরানা। এ নজরানা পেশ করছি আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে নয়, স্পেনের হাজারো মা, হাজারো বোন, হাজারো নারীর পক্ষ থেকে। পথ চলতে চলতে যদি কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ো, স্মরণ করো আমার এ অশ্রুর কথা, তুমি উজ্জীবিত হবে। লড়াই করতে করতে যদি শিথিল হয়ে আসে বাহু, এ অশ্রু সে বাহুতে দেবে অমিত তেজ। যদি কখনো নিরাশার মেঘ জমে হৃদয়ে, এ অশ্রু সে মেঘ উড়িয়ে দেবে। আমি চাই প্রতিটি ময়দানে এ অশ্রু হোক তোমার সঙ্গী, তোমার প্রেরণা। প্রতিটি মুহূর্ত যেন এ অশ্রু তোমায় তাড়িয়ে ফেরে। যতক্ষণ বাহাদুরের মত বিজয়ী হয়ে তুমি আমার বুকে ফিরে না আসছো, ততক্ষণ এ অশ্রু

যেন তোমাকে ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশ না দেয়।'

আহমদ বলল, 'তাহেরা! তোমাকে পেয়ে আমি গর্বিত। তোমার কাছে বসলেই আমার সময় জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। সম্ভবত আমার সাথীরা আমার জন্য অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছে। আজ আসি। আব্বাকে এ সময় জাগানো সঙ্গত হবে না। তাঁর কাছে তুমি আমার সালাম দিও।'

উভয়ে হাত ধরাধরি করে নীচে নেমে এল। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে তাহেরা বলল, 'খোদা হাফেজ।'

'খোদা হাফেজ' বলে আহমদ ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষল।

৬.

তিন মাস পর।

আহমদ ইবনে আবদুল মুনীম কয়েক দিনের জন্য ফিরে এল টলেডো। তারপর আবার পা বাড়াল অন্য রণাঙ্গণে। এরপর পেরিয়ে গেল আরো দুমাস।

হঠাৎ পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্তে আক্রমণ করল আলফানসু। কয়েক দিনের মধ্যে সে টলেডোর ত্রিশ মাইলের মধ্যে এসে গেল। এ নতুন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য টলেডোর মুজাহিদরা ময়দানে অবতীর্ণ হল। প্রবল প্রতিরোধের মুখে খৃষ্টানরা পিছু হটতে বাধ্য হল। কিন্তু এ যুদ্ধে টলেডোর প্রায় দুহাজার লোক শহীদ হয়ে যায়।

তাহেরার চিঠিতে আহমদ এ দুঃখজনক খবর জানতে পারে। এ যুদ্ধে আবু ইয়াকুবও শহীদ হন। কিন্তু প্রত্যেক রণাঙ্গনেই খৃষ্টানদের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় আহমদ খবর পাওয়ার পরও দু মাসের মধ্যে টলেডোতে আসার সুযোগ পেল না।

হঠাৎ স্পেনের অবস্থার আর একটি পটপরিবর্তন ঘটল। আচানক আলফানসু টলেডো ছেড়ে অন্য দিকে মনোযোগ দিল।

সে তার করদ রাজ্যগুলো থেকে যুদ্ধের খরচ সংগ্রহ করতো। আর এ করদ রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী ছিল সেভিল। মুতামিদের বিলাসিতা ও আলফানসুর ক্রমবর্ধমান খাজনা আদায় করতে গিয়ে সেভিলের রোজকোষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল। এবার খাজনার জন্য আলফানসু বিরাট অংকের অর্থ দাবী করলে মুতামিদ তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়।

জানা যায়, আলফানসুর দাবী পুরণে ব্যর্থ হয়ে মুতামিদ জাল মুদ্রা তৈরী করে। ইবনে আশালীব নামক এক ইহুদী আলফানসুর পক্ষ থেকে খাজনা আদায় করতে এসেছিল। সে জালমুদ্রা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা দাবী করল। মুতামিদ অক্ষমতা প্রকাশ করলে সে সেভিল দখল করার হুমকি দেয়। এতে ক্ষীপ্ত হয়ে মুতামিদ তাকে ফাঁসি দেয় এবং তার সঙ্গীদের কারারুদ্ধ করে। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য

আলফানসু সেভিল আক্রমণ করে বসল।

সেভিল আক্রমণ করার জন্য আলফানসু বহুদিন ধরে এ ধরনের একটি অজুহাত তালাশ করছিল। সে অজুহাত তৈরী হওয়ায় আচানক টলেডো থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করে সেভিলে এসে আলফানসু লুঠতরাজ, হত্যা ও অত্যাচার শুরু করে দিল।

টলেডোর অধিবাসীরা এ সুযোগে খৃষ্টানদের দখল করা এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার করে নিল। সিপাহসালার আহমদকে ডেকে এনে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দিলেন।

এক রাতে আহমদ বাড়ি ফিরে এলে দরজা খুলেই চাকরাণী বলল, 'গ্রানাডা থেকে এক মেহমান এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।'

আহমদ তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় ঢুকে দেখল আলমাস বসে আছে। কোলাকুলি করে আহমদ বলল, 'চাচা, বাড়ির কি খবর বলো।'

আলমাস বলল, 'ইদ্রিস মালাকা থেকে ফিরে এসেছে। অন্তত কয়েকদিন থাকবে। আবদুল মুনীম মর্সিয়া থেকে ফিরে এসে গ্রনাডায় কিছুদিন ছিলেন। তারপর আবু জাফরকে সাথে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছেন। অনেকদিন ধরে হাসানের কোন খবর পাচ্ছি না। ওর সাথে যারা গিয়েছিল তাদেরও কোন খবর নেই। দুমাস আগে মরক্কো থেকে সাদ জানিয়েছিল, সে শীঘ্রই বাড়ি আসছে। কিন্তু নতুন খবর এসেছে, সাদ নৌবাহিনীর সাথে এক সামরিক অভিযানে চলে যাচ্ছে।'

আলমাস আরো বলল, 'তোমার আম্মা বলেছে, তুমি যদি এখন বাড়ি যেতে না-ই পারো তাহলে বৌমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে। তোমার আব্বার ইচ্ছাও তাই। তিনি মনে করেন, টলেডোর অবস্থা এখনও সংকটজনক।'

রাতে আহমদ তাহেরাকে গ্রানাডা যাওয়ার কথা বললে তাহেরা বলল, 'না, আমি টলেডো ছেড়ে যাবো না। গ্রানাডায় গিয়ে আপনার পথের দিকে তাকিয়ে থাকার চাইতে দুশমনের তীর বৃষ্টির মধ্যে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে বেশী সহজ।'

এক সপ্তাহ ওখানে থাকার পর আলমাস চলে গেল। কিছুদিন সেভিলের সীমান্ত এলাকায় লুটতরাজ ও খুনখারাবী করার পর আলফানসু রাজধানীর দিকে অগ্রসর হল। তার ফৌজ সেভিলের উপকণ্ঠে পৌঁছে বাড়ি ঘর পুড়ে ছারখার করল। নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে রক্তের বন্যা বইয়ে দিল। হাজার হাজার মুসলমানদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। তিনদিন পর্যন্ত শহর অবরোধ করে রাখার পর আলফানসু সেভিল জয় না করেই তার সৈন্যবাহিনীকে টলেডোর দিকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিল।

মুতামিদের সিংহাসন এ যাত্রা রক্ষা পেল। কিন্তু সে বুঝতে পারল, স্পেনের অন্যান্য শাসকদের নৌকা যদি একের পর এক ডুবে যায়, তাহলে তীরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তামাশা দেখার সুযোগ সেও পাবে না। আরও বুঝতে পারল, টলেডো বিজয়ের পর আলফানসু বর্ধিত শক্তি নিয়ে যে কোন দিন সেভিল আক্রমণ করবে।

ছয় মাস পর।

টলেডোতে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। বিভিন্ন দিক থেকে আলফানসুর সৈন্য বাহিনী পঙ্গপালের মত টলেডোর দিকে ধেয়ে আসছে। ওমর মুতাওয়াক্কিলের সৈন্য এবং মুজাহিদরা বীর বিক্রমে তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু খৃষ্টানদের প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল।

টলেডোর হাজার হাজার মুজাহিদ ছাড়াও বাতলিউসের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ হারাল। টলেডোকে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য রাজ্য থেকে ছুটে এল অসংখ্য মুজাহিদ। অপর দিকে উত্তরাঞ্চলের ছোট বড় সকল খৃষ্টান রাজ্য থেকে আলফানসুর সাহায্যের জন্য ছুটে আসছিল বিশাল সৈন্য বাহিনী।

ওমর মুতাওয়াক্কিলের শক্তিকে দ্বিধা বিভক্ত করার জন্য আলফানসু তার সেনাবাহিনীর একাংশকে বাতলিউসের দিকে পাঠিয়ে দিল। ওমর মুতাওয়াক্কিল টলেডোর জন্য নিজের রাজ্য বিপদগ্রস্ত করতে প্রস্তুত ছিল না। এছাড়া বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য খণ্ডরাজ্যের শাসকদের উদাসীনতায় তিনি নিরাশ হয়ে পড়লেন। তাই তিনি টলেডোবাসীদেরকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে বাতলিউস ফিরে যান। ওমর মুতাওয়াক্কিলের রণক্ষেত্র ত্যাগ করায় টলেডোবাসী যেমন পেরেশান হলো আলফানসুর বাহিনী তেমনি হলো উল্লসিত।

কয়েক সপ্তাহ ধরে আহমদ মুজাহিদদের একটি দল নিয়ে পশ্চিম সীমান্তের একটি শহর প্রতিরক্ষায় ব্যস্ত ছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুজাহিদ নিয়ে বিপুল সংখ্যক খৃষ্টান বাহিনীর কয়েকটি দলকে একাধিকবার সে নাস্তানাবুদ করল। আবারও ওরা শহরে হামলা করলে দুশমনকে শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে হটিয়ে দিয়ে আহমদ টলেডোতে অবস্থানরত মুতাওয়াক্কিলের সেনাপতির কাছে খবর পাঠাল, 'আপনি আমার সাম্প্রতিক সফলতা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবেন না। আমার সাথীদের অর্ধেক এরই মধ্যে শহীদ হয়ে গেছে। নতুন মুজাহিদ ভর্তি হচ্ছে খুবই কম। শহরের বাসিন্দারা ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে চারশ অশ্বারোহী না পাঠালে শহরের হেফাজত করা কঠিন হয়ে পড়বে।'

অন্য এক চিঠিতে আবদুল ওয়াহিদকে লিখল, 'বাতলিউসের সেনাপতি বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব না দিলে আপনি অবশ্যই আরো মুজাহিদ পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।'

সাত দিনের মধ্যে তার চিঠির কোন জবাব এল না। অষ্টম দিনে আহমদ শুনতে পেল বাতলিউস থেকে তাদের প্রত্যাহারের দুঃসংবাদ। সাথে সাথেই আহমদ পদস্থ ফৌজি অফিসার ও শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে বৈঠকে বসল।

টলেডোর মুজাহিদরা বেশীর ভাগই বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিল।

শহরের নেতাদের মনে তখন হতাশার কালো পর্দা। তারা আহমদের মতামত জানতে চাইলে সে অত্যন্ত শান্তভাবে বলল, 'যদি আপনারা ওমর মুতাওয়াক্কিলের জন্য লড়তে এসে থাকেন, তাহলে আপনাদের এ হতাশা খুবই সংগত। আর যদি আপনারা আল্লাহর জন্য লড়তে এসে থাকেন তাহলে আমি বলতে চাই, আল্লাহর সৈনিক কখনও নিরাশ হতে পারে না।

আমাদের সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে। একটি হচ্ছে সেই পথ, যে পথে চলেছেন আমাদের পূর্বসুরীরা, যে পথে কোন পরাজয় নেই। এ পথে চলতে হয় আমরা গাজী হবো নয়তো শহীদ। গাজী বা শহীদ যাই হই না কেন, এ পথেই আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই একজন মুমীনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

অন্য পথটি হচ্ছে ময়দান থেকে সরে দাঁড়ানো। এতে শাহাদাতের মৃত্যু সৌভাগ্য না হলেও বেঁচে থাকারও কোন সম্ভাবনা নেই। আলফানসু যেসব মুসলিম জনবসতি জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং নির্বিচারে সেখানকার মুসলমানদের হত্যা করেছে, অস্ত্র ধরেনি বলে তাদের আলফানসু ক্ষমার চোখে দেখেনি। লড়াই না করলেও খৃস্টানরা আমাদের রেহাই দেবে না, করলেও আমাদের দ্বিতীয়বার শহীদ করার সুযোগও তারা পাবে না। আর যদি সে আপনাদের ওপর খুবই রহম করে তবে বড়জোর গোলামীর ও লাঞ্ছনার জীবন আপনাদের উপহার দিতে পারে।

এ গোলামীর ও লাঞ্ছনার জীবন আমি কিছুতেই বরদাশত করতে পারবো না। ফলে মরণ ছাড়া আমার গতি নেই। আর মরতেই যদি হয় তবে শাহাদাতের মৃত্যুই আমার কাম্য। এ জন্য আমি নিজের জন্য প্রথম পথটিই বেছে নিয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যারা ঈমানের পথে চলতে চায় তারাও এ পথই পছন্দ করবেন।

আপনাদেরকে আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, আপনারা যদি আমাকে একা ছেড়ে চলে যান তবু আমি আমার তরবারি কোষবদ্ধ করবো না। বাতলিউস আক্রান্ত হওয়ায় মুতাওয়াক্কিল তার সেনাবাহিনী টলেডো থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তিনি ময়দান ছেড়ে যাননি, পড়শির ঘরের আগুন নিভাতে এসে যখন সে নিজের ঘরে আগুন দেখতে পেল তখন সে আপন ঘর বাঁচাতে চলে গেল। তার এ ফিরে যাওয়া প্রমাণ করে না যে, আমাদের ঘরের আগুন নিভে গেছে। বরং সময়ের দাবী হচ্ছে, আরো তীব্রভাবে এ শহর বাঁচানোর জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

তাই আমি মনে করি, টলেডোর মুক্তিসেনাদের সাহসিকতায় বিন্দু মাত্র ঘাটতি দেখা দেওয়ার কোন অবকাশ নেই। আমি আবদুল ওয়াহিদের নামে চিঠি দিয়েছি। সে চিঠির উত্তর এখনো আসেনি। আমার বিশ্বাস, তিনি শীঘ্রই সেখানকার হাল-অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানাবেন। এখন যে কোন মূল্যে এ শহর রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকলে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের মদদ করবেন।'

টলেডোর মাত্র তিন মাইল দূরে কার্ডিজের ফৌজ ছাউনি ফেলল। শহরবাসী প্রতি মুহূর্তেই আক্রমণের আশংকা করছিল। টলেডো সম্পর্কে নানারকম গুজব শোনার পর আহমদ চারজন অশ্বারোহী পাঠাল সঠিক খবর আনার জন্য। তাদের মধ্যে একজন ছিল তাহেরার প্রতিবেশী। এ জন্য আহমদ তার হাতে তাহেরার নামে একটি চিঠিও দিল।

ছয় দিন পর। আহমদ শহরের প্রাচীরের ওপর টহল দিচ্ছিল। আচমকা ও দেখল কয়েকজন অশ্বারোহী শহরের দিকে আসছে। অশ্বারোহীরা ফটকের কাছে এলে আহমদ প্রহরীকে ফটক খুলতে হুকুম দিল। এ অশ্বারোহীরা এসেছে টলেডো থেকে। বাহিনীর সবার আগে ছিলেন আবদুল ওয়াহিদ। আহমদ নীচে নেমে তার ঘোড়ার বাগ ধরল।

টলেডোর এ বৃদ্ধ মুজাহিদ ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। উভয়ে নিরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আহমদ তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিল, কিন্তু বৃদ্ধের মুখমণ্ডলে হতাশার ছাপ দেখে তার জবান বন্ধ হয়ে গেল। সে শুধু পেরেশানী নিয়ে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধের দিকে।

ঘোড়া থেকে নেমে এল আরেক অশ্বারোহী। তার গায়ের বর্ম চকচক করছে। চোখ দুটি ছাড়া সারা মুখমণ্ডল মুখোশে ঢাকা। কিন্তু এ বর্ম ও মুখোশ আহমদকে বিভ্রান্ত করতে পারল না। অশ্বারোহীর চোখই বলে দিচ্ছিল সে কে? আহমদ তাকাল তার হাতের দিকে। সে জানে, এ হাত তরবারি ধরার জন্য নয়, তৈরী হয়েছিল ফুল নিয়ে খেলা করার জন্য।

আবদুল ওয়াহিদ আহমদের হাত ধরে তাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোমার চিঠির জবাবে আমি নিজেই চলে এসেছি, তবে তোমার জন্য কোন ভাল খবর আনতে পারিনি।'

আহমদ বলল, 'আমি আপনার মুখ দেখেই সে খবর জেনে ফেলেছি।'

আবদুল ওয়াহিদ বললেন, 'ওমর মুতাওয়াক্কিল ফিরে গেলে টলেডোর জনসাধারণ হতাশ হয়ে পড়ে। ইয়াহইয়ার সমর্থকরা এর সুযোগ নেয়। তারা হতাশা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নানা রকম গুজব ছড়াতে শুরু করে।

শহরের চার দেয়ালের সামনে দুশমন দেখে নেতৃস্থানীয়রাও হাল ছেড়ে দিল। অন্যান্য জনপদ ও শহরগুলোর মত টলেডোকে দুশমনের দ্বারা বিধ্বস্ত হতে না দিয়ে তারা ইয়াহইয়ার শাসন মেনে নেয়াই সঙ্গত ভাবল। অধিকাংশ নেতা ইয়াহইয়ার আনুগত্য মেনে নিল। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে মুজাহিদরাও ময়দান ছেড়ে বাড়ি চলে গেল। আর যারা ঈমানের বলে বলীয়ান ছিল তারা হিজরত করল ব্যালেন্সিয়া, মর্সিয়া, কর্ডোভা এবং সেভিলে।

আমি সেভিল যাচ্ছি। এখান থেকে দু'মাইল দূরে আমার পরিবার পরিজন অপেক্ষা

করছে। তুমি অবিলম্বে এখান থেকে বের হয়ে যাও। তিন চারদিন পর টলেডোর কোন স্থানই তোমার জন্য নিরাপদ থাকবে না। ডুবন্ত নৌকায় আরোহন করে কোন লাভ নেই। তোমার সাথে টলেডোর যে সব মুজাহিদ আছে তাদের ছেড়ে দাও। ওরা আপন পরিবার পরিজনের কাছে চলে যাক। এখন এখানে লড়াই করেও তুমি খৃষ্টানদের অগ্রগতি রোধ করতে পারবে না। আমি তোমার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে এসেছি। তাকে নিয়ে এক্ষণি এখান থেকে চলে যাও। নিজের সন্তানের চেয়েও তোমাকে অধিক ভালবাসি বলে এবং তোমার মত যুবকের স্পেনে আরো অনেক করণীয় রয়েছে মনে করেই তোমাকে এ অনুরোধ করছি।'

আহমদ বিস্ফারিত চোখে আবদুল ওয়াহিদের দিকে তাকিয়ে রইল। ফটকে আবদুল ওয়াহিদের সঙ্গীদের পাশে ভীড় জমে গিয়েছিল। আবদুল ওয়াহিদ আহমদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

আবদুল ওয়াহিদ বিদায় নিলে আহমদ টলেডোর মুজাহিদদেরকে সফরের জন্য নিজ নিজ ঘোড়া তৈরী করতে বলে এগিয়ে গেল বর্মধারীর কাছে। বলল, 'তাহেরা, আমি তোমাকে প্রথম নজরেই চিনতে পেরেছি। কিন্তু আফসোস! তোমার কবি স্বামী তোমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কোন ভাষা খুঁজে পায়নি।'

শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলল তাহেরা। চোখ দুটো তার অশ্রুতে টইটম্বুর। এক মুজাহিদ আহমদের ঘোড়া তৈরী করে নিয়ে এল। তার চোখেও চিকচিক করছিল বেদনার অশ্রু। সে বলল, 'এই নিন আপনার ঘোড়া। শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা খৃষ্টান সেনাপতির কাছে সন্ধির প্রস্তাবসহ প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে। আপনি কালবিলম্ব না করে এ শহর ছাড়ুন।'

আহমদ এবং তাহেরা ঘোড়ায় সওয়ার হল। শহরের বাইরে পৌঁছে তাহেরা আহমদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি এখনো আপনার সেই সুহাসিনী ভোরের স্বপ্ন দেখেন?'

আহমদ বলল, 'অবশ্যই।'

তাহেরা বলল, 'এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

আহমদ অনুচ্চ কণ্ঠে জবাব দিল, 'গ্রানাডা।'

অমানিশার অন্ধকার

মোটা অংকের খাজনা দেয়ার শর্তে আলফানসু ইয়াহইয়াকে সাহায্য করেছিল। ক্ষমতা ফিরে পেয়ে ইয়াহইয়া জনসাধারণের ওপর তাই বিপুল কর ধার্য করল তারপরও

সে আলফানসুর খাজনা সম্পূর্ণ আদায় করতে পারল না। ফলে বাধ্য হয়ে আরও কয়েকটি দুর্গ আলফানসুর হাতে তুলে দিল।

আলফানসুর চাহিদা ক্রমেই বাড়তে থাকল। ইয়াহইয়া যতই বর্ধিত হারে প্রজাদের কাছে থেকে কর আদায় করে আলফানসুর খাই মেটাতে লাগল ততই আলফানসুর লোভ বেড়ে চলল। ক্রমে জনসাধারণ কর দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। ইয়াহইয়া জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে জনগণের সর্বস্ব হরণে মেতে উঠল। জনগণ তার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে আশপাশের রাজ্যে হিজরত করতে শুরু করল। ইয়াহইয়া আজ এই দুর্গ, কাল ওই এলাকা আলফানসুর হাতে তুলে দিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখল।

কয়েক মাসের মধ্যে ইয়াহইয়ার রাজত্ব টলেডো শহর ও তার উপকণ্ঠে এসে ঠেকল। সারা দেশ চলে গেল আলফানসুর হাতে। ইয়াহইয়া করজোড়ে বলল, 'আমার রাজকোষে আর কিছু নেই। প্রজাদেরও সর্বস্ব লুটে নিয়েছি। আর কিছু দেয়ার সাধ্য নেই আমার।'

আলফানসু ক্রুর হেসে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি টলেডো ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে ভ্যালেন্সিয়া দখল করতে সাহায্য করব।'

ইয়াহইয়া বুঝল, সে এমন এক জল্লাদের পাল্লায় পড়েছে, যার হাত থেকে তার নিস্তার নেই। সে আলফানসুর হাতে টলেডোর কর্তৃত্ব ছেড়ে দিল।

৪৭৮ হিজরীর ২৭ শে মুহরম। আলফানসু বিজয়ীর বেশে টলেডো প্রবেশ করল। গোলামীর শিকল পড়া অথবা দেশ ত্যাগ করা ছাড়া মুসলমানদের আর কোন উপায় রইল না।

টলেডো খৃস্টানদের দখলে চলে যাওয়ায় স্পেনের অন্যান্য এলাকার মুসলমানরাও চরম পেরেশানীতে পড়ল। এ যাবত টাইগ্রীস নদী উত্তরাঞ্চলের আক্রমণকারী ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক সীমারেখার কাজ করছিল। কিন্তু টলেডো শত্রুদের দখলে যাওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের সকল এলাকাই আলফানসুর আক্রমণের আওতায় এসে গেল। খণ্ডরাজ্যের কোন কোন শাসক আলফানসুর টলেডো জয়কে মোবারকবাদ জানালেও অধিকাংশই নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে শংকিত হয়ে পড়ল।

টলেডো জয়ের কিছুদিন পর আলফানসু আচানক একদিন ভ্যালেন্সিয়া দখল করে সেখানে ইয়াহইয়াকে বসিয়ে দিল। কিন্তু জনগণের বুঝতে বাকী রইল না, ইয়াহইয়া নামমাত্র শাসক, মূল শাসক আলফানসুই। একদল জিন্দাদীল স্বাধীনতাকামী মানুষ মরণ নিশ্চিত জেনেও বিদ্রোহ করল। ইয়াহইয়ার সৈন্যরা তাদের দমন করল কঠোর হাতে।

আলফানসুর সৈন্য বাহিনীর খরচ জোগানোর জন্য ইয়াহইয়া কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্যালেন্সিয়ার জনগণের ওপর বেধড়ক লুটতরাজ ও অত্যাচার চালাল। যারা দাবী মত অর্থ দিতে পারল না তাদের জমি-জমা বাজেয়াপ্ত করে খৃস্টানদের মধ্যে বিতরণ করে দিল। ফলে ভ্যালেন্সিয়ায় আসা আলফানসু সৈন্যরা প্রত্যেকেই জমিদার বনে গেল এবং জমির

মূল মালিক মুসলমানরা শ্রমিক ও ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হল।

খৃস্টান সৈন্যদের অবাধ লুটতরাজ ও অত্যাচার দমন করার কোন শক্তি ছিল না ইয়াহইয়ার। শহরের চৌরাস্তায় পুরুষদের হত্যা করা হতো, নারীদের ইজ্জত লুট করা হতো, কিন্তু এসব ব্যাপারে সে ছিল নির্বিকার। পলায়নপর মুসলমানদের গ্রেফতার করে কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করা হতো। এসব কয়েদীদের পরে তারা দাস হিসাবে বিক্রি করে দিতো।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে জড়ো হল আলফানসুর বাহিনী। টেগাস নদী থেকে শুরু করে মালাকা পর্যন্ত বিশাল এলাকার মুসলিম রাজ্যগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। বাতলিউস, সেভিল, শিরীশ, ভিলিয়া এবং সেন্ট-সুফিয়ার মুসলমানরা দেখতে পেল তাদের ভাগ্যাকাশে নিরাশার কালো মেঘ।

আলফানসুর সৈন্যরা ভ্যালেন্সিয়ায় স্থায়ী শিবির স্থাপন করল। মর্সিয়া, আলমুরিয়া, গ্রানাডা ও কর্ডোভার মুসলমানরা টের পেল, আলফানসুর তরবারী তাদের গর্দানে এসে ঠেকেছে। স্পেনের প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষ পরিষ্কার দেখতে পেল, অচিরেই পূর্ব ও পশ্চিমের সকল বাধা অতিক্রম করে খৃস্টান বাহিনী জিব্রাল্টার থেকে মালাকা পর্যন্ত ছুটে যাচ্ছে বিজয়ের নিশান উড়িয়ে।

জিমিনিজ নামক আলফানসুর এক সেনাপতি ভ্যালেন্সিয়ার দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে হাসনুল্লায়েত দখল করল। এটি ছিল দক্ষিণ পূর্ব স্পেনের এক গুরুত্বপূর্ণ কেল্লা। এটি দখল করার পর খৃস্টানরা মর্সিয়া ও আলমুরিয়ার নিকটবর্তী এলাকাগুলোতে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা শুরু করল। এ লুটতরাজে অংশ নিল আলফানসুর সেনাবাহিনী ছাড়াও উত্তরাঞ্চলের দস্যু ও ডাকাতরা। জনমনে ত্রাসের কাঁপন তুলে গ্রামের পর গ্রাম তারা উজাড় করে ফেলল। অসহনীয় বিভীষিকা ছড়িয়ে আলফানসু চাচ্ছিল মুসলমাদের অবশিষ্ট মনোবলটুকুও ধ্বংস করে দিতে।

আলফানসু যতই তার মুখোশ খুলতে লাগল খণ্ডরাজ্য শাসকদের চোখও ততই খুলে যেতে লাগল। তারা বুঝতে পারল, এতদিন প্রজাদের রক্ত খাইয়ে যে অজগরকে তারা মোটা তাজা করেছে, সে অজগর এখন তাদেরকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

জিমিনিজের এক সহকারী হাসানুল্লায়েত থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পথের সকল শহর ও জনপদ তছনছ করে গ্রানাডার কাছে এসে পৌঁছল।

উত্তরাঞ্চলের শহর ও গ্রাম ছেড়ে যেসব মুসলিম কাফেলা দক্ষিণাঞ্চলে হিজরত করছিল সহসা তারা দেখতে পেল, তাদের পেছনে ধ্বংসলীলার জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আর সামনে নিরাশার ঘন অন্ধকার। বছরের পর বছর ধরে যেসব শাসক এ আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছিল, তারাও এখন নিজেদের চামড়ায় সে আগুনের উত্তাপ অনুভব করতে পারল। পেরেশান হয়ে তারা একে অন্যকে প্রশ্ন করতে লাগল, 'এখন আমাদের কি হবে?'

স্পেনের এক কবি বলেছিলেনঃ

'স্পেনের মুসলমানরা!

এখনও সময় আছে সাবধান হও

নইলে এমন একদিন আসবে

আজাবের ভয়ে পালাতে গিয়ে ত্রিভুবনে

মাথা গোঁজা একটু ঠাঁইও কোথাও খুঁজে পাবে না।'

কবির এ সাবধান বাণী একদিন যারা কানেও তোলেনি তারাই আজ লক্ষ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'হায়! এখন আমাদের কি হবে?'

২

স্পেনে মুসলিম শাসনের দুর্দিনে যেসব লোকের ভাগ্য খুলে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ইবনে রশীদ অন্যতম। কয়েক বছর আগে ইবনে রশীদ মুতামিদের মন্ত্রী আম্মারকে মর্সিয়া অভিযানে সাহায্য করেছিল। ইবনে আম্মারের পতনের পরে ইবনে রশীদ মর্সিয়ায় মুতামিদের স্থলাভিষিক্ত হলো।

আলফানসু সেভিল আক্রমণ করলে সুযোগ দেখে ইবনে রশীদ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ভ্যালেন্সিয়া ও হাসনুল্লায়েত দুর্গের দরজায় মর্সিয়া সীমান্তে লুটতরাজ শুরু করলে ইবনে রশীদ তাদের ঘুষ দিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারল, এই পথে দীর্ঘকাল এ বিপদ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

মর্সিয়ার মত আলমেরিয়ার সীমান্তেও খৃষ্টানদের লুটতরাজ শুরু হল। আলমেরিয়ার আমীর মুতাসিম ছিলেন পরহেজগার ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তার জ্ঞান, দ্বীনদারী ও পরহেজগারীর দরুণ প্রজারা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করত। খৃষ্টানরা আলমেরিয়া সীমান্তে অত্যাচার শুরু করায় তিনি জীবনের প্রথম কলম ছেড়ে তরবারি ধরলেন। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে দুশমনদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন তিনি।

তাঁর বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এক অভিজ্ঞ সেনাপতি। একদিন সীমান্তে খৃষ্টানদের সাথে এ বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। দুপুরের দিকে খৃষ্টানরা যখন পলায়ন করছিল ঠিক সে সময় হাসনুল্লায়েত থেকে দুশো সৈনিক তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

ফলে যুদ্ধের গতি পাল্টে যায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও জয়-পরাজয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। হঠাৎ এক খৃষ্টান অশ্বারোহীর আঘাতে মর্সিয়ার সিপাহসালার আহত হলেন। তাকে এক টিলার ওপর উঠিয়ে নেয়া হল। আহত সিপাহসালার হতাশ চিত্তে টিলার ওপর বসে যুদ্ধের অবস্থা দেখছিলেন। তার সৈন্যরা ক্রমেই পিছু হটছিল, হঠাৎ তার দেহরক্ষীদের একজন উত্তর দিকে ইশারা করে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ দেখুন, দুশমন বাহিনীর পেছনে পাহাড়ের দিক থেকে একটি অশ্বারোহী দল তাদের দিকে ছুটে আসছে।'

সিপাহসালার অবাক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে পেরেশান হয়ে এক অফিসারকে বললেন, 'আমাদের সৈন্যদের আরো দক্ষিণে সরে আসতে বলো। এরা হয়ত দুশমনের মদদে আসছে। এরা কোন বিরাট বাহিনীর অংশ কিনা তাই বা কে জানে!'

অফিসার দ্রুত নীচে নেমে তাদের সকল সৈন্যকে পাহাড়ের দিকে সরিয়ে আনল। সেনাপতি মনে করেছিলেন আগন্তুক দলটি দুশমনের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে তিনি দেখলেন, মুহূর্তে তারা দুশমনকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে বসল।

এ নতুন দলে সৈন্য ছিল মাত্র শখানেক। খৃষ্টানরা এ ধরনের আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। দেখতে দেখতে দেড়শো খৃষ্টান সেনা নিহত হল। বিশজনের একটি দল খৃষ্টানদের মধ্য দিয়ে এসে মিলিত হলো আলমেরিয়ার সেনাদের সাথে।

সাদা ঘোড়ায় বসে লড়াই পরিচালনা করছিল এক সালার। সৈন্যদের দুভাগ করে দুশমনের ডান ও বামে চড়াও হল সে। আলমেরিয়ার সৈন্যরা এটাকে আল্লাহর রহমত মনে করে আবার বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুশমনের ওপর। এক ঘন্টা পর দেখা গেল খৃষ্টান সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছে। আহত সেনাপতি একটু আগেও যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন, কিন্তু এ অভাবিত ঘটনায় আঘাতের যন্ত্রণা ভুলে তিনি তকবীর-ধ্বনি দিতে লাগলেন।

নতুন দলের সালার তার সঙ্গীদের নিয়ে শত্রুর পিছু ধাওয়া করল। সূর্যাস্তের পর ফিরে এল তারা। সেনাপতি তাদের দেখে নিজের আঘাত ভুলে ছুটে এলেন নীচে এবং সওয়ারের কাছে পৌঁছে বললেন, 'যুবক! আমি শুনেছি, আল্লাহর বান্দারা কঠোর সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহই তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

যুবক ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বলল, 'আমরা মর্সিয়া থেকে এসেছি।'

সিপাহসালার একটি পাথরের ওপর বসতে বসতে বললেন, 'আমার বিশ্বাস ছিল, বিপদের সময় ইবনে রশীদের সাহায্য পাবো। গ্রানাডার অধিবাসীরাও আর উদাসীন থাকতে পারবে না। দুশমন আমাদেরকে ভালই শিক্ষা দিয়েছে।'

যুবক বলল, 'গ্রানাডার অধিবাসীরা কি করবে জানি না। দুশমনের একের পর এক আক্রমণ শাসকদের চোখ খুলে দিতেও পারে। কিন্তু ইবনে রশীদ থেকে কোন সাহায্যের আশা করবেন না। আমরা ভ্যালেন্সিয়া থেকে ইবনে রশীদের কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু ইবনে রশীদ খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তারবারী ধরতে রাজী নয়। তার নিজের মাথায় আঘাত না পড়লে অন্য কারো সাহায্যের জন্য সে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না।'

'তাহলে আপনি ভ্যালেন্সিয়ার অধিবাসী?'

'না, আমি গ্রানাডার বাসিন্দা।'

'আপনি ভ্যালেন্সিয়ার সেনাবাহিনীতে ছিলেন?'

'না, আমরা গ্রানাডার মুজাহিদ। স্পেনে খৃষ্টানদের সয়লাব রোধ করতে আমরা

বদ্ধপরিকর। গ্রানাডার যে মুজাহিদরা স্পেনে মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার অভিযান শুরু করেছিল আমরা তাদেরই দলভুক্ত। প্রথমে আমরা চার সঙ্গী কার্ডিজ যাই। সেখানে আমরা সেনাবাহিনীতে নাম লেখাই। উত্তর সীমান্তে লুণ্ঠনকারীদের সাথে আমাদের একাধিকবার লড়াই হয়। আমরা দেখলাম, কার্ডিজের মুসলমানরা ভাল যোদ্ধা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের বাহিনীর অধিকাংশ অফিসার খৃষ্টান। আমরা কার্ডিজ বাহিনী থেকে খৃষ্টানদের প্রাধান্য হ্রাস করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কার্ডিজের শাসনকর্তা তাদের হাতের ক্রীড়নক বলে আমাদের কার্ডিজ ত্যাগ করতে হয়।

ভ্যালেন্সিয়ায় আমাদের কিছু সঙ্গী-কাজ করছিল, সে জন্য আমরা সেখানে চলে যাই। সেখানে আমরা মুজাহিদ সংগ্রহ ও সংগঠিত করার অভিযান শুরু করি। বিপ্লবের পর আমরা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে আমাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখি। কিন্তু জনৈক বিশ্বাসঘাতক আমাকে এবং আমার বিশজন সঙ্গীকে গ্রেফতার করিয়ে দেয়। তিন মাস পর ভ্যালেন্সিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কারাগার আক্রমণ করে আমাদের উদ্ধার করে।

তারপর আমরা মনে করলাম, মর্সিয়ায় আমাদের প্রয়োজন হবে। মর্সিয়ায় ইবনে রশীদের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে আমরা গ্রানাডা যাচ্ছিলাম, পথে এ যুদ্ধের খবর পেয়ে আমরা এখানে ছুটে আসি।'

'কাজী আবু জাফর আপনাদের ভ্যালেন্সিয়া পাঠিয়ে ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'এখন আপনি কোথায় যেতে চান?'

যুবক সাথীদের দিকে তাকাল এবং চিন্তা করে বলল, 'আপনারা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখলে আমরা আপনাদের সাথে থাকতে রাজি আছি।'

সিপাহসালার বললেন, 'অবশ্যই আমরা লড়াই জারি রাখবো এবং এ লড়াইয়ে আপনাদেরকে পাশে আশা করবো। আপনার নাম?'

'আমার নাম হাসান ইবনে আবদুল মুনীম।'

'আমি আপনাকে আমার বাহিনীতে নায়েবে সিপাহসালার পদে আশা করছি।'

'কিন্তু আমি তো এ মহান দায়িত্ব পালনের মত কোন যোগ্যতা এখনো দেখাইনি।'

'এ লড়াইতেই আপনি সমরনায়ক হিসাবে যথেষ্ট যোগ্যতার প্রমাণ পেশ করেছেন। আপনাদের সঙ্গীদের সম্পর্কে এখন কোন মতামত পেশ করবো না, তবে আমার বিশ্বাস, তারা অচিরেই আলমেরিয়ার সেনাবাহিনীতে নয়া যুগের সূচনা করবে।'

দু মাস পর।

হাসান ইবনে আবদুল মুনীম আলমেরিয়ার সেনাবাহিনীতে এক হাজার সৈন্যের সেনাপতির পদে উন্নীত হল। সিপাহসালারের মত মুতাসিমও তার প্রজ্ঞা, যোগ্যতা, দায়িত্বানুভূতি ও জাতির প্রতি অপরিসীম কর্তব্যবোধ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং প্রকাশ্যেই তার প্রশংসা করতে শুরু করলেন।

৩.

হাসান আলমেরিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক পাহাড়ী দুর্গের সালার নিযুক্ত হল। হাসনুল্লায়েত থেকে খৃষ্টান লুটেরা দল রাতের আঁধারে নিকটবর্তী জনপদে এসে লুটতরাজ করতো। এদের দমনের উদ্দেশ্যে হাসান চারদিকে গোয়েন্দা ছড়িয়ে দিল। সীমান্তের কোন এলাকায় লুটেরা দল ঢুকে পড়লে হাসান সেনাবাহিনী নিয়ে দ্রুত সেখানে পৌছে যেত।

এ দুর্গের পূর্ব সীমান্ত ছুঁয়েছে গ্রানাডার সীমানা। আলমেরিয়া ও গ্রানাডার সীমান্ত প্রহরীরা পরস্পরকে দুশমনের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করত।

এক রাতে গ্রানাডার সীমান্ত চৌকির দূত এসে খবর দিল, 'হাসনুল্লায়েত থেকে দেড় হাজার খৃষ্টান অশ্বারোহী গ্রানাডার দিকে অগ্রসর হচ্ছে; গ্রানাডার সালার অনুরোধ করেছেন, আপনি যদি খৃষ্টানদের পেছন দিক থেকে অবরোধ করে দাঁড়ান তাহলে গ্রানাডার সেনারা সম্মুখ থেকে তাদের আক্রমণ করে বিগত কয়েক মাস যাবত গ্রানাডা ও আলমেরিয়া সীমান্তে যে সব লুটতরাজ করেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে।'

হাসান অফিসারদের নিয়ে পরামর্শে বসল। কোন কোন অফিসার বলল, 'সিপাহসালারের অনুমতি ছাড়া গ্রানাডার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা উচিত হবে না। গ্রানাডা ও আলমেরিয়ার মধ্যে এমন কোন যৌথ সামরিক চুক্তি নেই যার আওতায় এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায়।'

হাসান এর জবাবে বলল, 'এমনও তো হতে পারে, আলমেরিয়া ও গ্রানাডা সৈন্যরা যৌথ অভিযানে গেলে সরকার যৌথ সামরিক চুক্তি করতে উৎসাহ ও প্রেরণা পাবে। এ সময় শত্রুর অগ্রগতি রোধ করার জন্য আমাদের সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। আজ যদি আমরা গ্রানাডায় শত্রুর অগ্রগতিকে বাধা দান করতে এগিয়ে যাই তাহলে কাল আলমেরিয়া সীমান্তে শত্রুর অগ্রগতি রোধ করার জন্য গ্রানাডার সৈনিকরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। আমরা যে ঝড়ের পূর্বাভাস দেখছি সে ঝড় প্রচণ্ড বেগে বইতে শুরু করলে আমাদের একক প্রচেষ্টা প্রবল বন্যার মুখে খড়কুটার মতই ভেসে যাবে।'

এক যুবক উঠে বলল, 'সঠিক পদক্ষেপ নিতে গিয়ে আমাদের এত দ্বিধা করা উচিত নয়। এই দস্যুরা আমাদের সীমান্ত এলাকার অসংখ্য বাড়িঘর জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে। এখন প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে আমরা তাদের ছেড়ে দিতে পারি না। অবশ্যই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। আমরা সবাই আপনার সাথে আছি। আপনি আমাদের নিয়ে ময়দানে চলুন এবং সিপাহসালারকে জানান, এখানকার অফিসাররা নিজ দায়িত্বে এবং সম্মিলিত পরামর্শের ভিত্তিতে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।'

পর দিন সকাল। গ্রানাডার এক সীমান্ত শহরে খৃষ্টান সৈন্যরা লুটতরাজ করছে। শহরবাসী মোকাবেলা না করায় তারা সতর্কতা ছেড়ে বিভিন্ন বাড়িঘরে ঢুকে মৌজে মেতে

উঠল। পথে পথে লোকজনকে হেনস্তা ও অত্যাচার করতে লাগল। আচমকা আলমেরিয়ার আটশ অশ্বারোহী পাহাড়ের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে তাদের ওপর অতর্কিতে হামলা করল।

খৃষ্টানরা এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা আত্মরক্ষার জন্য ফিরে দাঁড়ানোর আগেই কয়েকশ সৈন্য লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়। এরপর ঘন্টাখানেক শহরের ভেতর শুধু তলোয়ারের ঝনঝনানি শোনা গেল। আলমেরিয়ার সৈনিকদের সামনে টিকতে না পেরে পিছু হটে উল্টোদিক দিয়ে সরে পড়তে চাইল খৃষ্টানরা। কিন্তু তাদের ওপর নেমে এল গজবের পাহাড়। গ্রানাডার সৈন্যরা বের হয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। তাদের আঘাত এড়িয়ে খুব কম সংখ্যক খৃষ্টান সৈন্যই পালাতে পারল।

আলমেরিয়া ও গ্রানাডার সীমারেখা টানা ছিল আশ নদী দিয়ে। নদীর অপর পাড়ে হাসানের এক দল সৈন্য ওঁত পেতে বসেছিল। গ্রানাডা ও আলমেরিয়ার সম্মিলিত সৈনিকদের ধাওয়া খেয়ে যে কয়জন পুল পেরিয়ে ওপারে পৌঁছল ওঁৎ পেতে থাকা সৈনিকদের তীরের আঘাতে প্রাণ হারাল ওরা।

৪.

লড়াই শেষ হতেই গ্রানাডার এক অশ্বারোহী হাসানের দিকে এগিয়ে এল। হাসান তার সৈন্যদের খোঁজখবর নিচ্ছিল। গ্রানাডার অশ্বারোহীকে দেখে সে হতবাক হয়ে গেল। পরম বিস্ময় নিয়ে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দু ভাই। তার পর নিজ নিজ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রানাডার আরো কিছু সৈনিক ওদের পাশে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। এদের অনেকেই ছিল হাসান ও আহমদের সহপাঠি।

আহমদ বলল, 'হাসান! গ্রানাডা থেকে আলমেরিয়া খুব বেশী দূরে নয়। নিজের খবরাদি বাড়িতে জানানো উচিত ছিল তোমার। তোমার সংগীরাই বা কেমন? তারাও কি বাড়িতে একটু যোগাযোগ করতে পারেনি?'

হাসান বলল, 'ভাইজান, মাত্র তিন মাস হল আমি এখানে এসেছি। খৃষ্টান ও দস্যুদের উৎপাতে এ কয়দিন বাড়িঘরের কথা চিন্তা করারই ফুরসত পাইনি। আশা করি কিছুদিন আর ওরা উপদ্রব করবে না। ইনশাআল্লাহ শীগগীরই গ্রানাডা যাওয়ারও সুযোগ করে নিতে পারবো।'

'আলমেরিয়া আসার আগে কোথায় ছিলে? দীর্ঘদিন তোমার কোন খবর না পেয়ে আমরা খুবই চিন্তিত ছিলাম। আমি নিজে তোমাকে খুঁজতে কার্ডিজ গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনতে পেলাম তুমি চাকুরী ছেড়ে বহুদিন আগেই সেখান থেকে চলে গেছো।'

হাসান সংক্ষেপে নিজের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করল এবং তারপর ভাইয়ের কাছ থেকে বাড়ির খবর নিল।

আহমদ বলল, 'বাড়িতে সবাই ভাল। আম্মাজান, খালা ও মায়মুনা তোমার জন্য খুবই চিন্তিত। ইদ্রিস ও আলমাস ভাল আছে। আমাদের পরিবারে একজন সদস্য বেড়েছে।'

হাসান জিজ্ঞাসু নেত্রে ভাইয়ের দিকে তাকাল। আহমদ হেসে বলল, 'আমার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'কোথায়?'

'টলেডোতে।'

'আলহামদুলিল্লাহ। খুবই আনন্দের সংবাদ দিলেন ভাইজান। বড় ভাইয়া এখনো ফিরে আসেন নি?'

'যে আলোর সন্ধানে তিনি মরু সাহারা চষে ফিরছেন সে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দুমাস আগে তিনি তিন দিনের জন্য বাড়ি এসে এ খবর দিয়ে গেছেন।'

হাসান আহমদকে একদিকে টেনে নিয়ে এক গাছের নীচে দাঁড়াল। বলল, 'অন্যদের সামনে বিস্তারিত আলাপ করা সঙ্গত বিবেচনা করিনি। ভাইজান কি কোন আশার খবর নিয়ে এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে খুলে বলুন।'

'ভাইজান কাজী আবু জাফরকে জানিয়েছেন, ইউসুফ বিন তাশফিন আলফানসুর অগ্রাভিযানে খুবই উদ্বিগ্ন। স্পেনের আলেম ও শাসকরা একমত হয়ে তাঁকে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আমন্ত্রণ জানালে তিনি তাদের নিরাশ করবেন না।

আফ্রিকায় আমীর ইউসুফের দৃষ্টিতে সম্মানিত যেসব আলেম আছেন তাদের সকলকেই ভাইজান স্পেনের অবস্থা বুঝিয়ে বলেছেন। উপজাতীয় সর্দারদেরও তিনি স্পেনকে সাহায্য করতে রাজী করিয়েছেন। এখন আর আফ্রিকায় আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহ নেই। ফলে আমন্ত্রণ পেলেই তিনি স্পেনে আসতে পারেন। এ খবর পেয়েই কাজী আবু জাফর স্পেনের মশহুর আলেমদের নিয়ে কর্ডোভায় বৈঠক করেছেন। বৈঠকে কয়েকটি খণ্ডরাজ্যের সরকারী প্রতিনিধিও ছিলেন।'

'মর্সিয়ায় থাকতেই আমি এ সভার খবর শুনেছিলাম। কিন্তু ফলাফল জানতে পারিনি।'

আহমদ বলল, 'আমিও সে বৈঠকে ছিলাম। ইচ্ছে করেই এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত গোপন রাখা হয়েছে। সময় হলেই তা প্রকাশ করা হবে। বৈঠকের একটা সিদ্ধান্ত ছিল, আলেমদের একটি প্রতিনিধি দল আবার খণ্ডরাজ্য শাসকদের সাথে দেখা করবেন এবং তাদেরকে আমীর ইউসুফের নেতৃত্বে আলফানসুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করার

দাওয়াত দিবেন।

কাজী আবু জাফরের নেতৃত্বে গঠিত এ প্রতিনিধি দল প্রথমে মুতামিদের কাছে যায়। সেভিলে আলফানসুর আক্রমণের দরুণ মুতামিদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছিল। একটা সময় ছিল যখন কাজী আবু জাফরের পক্ষে সেভিলে প্রবেশ করাই অসম্ভব ছিল। আর এখন স্বয়ং মুতামিদ শহরের সদর ফটকে এসে কাজী আবু জাফরকে অভ্যর্থনা জানান।

আলেমদের ভয় ছিল, মুতামিদ আমীর ইউসুফের সহযোগিতা পছন্দ করলেও তার নেতৃত্ব মেনে নেবে না। কিন্তু আলফানসুর তরবারি গর্দানে দেখে হুশ ফিরেছে তার। আলেমদের সাথে আলোচনার পরপরই অন্যান্য শাসনকর্তার কাছে দূত পাঠিয়েছেন তিনি। চলতি মাসেই স্পেনের সকল শাসনকর্তা অথবা তাদের প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য একত্রে বসবেন।

আমার বিশ্বাস, এসব লোক ইসলামের জন্য ঐক্যবদ্ধ না হলেও নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হবে। আলফানসুর সেনাবাহিনী টলেডো থেকে অগ্রসর হয়ে অন্য রাজ্য আক্রমণ করতে বেশী বিলম্ব করবে না। আননেভার, আরগুন এবং লিউনের খৃষ্টান শাসনকর্তারা ছাড়াও ফ্রান্স এবং ইটালী থেকে হাজার হাজার অশ্বারোহী তার পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে।'

হাসানের অন্তর খুশীতে টগবগ করে উঠল। সে বলল, 'ভাইজান, আপনি এত খবর জানেন! আর আমি এ খবরটুকুই জানতাম না যে আপনি আমার এত কাছে আছেন। আমার গোয়েন্দারা সব সময় এ চৌকির সালারের প্রশংসা করে। আমি ভাবতাম, এখানকার সালার কোন বয়স্ক ব্যক্তি।'

আহমদ বলল, 'আমি সালারে আলার নায়েব। আমাদের সালারে আলার সাথে দেখা হলে তুমি এ বিজয়ের চাইতেও বেশী খুশী হবে।'

হাসান জিজ্ঞেস করল, 'তিনি কোথায়?'

'তিনি এ শহরেই আছেন।'

'এখন আমার ফিরে যাওয়া উচিত। নিজ দায়িত্বেই আমি আলমেরিয়ার সৈন্যদেরকে রণক্ষেত্রে নিয়ে এসেছি। আমীর এ জন্য আমার ওপর নাখোশ হতে পারেন। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার সালারে আলার সাথে দেখা করতে আসবো।'

আহমদ বলল, 'না না, তুমি যাওয়ার আগেই সালারে আলার সাথে দেখা করে যাও। তিনি অচিরেই সেভিল চলে যাবেন।'

'সেভিল কেন?'

আহমদ বলল, 'সেভিলেই আলেম ও শাসকরা একত্রিত হচ্ছেন।'

'আচ্ছা, আমি সৈন্যদের রওনা করিয়ে দিয়েই আপনার সাথে যাচ্ছি। কিন্তু আজই আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

'তুমি সন্ধ্যার আগেই ফিরে যেতে পারবে। তোমাকে তাজাদম ঘোড়া দিয়ে দেব।'

'তাহলে তো ভালই হবে। কিন্তু আপনার সালারে আলার নাম কি?'

আহমদ বলল, 'এখন বলব না, আগে দেখি তুমি তাকে চিনতে পারো কি না।'

'গ্রানাডা ফৌজের কোন পদস্থ অফিসারই আমার অচেনা নয়।'

'তিনি গ্রানাডা ফৌজের কেউ নন। তিনি আমাদেরই মত এক মুজাহিদ। খৃস্টানদের অগ্রগতির মুখে গ্রানাডার ফৌজ যখন পিছু হটছিল সে সময় তিনি মুজাহিদদের নিয়ে এলাকা হেফাজতের দুঃসাহসিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।'

৫.

হাসান অশ্বারোহীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আহমদের সাথে গ্রানাডার সীমান্তবর্তী শহরের সেনা ক্যাম্পে রওনা হল। শহরবাসীরা তখন মুজাহিদদের নিয়ে আনন্দ মিছিল করছিল।

একটি বাড়ির সামনে এসে ওরা ঘোড়া থেকে নামল। আহমদ বলল, 'হাসান, আমাদের সালারে আলা এ বাড়িতে থাকেন। তুমি এখন এক মহান ব্যক্তির সামনে যাচ্ছো।'

ওরা ঘোড়া থেকে নামলে দুজন সিপাই এগিয়ে এসে ঘোড়ার বাগ ধরল। তারা দুজন বাড়িতে ঢুকে গেল। বারান্দায় এক যুবক দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাধা। হাসান তাকে দেখামাত্রই চিনে ফেলল। আহমদের দিকে ফিরে বলল, 'ভাইজান, আপনি মনে করেন আমি ইলিয়াসকেও চিনতে পারবো না?'

তারপর সে এগিয়ে ইলিয়াসের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল এবং বলল, 'ভাইজান বলেছিলেন, আমি তাঁর সালারে আলাকে চিনতে পারবো না। সারা পথ আমি খুবই চিন্তায় ছিলাম।'

আহমদের ইশারায় ইলিয়াস বলল, 'আমারও মনে হয়, সালারে আলাকে তুমি চিনতে পারবে না।'

হাসান ও ইলিয়াস কথা বলছে, আহমদ একটি কামরায় প্রবেশ করল। একটু পর সে কামরা থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। হাসান চমকে উঠে বলল, 'ইদ্রিস ভাই...!'

ইদ্রিস এগিয়ে এসে তার সাথে কোলাকুলি করল। তারপর বলল, 'হাসান, তুমি আগে সালারে আলার সাথে দেখা কর। পরে কথা বলব।'

'আপনি যে এখানে আছেন এ খবর তো ভাইজান আমাকে বলেন নি!'

'আমি এখানে থাকি না। কাছেই এক চৌকি আছে, ওখানে থাকি। একটু আগে এলাম, চলো সালারে আলার কাছে।'

হাসান ইদ্রিসের সাথে কামরায় প্রবেশ করল। বৃদ্ধ সালারে আলা একটি টেবিলের ওপাশে বসেছিলেন। টেবিলের ওপর নানা রকম নকশা ও কাগজপত্র। আহমদ সালারে

আলার বাম পাশে বসা। হাসানের পরিচয় দিতে গিয়ে আহমদ বলল, 'ইনি আলমেরিয়ার সীমান্ত-দুর্গের সালার।'

বৃদ্ধ সালারের অপলক দৃষ্টি হাসানের চেহারায় আটকে রইল। হাসান আস্তে করে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম।'

বৃদ্ধ সালার সালামের জবাব দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন সামনে। হাসান পরম উৎসাহে করমর্দন করতে করতে বলল, 'আপনাকে কখনও গ্রানাডায় দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

বৃদ্ধ সালার ব্যথাহত কণ্ঠে বললেন, 'না, আমি ওখানে ছিলাম না।'

'তবে আমি যেন আপনাকে কোথাও দেখেছি।'

বৃদ্ধ সালার কোন জবাব দিলেন না। তিনি হাসানের হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। হাসান আহমদের দিকে তাকাল। তার ঠোঁটের কোণে হাসি কিন্তু চোখে জমাট বাঁধা অশ্রু। এই অবরুদ্ধ আবেগ প্রকাশ করতে না পেরে সে ভেতরে ভেতরে ঘামছিল। হাসানের চাহনির জবাবে বলল, 'হাসান, তুমি এঁকে আর কখনও দেখেছো বলে মনে করতে পারছো না?'

হাসান পেরেশান হয়ে অতীতের পাতাগুলো খুলে খুলে দেখছিল কিন্তু এর কোন সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। সে অস্থিরভাবে একবার আহমদের দিকে, একবার বৃদ্ধ সালারের দিকে তাকাচ্ছিল।

বৃদ্ধ সালার আহমদ এবং ইদ্রিসের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, 'তখন ও খুবই ছোট ছিল। আমার মনে আছে, যেদিন আমি বিদায় নিয়েছিলাম, সে দিন সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলছিল, 'আব্বা, আমাকে সাথে নিয়ে যান। আপনি ওয়াদা করেছিলেন, যুদ্ধ শেষ হলে আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন।'

কথাগুলো হাসানের অন্তরে তীরের মত বিঁধে গেল। মায়ের কাছে সে এ কথা অনেকবার শুনেছে। হঠাৎ সে 'আব্বা' বলে চিৎকার করে উঠল এবং ছুটে গিয়ে বৃদ্ধ সালারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘরের সবার চোখ থেকেই তখন টপটপ করে অশ্রু ঝরছিল। যে অবুঝ শিশুকে রেখে কারাগারে গিয়েছিলেন আবদুল মুনীম, সে শিশু এখন জাঁদরেল মুজাহিদ। দীর্ঘ বিরহের পর পিতা-পুত্রের এ মিলন দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে কেউ চোখের অশ্রু সামলাতে পারল না। হাসান কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আব্বাজান, এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন? যুদ্ধ কি এখনো শেষ হয়নি আব্বাজান!'

৪

মু'তামিদের শাহী মহল। প্রশস্ত দরবার হলে খণ্ডরাজ্যের শাসকবৃন্দ বৈঠক করছেন। অধিকাংশই মত দিলেন, তারা আলফানসুর বিরুদ্ধে আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের

নেতৃত্বে লড়াই করতে প্রস্তুত। তারা আমীর ইউসুফের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানোর জন্য তৈরী।

কিন্তু কয়েকজন এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করল। এদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা নিল শাহজাদা রশীদ। সে বৈঠকের আগেই তার পিতাকে বলেছিল, 'আফ্রিকানরা বর্বর, অসভ্য ও জংলী। তাদেরকে স্পেনে ডেকে আনার মানে খাল কেটে কুমির আনা। এর পরিণতি হবে অত্যন্ত মারাত্মক। স্পেনের আলেমরা জনগণকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ইউসুফ বিন তাশফিন সব কাজই করবে এই আলেমদের পরামর্শে। আর আলেমরা প্রথমেই বলবে আমাদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে। জনগণও এ প্রস্তাব সমর্থন করবে। ফলে আমীর ইউসুফ বিনা বাধায় স্পেনের হর্তাকর্তা হয়ে যাবে।

তখন, যে সব আলেম আমাদেরকে দ্বীনের দুশমন বলে ফতোয়া জারি করেছিল, ক্ষমতা থাকবে তাদের হাতে। তারাই হবে বিচারক আর আমাদের জন্য নির্ধারিত হবে আসামীর কাঠগড়া। এ বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার পরিবর্তে আমাদের যে কোন মূল্যে আলফানসুর সাথে সন্ধি করে নেয়া উচিত।'

শাহজাদা রশীদের পর সবচে সোচ্চার যে কণ্ঠটি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করল, সে হল রাণী রেমিকা। সে মনে করত, আমীর ইউসুফের সাহায্যে যে সব লোক ক্ষমতায় আসবে তারা প্রথমেই শাহী মহলের বিলাসিতার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করবে এবং সাধারণ জীবন যাপন করতে আমাদের বাধ্য করবে। কিন্তু মুতামিদ এ সব কথায় কান দেয়া জরুরী মনে করল না।

অন্যান্যের মধ্যে মালাকার শাসক হাকিম আবদুল্লাহ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করল। বলল, 'আপনারা ইসলামের নামে রাবাতের আমীরকে সাহায্যের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চাচ্ছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আমীর ইউসুফ স্পেনের আলেম ও জনগণের সমর্থন নিয়ে যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবে, সেখানে আপনাদের কোন স্থান থাকবে না। ওরা ধর্মান্ধ এবং সভ্যতা ও কৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। তাদের ইসলাম প্রবল ঝড়ের মত এসে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল চিহ্ন মুছে ফেলবে।

যে আলেমরা আমাদের সম্মানিত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রূপ করে তারাই হবে সকল রুণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওরা আশরাফ আতরাফ মানে না। ভদ্র লোকদের সম্মান দিতে জানে না। ওদের আইনে পথের ভিক্ষুক আর বিত্তবানরা একই সমান। আমীর ফকীরের ভেদাভেদ জ্ঞানটুকুও ওদের নেই। আমাদের অনৈক্যের কারণে আলফানসু আমাদের জন্য বিপদজনক হয়ে উঠেছিল ঠিক, কিন্তু এখন আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তাহলে সে পালাবারও পথ পাবে না। আর যদি চূড়ান্ত সংঘর্ষে যেতে না চাই তাহলে তার সেনা অফিসারদের ঘুষ ও তাকে খাজনা দিলেই হবে। ইউসুফ বিন তাশফিনকে ডেকে আমার ঝুঁকি নেয়ার চাইতে আলফানসুকে খাজনা দিয়ে সন্ধি করা আমি হাজার গুণ ভাল মনে করি। এতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। আলফানসুকে তুষ্ট রাখা যাবে,

আমাদের গদি রক্ষা পাবে, আর ধর্মান্ধদের কবল থেকে বেঁচে যাবো আমরা।'

এ বক্তৃতার জবাবে ওমর মুতাওয়াক্কিল উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আলমেরিয়া আলফানসুর আওতা থেকে অনেক দূরে বলে আপনি এত কথা বলতে পারলেন। কিন্তু ধন সম্পদ দিয়ে কোন রাক্ষসের পেট ভরানো যায় না। যতই আমরা আমাদের সর্বস্ব তার হাতে তুলে দেই না কেন, সে আমাদের নিস্তার দেবে না। টলেডোর সুলতানের চাইতে বেশী সম্পদ কেউ তাকে দেয়নি, কিন্তু টলেডোর কি পরিণাম হয়েছে আমরা সবাই জানি। তার খাই মেটাতে গিয়ে রাজকোষ শূন্য করেছি, কিন্তু তার ক্ষুধা মেটাতে পারিনি।

আমীর ইউসুফ আমাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে কিনা আমি জানি না। তবে তিনি যদি আমাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে আমাদেরকে মরুভূমিতে রাখালের কাজও দেন সেটাকেও আমি খৃষ্টানদের কয়েদখানা থেকে উত্তম মনে করবো। অন্তত খোলা আকাশের নীচে মুক্ত হাওয়ায় আরো কিছুদিন বেঁচে থাকার সুযোগ পাবো তাতে।

আমি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এমন এক সময়ে আমরা ইউসুফ বিন তাশফিনকে আহবান জানাচ্ছি, যখন আমাদের নাজাতের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আপনারা কি চান, আলফানসু গোটা স্পেনে খৃষ্টানদের বিজয় পতাকা উড়াক আর সারা দুনিয়ার মুসলমান আমাদের ধিক্কার ও অভিশাপ দিক? আমাদের ওরা কারাগারে বন্দী করুক আর আমাদের জনগণকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের দাস বানিয়ে নিক? আমাদের মসজিদগুলো থেকে আজানের পরিবর্তে ওদের পশুর ডাক-চিৎকার ভেসে আসুক?

যে তথাকথিত কাব্যকলা ও শিল্পকলার জন্য আমাদের এত প্রাণপাত, ক্লেদাক্ত জীবন ছাড়া জনগণকে সে আর কি দিয়েছে? সে কি জনতার মনে সাহস, উদ্দীপনা ও মহত কোন ভাবের জন্ম দিয়েছে? আমি সেই সব কবিদের কথা বলছি না, যারা আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত হয়ে নিতান্ত দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে থেকেও জনগণকে কিছুটা হলেও স্বপ্ন দেখাতে পেরেছে এবং জনগণের সহায়তায় কোন রকমে এখনো টিকে আছে। আমি বলছি যাদের আমরা লালন পালন করছি তাদের এ দুর্যোগের দিনে কি করতে পারছে তারা? তারা কি খৃষ্টানদের এই সয়লাব রোধকল্পে জনগণকে সজাগ করার জন্য একটি লাইনও লিখেছে? খৃষ্টানদের তলোয়ারের ঝনঝনানি কি এসব কবিতা রুখতে পারবে?

আপনারা জেনে রাখুন, এ সয়লাব রুখতে পারে কেবল তলোয়ার। আমাদের তরবারী ভোতা হয়ে গেছে, কিন্তু যাদের আপনারা অসভ্য ও জংলী বলছেন তাদের তলোয়ারের চমক বিদ্যুতের ঝলকানির চাইতেও দ্যুতিময়। আমীর ইউসুফের সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমি জানি, তিনিই আমাদের ভাগ্যাকাশের শেষ ধ্রুবতারা, আমাদের দুর্দিনের অথৈ সমুদ্রের একমাত্র কাণ্ডারী, আমাদের অন্ধকার ঘরের একমাত্র বাতি, আমাদের শেষ আশা ভরসার স্থল।

যারা আজ আমীর ইউসুফের হাত ধরে মুক্তির ময়দানে ঘোড়া ছুটাতে চান, তারা

আমাকে তাদের সাথেই দেখতে পাবেন।'

দীর্ঘ বিতর্কের পর মুতামিদ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ওমর মুতাওয়াক্কিল আমার প্রাণের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। আলফানসুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আজ দরকার মুজাহিদদের তরবারি।

আলফানসুকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা কোষাগার শূন্য করেছি, বিনিময়ে সে এখন সেভিলের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করছে। বাইরের সাহায্য ছাড়া সেভিল ও কর্ডোভাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো না। আপনাদের মধ্যে যদি কারো নিজের শক্তির ওপর ভরসা থাকে তাহলে তাকে আমরা আমাদের সাথে মিলিত হতে বাধ্য করবো না। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যারা আমার মত ভবিষ্যত চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের কাছে আমার আবেদন, আলাপ আলোচনা করে আর সময় নষ্ট করবেন না। আমরা একটি আগ্নেয়গিরির মুখে বসে আছি, যে কোন সময় এর মুখ থেকে অগ্নুৎপাত শুরু হয়ে যেতে পারে।

আমি ইউসুফ বিন তাশফিনের তারিফ করছি না। শুধু বলতে চাই, এ দুঃসময়ে তিনিই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আমাদের অন্ধকার দিগন্তে তিনিই একমাত্র আশার আলো।'

দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, আমীর ইউসুফকে স্পেনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, তিনি স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না এ ব্যাপারে তাকে ওয়াদা করতে হবে।

ওমর মুতাওয়াক্কিল ইউসুফ বিন তাশফিনের নামে দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। খণ্ডরাজ্যের শাসকরা একের পর এক সে চিঠিতে স্বাক্ষর দান করলেন। কাজী আবু জাফর আগেই এক পত্রে স্পেনের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের স্বাক্ষর নিয়েছিলেন।

পরের দিন। স্পেনের সকল খণ্ডরাজ্যের শাসক ও আলেমদের পক্ষ থেকে একটি সম্মিলিত প্রতিনিধি দল এই দুই চিঠি নিয়ে মরক্কো অভিমুখে রওনা হলো।

ফরিয়াদ

আল্লাহতায়ালা স্পেনের উদ্ধারকর্তা হিসাবে যাকে মনোনীত করেছিলেন অবশেষে স্পেনের আলেম ও শাসকদের দূত আফ্রিকার সেই দরবেশ শাসকের দরবারে উপস্থিত হল। আমীর ইউসুফ বিন তাশফিন বসেছিলেন খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর। হীরার মুকুট ও জরীর আলখেল্লার পরিবর্তে তার গায়ে শোভা পাচ্ছিল পশমের তৈরী মোটা

কাপড়। কিন্তু চেহারায় ছিল পবিত্রতা, প্রজ্ঞা, মহত্ব ও ব্যক্তিত্বের সমন্বিত দ্যুতি। তার চোখে একই সাথে খেলা করছিল বাহাদুরের নির্ভীকতা ও শিশুর সরলতা। তাকে ঘিরে বসেছিলেন শ্রদ্ধেয় আলেমবৃন্দ ও ফৌজি সালারগণ।

স্পেনের জনৈক আলেম করমর্দন করার পর তাঁর হাতে চুমো দিতে গেলে তিনি হাত সরিয়ে বললেন, 'আমি অসাধারণ, কেউ আমার মনে এমন ভুল ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবেন না। প্রতিটি ইনসানই সমান, সবাই আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির সেরা।'

কাজী আবু জাফর এগিয়ে স্পেনের আলেম সমাজের পক্ষ থেকে নিয়ে আসা পত্র আমীর ইউসুফের হাতে পেশ করলেন। তারপর স্পেনের অসহায় মুসলমানদের ওপর আলফানসুর আগ্রাসন ও অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে বললেন, 'হে আমীর, আমরা বড় আশা নিয়ে আপনার দরবারে এসেছি। চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিপর্যয়ের তুফানে পড়ে আমরা আল্লাহরওয়াস্তে আপনাকেই শেষ ভরসা ও আশ্রয় বিবেচনা করছি। স্পেনে আমাদের অবস্থা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। টলেডো ও ভ্যালেন্সিয়ায় ইসলামের পতাকা নামিয়ে ক্রুশের ঝাণ্ডা উড়ানো হয়েছে, কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারিনি। নাসারারা এখন সেভিল, বাতালিউস, কর্ডোভা, মর্সিয়া ও গ্রানাডার সদর ফটকে এসে করাঘাত করছে। আমারা স্পেনের ঐ সব মা-বোন ও কন্যাদের আর্তনাদ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, যাদের টলেডো ও ভ্যালেন্সিয়া থেকে বন্দী করে কার্থেজ, লিউন ও আননেভারের বাজারে পশুর মত বিক্রি করা হচ্ছে।

হে আমীর!

স্পেনের প্রতিটি শহর আজ অরক্ষিত। টলেডো ও ভ্যালেন্সিয়ার দুর্ভাগ্য এখন সব শহরের দেয়ালে দেয়ালে আঘাত হানছে। এখনই এ সয়লাব রোধ করতে না পারলে সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন স্পেনের প্রতিটি ঘরে বেইজ্জতি হবে আপনারই মা-বোন। তাদের আহাজারি ও দুশমনের অট্টহাসি ছাড়া স্পেনের বাতাসে আর কোন শব্দ থাকবে না। স্পেনের মসজিদগুলো থেকে বন্ধ হয়ে যাবে আজানের ধ্বনি, মাদ্রাসাগুলোতে কেউ আর তেলাওয়াত করবে না আল্লাহর কালাম। এ সয়লাব রোধ করার সাধ্য যে আমাদের নেই টলেডো ও ভ্যালেন্সিয়ায় আমাদের পরাজয় থেকে তা স্পষ্ট। তাই আফ্রিকার মরুভূমি ও অরণ্যে যিনি ইসলামের চাষ করেছেন তার কাছে ছুটে এসেছি আমরা। আজ স্পেনের প্রতিটি মুসলমান অধীর হয়ে আকুতি ও প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে। মরার আগে তারা শুধু একবার দেখতে চায় খৃস্টানের তলোয়ারের ধার বেশী, নাকি আল্লাহর তলোয়ারের। আলফানসুর তলোয়ারের চমক তারা দেখেছে, এবার দেখতে চায় আপনার তলোয়ারীর ঝিলিক।'

কাজী আবু জাফরের বক্তব্য শোনার পর আমীর ইউসুফ মাথা নত করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় বললেন, 'চূড়ান্ত ফায়সালার মালিক আল্লাহ। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকু ওয়াদা করতে পারি, নিরব দর্শক সেজে আমি

স্পেনের মুসলিম ভাইদের এ বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলায় তামাশা দেখবো না। কিন্তু এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে স্পেনের শাসনকর্তাদের মতামত জানা দরকার আমার।'

এ কথার জবাবে উজির ইবনে জায়দুন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি শাসনকর্তাদের স্বাক্ষরিত চিঠি আমীর ইউসুফের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'দেরীতে হলেও স্পেনের শাসকদের টনক নড়েছে। এ আবেদন পত্রে সমস্ত খণ্ডরাজ্য শাসকরা শুধু দস্তখতই করেননি, আপনাকে কাছে পাওয়ার জন্য তাদের আত্মার আকুতিও দেখতে পাবেন।'

ওমর মুতাওয়াক্কিল ছিলেন পণ্ডিত আর মুতামিদ কবি। অনেক যত্ন করে তারা দুজন মিলে ইউসুফ বিন তাশফিনের জন্য যে চিঠিটি তৈরী করেন তা ছিল উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও কাব্য সুষমামণ্ডিত। আমীর চিঠিতে কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে মরক্কোর এক আলেমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। স্পেনের শাসনকর্তারা জ্বলন্ত আগুনের ওপর বসেও কাব্য চর্চা করেন?'

মরক্কোর আলেম চিঠি পড়ে বললেন, 'খণ্ডরাজ্যের শাসকরা স্পেনের বর্তমান বিপদের উল্লেখ করে রাবাতের আমীরকে অনুরোধ করেছেন, যদি একজন ভাই হিসাবে আপনি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন তাহলে আপনার নেতৃত্বে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা গৌরব বোধ করবো। কিন্তু আমরা আশা করবো, আপনি স্পেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং যুদ্ধ শেষ হলে স্পেন থেকে আপনার বাহিনী প্রত্যাহার করে নেবেন।'

ইউসুফ বিন তাশফিন বললেন, 'আমি এ শর্ত মেনে নিলাম। যে দেশের শাসনভার আমার ওপর ন্যস্ত আছে তাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি অন্যের বোঝা নিজের ঘাড়ে চাপাতে চাই না। যদি স্পেনের শাসনকর্তারা একমত হয়ে কাউকে নেতা নির্বাচন করতেন, তাহলে তার অধীনে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও আমি আপত্তি করতাম না। যদি ফ্রান্স ও ইটালীর খৃষ্টানরা আলফান্সুর পতাকাতলে এক হতে পারে তাহলে মুসলিম পতাকাতলে নগন্য এক মুজাহিদ হয়ে লড়তে আমার আপত্তি নেই। এখন বলুন, সাগর পাড়ি দিয়ে আমার সেনারা কোন বন্দরে নামবে?'

ইবনে জায়দুন বললেন, 'স্পেনের শাসনকর্তারা জিব্রালটার বন্দরে আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য সমবেত থাকবে।'

'কিন্তু আমি যদি অন্য কোন বন্দর পছন্দ করি?'

ইবনে জায়দুন বললেন, 'আমি শুধু আমাদের শাসকদের ইচ্ছাটুকু আপনাকে নিবেদন করেছি।'

আমীর ইউসুফ বললেন, 'ইনশাল্লাহ, আগামীকাল আমি আপনাদেরকে আমার সিদ্ধান্ত জানাবো।'

পরদিন। প্রতিনিধি দল আবার আমীরর সাথে মিলিত হলো। তিনি জানালেন, 'একাধিক কারণে জিব্রালটারের তুলনায় খিজরা দ্বীপের বন্দরে অবতরণ করা আ কি সঙ্গত

মনে করছি। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বন্দর ও আশপাশের কিছু এলাকা আমার নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিতে হবে।'

খিজরা দ্বীপের নাম শুনে ইবনে জায়দুন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এ দ্বীপটি মুতামিদের রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। মুতামিদ আগেই ইবনে জায়দুনকে বলে দিয়েছিলেন, আমীর ইউসুফ খিজরা দ্বীপে অবতরণ করতে চাইলে নানা অজুহাত দেখিয়ে তাকে বিরত করতে হবে। কাজী আবু জাফর ইবনে জায়দুনের চেহারা দেখেই তার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ইবনে জায়দুন সুলতান মুতামিদের পক্ষ থেকে পূর্ণ ক্ষমতা নিয়েই এখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আপনি সামরিক কারণে ওখানে অবতরণ করতে চাইলে তিনি এক্ষুণি খিজরার গভর্নরকে বন্দর খালি করে দেয়ার নির্দেশ পাঠাবেন।'

ইবনে জায়দুন অস্থির হয়ে বললেন, 'না না, এমন ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয়নি।'

আমীর ইউসুফ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তার মানে, আপনি বলতে চান, সুলতান মুতামিদের পছন্দ মত আমাকে লড়াই করতে হবে?'

প্রতিনিধি দলের সদস্যারা অনুভব করছিলেন, তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। সবাই কাজী আবু জাফরের দিকে তাকালে তিনি বলে উঠলেন, 'সুলতান মুতামিদ আমীর ইউসুফের জন্য জিব্রালটার বন্দরকেই অধিক উপযোগী মনে করলেও আমীর ইউসুফ যদি তাঁর জন্য খিজরা দ্বীপকে অধিকতর পছন্দ করেন তাহলে আপনার এ দাবী সানন্দে মেনে নেয়া উচিত। আপনি এ কথা প্রমাণ করার জন্যই আমাদের সাথে এসেছেন যে, অন্যান্য শাসকদের মত সুলতান মুতামিদও আলফানসুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমীর ইউসুফের নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন।

আমি এ কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যুদ্ধের জন্য স্পেনের জনগণ কোন রকম শর্ত ছাড়াই আমীর ইউসুফকে তাদের সাথে চায়। মুতামিদও ভাল করেই জানেন, তার গর্দানের ওপর আলফানসুর তলোয়ারি ঝুলছে। তার সামনে বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকলে তিনি আফ্রিকার আমীরকে আমন্ত্রণ জানাতেন না। আমাদের জানা উচিত, তিনি কবিতা আবৃত্তির জন্য স্পেনে যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন লড়াই করার জন্য। কাজেই সামরিক প্রয়োজনে শুধু খিজরা দ্বীপই নয়, স্পেনের যে কোন বন্দর ব্যবহারের অধিকার আমীরকে দিতে হবে।

আমাদের সন্তুষ্টির জন্য আমীর ইউসুফের ওয়াদাই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, তিনি স্পেন দখল করতে চান না। লড়াই শেষ হলেই তিনি স্পেন থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবেন। এ ওয়াদার পর দয়া করে আপনি এ কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন না যে, স্পেনবাসী আমীর ইউসুফের সাহায্য চায় কিন্তু তাকে বিশ্বাস করে না।'

ইবনে জায়দুন বললেন, 'আমীর ইউসুফের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করাকে আমি পাপ মনে করি। আমার দূর্ভাগ্য, আমি এখানে এক দূত হয়ে এসেছি এবং সুলতান

আমাকে খিজরা দ্বীপ সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষমতা দেননি।'

আমির ইউসুফ বললেন, 'এ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। কাজী আবু জাফর স্পেনের সকল বন্দরই আমার হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত, কিন্তু সম্ভবত স্পেনের মসজিদে স্বাধীনভাবে খোতবা দেয়ার অধিকারও তার নেই। সুলতান মুতামিদ এখন স্পেনের শাসকদের মুখপাত্র। তিনি আমাকে আমার পছন্দনীয় বন্দর ব্যবহারের অনুমতি না দিলে সেখানে যাওয়া আমার উচিত হবে না। যতদিন পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কাজী আবু জাফরের মত কেউ স্পেনের পক্ষ থেকে আমার সাথে আলোচনা করতে না আসবেন, ততদিন আমাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমি স্পেনের আলেমদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু খণ্ডরাজ্যের শাসকদের পক্ষে স্পেনে পা রাখার আগে আমাকে অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে।'

আমীর বৈঠক শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রতিনিধিদলকে হতাশার আবর্তে রেখে স্থান ত্যাগ করলেন। কাজী আবু জাফরের সঙ্গীরা অস্থির হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিল। মনে মনে বলছিল, 'এখন কি হবে?'

কাজী আবু জাফর হঠাৎ উঠে ইউসুফ বিন তাশফিনের পিছু নিলেন এবং দ্রুত তার কাছে গিয়ে ডাকলেন, 'হে আমীর।' ইউসুফ বিন তাশফিন কাজী আবু জাফরের দিকে ফিরে তাকালে তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, স্পেনের সকল শাসক মুরতাদ হয়ে খৃষ্টানদের গোলামী কবুল করলে আপনিও কি সে অসহায় মুসলমানদেরকে পরিত্যাগ করবেন? ইসলামের জন্য যে লক্ষ লক্ষ মুসলমান বেঁচে থাকতে চায়, তাদের আহবানের কি কোনই দাম নেই?'

'এখন আমি কিছুই বলতে পারছি না। দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার তৌফিক দেন। আলফানসুর সাথে লড়তে আমার ভয় নেই। কিন্তু আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, স্পেনের শাসনকর্তারা আমাকে সহযোগিতা করবেন। তারা শত্রুদের সারিতে দাঁড়ালে আপনাকে সাহায্য করা আমার পক্ষে সহজ হতো। কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব আমি অপছন্দ করি, যারা কাফেরকে ভয় পায় অথচ মুসলমানের ওপরও আস্থা আনতে পারে না।

আমি বুঝতে পারছি, লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিলে শেষ পর্যন্ত আমাকে একাই লড়তে হবে। কারণ, খণ্ডরাজ্যের শাসকদের সহযোগিতার কোন নিশ্চয়তা নেই। এ অবস্থায় মজলিসে শুরা ও জেনারেলদের মতামত ছাড়া আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

নৌবাহিনীর প্রধান সিয়ার বিন আবু বকর এখানে নেই। তিনি কাল-পরশু এখানে পৌঁছে যাবেন। তার সাথে আছে সেই যুবক, যার নাম সাদ ইবনে আবদুল মুনীম। আপনি তাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন বলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। তার বাহাদুরী ও বুদ্ধিমত্তা দেখার মত। সে যদি বলে, জিব্রালটারে সেনা নামানো নিরাপদ, তাহলে আমি মুতামিদকে বিরক্ত করব না। ইচ্ছা করলে আপনি মজলিসে শূরায় আপনার বক্তব্য পেশ করতে

পারেন, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু খণ্ডরাজ্য শাসকদের প্রতিনিধিদের আর এখানে থাকার দরকার নেই, তারা ফিরে যেতে পারেন।'

২

এশার নামাজের পর স্পেনের আলেম ও খণ্ডরাজ্যের দূতগণ ভিন্ন ভিন্ন কামরায় বসে আলোচনা করছিল। জায়দুন সংগীদের বলছিল, 'রাবাতের আমীর তো দেখছি মূর্তিমান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার দাবী যেমন মানা সম্ভব নয়, তেমনি তাকে রেখে যাওয়াও অসম্ভব। খালি হাতে দেশে ফিরলে মুখ দেখাবো কেমন করে?'

তার এক সাথী বলল, 'এরা এত বেশী অসভ্য জানতে পারলে স্পেনের অভিজাত লোকেরা খৃষ্টানদের গোলামীকেই পছন্দ করবে। মালাকার শাসকের অভিমতই সত্য হল। এদের সাহায্যে খৃষ্টানদের আক্রমণ থেকে যদি রেহাই পাই, এ জংলীদের হাত থেকে রেহাই নেই আমাদের। আর তারা ইসলামী আইন জারী করলে আমাদের পরিণতি হবে বড়ই করুণ। আমাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির সকল চিহ্ন এরা মিটিয়ে দেবে। সেভিল ও কর্ডোভার মর্মর প্রাসাদে এরা ঘোড়া বাঁধবে, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আসনগুলোতে বসাবে ছেঁড়া জোব্বা পরা আলেমদের। খৃষ্টানদের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে এ লোকগুলো আমাদের জীবনের সকল হাসি-আনন্দ বিষাদে ভরিয়ে দেবে। ফূর্তি ও বিনোদনের বারোটা বাজাবে এরা।'

'যে লোক একটা চিঠির মর্ম উদ্ধার করতে পারে না তার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি?'

আরেকজন বলল, 'খোদার কসম, আমাদের আস্তাবলও এর বাসস্থানের চাইতে ভাল। আমাদের মাঝি-তাতীরাও আমীর ইউসুফের পোশাকের চেয়ে ভাল পোশাক পরে। এখানে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ নেই। যার যখন খুশি ছুট করে এসে আমীরের কাছে বসে যায়। কোন দারোয়ান নেই, প্রহরী নেই। কাল দেখলাম, মসজিদের দরজায় এক বুড়ো আমীরের জামা ধরে টানছে, আর রাখালেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। এ ধরণের মানুষ যদি স্পেন দখল করে বসে থাকে তাহলে মান-সম্মান নিয়ে বাস করার কোন উপায় থাকবে না। কাজী আবু জাফরের মত লোককে বিচারকের আসনে বসানো হবে, আমাদের কেউ পাত্তাও দেবে না।'

ইবনে জায়দুন চুপচাপ ওদের কথা শুনল। অবশেষে বলল, 'আমি তোমাদের সাথে একমত হতে পারছি না। মরক্কোয় এ কয়দিন থেকে নিজের চোখে যা দেখেছি তাতে আমি বিশ্বাস করি, স্পেনের আলেম ও শাসনকর্তারা আমীর ইউসুফকে তাদের আখেরী ভরসা মনে করে কোন ভুল করেনি। আলফানসুর পঙ্গপালকে কুপোকাত করার তাকদ কেবল এদেরই রয়েছে। আমীর ইউসুফের খাপে আমি ইসলামের তরবারি দেখতে পেয়েছি। আমরা ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়েছি বলেই তাঁর কথা আমাদের কাছে

অদ্ভুত মনে হচ্ছে। আমার জীবনে আমি এ ধরণের সাদামাটা অথচ বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি দেখতে পাইনি। তার বুকে একই সাথে মরুভূমির প্রশস্ততা ও সমুদ্রের গভীরতা রয়েছে। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে শুধু খিজরা দ্বীপ নয় বরং সেভিলের সব বন্দর তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম। মুতামিদের উজির না হয়ে একজন সাধারণ মুসলমান হিসাবে যদি কথা বলতে পারতাম, তাহলে বলতাম, আলফানসুর গজব থেকে নাজাতের জন্য স্পেনের সকল শাসকের উচিত বিনা শর্তে আমীর ইউসুফের আনুগত্য কবুল করে নেয়া।'

পাশের কামরায় তখন কাজী আবু জাফর বলছিলেন, 'আমরা আরো একবার খণ্ডরাজ্যের শাসকদের সহযোগিতা চেয়ে ভুল করেছি। আমরা নিজেদের দায়িত্বে এখানে এলে আফ্রিকার আলেমদেরকে অন্ততঃ আমাদের পক্ষে পেতাম। কিন্তু এখন তারা আমাদের ভুল বুঝেছেন। অনেকেই মনে করছেন, স্পেনের শাসকরা বিশেষত মুতামিদ ইউসুফ বিন তাশফিনকে সরল মনে আমন্ত্রণ করেননি। তারা আরো মনে করেন, আমরা জনগণের মুখপাত্র হিসেবে এখানে আসিনি, এসেছি শাসকদের ক্রীড়নক সেজে। তারা আমীর ইউসুফকে বুঝাচ্ছেন, যে ব্যক্তি কর্ডোভার বন্ধু সেজে ধোকা দিতে পারে, তার বন্ধুত্বের ওপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। অসম্ভব নয়, একদিকে আফ্রিকার সেনাবাহিনী স্পেনে পৌছবে, অন্য দিকে মুতামিদ ও তার বন্ধুরা আলফানসুর সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি করতে ছুটে যাবে।'

ইবনে আদহাম বললেন, 'জানি, খণ্ডরাজ্যের শাসকদের বিশ্বাস করার উপায় নেই। তারা যে কোন সময় যে কোন জঘন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এ আশংকাও মিথ্যে নয়। কিন্তু শাসকদের পাপের ফল কি এখন পুরো জাতিকে ভোগ করতেই হবে? এর থেকে মুক্তির কোন পথই কি নেই? আল্লাহর দরবারে আমাদের এত আকুতি, এত কান্না সবই কি বিফল যাবে? স্পেনের ভাগ্যে ধ্বংস ছাড়া আর কি কিছুই লেখা নেই?'

কাজী সাহেব বললেন, 'আমি এখনো আশা ছাড়িনি। আমীর ইউসুফ আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় আলেম এবং সামরিক বাহিনীর জেনারেলদের এক বৈঠক ডেকেছেন। সেখানেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। বৈঠকে সাদ বিন আবদুল মুনীম থাকবে, আমাকেও থাকার জন্য বলেছেন আমীর। আমার বিশ্বাস, বৈঠকের সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষেই যাবে। মুতামিদের আপত্তির কোন তোয়াক্কা করি না আমি। আমীর রাজি হলে তিনি যেখানে ভাল মনে করবেন সেখানে সৈন্য নামাবেন। তিনি একবার সেখানে পৌছে গেলে তার বিরোধিতা করবে এমন বুকের পাটা কোন শাসকের আছে বলে আমি মনে করি না। এখন এসব কথা জানাজানি না হওয়াই ভাল। আমার অনুরোধ, স্পেনে ফিরে গিয়েও এসব কথা আপনারা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না।'

পর দিন। কাজী আবু জাফর ছাড়া সকল দূত ফিরে চলল স্পেনে। সংগীদের বিদায় করে দেয়ার পাঁচ দিন পর। কাজী আবু জাফর এক রাতে ঘুমানোর উদ্যোগ করছেন, হঠাৎ

দরজায় করাঘাত হল। কাজী আবু জাফর বললেন, 'কে, আসুন।'

আগন্তুককে দেখেই কাজী আবু জাফর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সাদ, তুমি!'

'অসময়ে এসে আমি আপনাকে বিরক্ত করলাম নাতো?'

'কি যে বলো, আজ কয়দিন থেকে আমি তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। বিশ্বাস করো, এখনো আমি তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম। কখন এলে?'

'এশার নামাজের পর। এসেই আমীর ইউসুফের সাথে দেখা করেছি, ওখান থেকে সোজা আপনার কাছে এলাম।'

কাজী আবু জাফর সাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি তো দেখছি জবরদস্ত সৈনিক বনে গেছ। আমীর ইউসুফের সাথে কি কথা হলো বলো তো দেখি।'

'আপনার জন্য সুসংবাদ আছে। তিনি স্পেন সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন এবং পরশু সকালে আলেম ও জেনারেলদের বৈঠক ডেকেছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি আলফানসুর বিরুদ্ধে সেনা চালনা করতে চান। বৈঠকের রায় অনুকূল হলে খিজরা বন্দরে অবতরণের জন্য তিনি মুতামিদের অনুমতি জরুরী মনে করছেন না।'

'মরক্কোর আলেমরা আমাদের ওপর সন্তুষ্ট নন, তারা এ অভিযানের বিরোধিতা করতে পারেন।'

'আমি এখনো কারো সাথে দেখা করিনি, তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা কেউ এ অভিযানের বিরোধিতা করবেন না।'

৩.

ইউসুফ বিন তাশফিন আফ্রিকার মুসলমানদের নয়নের মনি, আশার আলো। জনগণ তাঁকে শ্রদ্ধা করতো, তার ইংগিতকে মনে করতো আদেশ। তবু তিনি আলেমদের সমর্থন ও পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতেন না। তিনি বলতেন, 'দয়া করে আপনারা জি-হুজুরের ভূমিকা নেবেন না। দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের মতামত প্রকাশ করবেন। আমার কোন প্রস্তাব পছন্দ না হলে যুক্তি দিয়ে তার বিরোধিতা করবেন। সম্মিলিত সিদ্ধান্তের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করবেন না আমাকে। একা আমি ভুল করতে পারি, কিন্তু সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলে সেখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম, আল্লাহর রহমত থাকে বেশী।'

বৈঠকে রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় আলেম, উপজাতীয় শেখগণ এবং সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত। দুদিন ধরে আমীর ইউসুফ তাদের মতামত শুনলেন। অধিকাংশ আলেমই অভিযানের স্বপক্ষে মত দিলেন। তবে কেউ কেউ খণ্ডরাজ্য শাসকদের সততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, স্পেনের শাসনকর্তারা বেঈমানী করলে আফ্রিকার সেনাবাহিনীকে দ্বিমুখী লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হবে। সে অবস্থায় স্পেনের জনগণ আমীর ইউসুফের পক্ষ নেবে কি না, সৈন্য পরিচালনা করার আগে তা ভালভাবে জেনে নেয়া

দরকার। অন্যথায় স্পেনের খণ্ডরাজ্য শাসকদেরকে জানিয়ে দিতে হবে, তারা লড়াই শুরু করলে আফ্রিকার সৈন্যবাহিনী তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে।'

সবার মতামত শোনার পর আমীর ইউসুফ কাজী আবু জাফরকে তার মতামত পেশ করার আহবান জানালেন। তিনি আফ্রিকার আলেমদের লক্ষ্য করে বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে বললেন, 'স্পেনের শাসনকর্তাদের সম্পর্কে আপনারা যে আশংকা করেছেন, তা যথার্থ। কিন্তু আমি স্পেনের আলেমদের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি, যদি খণ্ডরাজ্যের শাসকরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে জনগণকে নিয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করব। স্পেনের প্রতিটি মানুষই আজ বিপদ সম্পর্কে সচেতন। যদি শাসনকর্তারা মুনাফেকী করে, তাহলে স্পেনের প্রতিটি শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ তাদেরকে ইসলামের দুশমন ও নাসারাদের দালাল বলে ঘোষণা করবে এবং আপনাদের পতাকা তলে সমবেত হবে।'

কাজী আবু জাফরের বক্তৃতার পর সবাই আমীর ইউসুফের মুখের দিকে তাকাল। আমীর ইউসুফ বললেন, 'আমি আজ পর্যন্ত আপনাদের জিজ্ঞেস না করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। কিন্তু এটি এমন বিষয়, যে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমার বিবেকের সাড়াই যথেষ্ট ছিল।

কয়েক বছর আগে স্পেনের এক যুবক আমার কাছে স্পেনের মুসলমানদের ফরিয়াদ নিয়ে এসেছিল। সে সময় আমরা নিজেরাই এতবেশী সমস্যায় ছিলাম, স্পেনের ভাইদের সাহায্যের কথা বললে আপনারা আমার মাথা ঠিক আছে কিনা তাই নিয়ে সন্দেহ করতেন। কিন্তু সেদিনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, নিরব দর্শকের মত বসে বসে স্পেনের ধ্বংসলীলা দেখবো না আমি। ওয়াদা করেছিলাম, আফ্রিকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে এলে আমার তূণের প্রতিটি তীর আমার সেই সব ভাইদের সাহায্যে ছুটে যাবে, স্পেনে যারা নাসারাদের তীরের নিশানা হচ্ছে।

স্পেনের আলেম ও শাসকদের দূত আমার কাছে এলে আমি অনুভব করলাম, কুদরত আমাকে স্পেনে যাওয়ার জন্য হাতছানি দিচ্ছে। কিন্তু মুতামিদের প্রতিনিধি যখন খিজরা দ্বীপে সৈন্য অবতরণে আপত্তি করল তখন আমি অনুভব করলাম, খণ্ডরাজ্যের শাসকদের সহযোগিতার ওপর ভরসা না করে নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করার জন্য আল্লাহ আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আপনাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ করে আমি আল্লাহর কাছে এই দোয়াই করেছি, তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার তৌফিক দেন। আল্লাহর শোকর, আপনারা স্পেনের শাসকদের ওপর নির্ভর না করেই আলফানসুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত। এখন খিজরা দ্বীপে সৈন্য অবতরণ করার জন্য আমরা মুতামিদের অনুমতির অপেক্ষা করব, না তার তোয়াক্কা না করেই সৈন্য চালনা করব, এ বিষয়ে আপনাদের মতামত দরকার।'

মুফতীয়ে আজম বললেন, 'আপনি জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে যাচ্ছেন স্পেন।

মুতামিদের অন্তরে জিহাদের এ প্রেরণা থাকলে খিজরা দ্বীপে অবতরণে তার কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। আর যদি মুতামিদের উদ্দেশ্য খারাপ হয়, তাহলে আলফানসুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আগেই সে বন্দর কব্জা করা জরুরী। আপনি স্পেনের কোন অঞ্চল দখল করতে ইচ্ছুক নন ওয়াদা করার পরও কেউ আপনার প্রতি সন্দেহ পোষণ করলে তার তোয়াক্কা করা উচিত নয় আপনার।'

৪.

মুতামিদের কনিষ্ঠ পুত্র রাজী খিজরা দ্বীপের শাসনকর্তা। কবিতা চর্চা ও গানবাজনার আসরে দরবার কক্ষ সরগরম। হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে দরবারে প্রবেশ করল মহলের নিরাপত্তা বাহিনী প্রধান। তার চেহারায় উদ্বেগ ও ভীতি দেখে থেমে গেল গানবাদ্য। নিরাপত্তা প্রধান বলল, 'আলীজাহ, মরক্কো থেকে এক দূত এসেছে এবং আপনার সাথে দেখা করার জন্য জিদ করছে।'

মিষ্টি ঘুম থেকে কাউকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিলে যেমন রাগ হয়, তেমনি ক্ষেপে গেল রাজী। বলল, 'বেআদব, আহম্মক। দূতের সংগে দেখা করার সময় এটা?' তারপর বাদক ও গায়কদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা সাপ দেখলে নাকি! থামলে কেন, চালাও।'

আবার সুরেলা ঝংকারে ভরে গেল ঘর। ভয়ে ভয়ে রক্ষী প্রধান মসনদের আরো কাছে সরে এসে বলল, 'মাফ করবেন আলীজাহ! মনে হয় দূত বিশেষ জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছে। তাকে ক্লান্ত ও পেরেশান দেখাচ্ছিল।'

রাজী গর্জন করে উঠল, 'আমি তোমার জিহবা ছিঁড়ে ফেলব। যাও, তাকে গিয়ে বল, আগামী সাত দিনেও আমি কারো সাথে দেখা করব না।'

'জনাব, তাঁকে দেখলে আপনি এ কথা বলতেন না। ফটকে প্রহরীরা তাকে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু 'অপেক্ষা করার সময় নেই' বলে সে জোর করে ঢুকে গেছে। সে সরাসরি দরবারে ঢুকতে চাচ্ছিল, আমি বহু কষ্টে তাকে ঠেকিয়েছি। সে দর্শনার্থীদের কামরায় বসতে পর্যন্ত রাজী হয়নি।'

'কোথায় সে?'

'সাক্ষাতকার কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'বাহ, কি চমৎকার। এক নগন্য দূত বিনা দ্বিধায় মহলে ঢুকে পড়ল, তোমার বাহাদুর রক্ষীরা তাকে তো নিরস্ত করতে পারলোই না, উপরন্তু তুমি ছুটে এসে বলছো, চলুন হুজুর, তাকে অভ্যর্থনা করুন।'

'আলীজাহ, প্রহরীরা তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ......।'

'কিন্তু কি?'

'আলীজাহ, আপনার হুকুম ছিল, কোন দূতের ওপর হাত তোলা যাবে না। ও যেভাবে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, বাঁধা দিলে ওতো মারাই পড়তো।'

'তবু তুমি আমাকে তার সাথে দেখা করতে বলছো?'

'আলীজাহ, আদেশ পেলে আমি তাকে গ্রেফতার করব। কিন্তু সে মরক্কো থেকে এসেছে, রাবাতের আমীরের দূতকে গ্রেফতারের পরিণতি ভয়াবহ হবে।'

'সে রাবাতের আমীরের দূত হলে সেভিলে সুলতানের কাছে যাবে, আমার কাছে কি?'

রক্ষী প্রধান এর জবাব দেয়ার আগেই দরজায় উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা গেল। কেউ একজন বলছিল, 'আমার সময় তোমাদের গভর্ণরের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। সরো পথ থেকে।'

রক্ষী প্রধানের ইঙ্গিতে গভর্ণরের দেহরক্ষীরা বর্শা উঁচিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেল। কয়েকজন প্রহরী এক লোককে ঘিরে রেখেছিল। সে ওদের ঘেরাও থেকে জোর করে কামরায় ঢুকে গেল। বর্শাধারীরা তাদের বর্শা সামনের দিকে এগিয়ে দিল। দূত থমকে দাঁড়ালে দরবারের লোকেরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

দূত বলল, 'যদি তোমরা বর্শা ও তলোয়ার চালাতে জানতে, তাহলে আজ স্পেনের এ দুর্দশা হত না। শাহজাদা! আমি কোন খারাপ নিয়তে আসিনি, আপনি ওদের পথ ছাড়তে বলুন।'

প্রহরীরা তাকাল রাজীর দিকে। রাজী তার শুকনো ঠোঁট চেটে বলল, 'আমার সৈন্যদের ধৈর্য্য দেখে ভুল করা উচিত নয় তোমার। দূত না হলে এতক্ষণে তুমি লাশ হয়ে যেতে। ডাকাতের মত জোর করে মহলে ঢুকে যে দুঃসাহস দেখিয়েছো তাতে দূত হওয়ার পরও তুমি কঠোর শাস্তির যোগ্য বানিয়েছো নিজেকে।'

সিপাইদের বর্শা দূতের বুক স্পর্শ করল। কিন্তু ভয় ভীতির লেশ ছিল না তার চেহারায়। বলল, 'আমি জানি, আলফানসুর দূত আরো বেশী নির্ভীক ভাবে এ মহলে প্রবেশ করে।'

রাজী জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি চাও?'

'আমি জানাতে এসেছি, আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের সেনাবাহিনী এক সপ্তাহের মধ্যেই এখানে এসে যাবে। স্পেনের ত্রাণকর্তাকে যদি এখানে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য আপনি প্রস্তুত না হন, তাহলে আপনাদের পক্ষে এ শহর খালি করে দেয়াই ভাল হবে।'

রাজী ও দরবারীরা কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে দূতের দিকে তাকিয়ে রইল। চমক ভাঙলে এক সাহেব বলল, 'রাবাতের আমীরকে জিব্রালটারে অবতরণের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তাঁর তো খিজরা দ্বীপে আসার কথা নয়।'

দূত বলল, 'আমি আপনাদের অবান্তর প্রশ্নের জবাব দিতে আসিনি, আমীর ইউসুফের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে এসেছি। আমি আপনাদের পেরেশানীর কারণ বুঝতে

পারছি। ভয়ের কিছু নেই, আপনারা খিজরা ছাড়া স্পেনের সব শহরেই গানবাজনা জারী রাখতে পারবেন।'

রাজী বলল, 'আমীর ইউসুফ যদি আমাদের বন্ধু হিসাবে আসেন তাহলে আমরা তাকে জিব্রালটারে স্বাগত জানাব, আর খিজরা দখল করতে এলে শহরের প্রতিটি ইট রক্ষা করার জন্য আমরা লড়াই করবো।'

দূত মুচকি হেসে বলল, 'শাহজাদা, দাবা খেলা আর তরবারী খেলা এক নয়। আমীর ইউসুফ সম্পর্কে জানা থাকলে এমন কথা বলতে না। আলফানসুর মত আজদাহার সাথে যিনি লড়তে আসছেন, খেলোয়ারদের হাতে তরবারি দেখে তিনি ভয় পাবেন না। তিনি খিজরা দ্বীপ কখনোই দখল করবেন না, তবে ওটা ব্যবহার করার জন্য কারো অনুমতিরও দরকার নেই তাঁর।'

রাজী ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এ কথার অর্থ?'

'শাহজাদা, এর অর্থ তো খুবই সোজা। খিজরা বন্দর এখন আমাদের দখলেই আছে। বেলা ডুবার আগে এ শহরও আমাদের দখলে এসে যাবে। আমি আমীর ইউসুফের আগমনের পথ পরিষ্কার করতে এসেছি। তিনি এখানকার কোন মুসলমানের গায়ে আঁচড় কাটতে অপছন্দ করেন। তাই আমি সংগীদেরকে বন্দর থেকে একটু দূরে রেখে একা এখানে এসেছি। আমার উদ্দেশ্য, আমার সিপাইরা যেন এমন কিছু না করে যাতে আপনারা বিপদে পড়েন। আপনি লোকদের শান্ত থাকতে বললেই ভালো করবেন।'

রক্ষী প্রধানের ইঙ্গিতে রক্ষীরা তাদের তরবারি ও বর্শা নামিয়ে নিল। রাজী রাগ আর ভয় নিয়ে তাকাচ্ছিল দূতের দিকে। হঠাৎ মহলের এক কোণ থেকে গোলমাল শোনা গেল। শহরের প্রশাসক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকল দরবার কক্ষে। বলল, 'আলীজাহ! সর্বনাশ হয়ে গেছে। রাবাতীরা বন্দর দখল করে নিয়েছে আর শহরবাসী দলে দলে তাদের অভ্যর্থনার জন্য ছুটে যাচ্ছে।'

'এরা কি আসমান থেকে নাজিল হয়েছে? আমি জানতে চাই, এরা যখন নামছিল তখন বন্দর রক্ষক কি ঘোড়ার ঘাস কাটছিল?'

'শেষ রাতে বন্দর থেকে কয়েক মাইল দূরে এক জনমানবহীন স্থানে এরা জাহাজ থেকে নামে। ওখান থেকে পায়দল এসে অতর্কিতে বন্দরের কর্তৃত্ব দখল করে নেয়।'

রাজী দূতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা আমাদের ওপর আক্রমণের শামিল।'

দূত সামনে এগিয়ে বলল, 'দুর্দিন এলে মানুষ বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করার শক্তিও হারিয়ে ফেলে। আমীর ইউসুফ স্পেনের মুসলমানদের সাহায্য করতে আসছেন, দুশমনী করতে নয়। তিনি আসছেন আলফানসুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে, নাসারার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে। ইসলামের দুশমনদের সাথে হাত না মিলালে আপনাদের ভয়ের কারণ নেই। আলফানসুকে পরাজিত করার পর তিনি এক মুহূর্তও স্পেনে থাকবেন না। তবে

যাওয়ার আগে আপনারা ইসলামের দুশমন কি না অবশ্যই তা যাচাই করতে চাইবেন।'

পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর অফিসাররা জড়ো হয়েছিল শাহজাদার পাশে। তাদের চেহারায় হতাশা দেখে লজ্জিত ভাবে রাজী জিজ্ঞেস করল, 'আমীর ইউসুফ কবে নাগাদ এখানে পৌঁছবেন?'

'বিশেষ কারণে তার আগমনের সঠিক সময় বলতে পারছি না। তবে এটুকু বলতে পারি, সেভিল থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জেনে নেয়ার সময় আপনি পাবেন। বেশী কথা বলার সময় নেই। আমার অনুরোধ, আপনার আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আমাদের সহযোগিতা করতে বলুন।'

এক অফিসার বলল, 'আমাদের সহযোগিতা আপনারা অবশ্যই পাবেন। বলতে গেলে এখন তো আমরা আপনাদের হাতে বন্দী।'

'আপনাকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে,' বলে মুচকি হেসে দূত বেরিয়ে গেল।

মজলিশের লোকজন একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। রাজী নগর কোতোয়ালকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করবেন?'

'কি আর করবো, দেখি।' বলে সে দরবার থেকে বেরিয়ে এল এবং দ্রুত দূতের পেছনে হাঁটা ধরল। ফটকের কাছাকাছি এসে দূতকে ধরে ফেলল এবং জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম কি সাদ?'

দূত জবাব না দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসল। কোতোয়াল বলল, 'আপনাকে দেখামাত্রই চিনে ফেলেছি আমি। আপনি সেই লোক, যে মুতামিদের দরবারে আগুন ঝরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।'

'আপনার স্মরণ শক্তি বেশ ভাল।'

'না, না, এটা আমার স্মরণ শক্তির কৃতিত্ব নয়, কৃতিত্ব আপনার সাহস ও নির্ভীকতার। আপনার সে রূপ যারা দেখেছে কোনদিন তারা ভুলতে পারবে না। সেদিনই আমার মনে হয়েছিল, একদিন আপনি স্পেনের মুক্তিদূত হয়ে আসবেন। তারপর মনে মনে আপনাকে অনেক তালাশ করেছি। কিন্তু আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তখন মনে হতো আপনি ঐ নক্ষত্রের মত, যে রাতের আঁধারে হঠাৎ দেখা দিয়েই আবার অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। আপনাকে দেখে আবার আমার মনে আশার আলো জ্বলে উঠেছে। আপনি স্পেনের মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসে থাকলে আপনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।'

সাদ তার সাথে আন্তরিক করমর্দন করে বলল, 'কিছুদিনের জন্য আমাকে একটু অন্যত্র যেতে হবে। এখানে যেন কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে সেদিকে আপনি লক্ষ্য রাখবেন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাদের তরফ থেকে আপনার সংগীরা পূর্ণ সহযোগিতা পাবে। কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন?'

'আমি গ্রানাডা যাচ্ছি।'

কথা বলতে বলতে ওরা ফটকের বাইরে এল। বাইরে তখন আনন্দের জোয়ার বইছে। সড়ক ধরে এগিয়ে আসছে মরক্কোর একদল অশ্বারোহী। তাদের পেছনে সাধারণ মানুষের বিরাট মিছিল। ওরা আনন্দ উল্লাস করতে করতে এগিয়ে আসছে মহলের দিকে। প্রহরীরা তাড়াতাড়ি ফটক বন্ধ করে দিল।

ভিড়ের মধ্য থেকে এক যুবক সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে বলল, 'ইসলামের দুশমনরা! মরক্কোর মুজাহিদদের জন্য সদর দরজা খুলে দাও। তোমাদের হিসাবের দিন এসে গেছে।'

মরক্কোর অশ্বারোহীরা সাদকে দেখেই থেমে গেল। জনতা জড়ো হল মহলের ফটকের ওপর। সাদ জনতার ভীড় চিরে দ্রুত গিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়াল। বলল, 'ভাইসব, মরক্কোর সৈন্যরা আপনাদের শহর দখল করতে আসেনি। তারা এসেছে আলফানসুর দুর্গ ও দম্ভ ধুলিস্মাৎ করতে। খৃস্টানদের কালো হাত ভেঙে গুড়িয়ে দিতে। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, জালিমের বিষদাঁত না ভেঙে আমরা ঘরে ফিরবো না। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, দয়া করে আপনারা শান্ত হোন, এটা হৈ চৈ করার সময় নয়। শহরে কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি হলে আমীর ইউসুফ অসন্তুষ্ট হবেন। এখন আপনারা যার যার বাড়ি ফিরে যান। আপনাদের এই জাগরণকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু হাঙ্গামা করে জিহাদকে অপবিত্র করবেন ন। মনে রাখবেন, হাঙ্গামাকারীরা বিপ্লবের শত্রু। পাড়ায় পাড়ায় সংগঠিত হোন, আনসার বাহিনী গঠন করুন এবং আমাদের মুক্তিদূত আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন। সৈন্যদেরকে বলছি, তোমরা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যাও।'

জনতা শান্ত হলো এবং তারা ধীরে ধীরে মহলের ফটক থেকে সরে যেতে শুরু করল। সাদ সিঁড়ি থেকে নেমে এক সিপাইকে ইশারা করল। সিপাই ঘোড়া নিয়ে এলে সাদ এক লাফে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছুটে চলল গ্রানাডার পথে।

এদিকে শাহজাদা রাজীর পত্র নিয়ে একটি কবুতর সেভিলে সুলতান মুতামিদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই সুলতান মুতামিদের জবাব নিয়ে ফিরে এল আরেক কবুতর। তিনি লিখেছেন, 'বাঁধা দিতে যেও না। খিজরা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি রানদা চলে এসো।'

আশার আলো

ফজরের নামাজের পর মায়মুনা দোয়া করছিল, 'আমার মাওলা, কবে আসবে সে ভোর? কবে পোহাবে আমার অপেক্ষার রাত? আমি যে আর সইতে পারছি না! ও

কোথায়? কবে ফিরবে সে?'

প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের পর মায়মুনা আকুল হয়ে এ দোয়াই করে আসছে দিনের পর দিন। দোয়ার সময় তার মন চলে যায় আফ্রিকার সেই পাহাড়, জংগল ও মরুভূমিতে, যেখানে ছুটে বেড়াচ্ছে সাদ। সে কল্পনার চোখে দেখতে পায়, দ্রুতগামী ঘোড়ার সওয়ার হয়ে মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিচ্ছে সাদ। ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজ, তীরের শনশন ধ্বনি ও তরবারির ঝনঝন শব্দ শুনতে পায় সে। আহত সৈনিকদের কাতর আর্তনাদ এসে বাজে তার কানে। শত্রুদের বহু দূর তাড়িয়ে দিয়ে সাদ যেন মেঘমালার আড়াল থেকে সহসা বেরিয়ে আসে। মায়মুনার অন্তর নেচে ওঠে আনন্দে। আবার সে দেখতে পায়, আহত হয়ে সাদ এক তাঁবুতে শুয়ে আছে। তাকে দেখার, তার সেবা করার কেউ নেই। অন্তর কেঁদে ওঠে মায়মুনার।

আজও সে দোয়া করছিল। বলছিল, 'মাওলা, আমি জানি ওর চলার পথ খুবই কঠিন। তবু এ বাড়ির নরম বিছানার তুলনায় ওর চলার পথের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হতে আমি অধিক ভালবাসি। গ্রানাডার এ মনোরম শহরের তুলনায় খৈ ফোটা মরু বালুকায় আমি যদি ওর হাত ধরে ছুটে বেড়াতে পারতাম! আমি যদি পারতাম তলোয়ারের ছায়ায় ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে! হায়! আমাদের জীবনের লক্ষ্য এক, গন্তব্য এক, যদি আমাদের চলার পথও হতো এক ও অভিন্ন!'

দোয়া শেষ করে আচলে চোখ মুছে সবে সে উঠতে যাবে, এ সময় তার কোলের ওপর এসে পড়ল একটি গোলাপ। কেউ পিছন থেকে বলে উঠল, 'হে আল্লাহর পেয়ারের বান্দী, ওঠো, তোমার দোয়া কবুল হয়েছে।'

মায়মুনা চমকে পেছন দিকে তাকাল। তাহেরা দাঁড়িয়ে দুষ্টুমীর হাসি হাসছে। মায়মুনা বলল, 'তুমি তো সব সময় এ কথা বল, কিন্তু দোয়া তো কবুল হয় না।'

'আজ সত্যি বলছি মায়মুনা, আকাশ আলো করে তোমার ধ্যানের সূর্য সত্যি উদয় হয়েছে।'

'আহমদ ভাই দেখছি তোমাকেও কবি বানিয়ে ফেলেছে।'

তাহেরা বলল, 'মায়মুনা সত্যি করে বলতো, আজ কি গ্রানাডার আকাশ বাতাসে কোনই পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছো না? ঘর থেকে বের হয়ে দেখো, তোমার দুনিয়ার প্রতিটি অনুপরমাণু আজ খুশীর গান গাইছে। তিনি এসেছেন।'

মায়মুনা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাহেরার দিকে তাকিয়ে রইল। তার দুচোখের কোণে জমা হলো অশ্রুর ফোটা। কম্পিত স্বরে বলল, 'তাহেরা! খোদার দিকে চেয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করো না।'

'আমি সত্যি কথাই বলছি।'

মায়মুনা উঠে আবেগে কাঁপতে কাঁপতে তাহেরাকে জড়িয়ে ধরল। দরজা দিয়ে ঘরে উঁকি দিলেন সাদের খালাম্মা। বললেন, 'কি হচ্ছে তাহেরা?'

মায়মুনা লজ্জা পেয়ে এক দিকে সরে গেল। তাহেরা বলল, 'খালাজান, আমি এক সুসংবাদ নিয়ে এসেছি, সাদ ভাই এসেছেন।'

'কখন এসেছে?' তিনি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

'নামাজের একটু আগে এসে পৌঁছেছেন।'

খালা কোন কথা না বলে নেকাব টেনে বললেন, 'আমি দেখে আসি।'

তাহেরা বলল, 'না খালাজান! উনি এসেই আব্বাজানকে নিয়ে কাজী আবু জাফরের সাথে দেখা করতে গেছেন।'

আবু জাফরের নাম শুনেই ক্ষেপে গেলেন তিনি এবং গজর গজর করতে শুরু করলেন, 'বুড়োটা আমার বোনপুকে ঘর ছাড়া করেছে। একবার ওকে পেয়ে নিই, ওর যুদ্ধের সাধ আমি মিটিয়ে দেবো।'

মায়মুনা ও তাহেরা অতিকষ্টে হাসি সংবরণ করল। খালার রাগ কিছুটা কমলে তাহেরা তার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'খালাজান, এদিকে আসুন, কথা আছে।'

পাশের কামরায় গিয়ে তাহেরা বলল, 'খালাজান, সাদ ভাই মাত্র চার দিনের জন্য এসেছেন।' খালা রেগে উঠে বললেন, 'খোদা আবু জাফরের বিচার করুন। সে আমার ছেলেকে জীবনেও কোথাও শান্তিতে বসতে দেবে না।'

'খালাজান, আপনি অহেতুক কাজী আবু জাফরের ওপর রাগ করছেন। আমার কথা শুনুন, ভাইজান আর কখনোই আফ্রিকা ফিরে যাবেন না। আমীর ইউসুফের সেনাবাহিনী আলফানসুর সাথে যুদ্ধ করতে খিজরা দ্বীপে এসে গেছে। যুদ্ধ কবে শেষ হবে বলা মুশকিল, তাই আম্মা ওদের বিয়েটা এখনই সেরে ফেলতে চান। আপনি ইদ্রিস ভাইকে বলুন।'

'ইদ্রিসের আবার আপত্তি কি? গেল বার ও যখন এসেছিল, তখনই তো আলাপ করে রেখেছি। কিন্তু ছেলে অভিযান শেষ না করে বিয়ে করতে রাজি হলো না।'

'খালাজান, এখন তো সে সফল হয়েই ফিরে এসেছে, অতএব তার আপত্তিরও কিছু নেই।'

একটু পর শেখ আবু সালেহ এবং ইদ্রিস মসজিদ থেকে ফিরে এলো। আবু সালেহের বিবি তাহেরাকে বললেন, 'বাছা! তুমি মায়মুনার কাছে বসো, আমি এখুনি ওদের সাথে কথা বলছি।'

তাহেরা মায়মুনার কামরায় এল। তাকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আলতো খোঁচা মেরে বলল, 'বাহ, দুলহাকে স্বাগতম বলার জন্য এক পায়ে খাঁড়া দেখছি।'

মায়মুনা এক হাতে তাহেরার মুখ চেপে ধরে আরেক হাতে বাহু ধরে টানতে টানতে তাকে কামরার ভেতরে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি বড় বেশী ফাজিল হয়ে গেছো, মুখে কিছু আটকায় না।'

২

কাজী আবু জাফরের সাথে সাক্ষাত শেষে ফিরে এল বাপ-বেটা। খালার বাসায় ঢুকে দেখল, শেখ আবু সালেহ ও তার বিবি তারই জন্য অপেক্ষা করছে। সাদকে দেখামাত্রই খালা বললেন, 'সাদ, কয়দিনের জন্য এসেছ?'

'খালাজান, পরশুই চলে যাবো আমি।'

'এবার কোথায় যাবে?'

'খিজরা দ্বীপে। আমীর ইউসুফ সেনাবাহিনী নিয়ে ওখানেই আসছেন। তাকে অভ্যর্থনার সমস্ত আয়োজন করতে হবে আমাকে।'

খালা আবদুল মুনীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভাই সাহেব, আমি সাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছি। এখন আর কারো মানা শুনতে রাজি নই। আজই বিয়ে হবে ওদের। সাদ যে কয়দিন খিজরা থাকবে মায়মুনাও তার সাথেই থাকবে। যুদ্ধ শুরু হলে আমি ওকে নিয়ে আসব।'

আবদুল মুনীম বললেন, 'আমিও তো এ চিন্তাই করছিলাম। তবে ইদ্রিসের মত নেয়া দরকার। ও কি বাড়ি আছে? আমি তার সাথে আলাপ করতে চাই।'

'ইদ্রিসকে বিয়ের বাজার করতে পাঠিয়েছি।'

শেখ আবু সালেহ হাসি মুখে বললেন, 'বাবা সাদ, তোমার খালা ধরেই নিয়েছে এবার তুমি আপত্তি তুলবে না। তোমার খালার চিন্তা ঠিক আছে তো?'

সাদ কোন জবাব না দিয়ে মুখ নীচু করল। আলমাস আঙ্গিনা থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'সাদ, একটু বাইরে এসো তো। তোমাকে দেখার জন্য অনেক লোক জমা হয়ে গেছে।'

সাদ বাইরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই খালা বললেন, 'থামো! আগে প্রশ্নের উত্তর দাও।'

সাদ আনন্দ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল। কি বলবে ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। লজ্জায় চেহারা লাল হয়ে উঠেছিল। খালা ধমকের সুরে বললেন, 'কথা বলছ না কেন? বলো?'

সাদ আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, 'খালাজান, আম্মাকে জিজ্ঞেস করুন, যা বলার তিনিই বলবেন।'

খালা বললেন, 'নালায়েক কোথাকার! তবু স্বীকার করবে না, এ নিয়েতেই খিজরা থেকে এখানে ছুটে এসেছে।'

সাদ হাসি মুখে বাইরে চলে গেল। বাইরে উৎফুল্ল জনতার ভিড় ক্রমেই বাড়ছিল। খালা পেরেশান হয়ে আবদুল মুনীমকে বললেন, 'এদের কবল থেকে ওকে একটু রেহাই দাও। এদের জ্বালায় দেখছি ছেলেটা একটু স্বস্তিরও সময় পাবে না। আমি চাই আজ রাতেই বিয়েটা সেরে ফেলতে।'

আবদুল মুনীম হেসে বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি।'

শেখ আবু সালেহ রসিকতা করে বললেন, 'ও তো পারলে আজই এ শহরের সব ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়।'

খালাও উষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল, 'আপনার কি মনে হয় সাদের এখনো বিয়ের বয়স হয়নি?'

ঐ দিনই সন্ধ্যা। শেখ আবু সালেহের বাড়িতে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাদের বন্ধুরা সমবেত হল। বিয়ে পড়ালেন কাজী আবু জাফর।

আবদুল মুনীম ও সকিনার জন্য দিনটি ছিল আনন্দের। তবু আহমদ ও হাসানের অনুপস্থিতি বারবারই তাদের মনকে বেদনার্ত করে তুলছিল।

মধুময় স্বপ্নের রাত। বাসর ঘরে ফুলশয্যায় বসে আছে মায়মুনা। পাশে স্বপ্নের সুপুরুষ সাদ। ঠোঁটে তার আনন্দের হাসি, চোখের কোণে পরিতৃপ্তির অশ্রুবিন্দু। হৃদয়তন্ত্রীতে মোহময় সুর লহরী। সারা ঘরে মৌ মৌ ফুলের সুবাস। বছরের পর বছর ওরা পরস্পরকে দেখেছে চুরি করে। কখনো চোখাচোখি হয়ে গেলে নত করেছে দৃষ্টি। পরক্ষণেই মনের অজান্তে খুঁজে বেড়িয়েছে সেই চোখ।

আজ আর সেই লুকোচুরি নেই। একে অন্যকে দেখছে মুগ্ধ আবেশে। মনে হচ্ছে, বিশ্ব প্রকৃতিতে লেগেছে সেই খুশীর কাঁপন। আকাশ, বাতাস, নদী, বিহঙ্গ মাতোয়ারা আজ প্রাণময় সৌরভে, সুমধুর সুর মূর্চ্ছনায়।

সাদ বলল, 'মায়মুনা, আমি যে সুহাসিনী ভোরের ওয়াদা করছিলাম, সে ভোরের আর দেরী নেই।'

'সাদ, প্রিয়তম আমার, আমার সকল সাধ, সকল আশা পূর্ণ করে আমার জীবনের সূর্য হয়ে এসেছো তুমি, এখন আর কোন অন্ধকারেই ভয় নেই আমার।'

'আমি সে সুহাসিনী ভোরের কথা বলছি, যার আলো স্পেনের প্রতিটি ধুলিকণায় লাগিয়ে দেবে জীবনের রঙ। এতদিন ধরে যার জন্য প্রতীক্ষা করছে স্পেনের হাজারো মায়মুনা। যে হতাশার অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়েছিল আলফানসু তা দূর করার জন্য অচিরেই খিজরা দ্বীপে পা রাখবেন আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন। তাকে সাদর সম্বর্ধনা জানানোর জন্য আমাকেও ফিরতে হবে সেখানে।'

'আপনি কি আমাকেও সাথে নিয়ে যাবেন সেই মুক্তিদূতকে স্বাগত জানাতে?'

'মায়মুনা, এ আশা নিয়েই খিজরা দ্বীপ থেকে গ্রানাডার পথে ঘোড়া ছুটিয়েছিলাম, দূর দিগন্তে যখন আমীর ইউসুফের জাহাজ একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মত দেখা দেবে তখন তুমি আর আমি সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে একসাথে সে দৃশ্য উপভোগ করবো। আমি তোমাকে বলব, 'মায়মুনা ওই দেখো স্পেনের মুক্তিদূতের জাহাজ এগিয়ে আসছে। তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন আলফানসুর হিংস্র নখর থেকে, খণ্ডরাজ্যের কালসাপদের অনাহূত ছোবল থেকে। জালিমের দুঃসহ জুলুম থেকে। মায়মুনা, আজ থেকে স্পেনবাসীর দুঃখ-নিশি ভোর হলো। এখন এ স্পেন আমাদের, আমরা স্পেনের।'

তিনদিন পর। একটি চার ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আলমাস আবদুল মুনীমের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল। সাদ আম্মা ও খালার দোয়া নিয়ে মায়মুনা ও তার চাকরাণীসহ গাড়িতে উঠল।

'আব্বাজান, আগামী শুক্রবার নাগাদ আপনি খিজরা পৌছতে পারলে ভাল হয়।' গাড়িতে বসে বলল সাদ।

আবদুল মুনীম বললেন, 'মনে হয় সময় হবে না। আমীরকে আমার সালাম দিও আর বলো, গ্রানাডার মুজাহিদরা তার আদেশের অপেক্ষায় আছে। আচ্ছা যাও, খোদা হাফিজ।'

আবদুল মুনীমের ইঙ্গিতে আলমাস ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল। বৃদ্ধা খালা চোখ মুছে বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সকিনা, আজ থেকে এ মায়মুনাহীন ঘরে কি করে সময় কাটবে আমার।'

৩.

আমীর ইউসুফ রওনা দেয়ার আগের দিন তার বড় ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার অবস্থা আশংকাজনক। জ্বরে বেহুশ। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলের মাথায় হাত রেখে বসে আছেন। বিজ্ঞ হেকিম রোগীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন।

সিয়ার বিন আবু বকর এসে ঢুকলেন কামরায়। আমীর ইউসুফের কাছে বসে ভারাক্রান্ত কন্ঠে বললেন, 'অনুমতি দিলে যাত্রা আজ মুলতবী করে দেই। আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাস, এদিকে ওর এ অবস্থা। এ অবস্থায় রওনা করা ঠিক হবে না।'

আমীর ইউসুফ দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'না, তোমরা রওনা হয়ে যাও। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দরে আসছি।'

সিয়ার বিন আবু বকর বের হয়ে গেলেন। একটু পর রোগীর জ্ঞান ফিরে এল। চোখ খুলেই সে পিতাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'আব্বাজান, আপনি এখনো যাননি? আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। সুস্থ হয়েই ইনশাআল্লাহ আমি জিহাদে শামিল হওয়ার জন্য রওনা হয়ে যাবো।'

'একটু পরই রওনা হবো আমরা। তোমার অবস্থা এখন কেমন?'

'ভাল। আপনি দোয়া করুন, দেখবেন জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেবে না।'

হঠাৎ দমকা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল কামরায়। আমীর ইউসুফ বাইরে তাকিয়ে দেখলেন কালো মেঘে আকাশ ছেয়েছে। চারদিকে ঘন অন্ধকার।

এক ফকীহ বললেন, 'প্রচণ্ড তুফান আসছে। সম্ভবত আল্লাহ আপনার সফর মুলতবী

করার পক্ষপাতী।'

আমীর ইউসুফ বললেন, 'না, আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করছেন এবং সাবধান করে দিচ্ছেন। বলছেন, যাও ইউসুফ, তবে সাবধান, এ অভিযান হবে খুবই ভয়ঙ্কর ও জটিল।'

তুফানের তীব্রতা ক্রমে বেড়েই চলল। এক অফিসার ছুটে এসে বলল, 'আমাকে নৌবাহিনী প্রধান পাঠিয়েছেন। ঝড় ক্রমে প্রলয়ংকরী রূপ নিচ্ছে। আপনার অনুমতি পেলে জাহাজ থেকে রসদ ও ঘোড়া নামিয়ে নিতে পারি।'

'না, না, তাকে বলো, আমি আসছি।'

অফিসার ছুটে বেরিয়ে গেল। আমীর ইউসুফ পুত্রের কপালে হাত রেখে বললেন, 'আমি যাচ্ছি বাছা!'

পুত্র পুনরায় চোখ খুলে তাকাল এবং পিতার হাত ধরে বলল, 'খোদা হাফেজ আব্বাজান! আল্লাহ আপনাকে সাফল্য দান করুন।'

'খোদা হাফেজ' বলে আমীর ইউসুফ বের হতে গেলেন, এক আলেম এগিয়ে বললেন, 'তুফানের দাপাদাপি না কমা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

আমীর ইউসুফ বললেন, 'যদি আল্লাহ আমাকে স্পেনের মুসলমানদের উদ্ধার করার জন্য মনোনীত করে থাকেন, তাহলে এ ঝড় আমার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। সব জাহাজ রওনা হলে আমি আমার জাহাজ ছাড়বো বলে ভাবছিলাম, কিন্তু এখন সবার আগে আমার জাহাজের নোঙর তোলারই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

বেরিয়ে এলেন আমীর ইউসুফ। বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টির ছিটা এসে আমীর ইউসুফের কাপড় ভিজিয়ে দিল। বন্দরে এসে পৌঁছলেন তিনি। প্রচণ্ড ঝড় উপেক্ষা করে উপকূলে গিয়ে দাঁড়ালেন। অন্ধকার সমুদ্র থেকে ভয়ংকর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তীরে। হঠাৎ সুবিশাল এক ঢেউ ছুটে আসছে দেখে সিয়ার বিন আবু বকর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনি পেছনে সরে যান, ভয়ঙ্কর ঢেউ ছুটে আসছে।'

আশপাশে যারা ছিল ছুটে সরে গেল তারা। কিন্তু তিনি অটল পাহাড়ের মত নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সিয়ার বিন আবু বকর তার হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। সরে যাওয়ার বদলে তার ঠোঁটে দেখা গেল হাসির ঝিলিক। তরঙ্গটি তীরের ছোট ছোট টিলা ও শিলাখণ্ড গ্রাস করে চোখের নিমেষে আমীর ইউসুফের বুক পর্যন্ত ঢেকে দিল।

আমীর ইউসুফ সিয়ার বিন আবু বকরকে বললেন, 'সিয়ার, আমি গাফুরুর রহীমের কাছে দোয়া করেছি, যদি আমাদের যাত্রা তার অপছন্দনীয় হয় তাহলে যেন এ প্রবল ঢেউ আমাকে গ্রাস করে ফেলে। আর যদি আমাদের যাত্রা তার পছন্দনীয় হয় তাহলে এসব তুচ্ছ ঢেউয়ের পরোয়া না করে তার রহমতের বৃষ্টিতে ভিজে সামনে এগিয়ে যাওয়াই পছন্দ আমার।'

শান্ত হলো উত্তাল তরঙ্গ। মুজাহিদের সাথে বুক মিলিয়ে সংকুচিত হল অবাধ্য

ঢেউ। মেনে নিল বশ্যতা। সিয়ার বিন আবু বকর ভাইয়ের দৃঢ় মনোবল দেখে হাসলেন এবং চেঁচিয়ে বললেন, 'মুজাহিদ ভাইয়েরা, নোঙ্গর উঠাও। পাল তুলো। আমাদের গন্তব্য এখন খিজরা দ্বীপ।'

এক আলেম এগিয়ে এসে বললেন, 'আমীর, আপনার বিজয় মোবারক হোক। উর্মিমালা আপনার বিজয়ের আগাম সুসংবাদ দিয়ে গেল।'

৪.

শেষ রাত। সাদ ও মায়মুনা সমুদ্রের কাছে এক দোতালা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিল নৈসর্গিক দৃশ্য। পাশে ছোট এক দুর্গ প্রাচীরে মশাল হাতে পাহারা দিচ্ছে প্রহরীরা। সাগর তীরে এক টিলার ওপর তখনো আলো ছড়াচ্ছে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। সাদ পূবের আকাশে ইশারা করে বলল, 'মায়মুনা, ঐ উজ্জ্বল তারকাটির নাম জানো? ওকে বলা হয় ভাগ্য-সিতারা। এ তারাই ভোরের আগমনী বার্তা নিয়ে আসে। হয়তো স্পেনের আকাশেও আজ ভাগ্য-সেতারার উদয় হবে।'

মায়মুনা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি মনে করেন আজই পৌছবেন তিনি?'

'আমার একীন, তিনি অবশ্যই আজ পৌঁছে যাবেন।'

একটু পর ফজরের আজান ভেসে এল দুর্গ থেকে। ছাদেই নামাজ আদায় করল ওরা। তারপর তাকিয়ে রইল গভীর সমুদ্রের দিকে। ভোরের আলো স্পষ্ট হতে লাগল, হারিয়ে যেতে লাগল আকাশের তারকারাজি। ম্লান হয়ে এল চাঁদের আলো। ভূমধ্য সাগরের তলদেশ থেকে উঠে আসতে লাগল লাল টকটকে সূর্য। তার রক্তিমাভা সমুদ্রের শান্ত জলে বিছিয়ে দিল সোনালী চাদর। ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে নড়ছিল সে চাদর আর মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছিল সমুদ্রের রূপ। মায়মুনা মুগ্ধ চোখে অবাক হয়ে দেখছিল সে অপূর্ব দৃশ্য। শত শত লোক সাগর তীরে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে।

আচানক সাদ চেঁচিয়ে উঠল, 'মায়মুনা! মায়মুনা! আসছেন! তিনি আসছেন! স্পেনের মুক্তিদূত আসছেন! এদিকে তাকাও মায়মুনা! ঐ দেখো তিনি এসে গেছেন।'

বাতাসের ঝাপটায় মায়মুনার চুল উড়ছিল, সে চুল সামলাতে সামলাতে বলল, 'কোথায়! কোথায়?'

'মায়মুনা, এ দিকে আমার হাত সোজা তাকিয়ে দেখ।'

মায়মুনার দৃষ্টিতে চলমান একটি বিন্দু আস্তে আস্তে জাহাজের আকৃতি পেল। সাদ প্রচণ্ড আবেগে কাঁপছিল আর বলছিল, 'মায়মুনা! হাসো, খুশী হও। আজ স্পেনের আনন্দের দিন। স্বজাতির বধূ-মাতা-কন্যাদের এ সুসংবাদ শোনাও, তাদের ইজ্জত-আবরুর

মোহাফেজ এসে গেছেন। তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার আর সাহস হবে না কারো। নির্যাতীত মানবতাকে ডেকে বলো, মানবতার রক্ষক এসে গেছেন, আর তোমাদের কোন ভয় নেই।'

মায়মুনা অপলক চোখে তাকিয়েছিল সাগরের দিকে।

'আমি তাদের সম্বর্ধনা জানাতে যাচ্ছি।' বলতে বলতে সাদ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল এবং জনতার সাথে ছুটে চলল বন্দরের দিকে। সে ছুটছিল আর চিৎকার করছিল, 'এসেছেন, তিনি এসে গেছেন!'

এক বৃদ্ধ রাবাতের আমীরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মাঝ রাত থেকে এক পাথরের ওপর বসেছিলেন। দৃষ্টি শক্তি দুর্বল থাকায় জাহাজ দেখতে পাননি তিনি। সাদের চিৎকার শোনামাত্রই সিজদায় পড়ে গেলেন তিনি। সিজদা থেকে মাথা তুললেন কাজী আবু জাফর। ঠোঁটে তার হাসি, গাল বেয়ে বইছে অশ্রুর বন্যা। উঠতে ছুটতেই তার ওপর চোখ গেল সাদের। এগিয়ে গিয়ে সাদ তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। কাজী আবু জাফর দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'আমি জানতাম তিনি অবশ্যই আসবেন।'

৫.

ইউসুফ বিন তাশফিন দশদিন ধরে খিজরা দ্বীপে অবস্থান করছেন। এ কয় দিনে সারা স্পেনের মুসলমানদের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠল খিজরা দ্বীপ। রাবাতের বার হাজার নিয়মিত সৈন্য ছাড়াও বিপুল পরিমাণ রসদ ও ঘোড়া এসে পৌছল সেখানে। সরকারের পক্ষ থেকে আমীর ইউসুফকে গভর্নরের বাস ভবনে থাকার জন্য অনুরোধ করা হল, কিন্তু তিনি সৈন্যদের সাথে খোলা ময়দানে তাঁবুতেই থাকলেন।

খণ্ডরাজ্যের শাসকদের দূত, আলেম ও মুজাহিদরা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তার সাথে মোলাকাত করল। দূতরা আমীর ইউসুফকে একা পেলেই একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করত। আমীর ইউসুফ জবাবে বলতেন, 'আমি তোমাদের সুলতানদের পারস্পরিক ঝগড়া মেটাতে আসিনি। যুদ্ধ সম্পর্কে কোন পরামর্শ থাকলে বলো আমি মনোযোগ দিয়ে শুনবো। অন্য কিছু শুনতে আমি প্রস্তুত নই। তোমাদের সুলতানদের দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার পরীক্ষা আসন্ন, কথার খৈ ফুটিয়ে সে পরীক্ষায় পাস করা যাবে না।'

দূতরা নিজ নিজ সুলতানের পক্ষ থেকে নানা রকম মূল্যবান উপহার নিয়ে আসতো। তিনি সেসব ফিরিয়ে দিয়ে বলতেন, 'আমাকে খুশি করার জন্য কোন উপহারের দরকার নেই। তোমাদের শাসনকর্তারা আল্লাহ ও রাসূলের বন্ধু হলে আমাকেও তাদের বন্ধু হিসাবেই পাবে, আর ইসলামের সাথে দুশমনী করলে দুনিয়ার সব ধনরত্ন দিয়েও আমাকে

খুশী করতে পারবে না।'

ইউসুফ বিন তাশফিনকে সত্য ও ন্যায়ের মশালবাহী মনে করে মজলুম জনতা বিভিন্ন শহর থেকে খিজরা দ্বীপে ছুটে আসছিল। আমীর ইউসুফ খোলা ময়দানে নামাজের জামাতে ইমামতি করতেন। মুসলমানরা তার পেছনে নামাজ আদায় করার জন্য ছুটে আসতো দূর দুরান্ত থেকে। নামাজ শেষে তিনি তাদের ফরিয়াদ শুনতেন এবং প্রয়োজনীয় হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন নিজ নিজ এলাকায়।

কেউ বলতো, 'আমীর, আমার ভাই কালেমার আওয়াজ বুলন্দ করতে গিয়ে অমুক কারাগারে বছরের পর বছর বন্দী জীবন যাপন করছে।' কেউ বলত, 'হায় আমীর! অমুক গভর্ণর অন্যায়ভাবে আমার পিতাকে হত্যা করেছে এবং আমাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।'

আমীর ইউসুফ ধৈর্য ধরে সব অভিযোগ শুনতেন এবং সংশ্লিষ্ট শাসকদেরকে চিঠি লিখতে নির্দেশ দিতেন সচিবদেরকে।

একদিন তিনি নামাজ আদায় করে তাঁবুর দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এক বৃদ্ধা তাঁর কাপড় টেনে ধরে বলল, 'হে আমীর, আমার ফরিয়াদ শুনে যান।'

খিজরার এক পুলিশ অফিসার বৃদ্ধার হাত ধরে টেনে পথ থেকে সরানোর চেষ্টা করলে আমীর ইউসুফ বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও। তার ফরিয়াদ বলার সুযোগ দাও।'

বৃদ্ধা হাউমাউ করে কেঁদে বলল, 'আমার ছেলে কোথায়? বলুন, আমার ছেলেকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?'

আমীর পেরেশান হয়ে বললেন, 'আপনার ছেলে? কি হয়েছে তার?'

বৃদ্ধা এবার খিলখিল করে হেসে উঠল। 'জানতাম, আপনিও আমাকে পাগলী বলবেন। কিন্তু আমার ছেলের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়ছি না। বলুন আমার ছেলে কোথায়? বলুন! জলদি বলুন!'

পাগলের মত বৃদ্ধা আমীরের জোব্বা ধরে টানাটানি করছিল। পুলিশ অফিসার বলল, 'হে আমীর, এ এক পাগলী। দু বছর আগে তার একমাত্র পুত্র কারাগারে মারা যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে এ কথা বিশ্বাস করেনি।'

আমীর জিজ্ঞেস করলেন, 'কি অপরাধ ছিল তার পুত্রের?'

পুলিশ অফিসার ব্যথাভরা কণ্ঠে বলল, 'হে আমীর, এখানে শুধু অপরাধীদেরই সাজা হয়না। স্পেনের যে হাজার হাজার যুবক সত্য ও ন্যায়ের পথে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন তাদেরই একজন ছিল তার ছেলে।'

বৃদ্ধা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল, আমীর ইউসুফ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এই তো তোমার ছেলে আম্মা, এই তো আমি।'

তিনি পুলিশ অফিসারকে বললেন, 'বৃদ্ধার বসবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করো। আমার পক্ষ থেকে তিনি নিয়মিত ভাতা পাবেন।'

৩.

দশদিন পর ইউসুফ বিন তাশফিনের বাহিনী সেভিল যাত্রা করল। সাদ মায়মুনাকে 'খোদা হাফেজ' বলে সেনা ছাউনিতে চলে এল। মায়মুনা আলমাসের সাথে চাকরাণীকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বসল গ্রানাডার উদ্দেশ্যে।

শহরতলীর এক চৌরাস্তায় গাড়ি থামাল আলমাস। মায়মুনাকে বলল, 'সৈন্যবাহিনী এ পথেই এগিয়ে যাবে, এখান থেকে ওরা বায়ের পথ ধরবে।'

মায়মুনা বলল, 'তাহলে এখানে একটু দাঁড়াও। ওদের পথ চলা দেখে যাই।'

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও সৈন্যদের দেখতে না পেয়ে মায়মুনা আবার বলল, 'আলমাস চাচা, তুমি ঠিক জান তো, তারা এ পথেই আসবে?'

'তাদের যাওয়ার আর কোন পথ নেই, মা।'

একটু পরে সৈন্যদের দেখতে পেয়েই আলমাস চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে তারা আসছে।'

মায়মুনা জানালার পর্দা সামান্য ফাঁক করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। অগ্রগামী দলের সামনে বর্ম ও লৌহশিরস্ত্রাণ পরা সালারকে দেখতে পেয়ে তার অন্তর ধক্ করে উঠল। ভোরের আলোয় সাদের বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ঝকমক করছিল।

মায়মুনা বলল, 'আলমাস চাচা, ওকে ডেকো না, নিজের পথে যেতে দাও।'

'মা! তার দৃষ্টি বাজপাখীর দৃষ্টির চাইতেও প্রখর।'

আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল অগ্রগামী বাহিনী। চৌরাস্তায় পৌঁছে সালার নিজের ঘোড়া থামিয়ে সৈনিকদের কিছু বলল। ঘোড়াটি সরিয়ে নিল এক পাশে। অশ্বারোহীরা বায়ে ঘুরে অগ্রসর হল। সাদ চোখের নিমেষে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল।

'চাচা আলমাস, এখনো তুমি এখানেই রয়েছ?'

'তোমাদের সেনাবাহিনী দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম।'

মায়মুনা স্বামীকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি মনে করেছিলাম আপনি আমাদের দেখতে পাবেন না।'

সাদ মুচকি হেসে বলল, 'তোমার ধারণা ভুল, আমার চোখ খুব সতর্ক।'

উভয়ে উভয়ের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। এক সময় মায়মুনা বলল, 'আপনার সময় নষ্ট করবো না, যান।'

'খোদা হাফেজ মায়মুনা, আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।' সাদ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মায়মুনা চোখ বন্ধ করে বলল, 'আল্লাহ হাফেজ, নিশ্চয় তিনি আপনাকে সাফল্য দান করবেন।'

সাদ ঘোড়া ছুটিয়ে সৈন্যদের সাথে গিয়ে মিলিত হলো।

সৈন্যদের মিছিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত মায়মুনা ওখানেই বসে রইল। আলমাস বলল, দেখলে মা, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন গোত্রের বিচিত্র পোশাকের সৈনিকরা একই দ্বীনের পতাকা তলে সমবেত হয়ে মাথায় কাফন বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে লড়াইয়ের ময়দানে।

হঠাৎ আমীর ইউসুফকে ঘোড়ার পিঠে দেখতে পেল আলমাস। চেঁচিয়ে বলল, 'ঐ দেখ মা! আমীর ইউসুফ আসছেন।'

মায়মুনা আমীর ইউসুফের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, 'হে স্পেনের ত্রাণকর্তা, জাতির লাখো মা-বোন তোমার পথের পানে তাকিয়ে আছে। আল্লাহ প্রতি পদক্ষেপে তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।'

আলমাস আবার বলল, 'মা, এখন যিনি এগিয়ে আসছেন তিনি সিয়ার বিন আবু বকর। সাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। মরক্কোর প্রতিটি সৈনিক তার জন্য গর্ববোধ করে।'

মায়মুনা এবারও দোয়া করল, 'আমার প্রিয় ভাই, আল্লাহ তোমার সহায় হোন।'

আলমাস বলল, 'আমি তোমাকে গ্রানাডা পৌঁছে দিয়েই মুজাহিদদের সাথে শামিল হতে চাই।'

মায়মুনা বলল, 'আচ্ছা, চলুন।'

আলমাস ঘোড়ার পিঠে চাবুক হানল। গাড়ি দ্রুত গতিতে ছুটে চলল গ্রানাডার পথে।

জাল্লাকার প্রান্তরে

পথে পথে উৎফুল্ল জনতা আনন্দধ্বনি দিয়ে রাবাতের সৈন্যদের অভ্যর্থনা জানাল। মুতামিদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও শামিল হলো তাদের সাথে। খোশ আমদেদ ও জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হলো পথ-প্রান্তর। সেভিলের কাছে হাজার হাজার পুরুষ, নারী, শিশু তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল।

মুতামিদ ও তার উজীররা শহরের বাইরে এসে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন আমীর ইউসুফ ও তার বাহিনীকে। সেভিলের শাহী মহল আমীর ইউসুফের থাকার জন্য বিশেষ ভাবে সাজানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি সৈন্যদের সাথেই থাকলেন।

আলফানসু তখন সারকাস্তা অবরোধ করে রেখেছে। আমীর ইউসুফ তাকে লিখলেনঃ

'আমি শুনতে পেয়েছি, তুমি স্পেনের পর আফ্রিকা জয় করতে চাও। আমি

আফ্রিকায় তোমার জন্য অপেক্ষা করতে না পেরে নিজেই স্পেনে চলে এসেছি। তোমার জন্য এখন তিনটি পথ খোলা আছে। এক, ইসলাম গ্রহণ করো। এতে করে তুমি আমাদের ভাই হয়ে যাবে। দুই, নাহলে জিজিয়া কর প্রদান করে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করো। তিন, যদি এ পথও তোমার অপছন্দ হয় তাহলে যুদ্ধের জন্য তৈরী হও।'

ক্ষমতার নেশায় বিভোর আলফানসু জবাব দিলঃ

'মরার জন্য এতদূর তোমার ছুটে আসার দরকার ছিল না। ভূমধ্য সাগরের জলরাশিই তোমাকে আশ্রয় দিতে পারতো। তবে চলে যখন এসেছো তখন শুনে রাখো, স্পেন আমার, দুনিয়ার কোন শক্তিই তা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। জানের মায়া থাকলে দেশে ফিরে যাও আর মরার সাধ হলে এগিয়ে আসো ময়দানে।'

চিঠিতে আলফানসু সুলতান মুতামিদকেও যথেচ্ছ গালাগালি করল। আমীর ইউসুফ চিঠিটি দরবারে পড়ে শোনালেন। সেভিলের কবি, সাহিত্যিক ও সরকারী কর্মকর্তারা চমকে উঠল। মুতামিদের আবেদনে আমীর ইউসুফ দরবারী লোকদেরকেই এর জবাব দিতে নির্দেশ দিলেন।

পরদিন। কবি সাহিত্যিকরা আমীর ইউসুফের সামনে এক গাদা কাগজ এনে দিল।

'এসব কি?' আমীর ইউসুফ জিজ্ঞেস করলেন।

'সেভিলের বিখ্যাত লেখকরা আলফানসুর ধৃষ্টতাপূর্ণ চিঠির জবাব লিখেছেন। আপনি এর মধ্য থেকে যেটি পছন্দ করবেন, সেটিই পাঠিয়ে দেয়া হবে। পড়ে শোনাবো?'

আমীর ইউসুফ অসন্তুষ্ট হলেন। এক অফিসার ভয়ে ভয়ে বলল, 'হুজুর, সুলতান মুতামিদের সেরা দরবারী কবিরা এ জবাব লিখেছেন।'

আমীর ইউসুফ বললেন, 'আলফানসুর চিঠির জবাবে তোমরা কবিতা লিখেছো?'

'জি হুজুর, এক কবি তিনশ চরণ লিখেছিলেন। আমি তার মধ্য থেকে একশ আশিটাই কেটে দিয়েছি।'

এক কবি দাঁড়িয়ে বলল, 'হুজুর! অনুমতি পেলে আমি নিজেই আমার কবিতা পড়ে শোনাতে চাই।'

সে আমীর ইউসুফের অনুমতির অপেক্ষা না করেই সুর করে আবৃত্তি শুরু করল। আমীর ইউসুক তার কবিতার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলেন না। তিনি হাত উঁচু করে তাকে থামিয়ে দিলেন।

কবি মনোক্ষুন্ন হয়ে বসে পড়ল। অফিসার আরেকটি কাগজ উঠিয়ে বলল, 'হুজুর, আটজন বিখ্যাত সাহিত্যিক পরামর্শক্রমে এ জবাবটি লিখেছেন এবং সুলতান এটি সংশোধনও করেছেন। অবশ্যই এটি আপনার পছন্দ হবে।'

অফিসার জবাবটি পড়তে শুরু করলে আমীর ইউসুফের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি সবগুলো কাগজ একদিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও তোমাদের মত কাগজ, কালির অপব্যবহার কেউ করেনি। তোমরা বেঁচে থাকার

অযোগ্য। দুশমন তরবারি শান দিচ্ছে আর তোমরা কবিতা শান দিচ্ছো। বেকুব কোথাকার, আলফানসুর চিঠিটা দাও।'

অফিসার চিঠি এগিয়ে দিলে আমীর চিঠির এক কোণে লিখলেন, 'আলফানসু, সবুর করো। কার মরণ ঘনিয়ে এসেছে একটু পরই টের পাবে তুমি।'

২

আলফানসু বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে তার সৈন্যদের ডেকে এনে একত্রিত করল। সারকাস্তার অবরোধ তুলে দিয়ে রওনা হল টলেডোর দিকে। স্পেনের বিভিন্ন খৃষ্টান শাসনকর্তাদের বাহিনী ছাড়াও ফ্রান্স এবং ইটালীর খৃষ্টান সৈন্যরা তার পতাকাতলে সমবেত হল। টলেডোয় পৌঁছার পর আলফানসু সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ ফৌজ নিয়ে আমি জ্বীন, ইনসান এমনকি আসমান থেকে নেমে আসা ফেরেশতাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করে নিশ্চিত সাফল্য ছিনিয়ে আনতে পারবো।'

তার অশ্বারোহী ও পদাতিক সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে আশি হাজার।

আমীর ইউসুফ আলফানসুর যাত্রার খবর শুনে সেভিল থেকে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। বাতালিউস থেকে কয়েক মাইল দূরে জাল্লাকা প্রান্তরে এসে মুখোমুখি হলো দুই বাহিনী। প্রান্তরের একদিকে শিবির স্থাপন করলেন আমীর ইউসুফ, অন্য দিকে আলফানসু।

বাতলিউস, সেভিল, মালাকা ও গ্রানাডার শাসনকর্তারা আমীর ইউসুফের পতাকা তলে সমবেত। আলমেরিয়া ও মার্সিয়ার শাসনকর্তারা খৃষ্টানদের ভয়ে প্রত্যক্ষভাবে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যোগ না দিলেও গোপনে ছোট ছোট সেনাদল পাঠাল তাদের সাহায্যে। এ সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর তুলনায় আলফানসুর সম্মিলিত খৃষ্টান বাহিনী তিনগুণ। মুখোমুখি এই দুই বাহিনীর মধ্যে দূরত্ব ছিল তিন মাইল, আর একটি পাহাড় উভয় বাহিনীর মধ্যে ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

৪৮০ হিজরীর রমজান মাস। বৃহস্পতিবার দিন গিয়ে রাত নেমেছে। ইসলামী লশকর শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আলফানসু আমীর ইউসুফের কাছে খবর পাঠালো, 'আগামী কাল শুক্রবার। তোমাদের পবিত্র দিন। একদিন পরে রবিবার আমাদের পবিত্র দিন। এজন্য আমাদের শক্তি পরীক্ষা সোমবারে হলে ভালো হয়।'

আমীর ইউসুফ দুশমনের প্রস্তাব মেনে নিলেন। কিন্তু মুতামিদ সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'এটা অবশ্যই আলফানসুর কোন চাল।' তাই তিনি সৈন্যদের সতর্ক থাকতে বললেন।

শুক্রবার।

জুমার নামাজে কাতার বেঁধে দাঁড়াল ইসলামী বাহিনী। আলফানসু পাহাড়ের পাশ ঘেষে এসে স্পেনীয় মুসলিম শিবিরে আক্রমণ করল। যদিও মুতামিদ আগে থেকেই সতর্ক ছিলেন তবুও আলফানসুর আক্রমণের তীব্রতায় তারা বাতলিউসের দিকে পিছু হটতে বাধ্য হল। খণ্ডরাজ্যের শাসকরা পিছু হটলেও মুতামিদ বুক টান করে দাঁড়াল খৃস্টানদের বিরুদ্ধে। সুলতানের বীরত্ব ও সাহস দেখে সেভিলের সেনাবাহিনী বিক্রমে ফিরে পেল এবং সুলতানের সাথে অটল পাহাড়ের মত ময়দানে দাঁড়িয়ে গেল। ছত্রভঙ্গ স্পেনীয় সৈন্যদের মোকাবেলায় আননেভারের সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট বিবেচনা করে আলফানসুর অশ্বারোহী বাহিনী পাহাড় ঘুরে গিয়ে আমীর ইউসুফের বাহিনীর ডান ও বাম পাশে আক্রমণ করল। ততক্ষণে আমীর ইউসুফও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু আক্রমণের তীব্রতার মুখে রাবাত সৈন্যরাও পিছু হটতে বাধ্য হল। রাবাত বাহিনীকে পিছু হটতে দেখে খৃস্টানদের উৎসাহ বেড়ে গেল। লিয়ন ও ফ্রান্সের অশ্বারোহী সৈন্যরা রাবাত সৈন্যের বাম পাশকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে লস্করের মধ্যিখানে পৌঁছে গেল।

বিজয় প্রায় নিশ্চিত দেখে খৃস্টান সৈন্যরা উল্লসিত হয়ে পড়ল। ওদিকে সেভিল বাহিনী তখনো প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছিল। আননেভার সৈন্যরা তাদেরকে হাতিয়ার সমর্পন করার আহবান জানাল। বলল, 'তোমাদের বন্ধুরা ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে। হাতিয়ার ফেলে দাও, আত্মহত্যা করো না।'

আমীর ইউসুফ যুদ্ধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ইসলামী শক্তির বিজয় সম্পর্কে মোটেই নিরাশ হলেন না তিনি। শান্ত ভাবে সেনাপতি সিয়ারকে বললেন, 'সিয়ার, আমি যা আশা করেছিলাম তারও আগেই এ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। সাদকে বলো, সেভিল বাহিনীর সাহায্য করতে। আমি পাহাড়ের অন্য পাশে যাচ্ছি।'

আমীর ইউসুফ পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দীর্ঘ পথ ঘুরে তিনি চলে এলেন খৃস্টান শিবিরের পেছনে। অতর্কিতে তিনি খৃস্টান শিবিরে আঘাত হানলেন। মুসলিম ফৌজ ক্ষিপ্র গতিতে খৃস্টান প্রহরীদের হত্যা করে তাদের তাঁবু ও রসদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিল। এরপর কালবিলম্ব না করে পিছন থেকে আঘাত হানল খৃস্টান বাহিনীকে। এ অতর্কিত হামলায় থমকে দাঁড়াল খৃস্টান ফৌজ, পুরো পরিস্থিতি বুঝে উঠার আগেই লাশের স্তূপ ফেলে এগিয়ে গেল তারা।

এদিকে সাদ বিন আবদুল মুনীম সেভিল বাহিনীর সাহায্যে পৌঁছে গেল। তারা আননেভার বাহিনীর দৃষ্টি নিজেদের দিকে টেনে নিলে সেভিল বাহিনী সংকট থেকে হাফ ছেড়ে বাঁচল এবং ময়দানে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ ডান দিক থেকে পাঁচশো সৈন্যের একটি দল এগিয়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে দুশমনের উপর প্রচণ্ড হামলা করল। বিজলির মত মুহূর্তে তারা একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। একই সময়ে পাঁচশো অশ্বারোহীর আরেকটি দল বাম দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তে খৃস্টান বাহিনীকে তছনছ করে দিয়ে অন্য পাশে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল।

এই নতুন সেনাদল ছিল আলমেরিয়া, মর্সিয়া ও গ্রানাডার মুজাহিদদের। সাদ এদের সালারকে দেখামাত্রই চমকে উঠল এবং দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তার কাছে গিয়ে বলল, 'আব্বাজান! এ বয়সে আপনার ময়দানে আসার কোনো দরকার ছিল না।'

আবদুল মুনীম মুচকি হেসে বললেন, 'আমি এখনও বুড়িয়ে যাইনি বাছা। এ দিনের অপেক্ষাতেই তো আমি কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে এতগুলো রাত কাটিয়েছি।'

আচানক একদিকে নজর গেল সাদের। আহমদ এক বর্মাচ্ছাদিত খৃষ্টানের সাথে লড়ছে। আহমদের তরবারি খৃষ্টানের বর্ম ভেদ করতে পারছে না। এক অশ্বারোহী বর্শা উঁচিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। সাদও পলকে তার ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে অশ্বারোহীর বুকে বর্শা ঢুকিয়ে দিল। অশ্বারোহী মাটিতে পড়েই আবার উঠে দাঁড়াল এবং বর্শা ছেড়ে তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদের ওপর। আরেক অশ্বারোহী তেড়ে গেল সাদের দিকে।

আহমদ এখন এক সংগে দুটি তরবারি ঠেকাচ্ছিল। অকস্মাৎ একজনকে ভূপাতিত করে তলোয়ার ঘুরাল কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রচণ্ড আঘাতে তার তলোয়ারটি ভেঙ্গে গেল। সাদ ছুটে আসা অশ্বারোহীকে খতম করে আহমদের দিকে তাকাল, দেখল, আহমদ খালি হাতে নানা কৌশলে প্রতিপক্ষের আঘাত থেকে নিজকে বাঁচিয়ে পেছনে হটছে। সাদ এগিয়ে আক্রমণকারী খৃষ্টানকে বর্শার আঘাতে হত্যা করল। আহমদ ছুটে গিয়ে তার তরবারিটি তুলে নিল।

সাদ বলল, 'কবি, তুমি তো দেখছি ভাল সৈনিক হয়ে গেছ। তোমার ঘোড়া কই?'

'ঘোড়া আহত হয়েছে ভাইজান।'

সাদ বলল, 'ঐ দেখো তোমার ঘোড়া আসছে।'

এক খৃষ্টান অশ্বারোহী জনৈক আফ্রিকান সৈন্যের সাথে লড়ছিল। সাদ সেদিকে এগিয়ে গিয়ে খৃষ্টানের বুকে বর্শা ঢুকিয়ে দিল, আহমদ ছুটে গিয়ে তার ঘোড়াটির পিঠে সওয়ার হয়ে গেল।

'ঘোড়াটি তোমার পছন্দ হয়েছে?' সাদ মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল।

'বড় ভাইয়ের উপহার অপছন্দ হয় কি করে?'

'হাসান এসেছে?'

'হাসান, আব্দুল্লাহ, ইদ্রিস ও আলমাস সবাই এসেছে। হাসান আলফানসুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

যুদ্ধের অবস্থা পাল্টে গেছে দেখে আলফানসু আননেভার বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে এল। কিন্তু স্পেনীয় সৈন্যদের উৎসাহ ও উদ্যম ছিল দেখার মত। তারা জয়ের আশায় প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছিল। মুতামিদ আহত হয়েও সিংহের মত গর্জন করছিলেন। একটু আগে স্পেনের যেসব সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়েছিল তারাও ফিরে এসে সেভিল সৈন্যের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে শুরু করল।

পাহাড়ের অন্য পাশে তুমুল লড়াই চলছিল। আলফানসু ভাবছিল, আজকের লড়াইয়ে আমীর ইউসুফ পরাজিত হলে সে শুধু বিজয়ীই হবে না, ভুমধ্য সাগরের তীর পর্যন্ত গোটা স্পেন তার দখলে চলে আসবে। সেও জানতো, আফ্রিকার সৈন্যরাই হচ্ছে স্পেনীয় মুসলমানদের শেষ আশা ভরসার স্থল। এ আশা ভেঙ্গে গেলে তাদের প্রতিরক্ষা শক্তি চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে। এ জন্যই সে তার পুরো সামরিক শক্তি এ ময়দানে এনে আফ্রিকার সৈন্যদের বিরুদ্ধে জড়ো করেছিল।

প্রথম দিকে জয়ের চিহ্ন দেখে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার শিবিরে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে সে প্রমাদ গুনল। আমীর ইউসুফের ঝটিকা বাহিনী আলফানসুর সৈন্যদের ডান পাশের সারিগুলো তছনছ করে দিয়ে তাদের মধ্যভাগে এসে পৌছল। আলফানসুর হাসি মিলিয়ে গেল। বুঝতে পারল, কপালে তার দুর্ভোগ আছে।

হঠাৎ সিয়ার বিন আবু বকর নিজের বাহিনীর ভেতর থেকে একদল সৈনিক নিয়ে খৃষ্টান বাহিনীর বাম দিক থেকে আক্রমণ করলেন। খৃষ্টানদের সারিগুলোতে ফ্রান্সের এক নাইট লৌহ প্রাচিরের মত প্রতিরোধ খাড়া করে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ গতিতে সিয়ার এগিয়ে এলে খৃষ্টান সৈন্যরা টিকতে পারল না। তিনি খৃষ্টানদের বাঁধা পদদলিত করে ময়দানে লাশের স্তুপ বানিয়ে এগিয়ে গিয়ে আমীর ইউসুফের সাথে মিলিত হলেন।

মরক্কোর আরেক সেনাপতি শত্রু সৈন্যের পিছন থেকে আক্রমণ করে তাদের সুবিন্যস্ত সারিগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। খৃষ্টানরা যুদ্ধের অবস্থা পাল্টে যেতে দেখে মরিয়া হয়ে শেষবারের মত পূর্ণ শক্তিতে মুসলিম সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

খৃষ্টানদের এবারের আক্রমণ ছিল আরো তীব্রতর। রাবাত বাহিনী কৌশল পাল্টে দিল। তারা আত্মরক্ষামূলক লড়াই লড়তে করতে পেছনে সরে যেতে লাগল।

ওদিকে আনদোলাের খৃষ্টান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে সাদ সেখান থেকে তার সৈন্যদল নিয়ে এসে আলফানসুর সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আলফানসুর বাহিনী চারদিক থেকে মুসলিম ফৌজের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেল। স্পেনের মুজাহিদরাও পাহাড়ের অন্য পাশ থেকে ছুটে এসে রাবাতের সৈন্যদের সাথে যোগ দিল।

সন্ধ্যার আগেই খৃষ্টান সেনাদলে ছড়িয়ে পড়ল ভীতি ও বিশৃংখলা। রাবাত সৈন্যদের পেছন থেকে বেজে উঠল নাকাড়া। এ নাকাড়ার মানে জানত রাবাত বাহিনী। তারা প্রচণ্ড উদ্যমে একযোগে চতুর্দিক থেকে খৃষ্টানদের ওপর টুটে পড়ল। খৃষ্টানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে সাদের পাশ দিয়ে ঘেরাও ভেদ করে পিছু হটতে শুরু করল এবং আধ মাইল দূরে পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। খৃষ্টান সেনাপতি পূনরায় সেনা বিন্যস্ত করা শুরু করল কিন্তু ক্ষিপ্র গতিতে মুসলিম ফৌজ সেখানে পৌছে তাদের ওপর মরণ আঘাত হানল।

আমীর ইউসুফ চেঁচিয়ে বললেন, 'মুজাহিদ! দুশমনকে আর কোন সুযোগ দেয়া চলবে না। চরম আঘাত হানো, মিসমার করে দাও উদ্ধত আলফানসুর তামাম ফৌজ।'

সামরিক অফিসাররা আমীরের এ বাণী সৈন্যদের কানে কানে পৌছে দিল। নাকাড়ার ধ্বনি পাল্টে গেল। বেজে উঠল দ্রুত তালে। সাথে সাথে রাবাত বাহিনী ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুশমনদের ওপর।

এদিক ওদিক থেকে পালাতে শুরু করল দুশমন ফৌজ। কিন্তু আলফানসু তখনো খৃষ্টান সৈন্যদের বৃহত্তর অংশ নিয়ে মোকাবিলা করে চলছিল। তারা ইউসুফ বিন তাশফিনের রণকৌশল সম্পর্কে কিছুই জানতো না।

আমীর ইউসুফ তার সেনাবাহিনীকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করলেন। পদাতিক সৈন্যদের এক দিকে সরিয়ে দিলেন। অশ্বারোহী বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করে দুশমনদের হাঁকিয়ে নিতে বললেন তাদের। পলায়নকারী শত্রুদের পেছনে ধাওয়া করার জন্য নির্দেশ দিলেন সিয়ার বিন আবু বকরকে। বাম ও ডান দিকে পাঠালেন অভিজ্ঞ দুই সেনাপতিকে আর আমীর ইউসুফ নিজের ইস্পাত বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন খৃষ্টান বাহিনীর কেন্দ্রস্থলের দিকে। সম্মিলিত বাহিনী অর্ধ বৃত্তাকারে শত্রুদের তাড়া করল। ডান ও বাম পাশের বাহিনী শত্রুদের ঘেরাও করে মধ্য মাঠের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল আর আমীর ইউসুফের বাহিনী তাদের হত্যা করে পাঠিয়ে দিচ্ছিল পরপারে।

আলফানসু বুঝতে পারল, মহাসংকটে আটকে পড়েছে খৃষ্টান বাহিনী। মরুচারী সৈন্যরা আসল লড়াই শুরু করেছে এবার। বাঘ যেমন শিকার নিয়ে খেলা করে এবং খেলতে খেলতেই হত্যা করে শিকার, খৃষ্টানদেরকে নিয়ে এইসব বেদুঈনরা এবার সেই খেলায় মেতে উঠবে। ঘেরাও থেকে কাউকে বেরুতে না দিয়ে একে একে হত্যা করবে সবাইকে। পেরেশান হয়ে পালানোর আশায় সে তার পদাতিকদের দিকে তাকাল, কিন্তু ময়দানে তাদের দেখতে পেলো না। শেষ ভরসা হিসাবে সে তাকাল অশ্বারোহী বাহিনীর দিকে। তার অশ্বারোহী সৈন্যদের পেছনে যারা তাড়া করছিল, তাদের ঘোড়াগুলো ছিল অনেক দ্রুতগামী। ফলে মুসলমানদের ঘেরাও ভেদ করে ছুটে পালানোর বহু চেষ্টা করেও সফল হলো না তারা। যেদিক দিয়ে পালাতে যায় সেদিকেই তারা দেখতে পায় পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে মুসলিম বাহিনী।

আফ্রিকান মুজাহিদদের মত তাদের ঘোড়াও ছিল কঠোর পরিশ্রমী ও দ্রুতগামী। কিন্তু আফ্রিকানরা ভারী বর্ম পরতো না বলে তাদের ঘোড়া হালকা ওজন নিয়ে দ্রুত ছুটতে পারতো, অন্যদিকে অধিকাংশ খৃষ্টান সৈন্যই ছিল মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভারী লৌহবর্মে আচ্ছাদিত। ফলে ভারী বোঝা ও সারা দিনের ক্লান্তিতে তাদের ঘোড়াগুলো পালাতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল।

সূর্য ডুবে গেল। মুসলমান সৈন্যরা তাদের থলে থেকে খেজুর বের করে ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই ইফতার সেরে নিল। ইফতারের পরও শত্রুর পেছনে ধাওয়া করা

অব্যাহত রইল।

যুদ্ধের আগে আলফানসু তার সেনাপতিদেরকে বলেছিল, 'সারারাত ভরে চাঁদের আলোয় আমরা পরাজিত শত্রুকে তাড়া করব।' এখন সে চাঁদের আলোকেই সে সবচাইতে বেশী ভয় পাচ্ছিল আর খুঁজে ফিরছিল একটু অন্ধকার।

মুসলিম সৈন্যরা ডান ও বাম পাশ থেকে তীর ছুঁড়ছিল আর মধ্যভাগের সৈন্যরা বর্শার আঘাতে শত্রু নিধন করে যাচ্ছিল। মাইলের পর মাইল জুড়ে পড়েছিল খৃষ্টান সৈন্যদের লাশ। দীর্ঘক্ষণের একটানা লড়াইয়ে রাবাতের ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তখনো হাজার হাজার খৃষ্টান সেনা মুসলিম সৈন্যের বেষ্টনীর মধ্যে ফাঁদে পড়া শিকারের মত ছুটাছুটি করছিল। আমীর ইউসুফ পূর্ণ উদ্যমে খৃষ্টান সৈন্যদের মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দিচ্ছিল।

আলফানসুর বাঘা বাঘা জেনারেল ও নাইটরা লুটিয়ে পড়ল ভূমিতে। মধ্যরাত পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে মুসলিম ফৌজ তাদের ওপর গজব ঢেলে গেল। মাঝ রাতে দেখা গেল পঞ্চাশ হাজার খৃষ্টান সৈন্যের মধ্যে মাত্র হাজার চারেক সিপাই দুর্বল পায়ে তখনো ছুটতে চেষ্টা করছে।

এ সংখ্যাও দ্রুত কমে আসছিল। লুকানোর মত কোন জায়গা না পেয়ে তারা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল গোয়াদেল কুইভার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। চার হাজার খৃষ্টান সৈন্য বেপরোয়া হয়ে ছুটল নদীর দিকে। ঘেরাওয়ের ফাঁক গলে তাদের বেরিয়ে যেতে দিল মুসলিম ফৌজ ও মুজাহিদরা। নদী আর বেশী দূরে নয়। সহসা নদী তীর থেকে ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক তীর। ঘোড়ার মুখ ঘুরাতে বাধ্য হল খৃষ্টানরা।

এ সময় মুসলিম সৈন্যদের পেছন দিক থেকে দুশো তাজাদম অশ্বারোহীর একটি দল ছুটে এল। এসব সওয়ার ও ঘোড়া কেউ ক্লান্ত নয়। সিয়ার বিন আবু বকর তাদের শত্রু সেনা মনে করে পথ আটকাতে গেল, কিন্তু তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল আলফানসুর বাহিনীর সামনে।

দেখতে দেখতে দুহাজার খৃষ্টান সেনা নিহত হল। অবশিষ্ট খৃষ্টান সেনারা আবার পড়িমরি করে ছুটল নদীর দিকে। কিন্তু তারা দুদিক থেকেই পাইকারী হত্যার সম্মুখীন হল।

কার্ডিজের নাইটরা আলফানসুর চারদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী রচনা করে নদীর দিকে এগিয়ে গেল। আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যদের একটি দল আলফানসুর রক্ষী দলের ওপর আক্রমণ করল। এক কৃষ্ণাঙ্গ সেনা আলফানসুর উরুতে বর্শার আঘাত করল, আলফানসু ঘোড়া থেকে পড়তে পড়তে কোন রকমে রক্ষা পেল।

কার্ডিজের নাইট ও রক্ষীরা জীবন মরণ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে কোন রকমে নদীর কাছে পৌছে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুজাহিদরা পিছু নিতে উদ্যত হলে আমীর ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে উচ্চঃস্বরে বললেন, 'আর নয়, তোমরা তোমাদের জিম্মা সফলভাবে আদায়

করেছে। আর সামনে যাবার প্রয়োজন নেই। নদীর ওপারে শত্রুর নতুন বাহিনী ওঁৎ পেতে থাকতে পারে।'

বলতে গেলে সমুদয় খৃষ্টান সৈন্যই এ লড়াইয়ে খতম হয়ে গিয়েছিল। যারা নদীতে ঝাপিয়ে পড়েছিল তাদেরও অনেকে মৃত্যু বরণ করল ভারী বর্ম, অস্ত্র ও শিরস্ত্রাণের দরুণ পানিতে ডুবে। আলফানসু নদীর ওপারে গিয়ে হিসাব করে দেখতে পেল, মাত্র পাঁচশ সৈন্যের জীবন রক্ষা পেয়েছে।

এ যুদ্ধে তিন হাজার মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে সিয়ার বিন আবু বকর শেষ মুহূর্তে যোগদানকারী সৈনিকদের খোঁজ করলেন। জানা গেল, তারা গ্রানাডা ও আলমেরিয়ার মুজাহিদ। তাদের সালারদের সাথে পরিচিত হবার পর সিয়ার বললেন, 'আমি মনে করেছিলাম, শত্রুদের কোন ঘাঁটি থেকে তাদের সাহায্যে নতুন ফৌজ এসে গেছে। আপনাদের ঘোড়ার দৌড়ের গতি দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম।'

মুজাহিদ দলের সালার বললেন, 'আমরা তো পাহাড়ের উপরে লড়াই শেষ করে এখানে এসেছিলাম। আমাদের ঘোড়া খুবই ক্লান্ত ছিল। কিন্তু আল্লাহর অসীম দয়ায় আমরা শত্রু শিবিরে নতুন ঘোড়া পেয়ে গেলাম।'

সিয়ার মুজাহিদ দলের বিভিন্ন সালারের সাথে আলাপ করছিলেন, আচানক এক যুবককে দেখে সাদ 'হাসান! হাসান!' বলে ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সিয়ারকে বলল, 'আমার ভাই।'

সিয়ার পরম উৎসাহে হাসানের সাথে মুসাফাহা করলেন। সাদ অরেকজন সালারের সাথে তার পরিচয় করিয়ে বলল, 'এও আমার ভাই, নাম আহমদ। মুতামিদ ও রেমিকাকে নিয়ে রচিত তার কবিতা আপনি শুনেছেন। আর এ আমার দোস্ত ইদ্রিস বিন আবদুল জব্বার। ও আমার আরেক বন্ধু ইলিয়াস আর ইনি চাচা আলমাস।'

সাদ একে একে সকলের পরিচয় করানোর পর আহমদকে জিজ্ঞেস করল, 'আব্বাজান কোথায়?'

'তিনি তো আমার সাথেই ছিলেন।' বলল আহমদ।

ওরা এদিক ওদিক তাকিয়ে পিতাকে তালাশ করতে শুরু করল। আশপাশে না দেখে পিতার সন্ধানে রওনা হলে সিয়ার বিন আবু বকর তাদের সঙ্গ নিলেন। আবদুল মুনীম একদল আহত সৈনিকের আঘাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিলেন। বাঁধা শেষ হলে সাদ বলল, 'আব্বাজান, ইনি নৌসেনাপতি সিয়ার বিন আবু বকর। আপনার সাথে দেখা করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন।'

আবদুল মুনীম হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে দিলেন। রাবাতের গোত্র প্রধান ও সামরিক অফিসাররা আবদুল মুনীমের কাছে এসে জমায়েত হল। তাদের মুগ্ধ দৃষ্টি যেন বলছিল, 'ধন্য পিতা, ধন্য তুমি। যার ঔরসে এমন সন্তান হয় তার চাইতে সুখী আর কেউ নেই পৃথিবীতে। সব সম্পদের সেরা সম্পদ আজ তোমার হাতে।'

নতুন চেতনা, নতুন উদ্দীপনা

জাল্লাকার শহীদদের রক্তে স্পেনের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা হল। এ বিজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশের আনাচে কানাচে বয়ে গেল আনন্দের হিল্লোল। ছোট বড় সবার মুখে মুখে ইউসুফ বিন তাশফিনের গুণগান। মসজিদে মসজিদে তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করে দোয়া হতে লাগল। যে সব শাসকরা এ যুদ্ধে অংশ নেয়নি তারাও বিজয়ের আনন্দে ছুটে আসেন আমীর ইউসুফের কাছে।

জাল্লাকার প্রান্তরে কয়েকদিন অবস্থান করে ইউসুফ বিন তাশফিন সেভিল রওনা হলেন। স্পেনের মুসলিম শাসক ও আলেমরা সঙ্গ নিল তার। পথের বিভিন্ন লোকালয় ও শহরবাসীরা দলে দলে সমবেত হয়ে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাল তাদের।

আমীর ইউসুফের এ বিশাল মিছিল সেভিল পৌঁছলে অগণিত মানুষের ঢল তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। তাকে এক নজর দেখার জন্য ব্যস্তব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই। স্পেনের ছোট ছোট রাজ্যের শাসকরা জরির কাজ করা রেশমী পোশাক পরে এ মিছিলে শরীক হল। তাদের মাথায় মুক্তা বসানো মুকুট, এমনকি ঘোড়াগুলোও লাল শালু কাপড় ও অলংকারে সাজানো। ইউসুফ বিন তাশফিনের পরণে নেই জৌলুশের লেশ। সাদাসিধা মোটা কাপড় পরা, কিন্তু তবু সবার দৃষ্টি তারই ওপর নিবদ্ধ। যারা তাঁর ওপর ফুল ছুঁড়তে পারতো বা তাঁর ঘোড়ার পশম স্পর্শ করতে পারতো, গর্বে বুক ফুলে উঠত তাদের। মানুষের এ অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় কৃতজ্ঞ ইউসুফ বিনীত ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অথচ দুশমনের তীর বৃষ্টির মধ্যেও বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে অভ্যস্ত এ মর্দে মুজাহিদ।

উৎসুক জনতার ভীড়ে মিছিল সামনে এগুতে পারছিল না। সেভিলের পুলিশ রাস্তা পরিষ্কার করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল। হঠাৎ ভীড়ের ধাক্কায় এক বৃদ্ধ উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমীর ইউসুফ ছুটে গিয়ে বৃদ্ধকে টেনে তোললেন। আমীর ইউসুফকে জনতার চাপ থেকে বাঁচানোর জন্য পুলিশ তার চারপাশে বেষ্টনী তৈরী করল। তিনি পুলিশদের ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আমার চারদিকে বেষ্টনী রচনার কোন দরকার নেই।'

পুলিশকে সরিয়ে দিয়ে আমীর ইউসুফ সামনে এগুতে লাগলেন। এবার জনগণ নিজেরাই আমীর ইউসুফের এগিয়ে যাবার রাস্তা পরিষ্কার করে সরে দাঁড়াচ্ছিল। আমীর ইউসুফ ছাড়া কারো দিকেই জনতার নজর ছিল না। এমনকি স্পেনের খণ্ডরাজ্যের শাসকদের এত জাঁকজমক ও শাহী পোশাকের দিকেও জনতা তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না। খণ্ডরাজ্যের শাসকরা অনুভব করল, ইতিহাসের সামান্য এক ঘটনা আজ

তাদেরকে নিজের দেশে গুরুত্বহীন করে দিয়েছে।

আমীর ইউসুফ সেভিলের বড় মসজিদের সামনে এসে থামলেন। জনতা সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে গেল, তিনি সিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়ালেন। মসজিদের সামনের খোলা ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হল। আমীর ইউসুফ হাত তুলে জনতাকে শান্ত হতে ইশারা করলেন। যেন যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় পিনপতন নিরবতা নেমে এল ময়দানে। জনতা চুপ হলে তিনি বলতে শুরু করলেনঃ

'আমার প্রিয় ভাই ও শ্রদ্ধেয় বুজর্গগণ!

আমাকে আজ আপনারা যে সম্মান দিলেন, আমি তার যোগ্য নই। জাল্লাকার ময়দানে আমরা শত্রুকে পরাজিত করতে পেরেছি সেই সব শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে, যারা অকাতরে ঢেলে দিয়েছে তাদের বুকের তাজা খুন। আমি সেভিলের সেই সব মায়েদের আজ সালাম জানাতে এসেছি, যাদের কলিজার টুকরো, বুকের ধন আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বীরের মত লড়াই করে শহীদ হয়েছেন। এক মহান উদ্দেশ্যে জাল্লাকার প্রান্তরে নিজেদের রক্ত বিলিয়েছেন তারা, তাদের সে উদ্দেশ্যকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আজ আপনাদের। আফ্রিকায় আমার কাঁধে গুরু দায়িত্ব থাকায় এখানে বেশীদিন থাকতে পারব না আমি। এ জন্য আমি আপনাদের কাছে কয়েকটি জরুরী কথা আরজ করতে চাই।

জাল্লাকার রণক্ষেত্রে আমরা দুশমনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছি। আপনারা আরো শুনেছেন, দুশমন সারকাস্তা থেকে তাদের অবরোধ তুলে নিয়েছে। খালি করে দিয়েছে ভ্যালেন্সিয়ার কেল্লা। এখন এদেশের হেফাজতের জিম্মা আপনাদের। আপনারা যদি আবারো আত্মকলহে লিপ্ত হন তাহলে জাল্লাকার শহীদদের ত্যাগ ও কোরবানী বৃথা যাবে। দুশমন আরো শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে রণাঙ্গনে। নিজেদের এ আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দূর করে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে না তুলতে পারলে স্বাধীনতা বিপন্ন হবে আপনাদের।

প্রিয় ভাইয়েরা!

আপনাদের সবচে বড় দুর্বলতা হচ্ছে, আপনারা ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছেন। যদি ইসলামের ভিত্তির ওপর আপনাদের প্রতিরক্ষার প্রাচীর দাঁড় করাতে পারেন তাহলে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, দুনিয়ার তামাম অনৈসলামিক শক্তি এক হয়েও আপনাদের পরাজিত করতে পারবে না। আর যদি আপনারা ইসলাম থেকে দূরে সরে অন্য কোন ত্রাণকর্তার তালাশ করেন তাহলে আপনাদের পরিণতি ঐ সব লোকের পরিণাম থেকে ভিন্ন হবে না, যারা প্রবল বন্যার সময় পাহাড় থেকে নেমে বালির বাঁধের ওপর আশ্রয় নেয়। আল্লাহর রাহে যে কদম আপনারা বাড়িয়েছেন এ পথে অটল থাকলে প্রতিটি পদক্ষেপে সাফল্য ও বিজয় এসে আপনাদের পদচুম্বন করবে। আর ইসলামের বিপরীত পথে আপনারা যা কিছু করবেন তা আপনাদের ঠেলে দেবে পতন ও ধ্বংসের মুখে।

হে স্পেনের সুলতান ও জনগণ, আপনাদের কাছে আমার প্রথম ও শেষ আবেদন,

আপনারা যদি দুনিয়ায় মাথা উঁচু করে বাঁচতে চান তাহলে আল্লাহ ও তার রসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। যদি আপনারা কুরআনকে আপনাদের সংবিধান এবং রসূলকে আপনাদের একমাত্র আদর্শ ও নেতা মেনে নিতে পারেন, তাহলে আমি আপনাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, ভূপৃষ্ঠের সমস্ত নেয়ামত আপনাদের করায়ত্ব হবে এবং প্রতিটি রণক্ষেত্রেই আপনারা জাল্লাকার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারবেন।'

এক বৃদ্ধ ভিড়ের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কিছু বলার অনুমতি প্রার্থনা করলে আমীর ইউসুফ অনুমতি দিয়ে বললেন, 'বলুন।'

বৃদ্ধ বললেনঃ

'হে আমীর!

আপনি আমাদের বিধর্মীদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমাদেরকে আপনি ইসলাম দ্রোহীদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যাবেন না। আমরা আজ ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে গেছি। আমাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর ক্ষেত্রে যতটুকু ভূমিকা ইহুদী ও নাসারাদের তার চাইতে অনেক বেশী খণ্ডরাজ্যের তথাকথিত মুসলিম নামধারী শাসক ও সুলতানদের। তারাই আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, কোরানের আইন বাতিল করে নিজেদের খেয়াল খুশী মত আইন জারী করে দেশ চালিয়েছে তারাই। তারাই ইসলামের শিক্ষা আমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে এবং নিজেরাও ইসলামের শিক্ষা ভুলে আমাদের ওপর চালিয়েছে সীমাহীন জুলুম ও অত্যাচার। আমাদের গর্দান থেকে এই সব সিন্দাবাদের ভুত নামিয়ে দিয়ে যান। এরাই আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত লুটেছে, আমাদের শোষণ করে সর্বস্বান্ত করেছে। এদের এ জুলুম থেকে আমাদের মুক্তি দিয়ে যান। দোহাই আল্লাহর, যারা আমাদের পূর্ব পুরুষদের কবরের ওপর তাদের প্রমোদভবন নির্মাণ করেছে, যারা বার বার আমাদের আজাদী ও সম্ভ্রম দুশমনের কাছে বিক্রি করেছে তাদের হাতে আমাদের ছেড়ে দিবেন না।

হে আমীর!

আপনি যে স্পেনকে নব জীবনের পয়গাম দিচ্ছেন সে স্পেন এখনো উলঙ্গ, ক্ষুধার্ত, অসহায়। তাদের পায়ে এখনো খণ্ডরাজ্য শাসকদের লৌহ শৃংখল। এদেশ ছেড়ে যাবার আগে আপনি এ শৃংখল থেকে আমাদের মুক্তি দিয়ে যান।

এ স্পেন শাসক গোষ্ঠীর মাতৃভূমি নয়, এটা তাদের শিকার স্থল। তারা ইসলামের মহব্বতে আপনার পতাকাতলে সমবেত হয়নি, বাইরের এক শিকারী তাদের শিকার ছিনিয়ে নিতে আসায় তারা আপনার সাহায্য প্রার্থী হয়েছে।

আমাদের ওপর তারা যে জুলুম করেছে আমরা তার প্রতিশোধ নিতে চাইনা, চাই তারা অপসৃত হয়ে আমাদের গর্দান থেকে নেমে যাক। কিন্তু তারা যদি তাদের অতীতের কার্যকলাপ সম্পর্কে লজ্জিত না হয় আর আপনি স্পেনের মুসলমানদেরকে এদের হাতে তুলে দিয়ে যান তাহলে আপনাকে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে।

আজ আপনি তাদের কাছে যে আবেদন করেছেন; কয়েক বছর আগেই তাদেরকে সে আবেদন আমি শুনিয়েছি। আর সেই অপরাধে আমার জীবনের সোনালী দিনগুলো কর্ডোভা ও টলেডোর কারাগারে কাটাতে হয়েছে। আপনি স্পেনবাসীর সাহায্যে এসে থাকলে এসব শাসকদের হাত থেকে জনগণকে উদ্ধার করা আপনার পবিত্র দায়িত্ব। আর আপনি শাসকদের ক্ষমতা বহাল করতে এসে থাকলে শুনে রাখুন, জাল্লাকার বিজয়ের ফলাফল খুবই ক্ষণস্থায়ী হবে। স্থায়ীভাবে এ বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে দরকার স্পেনবাসীর ঐক্য। কিন্তু যতদিন জনগণের মাথায় এসব সুলতানদের ভূত চেপে থাকবে, ততদিন স্পেনের ঐক্য অসম্ভব।'

এ বৃদ্ধ ছিলেন আবদুল মুনীম। তার পরিচিতজনরা কল্পনাও করতে পারেনি, এ মৃদুভাষী লোকটি এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতে পারেন। তার সন্তানরাও পিতার বক্তৃতা শুনে হতবাক হয়ে গেল।

বিজয়ের পর আবদুল মুনীমের সাথে আমীর ইউসুফের আলাপ হয়েছিল। সে আলাপে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও আমীর ইউসুফ তার ইঙ্গিত থেকে বুঝেছিলেন, খণ্ডরাজ্যের সুলতানদের সাথে তার বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তবে আর কেউ না জানলেও কাজী আবু জাফর জানতেন, জনগণের মনে যে আগুন জ্বলছে আবদুল মুনীম তা অবশ্যই আমীর ইউসুফকে অবহিত করবেন।

উপস্থিত জনতা গগনবিদারী কণ্ঠে নারায়ে তাকবীর – আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে আবদুল মুনীমের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছিল। খণ্ডরাজ্যের শাসকরা চরম উদ্বেগ ও চিত্তচাঞ্চল্য নিয়ে জনতার নাগাল থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। জনতার ক্ষোভ ও ভাবাবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে সিয়ার বিন আবু বকর খণ্ডরাজ্যের সুলতানদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে অশ্বারোহী সেনারা চারদিক থেকে সুলতানদের ঘিরে দাঁড়াল। আমীর ইউসুফ বিন তাশফিন জনতার এ অভূতপূর্ব আবেগ ও উত্তেজনা লক্ষ্য করে আবার হাত উঁচু করে জনতাকে শ্লোগান থামাতে বললেন। জনগণ তার বক্তব্য শোনার জন্য সাথে সাথে শ্লোগান থামিয়ে দিল।

আমীর ইউসুফ বললেন, 'আপনারা জানেন, আমি আপনাদের আলেম ও সুলতানদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে এখানে এসেছি। চুক্তি মোতাবেক স্পেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করতে পারি না। যুদ্ধ শেষ হলে সেনাবাহিনী নিয়ে স্পেন থেকে আমার চলে যাওয়ার কথা। আমি সে চুক্তির উপর অটল আছি।

স্পেনের শাসনকর্তারা আমার এ মুরুব্বীর বক্তৃতা শুনেছেন। তারা যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে বাতাসের গতি নিশ্চয় তারা বুঝতে পারছেন। এরপরও তারা ইসলাম থেকে দূরে থাকলে এবং জাতির ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেললে তার পরিণতি অবশ্যই তাদের ভোগ করতে হবে। আপনারা জেনে রাখুন, জনমতের তোয়াক্কা না করে যত বড় স্বৈরাচারই হোক বেশী দিন ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকতে পারে না। পাহাড়ী ঢলের চাইতেও

জনতার ঢল বেগবান, তুফানের চাইতেও জনতার রুদ্ররোষ গতিশীল। ধৈর্যের শেষ সীমা পর্যন্ত জনতা হয়তো অপেক্ষা করে, কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। এক ফোটা বারুদ যেমন দাবানল তৈরী করে, কোন একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই জনতার এ দাবানল শুরু হয়ে যেতে পারে। সে দাবানল থেকে রেহাই পায় না কোন গণবিরোধী শাসক। স্পেনের জাগ্রত জনতার কাছে আমার আবেদন, যদি আল্লাহর আইনকেই আপনারা রাষ্ট্রীয় বিধান হিসাবে পেতে চান, যদি স্পেনে ইসলামী জীবন বিধানের পুনরুজ্জীবনই হয় আপনাদের কাম্য, তাহলে শীশাঢালা প্রাচীরের মত জনতার ঐক্য গড়ে তুলুন এবং যতক্ষণ অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে না যাবে ততক্ষণ এ দাবীর ওপর অনড় ও অটল থাকুন। যদি আপনারা শাসনকর্তাদেরকে শরীয়তী বিধান চালু করতে বাধ্য করতে না পারেন তাহলে আমি বলবো, আপনাদের আজাদী ও সম্ভ্রম বার বার বিপন্ন হবে। মনে রাখবেন, অসুস্থ হলে মানুষ লাঠি ভর দিয়ে হাঁটে, কোন সুস্থ মানুষ অন্যের পা দিয়ে হাঁটার চিন্তা করে না। নিজের ঈমান ও নিজের বাহুর শক্তি আগে যাচাই করুন। আমাকে আমার ওয়াদা পালন করতে দিন, তবে আবারও যদি মুসিবতের তুফান আপনাদের ঘেরাও করে ফেলে আর আপনারা আবারো সাহায্যের জন্য ছুটে যান এক ভাইয়ের কাছে, তবে সে ভাই কখনোই আপনাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না।'

বক্তব্য শেষ করে তিনি আবদুল মুনীমের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি আর কিছু বলতে চান?'

'জ্বি না, আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছি।' অত্যন্ত শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন আবদুল মুনীম।

আমীর ইউসুফ আবার জনতার দিকে ফিরলেন। বললেন, 'এখন সবাই নিজ নিজ বাড়ি চলে যান। আমি ওয়াদা করছি, যাওয়ার আগে আমি আপনাদের সুলতানদের সাথে এ নিয়ে আরো আলোচনা করবো এবং তাদেরকে সাধ্যমত বুঝানোর চেষ্টা করবো।'

জনসমাবেশ সমাপ্ত হলো। জনতা ঘরের পথ ধরল, সুলতানরা গেল মহলের দিকে আর আমীর ইউসুফ তাঁর বাহিনী নিয়ে শহরের বাইরে সেনা ছাউনিতে চলে গেলেন।

২

পর দিন সুলতান মুতামিদ তার মহলে ইফতারের দাওয়াত দিলেন আমীর ইউসুফ বিন তাশফিন ও তার সাথে আসা বিভিন্ন উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ, আলেম এবং পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের। মহলের ভিতরে বাগানের মধ্যে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হল।

মুতামিদের উজিরগণ ও আমলারা ছাড়াও স্পেনের কয়েকজন সুলতান এ ইফতার মাহফিলে উপস্থিত। সুন্দর পরিপাটি আলোকসজ্জায় সাজানো হয়েছে বাগান। সাধ্যমত

চেষ্টা করা হয়েছে জৌলুসের চেয়ে পবিত্র একটি পরিবেশ তৈরী করতে। কিন্তু আফ্রিকার এ দরবেশ শাসক ও তার সংগীদের কাছে এটুকুও ছিল বাড়াবাড়ি রকমের জাকজমক। এরপর এল ইফতারীর পালা। খাদ্যের ফিরিস্তি দেখে এ বিদেশী মেহমানরা তো তাজ্জব।

মাহফিল শুরু হবে, এ সময় এল রাণী রেমিকা। প্রসাধন চর্চিত চেহারায় কালো পোশাক, ও অলংকার পরে ভোজ সভায় হাজির হল সে, বসল মুতামিদের পাশে। বেদুঈন শেখ, আফ্রিকার আলেম ও সেনা অফিসারদের চোখ এক পলক তাকে দেখল। সেই যে তারা চোখ নত করল আর তুলল না। তাদের কেউ রেমিকার সাজ-পোশাকের প্রশংসা করল না, তার মুচকি হাসির জবাবে কেউ হাসল না। রেমিকা হতবাক ও পেরেশান হল, রাগে তার ঠোঁট কাঁপতে শুরু করল। এত মূল্যবান বেশ-ভূষা ও অলংকার দিয়ে রেমিকা যাদের জন্য নিজেকে সাজাল তারা কেউ ফিরেও তাকাল না তার দিকে। মুজাহিদদের নত চোখ যেন রেমিকার কানে কানে বলছিল, 'তুমি কারো বোন, কারো বিবি, কারো মা। তুমি নিজের মর্যাদা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর।'

রেমিকা গভীর আক্রোশে মনে মনে তাদের মুর্খ, অভদ্র আখ্যা দিয়ে তাকাল স্পেনের সুলতানদের দিকে। কিন্তু হায়! আজ তাদের নজরও অন্য দিকেই ছিল। মুতামিদ ফিসফিস করে বলল, 'বেগম, তুমি খাচ্ছ না যে?'

রেমিকা দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বলল, 'আমার ক্ষুধা নেই।'

'তোমার কি, শরীর খারাপ?'

'না, আমার মন খারাপ।'

'তাহলে তুমি বরং মহলে চলে যাও। এতে কেউ কিছু মনে করবে না।'

রেমিকা উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ এক যুবকের চেহারায় তার দৃষ্টি আটকে গেল। রেমিকা ফিসফিস করে মুতামিদকে বলল, 'কৃষ্ণাঙ্গ বৃদ্ধের পাশে ওই যে যুবক বসে খাচ্ছে, তাকে চিনতে পারছেন?'

'উনি আমীর ইউসুফের নাবিক বাহিনীর এক জেনারেল।'

'ভাল করে দেখুন।'

মুতামিদের বাম পাশে উজির ইবনে জায়দুন বসেছিল। সে ফিসফিস করে বলল, 'কয়েক বছর আগে আপনার দরবারে দাঁড়িয়ে যে যুবক উদ্ধত ভাষণ দিয়েছিল, এ সেই। আর আজ মসজিদের সামনে যে বৃদ্ধ বক্তৃতা করেছে, সে ওর বাপ। বৃদ্ধ এখানে আসেনি।'

মুতামিদ এবার ভাল করে সাদের দিকে তাকাল এবং তাকে চিনতে পেরে তার গলায় খাবারের গ্রাস আটকে গেল। রাণী উঠে চলে গেল মহলে।

খানা দাওয়ার পর মুতামিদ আমীর ইউসুফকে বললেন, 'স্পেনের বিখ্যাত কবিরা আপনাকে কবিতা শোনাবার অনুমতি চায়।'

আমীর ইউসুফ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতক্ষণ লাগবে?'

'আপনি যতক্ষণ বলবেন।'

'আমি বেশী সময় দিতে পারবো না।'

'আপনি ভাল মনে করলে এশার নামাজের পর শুরু করা যায়।'

'না, নামাজের পর আমি বিশ্রাম করব।'

ফলে তখনই শুরু হল আবৃত্তি। দুজন কবি আমীর ইউসুফের প্রশংসায় গেয়ে দুটি কবিতা আবৃত্তি করল। মুতামিদ, তার উজীর বর্গ এবং স্পেনের অন্যান্য সুলতানরা মহা উৎসাহে কবিদের বাহবা দিল, কিন্তু আমীর ইউসুফ নিরব। কবিরা তার প্রশংসা করছিল কি-না তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তৃতীয় কবি কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে মুতামিদ আমীর ইউসুফকে বলল, 'ইনি সেভিলের শ্রেষ্ঠ কবি। আপনি এ কবিতার অর্থ বুঝেন?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু এতটুকু বুঝেছি, এরা হালুয়া-রুটির কাঙাল। বেহুদা শব্দজাল সৃষ্টি না করে তারা যদি আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করত, তা হলে কতই না ভাল হত! যাক, এখন নামাজের সময় হয়েছে, আমি উঠি।'

আমীর ইউসুফ উঠে দাঁড়ালেন। কবি ও ভক্তরা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমীর ইউসুফ চলে যাবার সাথে সাথে মজলিশ ভেঙ্গে গেল। এতক্ষণ যে কবিরা আমীর ইউসুফের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, তারাই আমীরের উপেক্ষায় ক্ষুন্ন হয়ে তার বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করে তাদের হৃদয়ের আক্রোশ মিটাতে চেষ্টা করতে লাগল।

৩.

ইফতার মাহফিলের পর দিন, আলমাস সেভিল শহর ঘুরেফিরে দেখছিল, হঠাৎ মুতামিদের এক উজির তার সামনে পড়ে গেল। এ উজির এক সময় কর্ডোভার উজিরে আজম ছিল। তাকে দেখামাত্রই আলমাসের মাথায় খুন চেপে গেল। সে উজিরের পাগড়ি টেনে খুলে ফেলল এবং তা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাকে টানতে শুরু করল। জনগণ মুতামিদ ও তার দোসরদের ওপর খাপ্পা ছিল বরাবর। সাহস পায়নি বলে সরকারের বিরুদ্ধে জমে ওঠা ক্ষোভ এতদিন কেউ প্রকাশ করেনি, আজ আচানক এমন একটি মওকা পেয়ে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ল এ উজিরের ওপর। দেখতে দেখতে লোকজনের ভীড় জমে গেল সেখানে। পুলিশ উজিরকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করল।

এক পুলিশ আলমাসকে জিজ্ঞেস করল, 'ইনি আপনার কি করেছেন?'

আলমাস বলল, 'সে কথা আপনাকে নয়, আমীর ইউসুফকে বলব।'

জনতা সমস্বরে বলল, 'হাঁ! হাঁ! একে নিয়ে আমীর ইউসুফের কাছেই চলুন।'

উজির চেঁচিয়ে বলল, 'এ এক পাগল। আমি তাকে চিনি না।'

'মিছে কথা বলে রেহাই পাওয়ার দিন শেষ উজির সাহেব। তোমরা মনে করেছিলে দুনিয়ার বুক থেকে আল্লাহর বান্দারা মরে গেছে। কিন্তু তোমাদের ধারণা ভুল, আজ

তোমাদের হিসাব দেয়ার দিন।'

আলমাস কথা বন্ধ করে ফাঁসে টান দিল। উজিরের চোখ দুটি সে টানে বের হয়ে আসতে চাইল। আলমাস ফাঁস আলগা করে তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলল, পেছন থেকে জনতার ধাক্কা খেয়ে উজির সামনে বাড়ল। দাঁড়িয়ে তামাশা দেখা ছাড়া পুলিশের আর করার কিছুই ছিল না। জনতার রুদ্ররোষের সামনে তাদের প্রতিরোধ খড়-কুটোর মত ভেসে গেল। অগত্যা জনতার ভিড় থেকে সরে এসে তারা এ দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল।

যতই এ মিছিল এগিয়ে যাচ্ছিল ততই জনতার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। এ ভাবে একজন সম্মানিত ও বয়োবৃদ্ধ উজিরকে কেন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা কেউ জানতে চাইল না, বরং যারাই এ দৃশ্য দেখল তারাই মিছিলে শরীক হলো।

উজির বার বার চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'আমি কোন অপরাধ করিনি। আমাকে ছেড়ে দাও। হে সেভিলের অধিবাসীরা! আমি তোমাদের উজির। তোমাদেরই খাদিম, আমাকে উদ্ধার করো। বর্বর এক পাগলের হাতে আমাকে ফেলে দিও না।'

উজিরের এসব কথায় জনগণ বেশ মজা পাচ্ছিল। তারা আনন্দে লাফালাফি করছিল। এক যুবক পথে একটি গাধা দেখতে পেয়ে জোর করে উজিরকে তার পিঠে তুলে দিল। দেখতে দেখতে আট দশ হাজার লোকের বিশাল মিছিল তাকে নিয়ে আমীর ইউসুফের কাছে এগিয়ে চলল।

সেভিলের উজিরে আজম ইবনে জায়দুন আমীর ইউসুফের সাথে মোলাকাত করে তাঁবু থেকে বের হয়েই দেখতে পেলেন মিছিলটি। এক প্রবীণ উজিরের এ দুরবস্থা দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন। দাঁড়ালেন মিছিলের সামনে। ইবনে জায়দুনকে দেখতে পেয়েই উজির হাউমাউ করে কেঁদে উঠল এবং গাধার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামতে চাইল, কিন্তু আলমাস তাকে ছাড়ল না।

ইবনে জায়দুন আলমাসকে বলল, 'এসব কি হচ্ছে? ছাড়ো তাকে।'

আলমাস বলল, 'না, তাকে আমীর ইউসুফের কাছে যেতে হবে।'

'কেন, কি অন্যায় করেছেন তিনি?'

'আমীরের কাছে গিয়ে, ওখানেই বলব।'

আমীর ইউসুফের এক ফৌজি অফিসার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বললেন, 'আলমাস, এ সব কি হচ্ছে? ছেড়ে দাও ওকে।' এ অফিসার ছিল সাদ ইবনে আবদুল মুনীম।

আলমাস বলল, 'কর্ডোভার নায়েবে উজির থাকা কালে আমাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি দিয়ে সে আমার কাছে থেকে তিনশ দীনার ঘুষ আদায় করেছিল। আমি এর বিচার চাই।'

উজির বলল, 'মিথ্যা কথা। আমি একে চিনি না।'

আলমাস বলল, 'কর্ডোভা থেকে আমি এক হাজার সাক্ষী জোগাড় করতে পারব। যাদের কাছ থেকে তুমি জোর করে ঘুষ আদায় করতে তাদের অন্তত দুশো ব্যক্তির সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে।'

সাদ বলল, 'আমীর ইউসুফ এ সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না। তুমি একে ছেড়ে দাও।'

ইতিমধ্যে বিভিন্ন তাঁবু থেকে অনেক সৈনিকই সেখানে হাজির হয়েছিল। এদের মধ্যে আবদুল মুনীম, আহমদ, হাসান এবং ইদ্রিসও ছিল। তারাও উজিরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলে নিতান্ত অনিচ্ছায় আলমাস তাকে ছেড়ে দিল।

ইবনে জায়দুন আলমাসের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তিনি তোমাদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন, আমিও তা বিশ্বাস করি। আমি ওয়াদা করছি, তিনি তোমার কাছ থেকে অন্যায় ভাবে যে অর্থ আদায় করেছেন তা ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা আমি করব। আমীর ইউসুফ আমাদের মেহমান। তাকে এসব বিষয় নিয়ে বিরক্ত করা আমাদের উচিত নয়।'

আলমাস বলল, 'আমি সে টাকা আর ফেরত চাইনা– চাই ইনসাফ। আমি দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের হাত থেকে মুক্তি চাই, সমাজের সর্বস্তরে সুবিচার ও ইনসাফ চাই। আমি সেই সুদিনের অপেক্ষায় আছি।'

৪.

আলফানসুর ভয় স্পেনের শাসনকর্তাদের সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, কিন্তু তার পরাজয়ের ফলে ভয় যেমন দূর হল, খণ্ডরাজ্যের শাসকদের ঐক্যের বাঁধনও শিথিল হল তেমনি। জাল্লাকার বিজয়ের পর সবাই মনে করল, স্পেনের বাদশাহ হওয়ার জন্য প্রয়োজন আমীর ইউসুফ প্রিয়ভাজন হওয়া। ফলে আমীরের নজরে পড়ার জন্য শুরু হল নতুন খেলা। এ খেলার হাতিয়ার হয়ে উঠল ষড়যন্ত্র।

আমীর ইউসুফের সামনে ভক্তিতে গদগদ খণ্ডরাজ্য শাসকরা তাঁবুর বাইরে এসে পরস্পর কোলাকুলি করতো আর আমীর ইউসুফের সাদামাটা জীবনের সমালোচনা করতো। বলতো, 'মনে হয় তিনি আফ্রিকা ফিরে যাবেন না। স্পেন দখল করাই তার উদ্দেশ্য। জনগণ ও আলেমরা তার সমর্থক। রাজা বাদশাদের তুলনায় আমীর ইউসুফের মত সাধারণ এক সিপাই জনগণের কাছে বেশী সম্মানিত। এরা আমাদের প্রমোদভবনগুলোতে ঘোড়া বাঁধবে, আমাদের আধিপত্যের বারোটা বাজাবে। মুতামিদ এদের সেভিলে থাকার অনুমতি দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে। আমাদের মহল দেখার পর মরুভূমিতে ফিরে যেতে এরা কিছুতেই রাজী হবে না।'

আমীর ইউসুফের সাথে দেখা করার সময় এরাই আবার পরস্পরের বিরুদ্ধে নিন্দা ও অভিযোগের দীর্ঘ কাহিনী বয়ান করতো। সেভিল, গ্রানাডা, আলমেরিয়া, মার্সিয়া সব

খণ্ডরাজ্যের শাসকই একে অন্যের বিরুদ্ধে তুলে ধরতো দুর্নামের দীর্ঘ ফিরিস্তি।

আমীর ইউসুফ অনুভব করছিলেন, স্পেনের সকল শাসকের চরিত্রই সমান কলংকিত। জাল্লাকার যুদ্ধক্ষেত্রে যে মুতামিদ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে সেভিলে এসে সে মুতামিদ সম্পূর্ণ বদলে গেল। আবার সে ফিরে গেল রেমিকার শাসনে।

আমীর ইউসুফের আগমনের আগে রেমিকা ছিল সব মজলিশের মধ্যমণি আর এখন অন্দর মহলে সে বন্দিনীর মত অসহায় জীবন কাটাচ্ছিল। স্পেনে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তার জন্য ছিল মৃত্যুদণ্ডের শামিল। সে দেখতে পাচ্ছিল, তার নাচ গানের মাহফিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার হাত থেকে কেড়ে নেয়া হচ্ছে শরাবের পাত্র। এতদিন যারা রেমিকার রূপের প্রশংসায় ছিল উচ্ছ্বসিত, আজ তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে জোব্বা পরা এক ব্যক্তির সামনে। যে সামান্য একটা কবিতাও আবৃত্তি করতে পারে না, উচ্চাঙ্গের কবিতার রস আস্বাদন তো পরের কথা।

যেখানে মনিব ও ভৃত্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যে সমাজে নারীকে শুধু কন্যা-বোন, স্ত্রী এবং জননী হিসাবেই দেখা হয়, সে দুনিয়ায় রেমিকার মূল্য কোথায়? রেমিকা দুঃখ বেদনায় বার বার মুতামিদকে প্রশ্ন করত, 'এখন কি হবে?'

সব চাইতে বেশী দুর্ভাবনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল স্পেনের কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীরা। এরা অযোগ্য শাসকের প্রশংসা করে জীবিকা নির্বাহ করতো। ইসলামী হুকুমত কায়েম হলে এদের কোন দামই থাকবে না বুঝতে পেরে এরা ভবিষ্যত সম্পর্কে শংকিত হয়ে উঠল। তাদের মতই শংকিত হলো স্পেনের আমীর ওমরা ও পদস্থ ব্যক্তিরা। এরা বুঝতে পারছিল, খণ্ডরাজ্য শাসকদের কর্তৃত্ব খতম হলে জনগণ এদের কান ধরে নামিয়ে আনবে জনতার কাতারে। ফলে স্পেনের সত্যিকার আজাদীর মাঝে ওরা শুনছিল নিজেদের মৃত্যুঘন্টা।

আমীর ইউসুফ পালাক্রমে সৈন্যদের আফ্রিকা ফেরত পাঠাচ্ছিলেন। প্রথম সপ্তাহে তার দশ হাজার সেনা সেভিল ত্যাগ করল। তবু স্পেনের সুলতানদের মনের ভয় যায় না। প্রতিটি শহর থেকে প্রতিদিন যে হারে উল্লসিত জনতা দলে দলে এসে আমীর ইউসুফের সাথে দেখা করছিল তাতে সবাই বুঝতে পারছিল, স্পেন দখল করার জন্য তার বিরাট সেনাবাহিনীর কোন দরকারই নেই, তিনি ইঙ্গিত করলে জনগণই নিজেদের শাসকদের গদি যে কোন সময় উল্টে ফেলতে পারবে।

আতঙ্কিত সুলতানদের মধ্যে মুতামিদ ছিল সবচে বেশী উৎকণ্ঠিত ও মনোকষ্টে। তার আশা ছিল, আলফানসুর পতনের পর আমীর ইউসুফ স্পেনের অন্যান্য শাসনকর্তাদেরকে মুতামিদের নেতৃত্ব মেনে নিতে বলবেন। কিন্তু সে আশা পূরণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখছিলেন না তিনি। এ ব্যাপারে আমীর ইউসুফের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মুতামিদ বহু মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে আমীরের সাথে সাক্ষাত করলেন।

ইউসুফ বিন তাশফিন বললেন, 'আপনি এসব উপহার ফিরিয়ে নিয়ে যান।

আপনাদের মধ্যে কে ফেরেশতা আর কে শয়তান আমি আজও তা নির্ণয় করতে পারিনি। আপনাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবো না বলে ওয়াদা করায় আমি আপনাদের ভাল-মন্দ কিছু বলিনি। নইলে জনগণকে খণ্ডরাজ্য শাসকদের কবল থেকে মুক্তি না দিয়ে আমি কিছুতেই ফিরে যেতাম না। আমি জনগণকে ছোট ছোট ফেরাউনের বদলে বড় ফেরাউনের হাতে তুলে দিতে স্পেনে আসিনি। যদি আমি জনতার দাবী ও মিনতিতে সাড়া দিতাম তাহলে জনসাধারণের হাড়ের ওপর যারা প্রমোদভবন বানায় তাদের দুর্নীতি কেউ রোধ করতে পারতো না। আপনাকে আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি, আমার বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সব সময়ই একমাত্র আল্লার জন্য নির্ধারিত থাকবে। আপনি আমার বন্ধু না শত্রু হবেন তা নির্ভর করবে আপনার আগামী দিনের কাজের ওপর।'

এ সাক্ষাতের পর ভয়ে ও শংকায় মুতামিদ পাগলের মত হয়ে গেল। নিজের আশা পূরণ না হওয়ায় অন্যান্য খণ্ডরাজ্য শাসকদের কাছে সে আমীর ইউসুফের নিন্দাবাদ শুরু করল। সেসব শাসকরা মুতামিদের বন্ধু সেজে সব কথা গোপনে আমীরকে তা অবহিত করতো। আলমেরিয়ার শাসক মুনতাসিম আমীর ইউসুফ ও মুতামিদের মধ্যে বিরোধ ও দূরত্ব বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচে বেশী তৎপরতা চালাল। এভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার পরও আমীর ইউসুফ ও মুতামিদের পথ আর এক ও অভিন্ন থাকতে পারল না।

৫.

আমীর ইউসুফের জীবন শুরু হয়েছিল তরবারির ঝংকার ও তীরের শনশন ধ্বনির মধ্যে। জীবন কেটেছে তার মর্দে মুজাহিদ ও দ্বীনদার আলেমদের সান্নিধ্যে। ভণ্ডামী ও বেঈমানীর ছোঁয়া কোনদিন তাকে স্পর্শ করেনি। ফলে স্পেনের সুলতানদের লোক দেখানো ভদ্রতা ও কপট আচরণ তার কাছে ছিল অসহনীয়। রাজনীতির নামে প্রতারণা ছিল অসহ্য।

রমজানের বাকী দিন কয়টা তিনি সেভিলেই কাটানোর মনস্থ করেছিলেন কিন্তু গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় যে ছেলেকে তিনি সাবতায় রেখে এসেছিলেন তার মৃত্যুর খবর এসে পৌছল স্পেনে। এ খবর পেয়ে তিনি সেদিনই স্বদেশ যাত্রার সিদ্ধান্ত নিলেন।

যাত্রার আয়োজন সম্পন্ন করে আমীর ইউসুফ সাদকে ডেকে বললেন, 'সাদ, এবার তুমি তোমার আম্মা ও ভাইদের নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও।'

সাদ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমীর, গ্রানাডায় বসবাস করলেও আমরা আসলে কর্ডোভার বাসিন্দা। কিন্তু সে শহর কবে নাগাদ আমাদের বসবাসের উপযোগী হবে আল্লাহ জানেন। এখনো সেখানে ফিরে যাওয়ার মত অবস্থা নেই আমাদের।'

আমীর ইউসুফ তার কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বললেন, 'নিরাশ হয়ো না দোস্ত!

কর্ডোভা অবশ্যই তোমাদের বসবাসের উপযোগী হবে। আমি আবার আসব এবং তখন আমার পছন্দসই শর্তেই আসবো। যতদিন কর্ডোভা তোমাদের বাস যোগ্য না হবে ততদিন তোমার পিতার কথাগুলো আমাকে তাড়া করে ফিরবে।'

সাদ প্রশান্ত মনে বলল, 'আমারও বিশ্বাস, আপনি অবশ্যই আসবেন। তবে শুধু আমার জন্য নয়, স্পেনের লাখো মা বোনের কান্না ও আহাজারী থামাতে আসবেন আপনি।'

আমীর ইউসুফ উঠে দাঁড়ালেন। সাদকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁবুর বাইরে। খণ্ডরাজ্যের সুলতানরা এক পাশে অপেক্ষা করছিল। অন্য পাশে দাঁড়িয়েছিল স্পেনের আলেমরা। পথের দুপাশে জনতার ঢল। আমীর ইউসুফ আলেমদের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং একে একে সকলের সাথে মুসাফাহা করলেন। এরপর সুলতানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বন্দরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। আলেম এবং সুলতানরা তার পিছু নিল। সেভিলের হাজার হাজার শিশু, যুবক, বৃদ্ধ চোখের সাগরে ভাসতে ভাসতে বিদায় জানাল তাদের এক আত্মার আত্মীয়কে, তাদের মহান ত্রাণকর্তাকে।

সিয়ার বিন আবু বকর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সাদের বাপ ও ভাইদের সাথে আলাপ করছিলেন। আমীর ইউসুফ আলেমদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলে সাদও ওদের সাথে এসে যোগ দিল। হঠাৎ কি ভেবে সিয়ার বিন আবু বকর সুলতানদের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং গ্রানাডার শাসক আবদুল্লাহকে সাথে করে ফিরে এলেন।

সিয়ার সাদের কাঁধে হাত রেখে সুলতানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনাকে একটা জরুরী কথা বলতে এখানে টেনে এনেছি। এ আমার দোস্ত, এখন গ্রানাডায় থাকছেন। আমি আপনাকে শুধু এটুকুই বলতে চাই, যদি কখনো আপনি আমার এ দোস্ত ও তার আত্মীয় বন্ধুদের সাথে কোন রকম দুর্ব্যবহার করেন, তাহলে মনে রাখবেন, আমি তাকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি।'

আবদুল্লাহ বলল, 'ইনি আপনার দোস্ত হলে, আমার কাছ থেকেও তিনি দোস্তের মতই আচরণ পাবেন।'

'স্পেনে দোস্ত শব্দটি কলঙ্কিত হয়ে গেছে। আমি তাকে শুধু আপনার জুলুম থেকে নিরাপদ দেখতে চাই।'

আবদুল্লাহ এ কথায় যথেষ্ট অপমানবোধ করলেও তা চেপে যেতে বাধ্য হলেন।

আমীর ইউসুফ বন্দরের পথ ধরলে তারাও তাকে অনুসরণ করল। জনতার এক সুবিশাল মিছিল এগিয়ে চলল বন্দরের দিকে। সেভিলের জনগণ যখন তাদের চোখের অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে তাদের মহান ত্রাণকর্তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিল মুতামিদের মহলে তখন রাণী রমিকা আনন্দ উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত।

তখন ভর দুপুর। সকিনা বিছানায় শুয়েছিলেন। কদিন ধরে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাহেরা পাশে বসে তার মাথা টিপে দিচ্ছে আর মায়মুনা কাছেই এক চেয়ারে বসে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে।

হঠাৎ বাড়ির বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। পরিচারিকা দরজা দিয়ে মুখ বের করেই লাফিয়ে উঠল, 'এসে গেছেন! ওনারা এসে গেছেন।'

চমকে উঠলেন সকিনা। তার ফ্যাকাশে চেহারায় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। তিনি বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বললেন, 'কি বললে, এসে গেছেন!'

তাহেরা বলল, 'আম্মাজান, আপনি শুয়ে থাকুন।'

তিনি বললেন, 'না না, আমি ভাল হয়ে গেছি।'

আবদুল মুনীম পুত্রদের নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাহেরা ও মায়মুনা সালাম দিয়ে একদিকে সরে গেল। চেয়ার টেনে সকিনার কাছে বসলেন আবদুল মুনীম। ছেলেরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। বহুদিন পর সকিনা অনুভব করলেন, তার ঘরে আজ ফিরে এসেছে ঈদের আনন্দ।

'তুমি কেমন আছ, সকিনা?'

'আমি ভাল আছি।' মুখে হাসি টেনে বললেন সকিনা।

'না আম্মা, আমরা খবর পেয়েছি আপনার শরীর ভাল নয়। আমি ডাক্তার ডেকে আনছি।'

'না বাবা, ডাক্তার দরকার নেই। তোমাদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনেই আমি ভাল হয়ে গেছি। ইদ্রিস কোথায়?'

'ইদ্রিস খালাজানের ওখানে গেছে। এখনি এসে যাবে।'

সকিনা পুত্রবধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা ঘরের কোণে পালিয়ে গেলে কেন? এদিকে এসো।'

মায়মুনা ও তাহেরা লজ্জায় জড়সড় হয়ে এগিয়ে এল। সকিনা স্বামীকে বললেন, 'আপনার বিজয়ের জন্য মুবারকবাদ। আমরা কবে নাগাদ কর্ডোভা যেতে পারবো?'

আবদুল মুনীম দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'সময়ই সব বলে দেবে, তবে এখনো কর্ডোভা যাওয়ার সময় আসেনি।'

সকিনা চঞ্চল হয়ে বললেন, 'আপনিই তো বলেছিলেন, লড়াই শেষ হলেই আমরা কর্ডোভা চলে যেতে পারব?'

আবদুল মুনীম বললেন, 'আমরা অবশ্যই কর্ডোভা যাবো, তবে এখনি নয়।'

রাতে মায়মুনা স্বামীকে প্রশ্ন করল, 'আব্বাজান কর্ডোভা যাবার ইরাদা বাদ দিলেন কেন?'

সাদ বলল, 'আব্বাজান কর্ডোভা যাওয়ার ইচ্ছা বাদ দেননি, মুলতবী করেছেন।

কারণ, সেখানে এখনো যাওয়ার মত অবস্থা হয়নি।'

'তার মানে, এখনো স্পেনে কাঙ্খিত সুহাসিনী ভোরের আগমন ঘটেনি?'

'মায়মুনা! ঝড় থেমে গেলেও আকাশের সব মেঘ এখনো সরে যায়নি। আশা করি, শীঘ্রই এ মেঘও কেটে যাবে এবং তুমি তোমার সেই কাঙ্খিত ভোর দেখতে পাবে। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন ভোরের পাখির মত আমার মায়মুনাকে আমি বলতে পারবো, মায়মুনা ওঠো, দেখো ভোর হয়েছে, পাখি গান গাইছে, বাগানে ফুল ফুটেছে। ওঠো মায়মুনা, তোমার সেই কাঙ্খিত ভোর এসে গেছে, দেখো কি সুন্দর কোমল রুদ্দুর খেলা করছে উঠোনে।'

খুশি হওয়ার পরিবর্তে বিষাদে ভরে গেল মায়মুনার চেহারা। স্বামীর মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে উদাস চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। সাদ তাকে শান্তনা দিয়ে বলল, 'ভেঙে পড়ো না সোনা, আমি আর আফ্রিকা যাচ্ছি না। স্পেনের আকাশে এ কালো মেঘও আর বেশী দিন থাকবে না।'

তবু মায়মুনা কোন কথা বলছে না দেখে সাদ বলল, 'কি ভাবছ মায়মুনা?'

মায়মুনা ব্যথিত কণ্ঠে বলল, 'আমি আম্মাজানের কথা ভাবছি। কর্ডোভাবাসী যেদিন মামুনকে পরাজিত করেছিল, সেদিন তিনি ভেবেছিলেন, দুঃখ ও বিষাদ রজনী কেটে গেছে, এসেছে নতুন ভোর। কিন্তু তারপর তার জীবনে কত প্রভাতের উদয় হল, অথচ সে সব প্রভাত রাতের আঁধারের চেয়েও ছিল ভয়ানক, দুঃসহ। দিন গেল, মাস গেল, বছর পেরিয়ে অতীত হল যুগ। কিন্তু সে ভয়ানক রাতের অবসান হলো না তার জীবনে। জনমানব শুন্য মরুযাত্রীর মত একাকীই হেঁটে হেঁটে পার করলেন জীবনের ধূসর প্রান্তর।'

সাদ বলল, 'মায়মুনা, স্পেনে আল্লাহর নেয়ামতের কোন অভাব নেই। মানুষের অসুখী হবার কোন কারণ নেই। যে বিদেশীদের হাত থেকে আমরা নাজাত পেয়েছি তারাই আমাদের দুঃখের একমাত্র কারণ নয়। আমাদের দুর্দশার কারণ আমাদের নীতিহীন শাসকরা। যে আল্লাহর আইনে অনাদি অনন্তকাল ধরে সৃষ্টি জগত চলে আসছে শান্তিপূর্ণভাবে সে আল্লাহর আইন লংঘন করেছে শুধুমাত্র মানুষ। আমাদের সমস্ত দুঃখ মুসীবতের কারণ এই আল্লাহর আইন থেকে সরে দাঁড়ানো। স্পেনের নিপীড়িত নির্যাতীত লাখো জনতার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য, অসহায় মানুষকে অন্যায় ও অসত্যের ছোবল থেকে বাঁচানোর জন্যই আব্বা আল্লাহর আইনের দাবী তুলেছিল শাসকের দরবারে। আমাদের শাসকরা নিজেদেরকে আল্লাহর বান্দা দাবী করে, নিজেদের মুসলমান মনে করে, অথচ আল্লাহর আইন চালু করার পরিবর্তে সেই আল্লাহর বান্দারা আব্বাকে জীবনের সকল হাসি আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে। আব্বা ও তার বন্ধুদের সেই ত্যাগ ও কোরবানী বৃথা যায়নি। তাদের ত্যাগের কারণেই আজ স্পেনে সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। আমাদের সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় তারা যেমন সীমাহীন ত্যাগ ও কোরবানীর পথ বেছে নিয়েছিলেন, আগামী প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় আমাদেরও আপোষের পরিবর্তে বেছে নিতে

হবে সে কঠিন ত্যাগের পথ। তাহলেই গতকালের চেয়ে আজকের দিনটি যেমন উত্তম, তেমনি আজকের চেয়ে আগামী কাল হবে আরো সুন্দর, আরো মনোরম।'

সাদ থামলে মুখ খুলল মায়মুনা, 'আপনি যখন আমার কাছে ছিলেন না, তখন আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুবিশাল প্রান্তরে বহু ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার যে নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী হয়ে আপনি যেদিন এলেন সেদিন আমি অনুভব করলাম, চলার পথে অন্তত একজন বন্ধু জুটল। অতীত নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই, ভবিষ্যত নিয়েও আমার কোনই শংকা নেই। আমার আকাঙ্খা খুবই ছোট, আমি যেন সর্বদা আপনার পাশে পাশে থাকতে পারি। যত বিপদ আর মুসীবতই আসুক না কেন, আমি যেন সব সংকটে আপনার হাত ধরে মোকাবেলা করতে পারি সব প্রলয় ঝঞ্ঝার।'

সাদ হাসল। বলল, 'তুমি সব সময় আমার সাথেই ছিলে মায়মুনা। আমি কখনো তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। আফ্রিকার বিজন মরুতেও তুমি আমার সাথেই ছিলে, তরবারির ঝংকার ও তীরের শন্ শন্ শব্দে আমি তোমারই কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম। জাল্লাকার যুদ্ধক্ষেত্রে যখন কারো নিজের সম্পর্কে হুশ ছিল না, সে সময়ও তুমি আমার সাথে ছিলে। তুমি সর্বদা আমার সাথে ছিলে এবং থাকবে। স্থান ও কালের দূরত্ব কখনো তোমার আমার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

সাদ ও মায়মুনা যখন এ আলাপ করছিল, আরেক কামরায় তখন আহমদ ও তাহেরা পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল বিমুগ্ধ চোখে। ওরা কথা বলছিল জাল্লাকার যুদ্ধ নিয়ে। তাহেরা প্রশ্ন করলে ছোট্ট করে জবাব দিয়েই চুপ হয়ে যাচ্ছিল আহমদ। তাহেরা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করছেন?'

আহমদ বলল, 'যখনই আমি তোমার সামনে বসি তখনই আমার মনে হয়........।'

'টলেডোয় আমাদের দেখা হওয়ার আগেও আপনার মনমগজে আমারই ছবি আঁকা ছিল।' আহমদের অসমাপ্ত কথা শেষ করল তাহেরা।

আহমদ বলল, 'ঠিক নয় তাহেরা। যতবার তোমাকে দেখি ততবার মনে হয়, আমরা কখনো পরস্পরের কাছে অপরিচিত ছিলাম না। হয়তো জন্মের আগে আমাদের রূহ পাশাপশি ছিল। আর সে জন্যই আমরা একে অপরকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। ঘটনাচক্রে সেদিন তোমার কাছে না পৌঁছতে পারলে আরো যে কতকাল এ ছবি বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো আমায়।'

তাহেরা মুচকি হেসে বলল, 'বাহ, কাব্য চর্চায় তো বেশ এগিয়ে গেছেন।'

'না তাহেরা, এটা কবিত্ব নয়, এ আমার হৃদয়ের উপলব্ধি। মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি যে সব কথা বলছো, যে সুরে বলছো, সে সব আমি আগেই শুনে ফেলেছি।'

তাহেরা দুষ্টুমী ভরা হাসি দিয়ে বলল, 'আল্লাহ আপনাকে ভালবাসা ভরা এত বড় একটা হৃদয় দিয়েছেন যে, সে কথা মনে হলেই আমার ভয় হয়। মনে হয়, হায়, এ কবি

আমাকে না পেলে কাকে না জানি এ ভালবাসা দিয়ে দেউলে হয়ে বসে থাকতো।'

আহমদ গাল ফুলিয়ে বলল, 'তাহেরা, ভাল হবে না বলছি, ঠাট্টা করো আপত্তি নেই, কিন্তু আমার ভালবাসাকে অপমান করবে না।'

তাহেরা হাত বাড়িয়ে আহমদের কপালের ওপর নেমে আসা চুলগুলো এলোমেলো করতে করতে বলল, 'রাগ করলে! ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি তো আর কবি নই, তাই একটা বলতে গেলে আরেকটা বলে ফেলি। আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, আমারো মনে হয়, আমরা যেন তারকাখচিত এক মনোরম উদ্যানে লুকোচুরি খেলছিলাম। খেলতে খেলতে একবার আমি দুনিয়ায় চলে এলাম এবং আপনার চোখকে ফাঁকি দিয়ে টলেডোয় আত্মগোপন করলাম। আপনি গ্রানাডা ও কর্ডোভায় তালাশ করে আমাকে না পেয়ে যেই একটু দম নিতে গেলেন অমনি আমার সুবাস আপনার নাকে গিয়ে লাগল। আর আপনি সেই সুবাসের উৎস খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে আমাকে পেয়ে যান। আমার হার হয়েছে, আমি আর লুকোচুরি খেলব না।'

'আমার জীবন! আমার প্রাণ!' আহমদ তাহেরার হাত নিজের ঠোঁটের কাছে টেনে নিল। 'এ পরাজয়ের জন্য তোমার আফসোস হচ্ছে? তাহলে আর লুকোচুরি খেলবো না, এমন খেলা খেলবো, যে খেলায় দুপক্ষই জিততে পারে।' হাসতে হাসতে বলল আহমদ।

তাহেরা তার কোলে মাথা রাখতে রাখতে বলল, 'প্রিয়তম! এ পরাজয়ই আমার জীবনের অহংকার, আমার সবচে বড় বিজয়।'

৭

হাসানের খালা ঈদের পর ওদের বাড়ি বেড়াতে এসে সকিনাকে বললেন, 'সকিনা, এবার হাসানের বিয়ের ব্যবস্থা কর।'

'আপা, আমিও কদিন ধরে এ কথাই ভাবছিলাম। ভাল পরিবারের একটি মেয়ের খবরও পেয়েছি। আপনি গিয়ে একদিন দেখে আসুন।'

'একদিন কেন? চলোতো আজই যাই।' বলল খালা।

'এত তাড়াহুড়োর কি আছে! আমি বরং হাসানের মতটা জেনে নিই আগে।'

'হাসানের মত? ওটা আমিই নিচ্ছি। হাসান!' খালা উচ্চস্বরে ডাকলেন, 'কোথায় গেল পাজিটা?'

'ও ওর আব্বা ও ভাইদের সাথে কাজী আবু জাফরের কাছে গেছে।'

খালা জ্বলে উঠে বললেন, 'আবার সেই বুড়ো? উফ্ বুড়োটা জ্বালিয়ে মারবে দেখছি!'

মায়মুনা হাসতে হাসতে বলল, 'কে খালাজান?'

'কে আবার, কাজী আবু জাফর।'

কিছুক্ষণ পরই আবদুল মুনীম পুত্রদের নিয়ে ফিরে এলেন। খালাজান হাসানকে ডেকে কোন ভূমিকা ছাড়াই জিজ্ঞেস করলেন, 'হাসান, এ মাসেই তোমার বিয়ে হবে। আমি সব ঠিকঠাক করছি, তুমি আবার অমত করে বসবে নাতো?'

হাসানকে চুপ থাকতে দেখে খালা বললেন, 'হুম, বুঝেছি, কথায় বলে নিরবতা সম্মতির লক্ষণ। ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি সব দেখছি। মায়মুনা! তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমি এখনই মেয়ে দেখতে যাব। সকিনা, এবার বলো মেয়েটি কোন বাড়ির।'

মায়মুনা ও তাহেরার চেহারায় খুশীর ঝিলিক খেলছিল। তাই দেখে হাসান বলল, 'খালাজান! আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে!'

খালা চেঁচিয়ে বললেন, 'কি! কি বললে তুমি?'

'খালাজান, আমি বলেছি, আমার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'কোথায়? কখন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' খালাজান হতভম্ব হয়ে গেলেন।

'বিয়ে তো করেছি সেই কবে! আপনাকে কেউ কিছু বলেনি?'

খালাজান দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, 'কি ব্যাপার সকিনা, এসব কি শুনছি?'

সকিনা, মায়মুনা ও তাহেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। তাই দেখে খালা বললেন, 'হাসান, বিয়ে করেছো ভাল কথা, কিন্তু গোপন করলে কেন? আর কাউকে না হোক অন্তত আমাকে তো বলতে পারতে! যাক, এখন বলতো মেয়েটি কে? নাম কি তার? বাড়ি কোথায়?'

হাসান বলল, 'খালাজান! ও তো অপরূপা সুন্দরী। স্পেনে এমন মেয়ে আর দ্বিতীয়টি নেই। আপনি চাইলে তাকে যখন তখন দেখাতে পারি। দাঁড়ান, আমি এখনি নিয়ে আসছি তাকে।'

হাসান তার কামরা থেকে তরবারি হাতে ফিরে এসে বলল, 'দেখুন খালাজান! এই আমার জীবন সঙ্গিনী।'

খালাজান বললেন, 'বুঝেছি, আবু জাফরের সঙ্গ দোষে পেয়েছে তোকে। আল্লাহ, বুড়োটার যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। ওকে তোমার কাছে নিয়ে যাও।'

হাসান হাসতে হাসতে চলে গেল সেখান থেকে। খালা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ডাকলেন, 'হাসান এদিকে এসো।'

হাসান ফিরে এসে বলল, 'আরো কিছু বলবেন, খালাজান?'

'বলবো না মানে, তুমি তো আমার আসল প্রশ্নেরই জবাব দাওনি।'

হাসান গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি আপনার প্রতিটি প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছি খালাজান। এখন এ নিয়ে আর কথা বলবেন না আশা করি।'

আমীর ইউসুফ মরক্কো ফিরে গেলে খণ্ডরাজ্য শাসকদের ঘাড়ে আবার চেপে বসল ক্ষমতা ও দাপটের মোহ। এতে করে স্পেনবাসীর দুঃখ ও দুর্দশা দিন দিন বাড়তে থাকল। বাইরের বিপদ থেকে রেহাই পেয়ে যারা তাদের উদ্ধার করল সেই ইসলামী শাসনের দাবীদারদের কঠোর হাতে দমন করতে উঠে পড়ে লাগল খণ্ডরাজ্যের শাসকরা। মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোতে সরকারী গোয়েন্দা লেলিয়ে দিল। শরীয়ত বিরোধী কর দিতে যারা অস্বীকার করল তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল।

এরপর শাসকরা কালো টাকা ছড়িয়ে নিজ নিজ রাজ্যে সরকারের দালাল একদল আলেম সংগ্রহ করল। এসব তথাকথিত আলেমরা শাসকদের ইঙ্গিতে ইসলামী শাসনের দাবীদার ওলামাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করতে লাগল। কিন্তু সাধারণ মানুষ আমীর ইউসুফের স্বল্পকালীন অবস্থান সময়ে শান্তি ও সুখের যে জোয়ার পেয়েছিল তার জন্য ছিল লালায়িত। তারা বিপ্লবী আলেমদের সহায়তায় এগিয়ে এল। এসব আলেমরা ক্ষমতালোভী শাসকদের অত্যাচারে নতি স্বীকার না করে আরো আপোষহীন হয়ে উঠল। যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আলেমদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে বিপ্লবী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ল। ফলে শাসকদের অত্যাচারের মাত্রা যত বাড়ছিল, তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং শক্তিও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

জাল্লাকার যুদ্ধে পরাজয়ের পর খৃষ্টানরা অনুভব করল, হাওয়ার গতি পাল্টে গেছে। মুসলমানরা যদি এখন ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হয় তাহলে স্পেনে খৃষ্টান রাজ্য টিকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হবে। কিন্তু মুসলমান শাসকদের অনৈক্য ও জনগণের সাথে তাদের বৈরী আচরণের খবর পেতে আলফানসুর দেরী হল না। এ খবরে সে হারিয়ে যাওয়া সাহস ফিরে পেল এবং দক্ষিণ পুর্ব রণাঙ্গনে সৈন্য সমাবেশ করতে শুরু করল।

হিসনুল্লায়েত তখনো আলফানসুর সেনাপতি গিলবার্ট ফিলিপের কব্জায়। এ কেল্লাটি ছিল লোরকা ও মর্সিয়ার মাঝামাঝি এক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। স্থানগত সুবিধা ও নির্মাণ কৌশলের কারণে এ কেল্লাটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। এখানকার মুষ্টিমেয় সৈন্য বিশাল বাহিনীর সাথে দীর্ঘদিন লড়াই করার সামর্থ্য রাখতো। কেল্লাটি এত প্রশস্ত ছিল যে এখানে বার তের হাজার সৈন্য একত্রে থাকতে পারতো। আলফানসু ও তার মিত্ররা নতুন ভাবে খৃষ্টান সেনাবাহিনী সংগঠন করে এ কেল্লায় পাঠিয়ে দিল।

এসব সৈন্যরা জাল্লাকার রণক্ষেত্রে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ হিসাবে কেল্লার পার্শ্ববর্তী মর্সিয়া, শাকুরা, লোরকা এবং আলমেরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক লুটতরাজ ও গণহত্যা শুরু করে দেয়। ফলে কয়েক মাসের মধ্যে এ কেল্লার আশপাশের মুসলিম জনপদ সমূহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।

জাল্লাকার যুদ্ধের ফলে খৃষ্টানদের কবল থেকে ভ্যালেন্সিয়ার মুসলমানরা দীর্ঘদিন পর মুক্তিলাভ করেছিল। কিন্তু এ সেনা সমাবেশে তারা নতুন বিপদের সম্মুখীন হল। কার্ডিজের খ্যাতনামা নাইট সিড কম্বিডোর একসময় মুসলমানদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এবং খৃষ্টানদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

জাল্লাকা যুদ্ধের পর খৃষ্টানরা ভ্যালেন্সিয়া থেকে চলে গেলে সেখানকার জনগণ ইয়াহইয়া আল কাদিরের শাসন থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করে। ইয়াহইয়া আলফানসুর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে কম্বিডোরের সাহায্য কামনা করে। কম্বিডোর লুফে নেয় এ সুযোগ। সে তার পেশাদারী ডাকাত ও দস্যুদের সহায়তায় সেখানে জেঁকে বসে। ইয়াহইয়া তাকে প্রতিদিন ছয় হাজার দিনার চাঁদা দেয়ার বিনিময়ে ভ্যালেন্সিয়ার কর্তৃত্ব লাভ করে।

হিসনুল্লায়েতের খৃষ্টান সৈন্য ও কম্বিডোরের অত্যাচারে ভ্যালেন্সিয়াসহ দক্ষিণ পূর্ব স্পেনের মুসলমানদের জীবন বিষিয়ে উঠল। মর্সিয়া, আলমেরিয়া ও অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্যের অধিবাসীরা এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শাসকদের কাছে ধর্ণা দেয়। কিন্তু তারা আলফানসুর সাথে বন্ধুত্ব করার পরামর্শ দিয়ে জনতাকে বিদায় করে দেয়।

হঠাৎ একদিন মুতামিদ সেনাবাহিনী নিয়ে সেভিল থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ পূর্ব স্পেনের দিকে যাত্রা করল। দক্ষিণ পূর্ব স্পেনের দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানরা মনে করল, আল্লাহ তাদের ফরিয়াদ শুনে মুতামিদকে সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু কর্ডোভা সীমান্ত পার হয়ে মুতামিদ যখন হিসনুল্লায়েতের পথ বাদ দিয়ে লোরকার দিকে রওনা হল তখন মুতামিদের উদ্দেশ্য বুঝতে কারো অসুবিধা হল না। মুতামিদ এর আগেও কয়েকবার মর্সিয়া ও লোরকার ওপর তার অধিকার দাবী করে সুবিধা করতে পারেনি। সে ভাবল, শাসনকর্তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ সে রাজ্যের জনগণ তাকে সানন্দে বরণ করে নেবে। কিন্তু তার এ আশা পূরণ হওয়ার আগেই পথিমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে হিসনুল্লায়েতের সৈন্যের সাথে তার সংঘর্ষ বেঁধে যায় এবং পরাজিত মুতামিদ মর্সিয়ার দিকে পালিয়ে যায়।

এদিকে খৃষ্টান সেনাদের দ্বারা বিতাড়িত মুতামিদের কাছে আত্মসমর্পন না করে মর্সিয়ার শাসক ইবনে রশীদ যুদ্ধের জন্য শহর থেকে বেরিয়ে আসে। মুতামিদ অবস্থা বেগতিক বুঝে পশ্চিমে নিজের রাজধানীতে ফিরে আসে।

মুতামিদের এ পরাজয় খৃষ্টানদের সাহস বাড়িয়ে দিল। তারা লুটতরাজ করতে করতে কর্ডোভা ও গ্রানাডার সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আমীর ইউসুফের আগমনে স্পেনের মুসলমানরা স্বস্তির যে নিঃশ্বাস ফেলেছিল দেখতে দেখতে সেখানে আবার ভর করল সীমাহীন আতংক। আতংকিত স্পেনবাসী চারদিকে ঘোর অন্ধকার দেখে আবার ফিরে তাকাল আফ্রিকার দিকে। কিন্তু আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমীর ইউসুফকে স্পেনে আসার অনুমতি দিল না।

অবশেষে টিকতে না পেরে দক্ষিণ পূর্ব স্পেনের ছোট ছোট রাজ্যের নেতৃবৃন্দ ছুটল মরক্কো। আমীর ইউসুফের কাছে কাকুতি মিনতি করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকল তার দরবারে। অগত্যা আমীর ইউসুফ আবার স্পেনে আসার ওয়াদা করতে বাধ্য হলেন। খৃষ্টানদের হাতে নতুন করে মার খেয়ে সুলতান মুতামিদের চোখও আবার খুলে গেল। স্পেনের মুসলমানদের তুলনায় নিজেকে তার আরো বেশী অসহায় মনে হলো। নিরুপায় হয়ে সেও ছুটে গেল আমীর ইউসুফের দরবারে। আমীর ইউসুফ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন। মুতামিদ ফিরে এসে উৎকণ্ঠিত জনগণকে শোনাল আমীর ইউসুফের আগমনের সুসংবাদ।

২

ইউসুফ বিন তাশফিন হিসনুল্লায়েত কেল্লা অবরোধ করলেন। কেল্লার ভেতর তের হাজার সশস্ত্র খৃষ্টান সেনা। কয়েকবার হালকা হামলা করে আমীর ইউসুফ দুশমনের শক্তি সম্পর্কে ধারণা নিলেন। তারপর একদিন খুব ভোরে কেল্লার ওপর হানলেন প্রচণ্ড আক্রমণ।

খণ্ডরাজ্য শাসকদের নিয়মিত সেনাবাহিনী ও স্পেনের মুজাহিদরা কেল্লার উত্তর ও পূব দিকে এবং রাবাতের সেনারা দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে স্থান গ্রহণ করল।

শত্রুরা কেল্লার বাইরে পাহাড়ের চারদিকেই পরিখা খনন করে রেখেছিল। রাবাত সেনাবাহিনী প্রবল বন্যার মত খৃষ্টানদের সামনে পরিখা পদদলিত করে কেল্লার প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কিন্তু স্পেনীয় সেনাবাহিনী কষ্টকর পাহাড়ী পথে অর্ধেক অগ্রসর হয়ে খৃষ্টানদের তীরের ভয়ে পেছনে হটে গেল। কিন্তু মুজাহিদরা সাহসিকতার সাথে এগিয়ে প্রতি পদে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েও শেষ পর্যন্ত তারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতে সক্ষম হল। এ সময় কেল্লার দিক থেকে ছুটে আসে ঝাঁক ঝাঁক তীর।

কেল্লার বাইরের খৃষ্টান তীরন্দাজরা খণ্ডরাজ্যের নিয়মিত সৈন্যদের পিছু হটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুজাহিদদের ওপর। মুজাহিদরা আত্মরক্ষামূলক লড়াই করতে করতে পেছনে সরে যেতে বাধ্য হল।

খানিক পর খৃষ্টান সেনাধ্যক্ষ পূর্ব ও উত্তর দিক নিরাপদ করে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রাবাতী বাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে। রাবাত সেনারা সিঁড়ি দিয়ে প্রাচীরে উঠার চেষ্টা করছে, খৃষ্টান সৈন্যরা প্রাচীরের ওপর থেকে তীর বর্ষণ ছাড়াও ফুটন্ত তেল ঢেলে দিল তাদের ওপর। যুদ্ধের এ নাজুক মুহূর্তে আমীর ইউসুফ স্পেনীয় সেনা ও মুজাহিদদের পিছু হটার খবর পান। খৃষ্টানরা সবদিক থেকে নিরাপদ হয়ে রাবাত বাহিনীর মোকাবেলায় এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে তিনি তার নিজের সৈন্যদেরকেও পিছিয়ে আসার নির্দেশ দেন।

সন্ধ্যা। খণ্ডরাজ্যের শাসকরা একের পর এক আমীর ইউসুফের কাছে এসে সাফাই পেশ করতে লাগল। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে আমীর ইউসুফের সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করল। মুতামিদ বলল, 'আমার সৈন্যরা ছিল সবার আগে। কিন্তু বাতালিউস, গ্রানাডা, আলমেরিয়া ও মর্সিয়ার সৈন্যরা পিছু হটায় আমার সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।'

বাতালিউসের সুলতান সব দোষ চাপাল আলমেরিয়া সৈন্যদের ওপর। এভাবে সব শাসনকর্তাই নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করল। আমীর ইউসুফ সবার কথা শুনে পরদিন বাদ জোহর তাদেরকে তার তাঁবুতে দেখা করতে বললেন। প্রত্যেকেই মনে করছিল, যাক, আবার তাহলে অন্যদের দোষী প্রমাণ করার একটা মওকা মিলল। কিন্তু পরদিন তারা আমীর ইউসুফের তাঁবুতে এসে পড়ল এক বিপাকে। প্রত্যেকেই মনে করেছিল আমীর ইউসুফ শুধু তাকেই দাওয়াত করেছে, কিন্তু এসে দেখল স্পেনের সব শাসনকর্তাই সেখানে উপস্থিত। ফলে পরনিন্দা ও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের সুযোগ বঞ্চিত হয়ে সবাই হতাশ হয়ে পড়ল। তাদের সেই হতাশা পেরেশানীতে পরিণত হল যখন সেখানে এসে পৌঁছল মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ। কারণ ওরা পিছিয়ে যাওয়ার পরও মুজাহিদরা অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল।

কারুকাজ করা নরম গদিতে বসতে অভ্যস্থ শাসকরা আজ বসেছিল মামুলি কাঠের চেয়ারে। তবে এ জন্য তাদের দুঃখ ছিল না, তারা উসখুস করছিল ভর মজলিশে না জানি কোন অনাহুত পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। ইউসুফ বিন তাশফিনের আগমন অপেক্ষায় তারা সকলেই অধীর হয়ে তাকিয়েছিল তাঁবুর প্রবেশ পথের দিকে।

৩.

আমীর ইউসুফ শয়ন কক্ষ থেকে মোলাকাতের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। তার চলার পথে রেশমের গালিচা বিছানো ছিল না। দরবারীদের সতর্ক করার জন্য ছিল না কোন নকীব। তবুও তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের যে তেজ, কোমলতা ও গভীরতা ছিল তার সামনে খণ্ডরাজ্যের শাসকরা ছিল বড়ই নিস্প্রভ ও ম্লান।

এই সেই লোক, যে খিজরা দ্বীপে এক বৃদ্ধার দুঃখে অভিভুত হয়ে অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলেছিলেন, 'মাগো, আমিই তোমার হারানো পুত্র।' সেই দয়াদ্র ব্যক্তিই আজ খণ্ডরাজ্যের শাসকদের সামনে হাজির হলেন ভয়ংকর বিভীষিকা হয়ে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথাবলারও সাহস হল না কারো।

আমীর ইউসুফ তাঁবুতে প্রবেশ করলে স্পেনের বাদশাহগণ ও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ তার সম্মানে উঠে দাঁড়াল। তিনি হাতের ইশারায় সবাইকে বসতে বললেন। আসন গ্রহণের পর তিনি একে একে সব বাদশাহর দিকে তাকালেন, কিন্তু কেউই তার চোখের দিকে

তাকানোর সাহস করল না। তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। শ্রোতাদের মনে হল সাগরের উত্তাল জোয়ারের গর্জন ধ্বনি শুনছে তারা।

তিনি সেভিলের সুলতানকে লক্ষ্য করে বললেন 'সুলতান মুতামিদ, বাতলিউসের সুলতানের বিরুদ্ধে আপনার যেন কি কি অভিযোগ আছে?'

মুতামিদ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, 'না না, আমরা সবাই এক মহান উদ্দেশ্যে লড়াইয়ে নেমেছি। তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।'

আমীর ইউসুফ বাতালিউসের সুলতানকে বললেন, 'আপনার কোন অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে?'

'জ্বি-না।' কোন রকমে পেরেশানী দমন করে জবাব দিল বাতালিউসের সুলতান।

আমীর ইউসুফ গ্রানাডার শাসনকর্তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমীর আবদুল্লাহ, গতকালের বিপর্যয়ের জন্য কে দোষী বলে আপনি মনে করেন?'

আমীর আবদুল্লাহ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু তার মুখ থেকে কোন কথা বের হল না। আমীর ইউসুফ অন্যান্য শাসকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা যদি কেউ কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ করতে চান তবে আমি শুনবো। আছে কারো কোন নালিশ?'

খণ্ডরাজ্যের শাসকরা একে অন্যের দিকে তাকাল। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। সবাই মাথা নত করে বসে রইল।

আমীর ইউসুফ কিছুক্ষণ নিরবে তাদের দেখলেন। তারপর বললেন, 'আপনারা সামনাসামনি একে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পান। কিন্তু আপনাদের দীলে যদি সামান্য খোদার ভয় থাকত, তাহলে আজ স্পেনের এ দুর্গতি হত না। আমি জানি, আপনাদের প্রত্যেকের অন্তর অন্যের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষে ভরা। কিন্তু লোকলজ্জা ও কপট ভদ্রতা আপনাদের সেই বিষ ঢেকে রেখেছে। আফসোস! এতটুকু লজ্জা ও ভদ্রতা যদি আপনারা আল্লাহকে দেখাতে পারতেন!

আপনারা যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিলেন, তখন সেখানে কি ঘটেছিল আমি দেখিনি, কিন্তু আল্লাহতায়ালা সব কিছুই দেখেছেন। আল্লাহর কাছে আপনারা নিরপরাধ হলে আমার কাছে এসে সাফাই গাওয়ার দরকার হতো না আপনাদের। আপনারা সকলেই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করেছেন। আপনাদের কথাগুলো এক করলে মানে দাঁড়ায় আপনারা সকলেই এ জন্য দায়ী। গতকাল আপনারা যা বলেছেন আর আজ যা বললেন তাতে আপনাদের মিথ্যাচার আরেকবার প্রমাণিত হল। আপনারা প্রত্যেকেই অন্যকে দায়ী করে নিজেকে নির্দোষ বলেছেন, কিন্তু এখন আপনাদের সবার চেহারায় খেলা করছে সীমাহীন অপরাধবোধ। আমি আপনাদের কোনটাকে সত্য বলে ধরবো, গতকালের আপনার কথা, নাকি আজকের আপনাদের চেহারার লেখা?'

খণ্ডরাজ্য শাসকরা সবাই মাথা নত করে নিশ্চুপ বসে ছিল। আমীর ইউসুফ কথা বন্ধ

করার পরও কেউ মুখ তুলল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর আমীর ইউসুফ মুজাহিদ বাহিনীর সালারকে ডেকে বললেন, 'আবদুল মুনীম, আপনি তো রণক্ষেত্রে ওদের সাথে ছিলেন। আর এই সম্মানিত সুলতানদের আপনি অনেক আগে থেকেই জানেন, চেনেন। এদের মধ্যে কে দোষী আর কে নির্দোষ তা কি আপনি আমাকে বলে দিতে পারেন?'

আবদুল মুনীম দাঁড়িয়ে বললেন, 'মোহতারাম আমীর, আক্রমণের সময় আমাদের দৃষ্টি ছিল পাহাড়ের চূড়ার দিকে। সে চূড়ায় পৌঁছার আগ পর্যন্ত পেছনে ফিরে দেখার অবকাশ আমাদের ছিল না। আমাদের মুজাহিদরা তীর বৃষ্টির মধ্য দিয়ে যখন চূড়ায় পৌঁছল তখন আমরা ফিরে তাকালাম আমাদের বন্ধুরা কোথায় কতদূর এগিয়েছে দেখার জন্য। আফসোস! এসব সম্মানিত ব্যক্তিরা তখন কে কার আগে পালাবে তার প্রতিযোগিতা করছিল। ওরা পালিয়ে যাওয়ায় খৃষ্টানদের সাহস বেড়ে গেল এবং ময়দানের ওদিক নিরাপদ দেখে বিপুল উদ্যমে আমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ার সুযোগ পেল। ওরা যদি কেবলমাত্র ময়দানে দাঁড়িয়েও থাকতো তাহলে স্পেনের জানবাজ মুজাহিদদের মোকাবেলা করে দুশমন বেশীক্ষণ ময়দানে টিকে থাকতে পারতো না।'

আমীর ইউসুফ বললেন, 'ওরা যখন পালাচ্ছিল তখন নিশ্চয় দুশমন ওদের পেছনে ধাওয়া করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল?'

'জি না, ওরা যে আর ময়দানে দাঁড়াবে না, দুশমন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ওদের পিছু না নিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হয়।'

মুতামিদ বলল, 'উনি ঠিক বলেননি, দুশমনের প্রচণ্ড হামলার মুখে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই।'

গ্রানাডার সুলতান বলল, 'আমার সেনাদল গ্রানাডার মুজাহিদদের ডান পাশে ছিল। আমরা খৃষ্টান তীরন্দাজদের ওপর হামলা করেছিলাম বলেই আবদুল মুনীম চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবার সুযোগ পায়।'

মুতামিদ বলল, 'অন্যান্য রাজ্যের সৈন্যরা পালিয়ে গেলে আমার বাহিনী নিরুপায় হয়েই সকলের শেষে ময়দান ত্যাগ করেছে। হাসান ইবনে আবদুল মুনীম আমাদের পাশে থেকে মুজাহিদ বাহিনী পরিচালনা করছিল। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

আহত হাসানের হাতে পট্টি বাঁধা। বসে ছিল এক কোণে। বলল, 'আমি সাক্ষী দিচ্ছি, আলমেরিয়ার মুজাহিদরা বীরের মত লড়াই করেছে। তবে সুলতান মুতামিদ অন্যের দেখাদেখি পিছু না হটলে আমরা এতবেশী ক্ষতির সম্মুখীন হতাম না। আমি ভেবেছিলাম, আলমেরিয়ার মুজাহিদদের দৃঢ়তা দেখে ওরা আবার ফিরে আসবে। আমি আমীর মুতামিদের নিয়তের ওপর হামলা করছি না, তবে এ কথা বলতে পারছি না যে, তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল।'

হাসানের কথা শুনে বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যের সাত আটজন শাসনকর্তা এক সাথে দাঁড়িয়ে গেল। আমীর ইউসুফ হাত ইশারায় তাদের বসতে বলে বললেন, 'এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ির দরকার নেই। আমি জানি, তরবারির চেয়ে আপনাদের মুখের ধার অনেক বেশী। জাল্লাকার বিজয়ের পর আমার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতেই আমি বুঝেছি, স্পেনের অযোগ্য শাসকদের হাতেই আমি আমার মুসলমান ভাইদের ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু আপনারা আজ প্রমাণ করলেন, আপনারা শুধু অযোগ্যই নন, কুচক্রী এবং কাপুরুষও।'

মুতামিদ মিনমিন করে এর প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল। আমীর ইউসুফ তার জবাবে বললেন, 'আমি জানি, তোমাদের কান এ ধরণের তিক্ত কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়। নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয়েও তোমরা উৎকৃষ্ট নাম পছন্দ কর। তোমরা অযোগ্য না হলে দুশমনরা স্পেন জয়ের কল্পনাও করতে পারত না। কুচক্রী না হলে ইসলামের শ্বাশ্বত পথ ছেড়ে কখনো গোমরাহীর অন্ধ গলিতে পা বাড়াতে না।

তোমাদের জানা থাকা উচিত, ইসলামের ছায়াতলে দাঁড়ালেই কেবল কুফরীর তুফান থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। জাল্লাকার বিজয়ের পর তোমরা ইসলামের পথে ফিরে আসবে এবং ইসলাম বিরোধী সকল আইন কানুন বাতিল করবে বলে আমার কাছে ওয়াদা দিয়েছিলে। কিন্তু তোমরা কি করেছ? যারা ইসলামী আইনের দাবী তুলেছে তাদের কঠোর হাতে দমন করেছো, শরীয়ত বিরোধী কর বসিয়েছো জনতার ওপর, যারা সে কর দিতে অস্বীকার করেছে তাদের সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছ। তোমাদের এ দুষ্কর্মের ফল আজ ভোগ করছো তোমরা।

জাল্লাকার রণক্ষেত্রে খৃষ্টানদের চরম বিপর্যয় দেখে তোমরা ভাবতেও পারনি, আলফানসু আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস করবে। কিন্তু সে তোমাদের মত অথর্ব নয় বলে আজ হিসনুল্লায়েতে তোমরা তার নতুন এক বাহিনীর মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়েছ।

অন্য দিকে জাল্লাকার রণক্ষেত্রে তোমাদের সৈন্যরা যে বীরত্ব ও উদ্দীপনা নিয়ে লড়াই করেছিল, তোমাদের শয়তানীর খপ্পরে পড়ে তারা সে উদ্যম হারিয়ে ফেলেছে। সেদিন স্পেনের মুসলমানরা তোমাদের সমর্থন করেছিল, কারণ তারা তোমাদেরকে ইসলামের স্বপক্ষ শক্তি মনে করেছিল। আজ জনসাধারণ তোমাদের বিপক্ষে শ্লোগান দেয়, কারণ তারা ইসলামের সাথে দুশমনীর ব্যাপারে আলফানসু ও তোমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পায় না।

জাল্লাকার প্রান্তরে স্পেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে আট হাজার মুজাহিদ সমবেত হয়েছিল। আজ তাদের সংখ্যা কমতে কমতে আড়াই হাজারে ঠেকেছে। কারণ, তারা তোমাদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল জিহাদের প্রেরণা নিয়ে। কিন্তু সেই প্রেরণা তোমরা নিঃশেষ করেছ নিজের হাতে। তোমাদের আচরণ, তোমাদের কাজ দেখে তারা নিশ্চিত হয়েছে হিসনুল্লায়েতে তোমরা বিজয়ী হলেও তার সুফল তোমাদের মর্মর প্রাসাদেই সীমাবদ্ধ থাকবে, কিন্তু নিরন্ন জনতার কুটিরে তার কোন ছোঁয়া লাগবে না।

তোমরা যে গাছের ফল খাও নিজের হাতে সে গাছের শিকড় কাটো। যে মহলে বাস করো, সেই ঘরে আগুন লাগাও নিজের হাতে। তোমাদেরকে আহম্মক ও কুচক্রী ছাড়া আমি আর কি বলতে পারি?

তোমরা কাপুরুষ না হলে আজ শহীদের রক্তে রঞ্জিত হিসনুল্লায়েত থাকতো মুক্ত স্বাধীন। যদি জানতাম, তলোয়ারের সামনে বুক পেতে না দিয়ে পিঠ দেখাবে, তাহলে আমার বাহিনী দিয়েই কেল্লার চারদিক ঘেরাও করতাম। হিসনুল্লায়েত জয় করার জন্য একদল ভীরু ও কাপুরুষকে সঙ্গে নিতাম না।

যারা যুদ্ধের মাঠে পিঠ দেখায় তাদের সাথে মৈত্রীর বন্ধন রাখার কোন যৌক্তিকতা দেখি না আমি। আমার দরকার হাসিমুখে দুশমনের তীরের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কিছু মুজাহিদের। ইনশাআল্লাহ, হিসনুল্লায়েত আমি জয় করবো। আল্লাহর রাস্তায় আমি যে পা বাড়িয়ে দিয়েছি তা কখনো পেছনে টেনে নেবো না। আমি তোমাদের সামনে ওয়াজ করতে আসিনি, লড়াই করতে এসেছি। তোমরা যদি আলফানসুকে আল্লাহর চেয়ে বেশী ভয় কর তাহলে আমার সাথে আসার দরকার নেই। ময়দানে যারা পিঠ দেখায় তাদের আমি সহ্য করতে পারি না। ইচ্ছে করলে তোমরা ময়দান ছেড়ে যেতে পারো, আমি তাতে বাঁধা দেবো না। কিন্তু ময়দানে গিয়ে আমার শত্রুতা কেনা তোমাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

আমীর ইউসুফ থামলে বাতলিউশের শাসনকর্তা দাঁড়িয়ে বললেন, 'অনুতপ্ত অপরাধীকে যদি আপনি ক্ষমার যোগ্য মনে করেন তাহলে আমি আপনার পতাকাতলে দাঁড়িয়ে লড়াই করার জন্য নিজেকে পেশ করছি। আর যদি শাস্তি দিতে চান তাও আমি মাথা পেতে নেবো এই আশায় যে, হয়তো এতে আমার পাপ কিছুটা হলেও স্খালন হবে।'

মুতামিদ দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আমার সব অপরাধ স্বীকার করছি এবং আল্লাহকে স্বাক্ষী রেখে ওয়াদা করছি, ভবিষ্যতে আপনি আমাকে কুচক্রী ও কাপুরুষ বলার কোন সুযোগ পাবেন না।'

অন্যান্য শাসনকর্তারাও নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে আমীর ইউসুফের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলো। আমীর ইউসুফ কিছুক্ষণ নিরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'নতুন করে শপথ গ্রহণের আগে আমি তোমাদের ভাল ভাবে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ দিতে চাই। কারণ তোমাদের ওয়াদার পরীক্ষা দেয়ার জন্য তোমরা বেশী সময় পাবে না। আমি কাপুরুষ ও অথর্বদের ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু বেঈমান ও ওয়াদা বরখেলাপকারীদের জন্য আমার অন্তরে কোন দয়ামায়া নেই। তাড়াহুড়োর দরকার নেই, আজ ও আগামী কাল সারাদিন চিন্তা করো। কাল এশার নামাজের পর আবার আমরা এখানে মিলিত হবো। যারা আগুন নিয়ে খেলতে এবং রক্ত সাগরে গোসল করতে ইচ্ছুক তাদেরকে আমি আগাম মোবারকবাদ দিচ্ছি, আর যাদের কাছে জীবন খুব মূল্যবান কষ্ট করে তাদের সে বৈঠকে আসার দরকার নেই।'

শেষ হলো বৈঠক। স্পেনের শাসনকর্তারা তাঁবু থেকে বের হওয়ার পথে দেখল কাজী আবু জাফর ও কাজী আবুল ওয়ালীদ মরক্কোর আলেমের সাথে তাঁবুর বাইরে বসে আলাপ করছেন। মালাকার শাসক মুতামিদের কানে কানে বলল, 'আজ আমীর ইউসুফের মুখ দিয়ে কাজী আবু জাফর কথা বলছিল।'

মুতামিদ গ্রানাডার শাসনকর্তাকে বলল, 'আমি শুনেছি কাজী আবু জাফর এক সপ্তাহ ধরে এখানে আছে। যদি আপনি এ লোকটিকে দুরস্ত করতে পারতেন, তাহলে ভরা মজলিশে আজ এভাবে আমাদের নাক-কান কাটা যেতো না।'

'আবু জাফর সম্পর্কে এমন অভিযোগ করার সুযোগ আর কোনদিন কেউ পাবে না। আমি শুধু তার গ্রানাডা ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা করছি।'

মালাকার শাসনকর্তা বলল, 'আস্তে কথা বলুন। মুতামিদের কান কিন্তু খুবই প্রখর।'

মুতামিদ ও আবদুল্লাহ পেছন ফিরে তাকাল এবং মুতামিদকে ইবনে রশীদের সাথে আলাপ করতে দেখে আশ্বস্ত হল।

৪.

হিসনুল্লায়েতের উত্তর-পশ্চিম দিকে নদী তীরে একটি ছোট কেল্লা। সাদ তিন মাস যাবত এ কেল্লার দায়িত্বে। আমীর ইউসুফ সাদকে একহাজার সৈন্য দিলেন। আড়াইশ সৈন্য কেল্লা পাহারা দিত আর বাকীরা দুশমনের রসদ সরবরাহের পথ পাহারা দিত। এ জন্য নদী তীরে অনেক দূর পর্যন্ত ছোট ছোট ফাঁড়ি স্থাপন করা হল।

হিসনুল্লায়েতের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এই কেল্লায় বদলী হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর সাদ মায়মুনাকেও নিজের কাছে নিয়ে এল। মায়মুনার জন্য এটা খুবই আনন্দের বিষয় ছিল। একদিকে বিপদের আশংকা, অন্যদিকে কেল্লার এক কোণের অপরিসর এক ঘর, তারপরও তার কাছে মনে হয় সে বেহেশতে আছে।

এক রাতে মায়মুনা নিজের ঘরে বসে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে। বিকেলে কেল্লা থেকে বেরিয়েছিল সাদ। খবর পেয়েছিল, কেল্লা থেকে কয়েক মাইল দূরে শত্রুদের কয়েকটি দলকে নদীর অপর তীরে বিচরণ করতে দেখা গেছে। সাদ সাথে সাথেই একশ সৈন্য নিয়ে সেখানে রওয়ানা হয়ে যায়।

মাঝ রাত পেরিয়ে গেল। সাদ ফিরে না আসায় মায়মুনা দুশ্চিন্তায় অস্থির। হঠাৎ কেল্লার বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ হল। মায়মুনার বুক দুরু দুরু করতে শুরু করল। মায়মুনা চোখ বন্ধ করে বলতে থাকল, 'এখন তিনি কেল্লায় প্রবেশ করছেন। এখন ঘোড়া থেকে নামছেন। এখন সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন। এই তিনি সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন.... এক, দুই, তিন, চার, ... কাঠের সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হল। মায়মুনা গোণা বন্ধ

করে উৎকর্ণ হল। আওয়াজ বারান্দা পেরিয়ে দরজায় এসে থামল। তারপর সে শুনতে পেল, 'মায়মুনা।'

মায়মুনা চোখ না খুলেই সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সাদ কামরায় ঢুকে বলল, 'আমি এসে গেছি মায়মুনা, চোখ খোল।'

মায়মুনা চোখ খুলে স্বামীর বুকে ঝাপিয়ে পড়ল। সাদ ওর কোমল চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলল, 'এত রাত পর্যন্ত এভাবে আমার জন্য বসে থেকো না। এখন বেশীর ভাগ দিনই আমাকে কেল্লার বাইরে যেতে হবে। এলাকার অবস্থা ভাল নয়, ভাবছি, তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবো।'

'ভবিষ্যতের ভয় দেখানোর দরকার নেই। আজকের ঘটনাবলী বলুন।'

'খবর সত্য। দুশমন বাহিনী খচ্চরের পিঠে করে রসদ নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তাদের নিশ্চিন্তে নদী পার হওয়ার সুযোগ দিলাম। তারপর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যাওয়ার সময় হঠাৎ আমরা আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের ঘিরে ফেলি। পঞ্চাশজন শত্রুসৈন্য নিহত হয়েছে, পালিয়ে গেছে কয়েকজন। তাদের সব রসদপত্র এবং দুশো খচ্চর আমাদের দখলে এসেছে।'

মায়মুনা বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ। আপনি বসুন, আমি খাবার নিয়ে আসছি।'

সাদ পাশের কামরায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে চেয়ারে বসে গেল। মায়মুনা খাবার নিয়ে এসে বলল, 'আপনি বর্ম খুলবেন না?'

'না, আমাকে এখনি আবার বের হতে হবে।'

মায়মুনা আর কোন কথা না বলে স্বামীকে নিয়ে খেতে বসল। খাওয়া শেষ হলে সাদ বলল, 'মায়মুনা, আমি যাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ পরশু ফিরে আসব।'

'আপনি কি খুব দূরে যাচ্ছেন?'

'আমি আমীর ইউসুফের কাছে যাচ্ছি। কিছু বিষয় আছে যা নিয়ে তার সাথে আমার ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলা দরকার।'

'কিন্তু ওয়াদা করুন, আব্বাজানের সাথে আমাকে বাড়ি পাঠানোর চেষ্টা করবেন না?'

'আমি ওয়াদা করছি, অবস্থার চরম অবনতি না ঘটলে তোমাকে বাড়ি পাঠাব না।'

মায়মুনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাদ রাতের আঁধারে ঘোড়ায় চেপে বসল।

৫.

আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের তাঁবু। সাদ বিন আবদুল মুনীম দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রশস্ত টেবিলের পাশে। টেবিলে একটি নক্সা বিছানো। সিয়ার বিন আবু বকর ও অন্য একজন উপজাতীয় সেনাপতি সাদের ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে।

সাদ নক্সার একস্থানে আঙ্গুল রেখে বলল, 'কেল্লার পশ্চিমে এটিই আমাদের শেষ ফাঁড়ি। এ ফাঁড়ির ওদিকে কর্ডোভার সীমানা পর্যন্ত এলাকার দায়িত্ব সেভিল সেনাদের। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমি ঐ এলাকায় কয়েকজন গোয়েন্দা নিয়োগ করে রেখেছি। সেভিল সৈন্যদের অবহেলার কারণে দুশমনের কোন সেনাদল ঐ এলাকার ওপর দিয়ে গেলে আমি জানতে পারব এবং সময় মত আপনাকে খবরও দিতে পারব। পাঁচ দিন আগে আমি খবর পাই, দুশমনের তিনশ অশ্বারোহী ঐ এলাকা দিয়ে কোথাও গেছে। পরের দিনই খবর পাই, শত্রুদের আরো কয়েকটি ছোট ছোট সেনাদল পুব দিকে আমাদের সর্বশেষ ফাঁড়ি থেকে মাত্র দশ মাইল দূর দিয়ে নদী অতিক্রম করেছে।

একটি এলাকায় মর্সিয়া ও অন্য এলাকায় আলমেরিয়া সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছিল। দুদিক থেকেই শত্রু সৈন্য বিনা বাঁধায় এগিয়ে যেতে পারা আমার কাছে খুবই আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে। হতে পারে গাফলতির দরুণ এসব ফাঁড়ির প্রহরীরা শত্রু সৈন্যের চলাচল টের পায়নি। কিন্তু এ সম্ভাবনা বাঞ্ছিত নয় এবং পর পর দুদিন দুই এলাকায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রায় অসম্ভব। এবং যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়, শত্রু সৈন্যদের দেখেশুনেই তারা বিনা বাঁধায় যেতে দিয়েছে এবং শত্রুদেরকে তারা নিজেদের জন্য বিপদ মনে করেনি। এর অর্থ হচ্ছে, গোপনে দুশমনদের সাথে তাদের আঁতাত হয়েছে।'

সিয়ার বিন আবু বকর বললেন, 'তোমার খবর সত্যি হলে এটাও সত্যি যে, নদী অতিক্রমকারী এসব সৈন্যদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে হিসনুল্লায়েত। এমন একটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই আমি খণ্ডরাজ্য শাসকদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তারা যেন উত্তর দিক থেকে কেল্লা পর্যন্ত পৌছার সকল পথ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এ পর্যন্ত দুশমনের নতুন কোন সেনাদল কেল্লায় পৌছেছে এমন খবর পাইনি।'

'আপনি খবর না পাওয়ার কারণ হচ্ছে, খণ্ডরাজ্যের সৈন্যরা নির্বিঘ্নে দুশমনকে কেল্লায় ঢুকতে সহায়তা করেছে। কারণ, আমার গোয়েন্দারা আমাকে কোন মিথ্যে খবর দেয়নি।'

আমীর ইউসুফ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আরো কিছু বলবে, না তোমার কথা শেষ হয়েছে?'

'জি না, আমার আর কোন বক্তব্য নেই।'

'তাহলে তুমি জলদি ফিরে যাও। তোমাকে আরো পাঁচশ সৈন্য দিচ্ছি। এরা মর্সিয়া, আলমেরিয়া ও সেভিলের সেনাদের সাথে মিলেমিশে দূর এলাকার ফাঁড়িগুলো পাহারা দেবে। তাছাড়া আশপাশের পাহাড়ে শত্রুসৈন্য লুকিয়ে আছে কিনা তাও তারা খুঁজে দেখবে। অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় খণ্ডরাজ্য শাসকদের মাথায় আবার শয়তান ভর করেছে কি না আল্লাহ মালুম। তারা কিছুটা শিথিল হয়ে গেছে ঠিক, তবে একেবারে দুশমনের সাথে আঁতাতের মত দুঃসাহস করেছে বলে বিশ্বাস করতে পারছি না।

তুমি নিজের জায়গায় খুবই সতর্ক থাকবে। অচিরেই আমি শত্রুদের ওপর চূড়ান্ত

আঘাত হানব। দুদিন আগেই তোমাকে খবর দেবো। আক্রমণের দিন প্রত্যেক সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে সেনাদের এখানে পাঠিয়ে দেবে। তবে তুমি ওখানেই থাকবে। কারণ ঐ কেল্লাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার প্রতিরক্ষার জন্য তোমার চাইতে নির্ভরযোগ্য আর কেউ নেই আমার কাছে। এখন আর এখানে দেরী করো না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো।'

৬.

ভোর। এক উপজাতীয় সালার আমীর ইউসুফের তাঁবুতে ঢুকে বললেন, 'হে আমীর, কাজী আবু জাফর আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।'

'তিনি কখন এলেন?'

'এখনই।'

'নিয়ে এসো তাকে।'

সালার বেরিয়ে যেতেই কাজী আবু জাফর তাঁবুতে ঢুকলেন। আমীর ইউসুফ মুছাফাহা করতে করতে বললেন, 'আপনি এ কয়দিন কোথায় ছিলেন?'

কাজী আবু জাফর মৃদু হেসে বললেন, 'আজরাইলের ঘরে।'

ইউসুফ বিন তাশফিন অবাক হয়ে বললেন, 'মানে!'

'গ্রানাডা পৌছেই আমি গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিলাম।'

'আপনি গ্রেফতার হয়েছিলেন! বলেন কি? কিন্তু আমি তো এর কিছুই জানতে পারিনি। আবদুল মুনীমও আমাকে কিছুই বলেনি নি।'

কাজী আবু জাফর বললেন, 'আবদুল মুনীম নিজেই তো সারাটা জীবন কারাগারে কাটাল। অথচ পরিবারের লোকজন তিনি কোথায় আছেন জানা তো দূরের কথা, তিনি যে বেঁচে আছেন তাই জানতো না। এখানে কয়েদীদের খবর যেন বাইরে যেতে না পারে সে জন্য সরকার খুবই হুশিয়ার থাকে। আমি কর্ডোভার এক ওলামা সম্মেলন থেকে গ্রানাডা পৌছি। ইচ্ছে ছিল দুদিন থাকবো। কিন্তু এশার নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বাড়ি যাওয়ার পথেই গ্রেফতার হয়ে যাই।'

'নিশ্চয় আবদুল্লাহর হুকুমেই আপনাকে বন্দী করা হয়?'

'জ্বি, তিনি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। তার মায়ের হস্তক্ষেপে আমি এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।'

'আপনি কতদিন বন্দী ছিলেন?'

'প্রায় দেড় মাস।'

'বাকী সময় আপনি কোথায় ছিলেন? আপনি তো দুমাসেরও অধিক সময় ধরে নিখোঁজ।'

'আমি সেভিল, কর্ডোভা, বাতলিউস, গ্রানাডা এবং আরো কিছু শহর ঘুরে এসেছি।

সে সব শহরের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সাথে কথা বলেছি। তারা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, বর্তমান অবস্থায় স্পেনকে খণ্ডরাজ্য শাসকদের কবল থেকে উদ্ধার করা ফরজ।'

কাজী আবু জাফর পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে আমীর ইউসুফের হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখুন, এখানে বিশিষ্ট আলেমের ফতোয়া রয়েছে। এরা সবাই স্পেনের মশহুর আলেম। দ্বীনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পরহেজগারী ও তাকওয়ার জন্য এরা স্পেনের সমস্ত আলেমদের শ্রদ্ধাভাজন। স্পেনের অন্যান্য খ্যাতনামা আলেমদের ফতোয়াও দু'একদিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনি। এ ছাড়া মিশর, সিরিয়া ও আরবের মুফতিদের ফতোয়া আনার জন্যও লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। মরক্কোর ওলামায়ে কেরামও আমাদের এ ফতোয়া সমর্থন করছেন।'

কাগজটি ফিরিয়ে দিয়ে আমীর ইউসুফ বললেন, 'আপনি অযথা এত কষ্ট করেছেন। আমি আপনাকে আগেও বলেছি, রাজ্য জয়ের ইচ্ছায় আমি স্পেন আসিনি। আমার মাকসাদ, স্পেনকে খৃষ্টানদের কবল থেকে মুক্ত করা। আমার এ ইচ্ছা পূরণ হলেই আমি দেশে ফিরে যাবো। আমি স্বীকার করি, খণ্ডরাজ্য শাসকরা বদ এবং অযোগ্য। হাজারো দোষ রয়েছে তাদের চরিত্রে। কিন্তু তাই বলে আমি আপনাদের ফতোয়ার সাহায্য নিয়ে নিজের ওয়াদা লংঘন করতে পারি না। হিসনুল্লায়েতে কুফরী শক্তিকে নির্মূল করতে পারলে স্পেনে আমার আরাধ্য কাজ শেষ হবে। এরপর খণ্ডরাজ্য শাসকদের সংশোধন করা, সংশোধিত না হলে ক্ষমতাচ্যুত করা আপনাদের কাজ, আমার নয়।'

কাজী আবু জাফর বললেন, 'আপনাকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কোন অজুহাত তৈরীর উদ্দেশ্যে এ ফতোয়া জারী করা হয়নি, আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা ঈর্ষার কারণেও আমরা এ ফতোয়া দেইনি। এসব শাসকরা ইসলাম থেকে এতটাই দূরে সরে গেছে যে, এদের বরদাশত করলে আমাদের ঈমান আর অক্ষত থাকে না। তারা সংবিধান থেকে ইসলাম বিরোধী আইন কানুন বাতিল করতে রাজী নয়। ভোগ বিলাসে তারা এতটাই মত্ত হয়ে গেছে যে, তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় বলে কোন কিছু অবশিষ্ট নেই। সম্পদের মোহ তাদের বেপরোয়া করে তুলেছে। এই সম্পদের জন্য তারা জনগণের ওপর এমন সব কর ধার্য করছে যা ইসলাম অনুমোদন করে না। তারা শরিয়তের বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা করছে না। নৈতিকতার বিচারে ওরা মানুষ নামের অযোগ্য। দুশমনের তরবারি মাথার ওপর এলে তারা ইসলাম বিপন্নের জিগির তোলে, সে তরবারি একটু দূরে সরলেই ইসলামের কথা আর তাদের মনে থাকে না। যে ইসলাম তাদেরকে জাল্লাকার প্রান্তরে অনিবার্য ধ্বংস ও বরবাদির হাত থেকে বাঁচালো, বিজয়ের পর সে ইসলামই হয়ে দাঁড়াল তাদের শত্রু। স্পেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেসব মুজাহিদ ছুটে এসে রক্ষা করেছিল তাদের, বিজয়ের পর তাদেরকেই ধরে ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করল এইসব দুরাচাররা। যারাই ইসলামী শাসনের দাবী তুলল তাদের জন্য খুলে দিল কারাগারের দরজা। এক

মহান আদর্শের জন্য জাল্লাকার প্রান্তরে রক্ত দিয়েছিল ইসলামের সেবকরা, কিন্তু এ শাসকেরা জাল্লাকার সেইসব বীর শহীদদের কবরের ওপর বসে বাঈজী নাচাচ্ছে আর শরাব পান করছে।

হিসনুল্লায়েতে নতুন বিপদ দেখা দেয়ায় তারা আপনার শরনাপন্ন হয়েছে। কিন্তু তারা তাদের অতীত অপরাধের জন্য মোটেই অনুতপ্ত হয়নি। যদি জনগণ বাধ্য না করতো তবে এতটুকুও তারা করতো না। আপনার হয়তো জানা নেই, সুলতানরা আপনাকে আমন্ত্রণ না করলে স্পেনের বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে জন প্রতিনিধিরা আপনার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। সুলতানরা জানতো, আপনি জনগণের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবেন না। আর জনতার ডাকে আপনি স্পেনে এলে শাসনকর্তাদের জন্য তা বিপদের কারণ হবে মনে করেই তারা মুতামিদকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিল। আপনি এটাও জানেন, এ শাসকদের কারণেই হিসনুল্লায়েতের গত অভিযান আমাদের সফল হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সকল অভিযোগ যদি মিথ্যাও প্রমাণিত হয়, তবু যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যে বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করেছে তার শাস্তি থেকে তাদের আপনি রেহাই দিতে পারেন না।'

আমীর ইউসুফ বললেন, 'সে দিনের দুঃখজনক ঘটনার জন্য আমি তাদের সাথে খুবই কঠোর ব্যবহার করেছি। তারা ক্ষমা চেয়ে ওয়াদা করেছে, ভবিষ্যতে এ ধরণের কিছু করবে না। আমি ইচ্ছা করেই অবরোধ দীর্ঘায়িত করেছি। তবে শীঘ্রই আবার আক্রমণ চালাবো। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এবার যদি ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাদের ভাগ্যে আর ক্ষমা জুটবে না। কিন্তু আপনি আমাকে দিয়ে স্পেন জয়ের স্বপ্ন দেখবেন না।'

'শুনেছি, সেভিল ও গ্রানাডার সুলতান চলে গেছে। আমার বিশ্বাস, অন্যান্য শাসকরাও তাদেরই অনুসরণ করবে। আল্লাহ যদি আমাদের মুক্তির ফয়সালা করে থাকেন, তাহলে আপনার এ মনোভাব পাল্টাবার পরিবেশও তিনিই সৃষ্টি করে দেবেন।'

'তারা আমার অনুমতি নিয়েই গেছে। তাদের সেনাবাহিনীও এখানেই রয়েছে। তাই তাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা ঠিক হবে না।'

'আমীর, ভুল আমরাই করেছি। বছরের পর বছর ধরে খণ্ডরাজ্য শাসকদের সম্পর্কে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের হৃদয়ে গাথা ছিল, তাদের একদিনের মিষ্টি কথায় আমরা তা ভুলে গিয়েছিলাম। নইলে, আপনি যখন দুশমনকে পরাজিত করে স্পেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন তখনই আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। থাক, আপনি অবশ্যই এসব সুলতানদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। আমি এখন বিদায় যাচ্ছি, তবে এ বিশ্বাস নিয়েই যাচ্ছি, আবার যখন আমাদের দেখা হবে তখন স্পেনের ভবিষ্যত নিয়ে আমাদের মধ্যে চিন্তার কোন অমিল থাকবে না।'

আমীর ইউসুফ দাঁড়িয়ে কাজী আবু জাফরের সাথে মুছাফাহা করতে করতে

বললেন, 'আপনি এই দোয়া কেন করছেন না, আবার যখন আমরা মিলিত হবো, তার আগেই খণ্ডরাজ্য শাসকরা হেদায়াতের পথে এসে যাবে?'

কাজী আবু জাফর বললেন, 'বুড়ো হয়েছি তো, আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখার সাহস কম তাই।'

বেঈমানী ও বিজয়

আমীর ইউসুফের হুকুম পেয়ে সাদ ইবনে আবদুল [illegible] হিসনুল্লায়েতে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য এক হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দিল। বাকী পাঁচশ সৈন্যের চল্লিশজনকে কেল্লার পাহারায় রেখে অবশিষ্টদের নদী তীরের ফাঁড়ি গুলোতে মোতায়েন করে দিল।

মাত্র পাঁচশ সৈন্যের পক্ষে বিশাল এলাকায় নজর রাখা কঠিন দেখে সাদ স্থানীয় লোকদের সংগঠিত করে তাদেরকে দূর দূরান্তের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিল। একদিন সাদ কেল্লার কয়েক মাইল পূবে কয়েকটি গ্রামের রাখাল ও কৃষকদের সজাগ থাকার জন্য সতর্ক করে মধ্যরাতে কেল্লায় ফিরে এল।

মায়মুনা বসে ছিল তার অপেক্ষায়। সারা দিনের ক্লান্তির দরুণ খাওয়ার পর পরই সাদ ঘুমিয়ে পড়ল। ঘন্টাখানেক পর মায়মুনা তাকে গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে বলল, 'আলমাস আপনাকে ডাকছে।'

সাদ তড়াক করে লাফিয়ে নামল বিছানা থেকে এবং চোখ ডলতে ডলতে আলমাসের কাছে গিয়ে বলল, 'কি খবর চাচা?'

'নায়েবে সালারের পীড়াপীড়িতে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে হলো তোমাকে। গ্রামের মুজাহিদরা দুই লোককে ধরে এনেছে। এরা নদী পেরিয়ে হিসনুল্লায়েতের দিকে যাচ্ছিল। গ্রামবাসীরা তাদের আটক করলে তারা আমীর ইউসুফের কাছে ভ্যালেন্সিয়ার খবর নিয়ে যাচ্ছে বলে জানায়।

পাহারাদাররা বলল, 'রাতে নদী পার হওয়ার অনুমতি নেই। তোমাদেরকে সরদারের কাছে যেতে হবে।' আগন্তুকরা জবাব দেয়, 'আমরা তো রাত কাটানোর জায়গা খুঁজছিলাম। ভালই হলো, চলো।'

প্রহরীরা তাদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে গ্রামের দিকে রওনা হয়। আগন্তুকরা ছিল এগার জন। প্রহরীরা ওদের মুসলমান মনে করে ওদেরকে ঘোড়া থেকে নামায়নি, হাতিয়ারও কেড়ে নেয়নি। আগন্তুকরা ভ্যালেন্সিয়ার অধিবাসীদের ওপর কম্বিডোরের অত্যাচারের কাহিনী বলতে শুরু করলে প্রহরীরা ওদেরকে সন্দেহভাজন না ভেবে আরো অসতর্ক হয়ে

পড়ে। এই অসতর্কতার সুযোগ নেয় ওরা। হঠাৎ ওরা প্রহরীদের আক্রমণ করে কয়েকজনকে আহত করে পালিয়ে যায়।

প্রহরীদের চীৎকার ও হাকডাক শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে আসে। অবশেষে গ্রামবাসীদের ধাওয়া খেয়ে তিনজন ধরা পড়ে ও একজন নিহত হয়। তিনজনের মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই খারাপ। ওকে গ্রামের সরদারের কাছে রেখে বাকী দুজনকে এখানে নিয়ে এসেছে। ওরা কোন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। শুধু বলছে, 'আমাদেরকে সালারের কাছে নিয়ে চলো, সব কথা ওনাকেই বলব।'

সাদ জিজ্ঞেস করল, 'কয়েদীদের দেহ তল্লাশী হয়েছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'এসো আমার সাথে।'

সাদ তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল। কয়েদী রাখার কামরার সামনে প্রহরী ও গ্রামবাসীরা দুই লোককে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তারা সাদকে আসতে দেখে সরে দাঁড়াল।

অফিসার বলল, 'আপনি খুবই ক্লান্ত, তবু বিষয়টি জটিল দেখে আপনাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হলাম।'

'তুমি ঠিকই করেছ।'

এক গ্রামবাসী সাদকে বিস্তারিত ঘটনা বলতে যাচ্ছিল, সাদ তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমি সব শুনেছি। আপনারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন দেখে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এখন সকাল না হওয়া পর্যন্ত আপনারা আমার মেহমান।'

সাদ কয়েদীদের দিকে মনোযোগ দিল। মশাল হাতে এক সিপাই দাঁড়িয়েছিল। সাদ তার পাশ কাটিয়ে কয়েদীদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'বলো, কি বলতে চাও তোমরা?'

এক কয়েদী মাথা তুলে বলল, 'আমরা অনেক কিছু বলতে চাই। আমরা যে দুশমনের চর নই তা প্রমাণ করতে পারবো। স্বয়ং সুলতান মুতামিদ আমাদের নির্দোষীতার সাক্ষ্য দেবে। আমাদেরকে তার কাছে পাঠিয়ে দিন।'

'সাক্ষী তো ভালই জোগাড় করেছো, এবার বলতো সুলতান মুতামিদের সাথে ভ্যালেন্সিয়ার কি সম্পর্ক?'

কয়েদী চটপট জবাব দিল, 'আমরা সুলতান মুতামিদের নির্দেশে ভ্যালেন্সিয়ায় সিড্ কম্বিডোরের তৎপরতার খবর নিতে যাচ্ছিলাম।'

'একটা খবর নেয়ার জন্য এগার জন ছুটে যাচ্ছিলে?'

'ভ্যালেন্সিয়া থেকে আমীর ইউসুফের সাথে দেখা করার জন্য একটি দলও আমাদের সাথে এসেছিল। নদী পার হয়ে ভুলে গ্রামের মুজাহিদদের ডাকাত সন্দেহ করে আমরা পালাচ্ছিলাম।'

'ডাকাতকে যারা ভয় পায় তারা রাতের বেলা সফর করে না।'

'আমি আপনার সাথে তর্ক করতে চাই না। আমাদের নিয়ে আপনার সন্দেহ থাকলে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনিই বুঝবেন, আমাদের কি করবেন।'

'তোমরা হয়তো জানো না, সুলতান মুতামিদ আজকাল খুবই ব্যস্ত আছেন। কবে যে তোমাদের দেখার সুযোগ হবে বলা মুশকিল। তারচে বরং আমার সাথেই কথা বলো।'

সাদ প্রহরীর হাত থেকে মশালটি কয়েদীর মুখের দিকে বাড়িয়ে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর হঠাৎ ভ্রুকুঞ্চিত করে বজ্র হাতে কয়েদীর ঘাড় ধরে বলল, 'জেয়াদ! আমার দিকে তাকাও, দেখতো আমাকে চিনতে পার কিনা?'

কয়েদী অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। হঠাৎ সাদকে চিনতে পেরে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, জিহবা শুকিয়ে গেল।

সাদ বলল, 'নাদান, তুমি সব সময়ই কাপুরুষ ছিলে। জলদি সত্যি কথা বলো, আমার সময়ের দাম আছে।'

সাদ কয়েদীর গলায় বাঁধন শক্ত করল। চাপ দিল আরেকটু, ঠিকরে জেয়াদের চোখ বেরিয়ে আসতে চাইল। একটু পর সাদ তার হাত শিথিল করে বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি আজকাল বেশ সেয়ানা হয়েছ। শয়তানীতে আরো পোক্ত হয়েছ। অসুবিধা নেই, কি করে কথা বের করতে হয় আমি জানি। আজকাল আবার কথা বের করার যন্ত্রও আবিষ্কার হয়েছে। তোমার খৃস্টান বন্ধুরাই ওটা এ কেল্লায় রেখে গেছে মনে হয়।

ওটা যে কোন কাজে লাগবে তাই মনে হয়নি আমার। তুমি এসে ভালই করেছো, ওটা ব্যবহারের একটা সুযোগ এল। বহু নিরপরাধ লোকের ওপর নিশ্চয়ই তুমি ওই যন্ত্র ব্যবহার করেছ। আজকে না হয় নিজেই একটু ব্যবহার করে দেখলে কেমন মজা লাগে।'

সাদের ইঙ্গিতে ওকে কয়েদীদের কামরায় নিয়ে যাওয়া হল। দরজায় গিয়ে জেয়াদ চিৎকার করে বলল, 'আমি কোন অপরাধ করিনি, আমি সেভিলের রাজ কর্মচারী। আপনি মনে করবেন না, আমার বন্দী হওয়ার খবর এ কেল্লার বাইরে যাবে না। আমার সংগীরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই হিসনুল্লামেত পৌছে গেছে। আমার খবর পেলে সুলতান মুখে আঙুল দিয়ে বসে থাকবেন না। আমাকে গ্রেফতার করার আপরাধে এ গ্রামের তামাম লোককে হত্যা করা হবে। আর যদি তিনি জানতে পারেন, আপনি আমার ওপর জুলুম করেছেন, তাহলে আপনার পরিণতি হবে ভয়াবহ। সুলতান মুতামিদ আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করলে আমীর ইউসুফও আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না।'

'ভাল, তাহলে তো তোমার কোন চিন্তাই নেই। এবার তাহলে একটু আরাম করে বসো, দেখা যাক তোমার প্রভুরা তোমার জন্য কি করে।' এই বলে সাদ সিপাইদের হুকুম দিল, 'ওকে মরণ চড়কায় উঠাও।'

সিপাইরা জেয়াদের হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে দিল। তারপর তারা ঘরের মেঝেয় প্রোথিত পেষণযন্ত্রের ওপর তাকে শুইয়ে দিয়ে দু হাত কাঠের সাথে বেঁধে দিল সাদ ছিল

একজন সৈনিক। আঘাতের বদলে আঘাত করায় অভ্যস্ত। এ ধরণের নির্যাতনের দৃশ্য তার চোখে সহ্য হচ্ছিল না। সে অত্যন্ত যন্ত্রণাকাতর মন নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জেয়াদের চিৎকার শুনছিল।

এক সিপাই বেরিয়ে এসে বলল, 'আমরা হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'আমি আসছি।' একথা বলে সাদ তার সহকারীকে বলল, 'আপনি চারটি ঘোড়া প্রস্তুত করুন। হয়তো এখুনি আমাকে আমীরের কাছে যেতে হবে।'

সাদ কামরায় ঢুকল। জেয়াদ তাকে দেখামাত্রই কান্নাকাটি শুরু করল। সাদ ইশারা করলে এক সিপাই চাড়কা ঘুরাতে শুরু করল। কাঠের চড়কা থেকে চড় চড় শব্দ বেরিয়ে এল। জেয়াদের হাড় কড় কড় করে উঠল। সে চিৎকার করে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!'

সাদ বলল, 'জেয়াদ, এখন তুমি কাঠের কট কট ধ্বনি শুনতে পাচ্ছ, একটু পর শুনবে হাড় ভাঙার মট মট ধ্বনি। এখনো সময় আছে, ইচ্ছে করলে প্রাণে বেঁচে যেতে পার। সবকিছু খুলে বলো, নইলে তুমিও জানো, তোমার চিৎকার শুনে তোমার কোন প্রভু এখানে তোমাকে বাঁচাতে আসবে না।'

দ্বিতীয় কয়েদীকে লক্ষ্য করে সাদ বলল, 'তুমিও তৈরী হয়ে যাও। জেয়াদের পরই তোমার পালা।'

কয়েদী কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমি ভ্যালেন্সিয়ার লোক। আমার কোন দোষ নেই।'

'তুমি কে, কি করছিলে, চড়কায় চড়লেই সব জানতে পারবো।'

জেয়াদ যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমার কোন দোষ নেই। আমি সামান্য এক কর্মচারী মাত্র, মনিবের হুকুম তামিল করাই আমার কাজ। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি সব কথা বলবো তোমাকে।'

সাদের ইঙ্গিতে সিপাইরা চড়কার চাকা উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিল। জেয়াদের যন্ত্রণা কিছুটা কমল। সাদ বলল, 'যা বলার তাড়াতাড়ি বল। এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

'আপনি আমাকে হত্যা করবেন না ওয়াদা করুন, আমি সব বলছি।'

'আমি এখনই তোমার সাথে কোন ওয়াদা করতে পারবো না। আগে সব খুলে বলো আমাকে।'

'যদি আমি এমন কোন ভয়াবহ বিপদের খবর দেই, যা আপনার কল্পনার অতীত, তাহলে?'

সাদ কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সহকারী সালার হন্তদন্ত হয়ে কামরায় ঢুকল। সাথে এক অচেনা লোক।

ঢুকেই সহকারী সালার বলতে শুরু করল, 'ইনি সেই গ্রামের সরদার। কয়েদীদের নিহত সঙ্গীর দেহতল্লাশী করে তিনি একটি কাগজ পেয়েছেন।'

সাদ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় সে কাগজ?'

সরদার পকেট থেকে কাগজটি সাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'স্বেচ্ছাসেবকরা আপনার কয়েদীদের নিয়ে আসার পর আমি তাদের আহত সংগীর দেহতল্লাশী করি। কিন্তু কোন কিছু পাওয়া যায়নি। তারপর আমার খেয়াল হল, নিহত ব্যক্তিরও দেহতল্লাশী হওয়া দরকার। তার পকেট থেকে এ কাগজটি পেয়েই আমি ওটা আপনার কাছে পৌছানো জরুরী মনে করলাম।'

সরদারের কথার দিকে সাদের মনোযোগ ছিল না। সে এক মনে মশালের কাছে দাঁড়িয়ে কাগজটি পড়ছিল আর প্রতি মুহূর্তে তার চেহারার রঙ পাল্টে যাচ্ছিল। কাগজটি ছিল খৃষ্টান সেনাপতি আলফানসুর স্বাক্ষর করা একটি ঘোষণাপত্র। এতে লেখা ছিলঃ

'লিউ আরাগন, আনদেভার, লাকরুনা ও জালিকার মহামান্য আমীর এবং ভ্যালেন্সিয়ার প্রশাসক সিড কম্বিডোরের সমর্থনে আমি ঘোষণা করছি, স্পেনের মুসলমান বাদশাহরা আমাদের সাথে বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার বাস্তব প্রমাণ দিলে আমি তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করব না। আমি লক্ষ্য করছি, আফ্রিকার হানাদার বাহিনী বন্ধুত্বের মুখোশ পরে স্পেনের মুসলমানদের আজাদী হরণের চেষ্টা করছে। আমি জানি, তারা মুসলমান শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে আমাদের স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করতে প্রয়াস পাবে। তাই আমি মনে করি, খৃষ্টান-মুসলমান বিবাদ ভুলে বিদেশী হানাদারদের হাত থেকে স্পেনকে বাঁচানো আজকে সময়ের দাবী। আমি ক্রুশের নামে কসম করছি, স্পেনের খণ্ডরাজ্য শাসকরা নিজেদের আজাদী রক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হলে, আমিও আমার মিত্ররা তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বৃহত্তর স্পেনের আজাদী রক্ষায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যাবো। একটি মৈত্রী চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারণ করার জন্য আমি স্পেনের খণ্ডরাজ্য শাসকদের সাথে বৈঠকে বসতে ইচ্ছুক। হিসনুল্লায়েত সম্পর্কে আমার প্রস্তাব আমার প্রতিনিধি আপনাদের বিস্তারিত জানাবে।'

ঘোষণাপত্রটি পড়া শেষ করে সাদ জেয়াদের দিকে তাকাল। বলল, 'এখন তোমার থলেতে নিশ্চয়ই আর এমন কোন খবর নেই, যা দিয়ে তুমি আমাকে চমকে দিতে পারবে। তবু তোমাকে আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই। সময় নষ্ট না করে ঠিক ঠিক জবাব দিলে তোমার প্রতি যদি আমার করুণা জাগে তবে হয়তো তোমার জীবন বেঁচেও যেতে পারে। কিন্তু ভুল জবাব দিচ্ছো বুঝতে পারলে তোমার রেহাই নেই। আমীর ইউসুফের কাছে তোমাকে পেশ করলে পরিণতি কি হবে আমি বলতে পারবো না।'

জেয়াদ বলল, 'আমি আপনার সকল প্রশ্নের সত্য-সঠিক জবাব দেবো।'

'প্রথমে বলো, নিহত ব্যক্তির পরিচয় কি?'

'সে শাহজাদা রশীদের বিশেষ উপদেষ্টা।'

'আলফানসুর সাথে তোমার কোথায় দেখা হয়েছে?'

'ভ্যালেন্সিয়ার পশ্চিম সীমান্তের এক কেল্লায়।'

'তোমার এ সাথীর পরিচয় কি?'

'ইনি মালাকার আমীরের প্রতিনিধি।'

'তোমাদের দলনেতা কে?'

'শাহাজাদা রশীদ।'

'সে কি পালিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'গ্রামের সরদারের কাছে আটক আহত ব্যক্তিটি কে?'

'উনি গ্রানাডার আমীরের প্রতিনিধি।'

'এ ষড়যন্ত্রে কে কে জড়িত?'

'প্রায় সকল খণ্ডরাজ্য শাসকরাই এ ষড়যন্ত্রে জড়িত। অবশ্য যে বৈঠকে আলফানসুর কাছে প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সে বৈঠকে আলমেরিয়া, মর্সিয়া ও বাতলিউসের কোন প্রতিনিধি ছিল না। তবে আমীর ইউসুফের ওপর তারাও আমাদের মতই ক্ষুব্ধ।'

'তোমরা আলফানসুর কাছে আগে মৈত্রী প্রস্তাব দিয়েছো, নাকি আলফানসু তোমাদের কাছে আগে প্রস্তাব পাঠায়?'

'আমরা।'

'হিসনুল্লায়েত সম্পর্কে আলফানসু কি প্রস্তাব দিয়েছে?'

'তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, রাবাত বাহিনী স্পেন ত্যাগ করলে তিনি এ কেল্লা থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবেন। খণ্ডরাজ্য শাসকরা সরাসরি রাবাতীদের বিরোধিতা করার সাহস না পেলে তারা যদি কেল্লার ওপর আমীর ইউসুফের আক্রমণের সময় নিজেদের সৈন্য নিষ্ক্রিয় রাখে তাহলেও তিনি তার ওয়াদা পালন করবেন।'

সাদ সহকারীকে বলল, 'আমি গেলাম। আমীর ইউসুফ শুক্রবার শেষ বেলা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন আমি উড়ে গেলেও সময়মত সেখানে পৌছতে পারবো না। এতক্ষণে শাহজাদা রশীদ হয়তো খণ্ডরাজ্য শাসকদের কাছে আলফানসুর প্রস্তাব পৌছে দিয়েছে এবং আমি পৌছার আগেই যুদ্ধ চরম পর্যায়ে উপনীত হবে।

যদি খণ্ডরাজ্যের শাসকরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে আমাদেরকে ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হবে। দুশমন আমাদের বিরুদ্ধে পুর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে। যদি শত্রু সেনাদের কিছু অংশ কেল্লা থেকে পুর্ব অথবা উত্তর দিক দিয়ে বের হয়ে পশ্চাত দিক থেকে আক্রমণ করে তাহলে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

তুমি সকল ফাঁড়িতে আদেশ দিয়ে দাও, যেখানে যত সৈন্য আছে সবাই যেন এই মুহূর্তে হিসনুল্লায়েতের দিকে রওনা হয়ে যায়। সেখানে আমাদের সব শক্তি নিয়োজিত করা দরকার। আমি এখন শুধু চারজন অশ্বারোহী সাথে নিয়ে যাচ্ছি। কারণ কেল্লার প্রতিরক্ষার জন্য যে সৈন্য রয়েছে তার সংখ্যা দরকারের তুলনায় অনেক কম। ফাঁড়িতে

এখন আর পাহারার দরকার নেই, তবে এ কেল্লার পাহারা অটুট রাখতে হবে।'

সহকারী সালার বলল, 'আপনি সাবধানে যাবেন। যারা পালিয়ে গেছে তারা পথে ওঁৎ পেতে থাকতে পারে। খণ্ডরাজ্যের শাসকরাও পথের ওপর নজর রাখতে পারে। তারা এ ঘোষণাপত্র হাত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।'

সাদ বলল, 'পথে যদি আমি বিপদে পড়ি তাহলে একজন অন্তত এ ঘোষণাপত্র নিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবে। তারপর আমীর ইউসুফের কাছে এটা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব থাকবে তোমার ওপর। ছোট্ট এ কাগজটুকুতে স্পেনের তকদীর লেখা রয়েছে। কয়েদীদের প্রতি নজর রাখবে এবং সেনাদলের সাথে এদেরকে হিসনুল্লায়েত পাঠিয়ে দেবে।'

সাদ কামরা থেকে বের হয়ে এল। ওদিকে জেয়াদ চেঁচিয়ে বলল, 'আমি আরো একটি জরুরী কথা বলতে চাই।'

সাদ ফিরে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, জলদি বলো।'

'আলফানসু বলেছেন, খণ্ডরাজ্য শাসকরা যদি নিরব ভূমিকা পালন করে তবে চার দিনের ভেতর আরো পনর হাজার সৈন্য নিয়ে সে হিসনুল্লায়েত রওনা হবে। এসব সৈন্যরা ভ্যালেন্সিয়ার দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে এখান থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থান করছে।'

সাদ বেরিয়ে যেতে যেতে আলমাসকে বলল, 'চাচা, এ কেল্লা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। তুমি মায়মুনাকে সাথে নিয়ে সৈন্যদের সাথে হিসনুল্লায়েত চলে আসবে। খবরদার! আমার কথার যেন উনিশ-বিশ না হয়।'

২.

খানিক পর। সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে হিসনুল্লায়েতের দিকে ছুটছে সাদ তার তিন জানবাজ সঙ্গী নিয়ে। আঁধারের কালো পর্দা চিরে ভোরের আলো ফোটার আগেই তারা তিন ভাগের এক ভাগ পথ অতিক্রম করে ফেলল। দুর্গম পথ ধরে পাহাড়ী এক টিলা পার হয়ে পাশের উপত্যকায় নেমে যাওয়ার সময় সাদ হঠাৎ তার ঘোড়া থামিয়ে সংগীদের দিকে ফিরে বলল, 'একটু সতর্ক হয়ে চল। সামনের পুলে আমি কোন প্রহরী দেখতে পাচ্ছি না। অথচ এখানে সব সময় দুজন প্রহরী রাখার জন্য আমার আদেশ ছিল।'

এক অশ্বারোহী বলল, 'ভোর হয়ে গেছে দেখে হয়ত প্রহরীরা ফাঁড়িতে চলে গেছে।'

দ্বিতীয় সংগী বলল, 'ঝোপের আড়াল থেকে তিনজন অশ্বারোহী বের হয়ে পুলের দিকে ছুটে যাচ্ছে।'

সাদ ওদেরকে প্রহরী ভেবে ঘোড়ার পেটে চাপ দিল। কিন্তু পুল থেকে কয়েক গজ

দূরে থাকতেই তিন সিপাই তাদের সামনে বর্শা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেল। সাদ ঘোড়া থামিয়ে গর্জন করে বলল, 'চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? আমাকেও চিনতে পারছ না?'

বর্শাধারীদের একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে?'

সাদের এক সংগী এগিয়ে সাদকে উপজাতীয় ভাষায় বলল, 'এরা আমাদের লোক বলে মনে হচ্ছে না। সম্ভবত আমাদের ফাঁড়ি বেদখল হয়েছে। আপনি সতর্ক থাকবেন।'

সাদ সৈন্যদের লক্ষ্য করে বলল, 'আমার রাস্তা বন্ধ করার কোন অধিকার নেই তোমাদের।'

ওদের একজন বলল, 'আমাদের সালার না আসা পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ থাকবে।'

'তোমাদের সালার কে?'

'এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার অনুমতি নেই আমাদের।'

সাদ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কাঠের পুলে রক্তের ছিটা দেখতে পেয়ে পকেট থেকে কাগজটি বের করে এক অশ্বারোহীকে দিয়ে উপজাতীয় ভাষায় বলল, 'তুমি ফিরে চলে যাও। মনে হচ্ছে আমাদের পথে ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ানো হয়েছে। কেল্লায় পৌঁছেই তুমি এটি সালারের হাতে দেবে।'

বর্শাধারীদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি?'

'সব প্রশ্নের জবাব দেয়ার অভ্যাস আমারও নেই।' বলতে বলতে সাদ ক্ষিপ্র গতিতে খাপ থেকে তরবারি বের করে চোখের নিমেষে প্রতিপক্ষের একজনকে হত্যা করল। ততোক্ষণে ঘোষণাপত্র নিয়ে সাথের অশ্বারোহী তীর বেগে উল্টো পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। অন্য দুই সংগী অপর দুই বর্শাধারীর ওপর হামলা করে বসল।

আচানক পুলের পাশের এক ঝোপ থেকে ছুটে এল এক পশলা তীর। একটি তীর সাদের গর্দান ছুঁয়ে চলে গেল, একটি বিঁধে গেল তাঁর পাঁজরে। সাদের এক সংগী প্রতিপক্ষের একজনের বুকে মারল তলোয়ারের এক কোপ। আর্ত চিৎকার দিয়ে লোকটি পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। সাথে সাথে অন্য অশ্বারোহী ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উর্ধশ্বাসে পালাল। কিন্তু একই সময় ঝোপের আড়াল থেকে একটি তীর এসে বিঁধল সাদের এক সংগীর গায়ে। পুল পার হওয়ার সময় আরেকটি তীর আঘাত হানল সাদের পায়ে।

নদী পার হয়ে সাদ ও তার সংগীরা ছুটল পাহাড়ের এক উঁচু চূড়ার দিকে। সাদের পায়ের জখম গভীর ছিল না, ঘোড়ার ওপর বসে বসেই সে তীরটি বের করে ফেলল। কিন্তু পাঁজরের তীরটি টেনে বের করতে গেলে কিছুক্ষণের জন্য তার চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে গেল। তবু সাদ গতি না কমিয়েই হেঁচকা টানে তীরটি বের করে নিজের তূনীরে রেখে দিল।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে পাহাড়টির অন্য পাশে পৌঁছে তারা একটি প্রশস্ত উপত্যকায় নেমে এল। উপত্যকার এক ঘাঁটি থেকে তাদের ঘোড়া বদলী করে নেয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রায় এক মাইল দূরে থাকতেই তারা দেখতে পেল অশ্বারোহীদের একটি দলকে

সেই ঘাটি থেকে বের হয়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে।

সাদ এদের দেখেই বুঝতে পারল, এরা দুশমন ফৌজ। নিরাশ হয়ে সাদ সংগীদের বলল, 'পথ ছেড়ে বাম দিকের জংগলে ঢুকে পড়ো। এ অশ্বারোহীদের দ্বারা ঘেরাও হবার আগে জংগলে ঢুকতে না পারলে আমাদের বাঁচার আশা নেই।'

সাদের এক সংগী উৎকর্ণ হয়ে বলল, 'শুনুন, পেছন থেকে কারা যেন আসছে।'

সাদ ঘোড়া থামিয়ে উৎকর্ণ হল। পেছন থেকে দুটি ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল সে। বলল, 'দুজন আমাদের পিছনে ধাওয়া করে আসছে বলে মনে হয়। এরা আমাদের সামনে চলে গেলে বিপদ বাড়বে। তোমরা জংগলে ঢুকে যাও, আমি দেখছি ওদের।'

সংগীরা বলল, 'না না, আপনি আহত, আপনাকে রেখে আমরা যেতে পারি না।'

'এটা আমার হুকুম। আহত বলেই আমি পেছনে থাকতে চাই।' ধমক দিয়ে বলল সাদ।

সাদের সংগীরা এক বিপদজনক ঢালুর দিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল এবং পাহাড়ী পথ ছেড়ে ঝোপের আড়ালে এসে দাঁড়াল।

অশ্বারোহী দুজন তীরের আওতায় আসা মাত্রই তীর ছুঁড়ল সাদ। এক অশ্বারোহীর বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল একটি তীর। দ্বিতীয় অশ্বারোহী চকিতে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল, কিন্তু ফিরে যাওয়ার আগেই সাদের আরেকটি তীর তার পাঁজরে বিঁধল। ঘোড়া থেকে পড়ে গেল অশ্বারোহী।

ঘোড়া থেকে নেমে সাদ তলোয়ার দিয়ে রাস্তার ওপর একটি চিহ্ন আঁকল। এরপর পাশের এক গাছের ডাল কেটে সেখানে রেখে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেল। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে একটি গাছে নিজের খঞ্জরটি বিদ্ধ করে রেখে দিল এবং তারপর পাথর ও গাছের আড়াল নিয়ে পাহাড় থেকে নীচে নামতে শুরু করল।

বিপদজনক ঢালুতে এসে পৌঁছল সাদ। ঘোড়ার পা ফসকালে গভীর খাদে গড়িয়ে পড়তে হবে। কিছুদূর গিয়ে ঢালুটি একটি নালায় নেমে শেষ হয়েছে। সাদের সংগীরা তখনো তিনশ গজ দূরে। নালার উঁচু পাড় তাকে দুশমনের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রেখেছিল। সাদ বুঝতে পারল, নালা পার হয়ে সামনের জংগলাকীর্ণ পাহাড়ে উঠতে শুরু করলে দুশমন তাকে দেখে ফেলবে।

নালা থেকে বের হয়ে সাদ দেখতে পেল তার এক সংগী দ্রুত জংগলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। দ্বিতীয় সংগীর গতি ক্রমেই কমে আসছে। সাথে সাথে বামদিক থেকে আটজন অশ্বারোহীকে সাদের সংগীদের পিছনে ধাওয়া করতে দেখা গেল।

সাদ তাড়াতাড়ি তার ঘোড়া এক টিলার আড়ালে নিয়ে গেল। অশ্বারোহীরা টিলার কাছে পৌঁছলে সাদ তীর মেরে পেছনের দুই অশ্বারোহীকে হত্যা করল এবং দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ছুটন্ত অবস্থায়ই তীর ছুঁড়ে আরো একজনকে ঘোড়া থেকে মাটিতে ফেলে দিল।

ততক্ষণে দুজন অশ্বারোহী ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সাদকে আক্রমণ করল। সাদ তাদের একজনকে বর্শার আঘাতে আহত করে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে তীব্র গতিতে তরবারি কোষ মুক্ত করল এবং অন্য এক অশ্বারোহীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আক্রমণকারী সাদকে বর্শার আঘাত করলে সাদ একদিকে কাত হয়ে আত্মরক্ষা করল এবং নিজের তরবারি বাড়িয়ে দিল সামনে। সাথে সাথে সাদের তরবারি বিপক্ষের পেটে গেঁথে গেল।

মুহূর্তকাল আগে আহত সৈন্যটি কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ধনুকে তীর সংযোজন করল।

যে তিন অশ্বারোহী সাদের সংগীদের ধাওয়া করছিল তারা হঠাৎ ঘুরে গেল এবং সাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সাথে সাথেই সাদ তরবারি খাপে বন্ধ করে তীর ধনুক নিয়ে তৈরী হয়ে গেল। সাদের এক সংগী জংগলের কাছে পৌছে গিয়েছিল। অন্যজন যখন দেখতে পেল তার পেছনে ধাওয়াকারী অশ্বারোহীরা সাদের দিকে ফিরে যাচ্ছে তখন সেও নিজের ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল। আক্রমণকারীদের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য সে একের পর তীর ছুঁড়তে লাগল।

আক্রমণকারীদের একজন আহত হয়ে পেছনের দিকে ঘুরল। কিন্তু সামনের অশ্বারোহীর হাতের তীর ধনুক বিপদজনক মনে করে একদিকে পালিয়ে গেল। বাকী দুই অশ্বারোহী সাদের প্রায় ত্রিশ কদম দূরে থাকতেই সাদ তীর নিক্ষেপ করল। তার তীর লক্ষ্য ভেদ করলে একজন ধরাশায়ী হল, অন্যজন নিজেকে সাদ ও তার সংগী অশ্বারোহীর যুগপদ আক্রমণের লক্ষ্য ভেবে পালিয়ে গেল। সাদ সাথী সৈন্যটিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সংগী কোথায় সাদিক?'

সাদিক কাছে এসে বলল, 'ও ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ এখনি চলে আসবে। ওই যে আসছে।'

হঠাৎ ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে সাদ পেছন ফিরে পাহাড়ের দিকে তাকাল। চল্লিশ পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার ওপরের পাহাড় থেকে নেমে তাদের দিকে ধেয়ে আসছিল। বিষাদে মলিন হল সাদের চেহারা। সে তাড়াতাড়ি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিতে গেল, কিন্তু পাথরের আড়াল থেকে শন্ শন্ করে একটি তীর ছুটে এসে বিধঁল সাদের কোমরে। সাদের সাথী ঘোড়া ছোটাল যে পাথরটির আড়াল থেকে তীরটি ছুটে এল সেদিকে। তীরন্দাজ পাথরের আড়াল থেকে আরো একটি তীর নিক্ষেপ করল কিন্তু সাদের সংগী হঠাৎ মাথা নুইয়ে নিজেকে রক্ষা করল। তীরন্দাজ পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে ছুটল তার ঘোড়ার দিকে। সাদের সংগী তীর মেরে ফেলে দিল তাকে। এরপর সে সাদের সাথে এসে মিলিত হল এবং দুজনেই ছুটল জংগলের দিকে। তাদের উভয়েরই ঘোড়া ছিল ক্লান্ত, ধাওয়াকারীরা দ্রুত তাদের কাছাকাছি হচ্ছিল। মরিয়া হয়ে ছুটছিল ওরা, যদি একবার জংগলে ঢুকে পড়া যায় তাহলে কিছুটা হলেও বাঁচার আশা থাকে।

৩.

জংগলে ঢুকার মুখে সাদের ঘোড়াটি মাটিতে পড়ে মারা গেল। সংগীটি নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে সাদের দিকে এগিয়ে এল। সাদ বলল, 'সাদিক, ভুল করো না, পালাও। ওরা দ্রুত ছুটে আসছে। আমি বেশীক্ষণ তোমার সাথে চলতে পারব না।'

সাদিক বলল, 'আমার ঘোড়াও আর চলতে পারছে না। সামনে টিলা। যদি টিলাটাতে চড়তে পারি তাহলে ধাওয়াকারীরা ঘোড়া থেকে না নেমে এগুতে পারবে না।'

সাদ সাহসে ভর করে খাড়া পথে পাহাড়ের টিলার ওপর উঠতে শুরু করল। শত্রুরা ওদের দুশো গজের মধ্যে এসে গেল। সাদ তখনো টিলার শীর্ষ চূড়ার বিশ গজ নীচে। তার শরীর আর চলে না। ক্লান্ত হয়ে সে একটি পাথরের ওপর বসে পড়ল। সাদিক সাদকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। অবস্থা দেখে সে ফিরে এল এবং সাদের হাত ধরে উঠানোর চেষ্টা করল। বলল, 'চূড়ায় পৌছতে পারলে ওদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার একটা মওকা পাওয়া যাবে। এখনো আমাদের তূন তীরে ভরা। আরেকটু হিম্মত করুন।'

সাদ দাঁড়াতে গেল কিন্তু তার চোখের সামনে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। সাদিক বলল, 'আপনি চুড়ার দিকে যেতে থাকুন। আমি ওদের গতি রোধ করছি।'

সাদ ক্লান্ত স্বরে বলল, 'সাদিক, আমার জন্য নিজেকে বিপদে ফেলো না।'

'আমরা উভয়েই এখন বিপদের মধ্যে ডুবে আছি। আপনাকে ছেড়ে দিলেও একার পক্ষে এতগুলো দুশমনের মোকাবেলা করে বাঁচার কোন সম্ভবনা নেই।'

সাদিক সাদের কোমর ধরে তাকে উপরের দিকে নিয়ে চলল। সাদিকের সাথে একটু এগিয়ে সাদ বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি নিজেই চলতে পারবো। ওরা খুব কাছে এসে গেছে।'

সাদিক একটি পাথরের আড়ালে বসে পড়ল। চূড়ার শেষ কয়েক হাত অত্যন্ত দুর্গম। সাদ ধনুকটি গলায় ঝুলিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অতিকষ্টে ওপর দিকে উঠতে লাগল। হঠাৎ আবার তার মাথা ঘুরে উঠল। সাদ উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ওদিকে ধাওয়াকারীরা সাদিকের তীরের আওতায় এসে গেল। তীর ছুঁড়ল সাদিক। আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল তিনজন। একজন পা ফসকে গড়িয়ে পড়ল খাদে। বাকীরা ভয়ে পাথর ও ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

এই সুযোগে সাদিক পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে আবার দ্রুত চুড়ার দিকে উঠতে শুরু করল। নীচ থেকে শোনা গেল একজন তার সাথীদের চেঁচিয় বলছে, 'খবরদার, কেউ পিছু হটলে খুন করে ফেলব।'

নেতার ধমক খেয়ে ওরা আবার তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে চুড়ার দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু সাদিক ততক্ষণে চুড়ায় পৌছে গেছে। সাদের কাছে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কেমন আছেন?'

সাদ বলল, 'আমি ভাল আছি, তোমার অবস্থা কি?'

সাদিক কোন জবাব দেয়ার আগেই শুনতে পেল আটদশজন হৈ চৈ করে চূড়ার দিকে এগিয়ে আসছে। সাদ ও সাদিক তীর মেরে পাঁচজনকে হত্যা করল। বাকীরা আবার তীর বেগে নীচে নেমে আত্মরক্ষা করল।

সাদিক হাফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, 'অনুমতি দিলে আপনার তীর খুলে দিতে পারি।'

'না এটা অনেক গভীরে ঢুকে গেছে। আমি চেষ্টা করে দেখেছি।'

সাদিক বলল, 'মোনাফিকরা সব সময়ই ভীরু। দেখুন, ওরা পালাচ্ছে। আমরা আরো কিছুক্ষণ টিকে থাকতে পারলে আমাদের সাহায্যে কেল্লা থেকে সৈন্যরা এসে যেতে পারবে।'

'আমি ওদের আসার জন্য পথে চিহ্ন রেখে এসেছি। তোমার তূনে আর কি পরিমাণ তীর আছে?'

'প্রায় চল্লিশটি।'

'আমার তূনেও প্রায় এরকমই আছে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন একটি তীরও নষ্ট না হয়।'

ওদের পিছনে ছিল গভীর খাদ। সাদ চারদিক তাকিয়ে বলল, 'আমাদের পেছন দিক নিরাপদ। শুধু সামনে ও ডানে-বায়ে নজর রাখতে হবে।'

সাদ আবার ঝিমুতে শুরু করতেই সাদিক বলল, 'সাবধান, ওরা এখন তিন দিক থেকে সুসংগঠিত হয়ে এগিয়ে আসছে।'

সাদ ধনুকে তীর সংযোজন করে তিন দিকে তাকাল, পাথর ও ঝোপের আড়াল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছিল ওরা। একজন চিৎকার করে বলল, 'এখন লড়াই করে কোন লাভ নেই। আমরা তোমাদের ঘেরাও করে ফেলিছে। আত্মসমর্পণ কর, নইলে মারা পড়বে।'

সাদ সমান জোরে চেঁচিয়ে বলল, 'আমাদের তূনে এখনও যথেষ্ট তীর আছে। তোমরা নিশ্চিত থাকতে পার আমাদের একটি তীরও ব্যর্থ হবে না ইনশাআল্লাহ।'

'তোমরা কতক্ষণ লড়বে? বাইরে থেকে তোমাদের কোন সাহায্যের আশা নেই। এক সময় ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে তোমরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। তোমাদের আমি শেষ বারের মত চিন্তা করার সুযোগ দিচ্ছি।'

সাদ বলল, 'আমাদের সুযোগ না দিয়ে তোমরা নিজেদের ভবিষ্যত চিন্তা কর। আমরা আমাদের কয়েক ফোটা রক্তের জন্য মোটেই চিন্তিত নই। আমরা জানি, আমাদের এ রক্ত বেঈমানদের মরণ ডেকে আনবে। তোমরা যদি শাহজাদা রশীদের লোক হয়ে থাক, তাহলে শোন, সে আলফানসুর হাতে স্পেনের মুসলমানদের বিক্রি করে দিয়েছে। আমীর ইউসুফও সম্ভবত এতক্ষণে এ খবর জানতে পেরেছেন।'

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুশমন সালার। বলল, 'তাহলে তুমিও শুনে রাখো,

আমীর ইউসুফ এখানো বেঁচে থাকলে হিসনুল্লায়েত ছেড়ে এতক্ষণে কয়েক মনজিল দূরে পালিয়ে গেছে।'

সাদ এ কথার জবাব না দিয়ে তীর ছুঁড়ল। সরে যেতে গিয়েও পারল না সালার। তীরটি তার বাহুতে বিদ্ধ হল এবং সে অবস্থাতেই সে পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকাল।

এরপর সব চুপচাপ। কোন পক্ষেই কোন তৎপরতা নেই। স্তব্ধ হয়ে রইল উভয় পক্ষ। তীর ও তরবারির আওয়াজের চেয়েও এ নিরবতা সাদের কাছে মনে হল অধিক দুঃসহ। ব্যথায় অস্থির হয়ে সাদ কখনো পাথরের ওপর মাথা রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তো। কখনো ঘাড় তুলে এদিক ওদিক তাকাতো। চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এলে আবার মাথা নীচু করে শুয়ে পড়তো।

তার মন বলছিল, কেল্লা থেকে অবশ্যই সাহায্য আসবে। তারা আর বেশী দূরেও নয়। এখন তারা অমুক নদী পার হচ্ছে, এখন অমুক পাহাড় অতিক্রম করছে। না না, এখন আমাকে মরলে চলবে না। আমাকে বাঁচতে হবে। বাঁচতে হবে হিসনুল্লায়েতের কেল্লায় ইসলামের ঝাণ্ডা উড়ানোর জন্য, মায়মুনাকে বিজয়ের সুসংবাদ শুনাবার জন্যে, কর্ডোভার সেই পরিত্যক্ত বাড়ি আবাদ করার জন্য। এখনো আমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আমি আজও আমার জীবনের রঙিন স্বপ্নের তাবির দেখতে পাইনি। তবে যদি মরতেই হয়, তবে যতক্ষণ এ দেহে রক্তের স্রোত বইবে, ততক্ষণ আমি লড়তেই থাকবো।'

এ সব চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছিল সাদ, হঠাৎ সাদিক উত্তর দিকে ইশারা করে বলল, 'ওই দেখুন, ওই যে ওরা এসে গেছে।'

দ্রুতগামী একদল অশ্বারোহীকে পাহাড় থেকে উপত্যকায় নামতে দেখা গেল। সাদের মনে নতুন করে জ্বলে উঠল আশার আলো। সে বলল, 'সাদিক, কাপুরুষদের হাতে আমাদের মৃত্যু আল্লাহ পছন্দ করেননি। ওরা আমাদেরই লোক। নিশ্চয়ই ওরা দুশমনকে দেখতে পেয়েছে।'

হঠাৎ ডান দিকে পাথরের আড়ালে কেউ নড়ে উঠল। সাদিক উঁকি মেরে বলল, 'হুশিয়ার, ওরা আবার হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

সাদ বুকে হেঁটে সামান্য এগিয়ে নীচে ঝুঁকে দেখল। হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠছিল কয়েকজন। সাদ ও সাদিক তীর ছুঁড়ল, আহত হল দুজন। বাকীরা আবার পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করল।

'আপনি এদিকে খেয়াল রাখুন আমি বাদিকে দেখছি।' বলল সাদিক।

বাম দিক দিয়েও কয়েকজন একইভাবে এগিয়ে আসছিল। সাদিক তীর মেরে ওদেরও থামিয়ে দিল। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর হঠাৎ দেখা গেল হামলাকারীরা তিন দিক দিয়ে এক সাথে উপরে আসার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। সাদ ও সাদিক এমন জায়গা নির্বাচন করে বসল, যেন তিন দিকেই তীর চালানো যায়।

ওরা তীর চালাচ্ছিল আর বার বার উপত্যকার দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল। অশ্বারোহীরা দ্রুত এগিয়ে আসছিল। উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছিল সাদ ও সাদিকের। আচানক থেমে গেল হামলাকারীরা।

একটু পর। সহসা দেখা গেল ডান দিক থেকে সাতজন দুশমন প্রায় চূড়ায় উঠে এসেছে। সাদ দুজনকে তীর মেরে ঘায়েল করলেও বাকীরা ধেয়ে আসছিল তার দিকে। একজন দ্রুত তরবারি কোষমুক্ত করে সাদের ওপর চড়াও হতে উদ্যত হলে সাদের তীর তার বুক ভেদ করল। বিকট চিৎকার করে পড়ে গেল সে। সাদিক ধনুক রেখে তরবারি হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের ওপর।

প্রথম আঘাতেই একজনকে ধরাশায়ী করে দ্বিতীয় জনের সাথে লড়াই করছিল, এ সময় আরো দুজন উঠে এল চূড়ায়। সাদ তরবারি হাতে তাদের ওপর আক্রমণ করল এবং ওদেরকে কোণঠাসা করে পাহাড়ের এক কোণে নিয়ে গেল। পেছনে সরতে সরতে একজন পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে পড়ে গেল।

অন্য জন মরিয়া হয়ে আঘাত হানলে সাদের হাত জখম হল। মাথা ঘুরে পড়ে গেল সাদ। লোকটি আবার আঘাত করতে যাবে এ সময় সাদিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে এসে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিজের তরবারি দিয়ে আঘাত ঠেকাল দুশমন। এরপর তাদের তরবারির ঠোকাঠুকির আওয়াজ হতে লাগল ক্রমাগত।

অবশেষে সাদিকের একটি প্রচণ্ড আঘাত দুশমনের বুক চিরে ফেলল। বাকী আক্রমণকারীরা পালাতে শুরু করল। পালানোর সময় একজন চিৎকার করে বলল, 'রাবাতী সেনা এসে গেছে! পালাও, পালাও!'

প্রায় আধঘন্টা পর। সাদের জ্ঞান ফিরে এল। সাদিক বলল, 'আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করেছেন। কেল্লার সৈন্যরা এসে পৌঁছলে দুশমন পালিয়ে যায়।'

সাদ চোখ খুলে নীচের দিকে তাকাল। কেল্লার কয়েকজন সিপাই উপরে উঠে আসছিল। হঠাৎ সাদ একজনের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে গেল। সেনাদলের আগে আগে মায়মুনা আসছিল। সাদ বলল, 'সাদিক, আমি বেঁচে আছি তো?'

সাদিক বলল, 'আপনি বেঁচে আছেন, এবং আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে। আপনার জীবন জাতির কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।'

'আমার দেশ, আমার জাতি।' সাদ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল।

তারপর চোখ বন্ধ করে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে রইল। তার চেহারায় এক বেদনামাখা হাসির রেখা লেগে রইল।

৪.

শেষ রাতে আমীর ইউসুফ ও খণ্ডরাজ্য শাসকদের সম্মিলিত সেনাবাহিনী

হিসনুল্লায়েতের ওপর আক্রমণ শুরু করল। বেলা উঠার আগেই দুশমনদের সকল বাঁধা দলিত-মথিত করে কেল্লার প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল ওরা। সম্মিলিত বাহিনী সিঁড়ির সাহায্যে প্রাচীরে উঠার চেষ্টা করলে প্রতিপক্ষ প্রাচীরের ওপর থেকে এবারও তীর ও উত্তপ্ত তেল নিক্ষেপ করতে থাকল।

কেল্লার পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর দিকে লড়ছিল রাবাতের সৈন্যরা। কেবল পূর্ব দিকে ছিল খণ্ডরাজ্য সৈন্য এবং স্পেনের মুজাহিদ বাহিনী। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমীর ইউসুফ তার সেনাদের মধ্য থেকে ক্ষুদ্র একটি দলকেও পূর্ব দিকে মোতায়েন করে রেখেছিলেন।

সেভিল, মালাকা ও গ্রানাডার সুলতানরা অনুপস্থিত থাকায় তাদের সেনাবাহিনী পরিচালনা করছিলেন সেভিলের সিপাহসালার। লড়াই শুরু হলে আরো কয়েকজন শাসনকর্তা ময়দান থেকে গোপনে সরে পড়লে তাদের সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন বাতলিউসের সিপাহসালার।

কেল্লার তিন দিকে ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। আমীর ইউসুফের সৈন্যরা শত্রুর প্রবল প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে অসীম সাহসিকতার সাথে প্রাচীরে সিঁড়ি লাগিয়ে ওপরে উঠার চেষ্টা করল। একদল পেছনে সরে এলে সাথে সাথে অন্য দল এগিয়ে তার স্থান দখল করছিল।

প্রতিপক্ষ প্রবল বৃষ্টিপাতের মত তীর মেরে ও গরম তেল ঢেলে রাবাতের ফৌজকে প্রাচীরে উঠতে বাঁধা দিচ্ছিল। রাবাত সেনারা আক্রমণের তীব্রতা ক্রমেই বাড়িয়ে তুলল। আমীর ইউসুফ ভরাট কণ্ঠে বললেন, 'বীর মুজাহিদরা, এগিয়ে যাও! আজ তোমাদের বিজয়ের দিন।'

আমীর ইউসুফের গলার স্বর মুজাহিদদের উৎসাহ ও প্রেরণা বহু গুণে বাড়িয়ে দিল। তিনি দ্রুত কেল্লার এপাশ থেকে ওপাশে ছুটাছুটি করছিলেন। তার চেহারা দেখামাত্র মুজাহিদদের দেহে নবজীবনের চাঞ্চল্য ও শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছিল।

মৃত্যুর তোয়াক্কা না করে যে সব মুজাহিদ প্রাচীরের কাছে পৌঁছে যেত, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের বর্শা ও তরবারির সম্মুখীন হতো তারা। প্রাচীরের ওপর পঞ্চাশ গজ দূরে দূরে যে সব গম্বুজ ছিল ওগুলো ছিল পাথরের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। ওসব ঘাঁটি দখল না করা পর্যন্ত প্রাচীরের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করার কোন উপায় ছিল না। বাইরে থেকে প্রাচীরে ওঠা যেমনি দুঃসাধ্য, তার চেয়ে দুঃসাধ্য ছিল প্রাচীরের ওপরের এসব ঘাঁটি দখল করা।

রাবাত সৈন্যরা কেল্লার বাইরে পাহাড়ের ওপর মিনজানিক স্থাপন করে পাথর ও অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করল। মিনজানিক অস্ত্রটি তীর ও তলোয়ার থেকে বেশ উন্নত। বর্শার মত লম্বা একটি কাঠের একপ্রান্তে তুলা বেঁধে তাতে বারুদ বা এ জাতীয় দাহ্য পদার্থ লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়ে মারা যায় এ যন্ত্রের সাহায্যে। অস্ত্রটি এতই শক্তিশালী যে ভারী পাথরও নিক্ষেপ করা যায় মিনজানিক দিয়ে। হঠাৎ মিনজানিকের ছোঁড়া একটি ভারী পাথর কেল্লার উত্তর দিকের একটি গুম্বুজে প্রচণ্ড আঘাত

করল। আঘাতের চোটে গম্বুজটি ভেঙে গুড়িয়ে গেলে ভেতরের সৈন্যরা চিৎকার করারও সময় পেল না, তার আগেই তাদের লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সাথে সাথে রাবাতের জানবাজ সৈন্যদের একদল পৌঁছে গেল প্রাচীরের ওপরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেল্লার সে অংশটি আমীর ইউসুফের বাহিনীর দখলে চলে এল। কিন্তু দুর্গের ভেতর থেকে খৃষ্টান বাহিনী মরিয়া হয়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করল তাদের ওপর। তাদের সে চাপে মুসলিম সৈন্যরা কোনঠাসা হওয়ার আগেই রাবাতের নতুন একদল সৈন্য তাদের পক্ষে ছুটে এল। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধে মুহূর্তে কেল্লার সে অংশে কেয়ামতের বিভীষিকা সৃষ্টি হল।

৫.

কেল্লার তিন দিকে যখন আমীর ইউসুফের নেতৃত্বে মুসলমানরা বিজয়ের তামান্না নিয়ে বীর বিক্রমে আঘাত হানছিল দুশমনের দুর্ভেদ্য দুর্গে, খণ্ডরাজ্যের সুলতানরা তখন বেঈমানী ও চক্রান্তের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করছিল।

আক্রমণের সূচনালগ্নে রাবাত বাহিনী ও খণ্ডরাজ্য বাহিনী সম্মিলিতভাবে যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ করল। ঠিক হল, কাফেরদের প্রতিরোধ শক্তি চুরমার করার জন্য এক যোগে চারদিক থেকে সম্মিলিত আক্রমণ চালানো হবে। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে চারদিক থেকে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রাচীর রক্ষীদের ওপর। প্রাচীর দখল করে চূড়ান্ত হামলা করা হবে কেল্লার ভেতর। কিন্তু স্পেনের বিশ্বাসঘাতক শাসকরা রাতের অন্ধকারে যে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল সেই পরিকল্পনার রূপ ছিল ভিন্ন।

খণ্ডরাজ্য শাসকরা এ ব্যাপারে একমত হল যে, আমীর ইউসুফ বিজয়ী হলে স্পেনের মাটিতে খণ্ডরাজ্য শাসকদের আর কোন দাম থাকবে না। তাদের হাতে নেতৃত্ব, গদি, ক্ষমতা কিছুই থাকবে না। গেল বৈঠকে তিনি তাদের শুধু অপমান করেছেন, আগামীতে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবে না এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আমীর ইউসুফকে সহযোগিতা করার চেয়ে নিজের গলায় নিজেই ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যা করা অনেক উত্তম। শাহজাদা রশীদ নেতৃত্ব নিল এর বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণের। সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত হল এবং সে সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে জানিয়ে দিল শাহজাদা রশীদ।

লড়াইয়ের শুরুতে রাবাতীদের সাথে সমান তালে যাত্রা শুরু করল স্পেনের সেনাবাহিনী। একই উদ্যমে ও তালে এগিয়ে গেল স্পেনের মুজাহিদ বাহিনী। কিন্তু মরক্কোর সৈন্য এবং স্পেনের মুজাহিদরা যখন প্রাচীরে চড়ার জন্য প্রাণপণ লড়ছিল, খণ্ডরাজ্য বাহিনী তখন পাহাড়ের অর্ধেক পথ অতিক্রম করে প্রাচীর থেকে বহু দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল লড়াইয়ের। সৈনিকরা এগিয়ে যেতে চাইলে অফিসাররা ওদের থামিয়ে দিত। দীর্ঘ সময় নিয়ে পরামর্শ করতো কোন দিক দিয়ে কিভাবে হামলা করলে সুবিধা হবে এই নিয়ে।

এক দিক দিয়ে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিয়ে সৈন্যদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে সৈনিকরা দ্রুত এগিয়ে যেতে শুরু করত, হঠাৎ অন্য এক অফিসার এসে তাদের থামিয়ে দিয়ে সারি ঠিক করার কাজে লেগে যেত। পেছনের তীরন্দাজদের হুকুম করতো সামনে আসতে, আর সামনের অশ্বারোহীদের পাঠিয়ে দিত মধ্যিখানে।

নতুন করে সারি ঠিকঠাক করে আবার যাত্রা শুরু হতো। উৎসাহী সৈন্যরা ছুটতে শুরু করতো দ্রুতবেগে। আরেক সালার এসে থামিয়ে দিত তাদের। আবার সে নতুন করে সৈন্য সাজাতো।

হঠাৎ দেখা যেত কোন সালার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অন্য সালাররা তখন সবাইকে থামিয়ে সেই সালারের কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করার জন্যে তার চারদিকে জড় হতো। সালার সাহেব মুখে কষ্টের হাসি নিয়ে বলত, 'জোয়ানরা, তোমরা এগিয়ে যাও। আমার জন্য চিন্তা করো না, আমি ভাল আছি।'

আবার কিছুদূর যাওয়ার পর অন্য সালার হাঁক দিত, 'দাঁড়াও। গোলা-বারুদ পেছনে রয়ে গেছে।'

এইভাবেই স্পেনের খণ্ডরাজ্য বাহিনীর জোয়ানরা আপন অফিসারদের হাতে নাস্তানাবুদ হচ্ছিল আর দেশপ্রেমিক সৈনিকদের অস্থিরতা ও পেরেশানী বাড়ছিল, কিন্তু তাদের করার কিছু ছিল না।

স্পেনের মুজাহিদ বাহিনীর অবস্থান ছিল খণ্ডরাজ্য সৈন্যদের ডান দিকে। আবদুল মুনীম তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আফ্রিকান সেনাদের একটি দলও স্পেনীয় সেনাদের বাম পাশে ছিল। এ উভয় দল দ্রুত অগ্রসর হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল। তারা প্রাচীর রক্ষীদের ওপর হামলা করার জন্য অস্থির হয়ে স্পেনীয় সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অধৈর্য হয়ে উপজাতীয় দলের সালার ছুটে এসে আবদুল মুনীমকে বলল, 'আমরা ধূর্ত শিয়ালের সাথে মৈত্রী করেছি। আমার বুঝে আসছে না, ওরা অগ্রসর হচ্ছে না কেন? কাপুরুষতারও একটা সীমা থাকা চাই। ওদের অবহেলায় আমাদের শত শত সৈনিকের প্রাণহানি ঘটছে। মনে হচ্ছে, ওরা জেনে শুনে ইচ্ছে করেই সময় নষ্ট করছে। আপনি ওদের তাড়াতাড়ি আসতে বলুন।'

আবদুল মুনীম বললেন, 'আমি বেহুদা কথা খরচ করতে চাই না। আমার কোন কথায় কান দেবে না ওরা। এদের এ অবহেলা কাপুরুষতা নয়, চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী। এতক্ষণ আমারও ধারনা ছিল, শত্রুদের তীরের ভয়েই ওরা এগুচ্ছে না। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, দুশমন তীরন্দাজরা তাদের ঘাঁটি খালি করে চলে গেছে অন্য পাশে। স্পেনীয় সেনাদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হলে তারা ঘাঁটি ছাড়তো না। তার মানে আলফান্সু ও সুলতানদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন আঁতাত হয়েছে। এ অবস্থায় বিলম্ব করার অবকাশ নেই আমাদের। আমরা প্রাচীর রক্ষীদের ওপর হামলা করছি। তাদের মনে অসৎ উদ্দেশ্য

যা থাকলে এগিয়ে আসবে, আর উদ্দেশ্য খারাপ হলে আমরা জীবন বাজি রেখে ওদের অভাব পূরণ করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আপনি আপনার বাহিনীকে হামলা করতে বলুন। আমরা প্রাচীর দখল করতে না পারলেও অন্য দিকের চাপ কিছুটা কমাতে পারবো। খণ্ডরাজ্যের সৈন্যরা এগিয়ে না এলে আপনি আমীর ইউসুফকে জানিয়ে দেবেন, স্পেনের মুজাহিদরা স্পেন বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করেছে।'

আবদুল মুনীম আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে মুজাহিদদের নিয়ে প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুশমনের ওপর। নিজে নেতৃত্ব নিলেন মধ্য ভাগের, ডান ও বাম পাশের সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন দুই পুত্র আহমদ ও হাসানকে। মরক্কোর সেনাদলটিও শামিল হল মুজাহিদদের সাথে। প্রাচীরের কাছে পৌঁছে মুজাহিদরা দুশমনদের তীর বৃষ্টির সম্মুখীন হল কিন্তু ঢালের সাহায্যে তীর ঠেকিয়ে প্রাচীরের কাছে পৌঁছে গেল দুঃসাহসী মুজাহিদরা। সিঁড়ি লাগিয়ে ওরা ওপরে উঠার চেষ্টা করল। প্রাচীরের এদিকটায় দুশমন ফৌজ কম ছিল এবং প্রতিরোধও তুলনামূলক দুর্বল ছিল।

মুজাহিদরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পূর্ণশক্তিতে আক্রমণ চালাল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই রক্ষীদের সকল বাঁধা ডিঙ্গিয়ে আবদুল মুনীমের নেতৃত্বে কুড়ি জন মুজাহিদ প্রাচীরে উঠে গেল। শুরু হল প্রাচীরের ওপর হাতাহাতি লড়াই।

এই ফাঁকে আবদুল মুনীমের ডান ও বাম পাশ থেকে আহমদ এবং হাসানও প্রাচীরে উঠে কিছু অংশে তাদের দখলে নিয়ে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেল্লার পূর্বদিকের প্রাচীরের ওপর দু'শ গজের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হল। পূর্বদিকের চারটি গম্বুজের সকল রক্ষী গম্বুজ ছেড়ে বেরিয়ে এল বাইরে। প্রাচীরের ওপর তলোয়ারের ঠোকাঠুকি আর উভয় পক্ষের আহত সৈনিকদের মরণ চিৎকারে কেল্লার এ অংশে এক তুলকালাম অবস্থার সৃষ্টি হল। উভয় পক্ষের আহত সৈনিকরা কেল্লার বাহির এবং ভেতর দিকে সমানে ছিটকে পড়তে লাগল।

প্রাচীর রক্ষীরা হাতাহাতি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ায় অন্যান্য মুজাহিদরাও প্রাচীরের ওপর উঠে আসার সুযোগ পেল। কিন্তু যে সব খৃষ্টান সৈন্য এ এলাকা নিরাপদ ভেবে অন্যত্র চলে গিয়েছিল, তারা এ এলাকা বেদখল হতে দেখে দ্রুত ফিরে এলো, ফলে লড়াই আরো তীব্রতর রূপ নিল।

কেল্লার ভেতর দিক থেকে প্রাচীরে ওঠার জন্য অসংখ্য সিঁড়ি লাগানো ছিল প্রাচীরের গায়ে। প্রতিটি গম্বুজে চড়ার জন্য ছিল প্রাচীরের অভ্যন্তর দিয়ে সিঁড়ি দরোজা। চারটি গম্বুজেরই ভেতরের দরজা খুলে দেয়া হল। প্রাচীরের গায়ে লাগানো সিঁড়ি এবং গম্বুজের সিঁড়ি দরোজা দিয়ে বিপুল সংখ্যক খৃষ্টান সৈন্য প্রাচীরের ওপর উঠে আসল।

মুজাহিদরা দেখতে পেল, উভয় দিক থেকে দুশমন তাদের ঘিরে ফেলছে। নতুন করে যে সব মুজাহিদ প্রাচীরে চড়ছে, আহত হয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে তার চেয়ে বেশী। ফলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাচীরে ওঠা অধিকাংশ মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলেন।

মুজাহিদরা প্রাচীরে টিকতে না পেরে গম্বুজগুলো দখল করার চেষ্টা করল। একদল চেষ্টা করল কেল্লার ভেতর থেকে নতুন শত্রুসৈন্যের গম্বুজে উঠার পথ বন্ধ করতে। কিন্তু প্রবল প্রতিরোধের মুখে তারা গম্বুজের কাছে যেতে পারল না। খৃষ্টান সেনাদের একজন আহত হলে দু'জন এসে পূরণ করতো তার জায়গা।

এত বেশী খৃষ্টান সৈন্য উপরে উঠে এল যে, তলোয়ার চালানোর জায়গাও আর রইল না। ফলে এখন হাতাহাতি লড়াই চলছিল এবং পরস্পর জড়াজড়ি করে খৃষ্টান ও মুজাহিদ একই সাথে নীচে পড়ে যাচ্ছিল।

সময়টি খঞ্জর ব্যবহারে অভিজ্ঞ মুসলমানদের জন্য অনুকূল হল। কিন্তু সংখ্যায় কম বলে তারাও সুবিধা করতে পারল না।

খঞ্জরাজ্যের সেনাবাহিনী কেল্লা থেকে আড়াইশ' গজ দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে সাধারণ সৈনিকরা অফিসারদের নির্দেশ অমান্য করতে পারছিল না। কিন্তু এই নির্লজ্জতা ও কাপুরুষতা তাদের কাছে অসহ্য ঠেকছিল। বিবেকের তাড়নায় ক্ষতবিক্ষত সৈনিকরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে অবশেষে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হল।

লড়াইয়ের প্রতি সৈনিকদের আগ্রহ ও উত্তেজনা দেখে উত্তপ্ত হয়ে উঠল গ্রানাডার এক অফিসার। সে অধীনস্ত সৈনিকদের বলল, 'এটা স্রেফ বিশ্বাসঘাতকতা। কেয়ামতের দিন আমরা শহীদদের মুখ দেখাবো কি করে?'

গ্রানাডার সালার নির্দেশ দেয়ার আগেই এক যুবক অফিসার তার অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে কেল্লার দিকে ছুটল। দেখতে দেখতে আলমেরিয়া, বাতলিউস, কর্ডোভা ও মোরাভিয়ার সৈন্যদের থেকে তিনশ' সৈনিক তাদের সালারের নির্দেশ অমান্য করে যোগ দিল তাদের সাথে। যারা সালারদের নির্দেশ অমান্য করার সাহস পায়নি তারা দাঁড়িয়ে রইল আগের মতই। কিন্তু সালাররা যখন সৈন্যদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিল তখন আরো দেড়শ' সৈনিক সালারদের গালাগালি করতে করতে আক্রমণকারীদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য তাদের পিছু নিল।

খঞ্জরাজ্যের এসব সৈন্যদের দেখে মুজাহিদদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আবার বেড়ে গেল। আবদুল মুনীম প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে গম্বুজের ভেতর ঢুকে পড়লেন।

গম্বুজে ঢুকেই তিনি উল্কার বেগে গম্বুজ থেকে সিঁড়ি পথে কেল্লায় প্রবেশ করলেন। মাত্র চারজন সৈনিক তার সাথে যেতে পারল। আঙ্গিনায় পৌছতে পৌছতে এদের তিনজন আহত হয়ে পড়ে গেল। সাথে রইল মাত্র একজন।

কেল্লার ভেতরে খোলা আঙ্গিনায় পৌঁছার সাথে সাথেই শত্রুসেনারা তরবারি ও বর্শা তুলে আবদুল মুনীমের সামনে প্রতিরোধের দেয়াল খাড়া করে দিল। তিনি ক্ষুধার্ত বাঘের মত শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুশমনের অস্ত্রের আঘাতে তার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে

গেল। চোখের পলকে তিনি তিনজন শত্রুসৈন্যকে হত্যা করে মুখ থুবরে পড়ে গেলেন এবং সাথে সাথেই আবার উঠে খাড়া হলেন।

শত্রুদের বাঁধা ডিঙিয়ে ছুটে এল মুজাহিদরা। নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ঢুকে পড়ল শত্রু ব্যূহে। আবদুল মুনীম আরো একজনকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেও শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন।

ইদ্রিস প্রচণ্ড জখম নিয়েও এ পর্যন্ত আবদুল মুনীমের সাথেই ছিল। সেও দুশমনদের সারির মধ্যে ঢুকে তিনজনকে হত্যা করে মাটিতে পড়ে গেল। সে যখন আবার উঠার চেষ্টা করছিল তখন এক খৃষ্টান সৈন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ইদ্রিস একবার মাত্র চিৎকার দিয়ে চিরকালের জন্য নীরব হয়ে গেল।

এ সময় পঞ্চাশ-ষাট জন মুজাহিদ কেল্লার আঙ্গিনায় নেমে এল এবং সিঁড়ির সামনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে গেল। প্রাচীরের ওপর থেকে আরো মুজাহিদরা ছুটে আসতে লাগল তাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য।

মুজাহিদ ও কেল্লা রক্ষীদের লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। কখনো মুজাহিদরা ধাওয়া করে খৃষ্টানদের নিয়ে যাচ্ছিল কেল্লার মূল ভবন পর্যন্ত, আবার কখনো ওদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পিছু হটে চলে আসত দেয়ালের কাছে। জীবন মৃত্যুর খেলা চলছিল প্রান্তর জুড়ে। মুজাহিদরা প্রাণপণ লড়াই করছিল মূল ভবনের সিঁড়িটি দখল করার জন্য।

খণ্ডরাজ্য সৈনিকরা ছুটে এসে মুজাহিদদের শক্তি বৃদ্ধি করল। এক দল আরো একটি গম্বুজ দখল করে খুলে দিল তার দরজা। আহমদের অধীনস্ত সেনারা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সে খোলা দরজা দিয়ে।

মুহূর্তে তারাও এসে শামিল হল কেল্লার আঙ্গিনায় যুদ্ধরত মুজাহিদদের সাথে। সৈন্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল প্রায় সাতশতে। আরো সৈন্যকে প্রাচীর টপকে ভেতরে আসার সুযোগ দেয়ার জন্য তারা এবার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ শুরু করল।

স্পেনীয় সেনাদের এক তৃতীয়াংশ তখনো প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আসতে পারেনি, হঠাৎ খৃষ্টানদের একটি দল বামদিক দিয়ে আক্রমণ করল তাদের। মুজাহিদদের ঠেলে দিল ময়দানের ডান দিকে।

৬.

আবদুল মুনীমের শাহাদাতের পর মুজাহিদদের পরিচালনার ভার পড়ল আহমদের ওপর। হাসানের লড়াকু মুজাহিদরা তখনো বাম দিকের অবশিষ্ট গম্বুজ দু'টি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে। তাদের সাথে আছে আমীর ইউসুফের নিয়োজিত উপজাতীয় ক্ষুদ্র দলটি। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা গম্বুজ দুটির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। মরক্কো দলের সালার হাসানকে বলল, "আপনি কিছুক্ষণ আমার

সৈন্যদেরও পরিচালনা করুন। আমি আমীর ইউসুফকে এদিকের অবস্থা অবহিত করে তার নতুন নির্দেশ নিয়ে আসি।'

হাসান এখন লড়াই করছিল কেল্লার পূর্ব দিকের প্রধান ফটক দখল করার জন্য। কেল্লার ফটক খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সেখানকার রক্ষা ব্যবস্থাও ছিল মজবুত। পর পর দুবার আক্রমণ চালিয়েও হাসান ফটক দখল করতে পারল না। শত্রুরা তীর ও গরম তেলের সাহায্যে তার দুটি আক্রমণই ব্যর্থ করে দিল। তৃতীয়বার পঞ্চাশ জন দুর্ধর্ষ মুজাহিদ নিয়ে হাসান আবার আক্রমণ চালাল। ফটক রক্ষীদের ডানে-বাঁয়ে হটিয়ে দিয়ে কোণঠাসা করে ফেলল তাদের। কিন্তু কিছুতেই কেল্লার ফটকের দখল ছাড়তে রাজি নয় খৃষ্টান বাহিনী। কোণঠাসা হয়েও মরিয়া হয়ে তারা দাঁত কামড়ে আঁকড়ে রইল নিজেদের দখল। অবস্থা নাজুক দেখে খৃষ্টান সালার ফটক রক্ষীদের সাহায্যে নতুন সেনাদল পাঠাল। শুরু হল ঘোরতর লড়াই।

হঠাৎ হাসানের পাশ থেকে এক রাবাতী সৈনিক চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ দেখুন আমাদের সৈন্যরা এদিকে আসছে।'

মুখ ঘুরিয়ে তাকাল হাসান। দেখল, কেল্লার দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ধূলিঝড় তুলে ছুটে আসছে আমীর ইউসুফের অজেয় বাহিনী। সাথে সাথেই হাসান অনুভব করল, আফ্রিকান বাহিনীর মোকাবেলার জন্য দুশমনরা এবার পঙ্গপালের মত ধেয়ে আসবে এদিকে। আফ্রিকান বাহিনীর সাথে টক্কর লাগার আগেই সে বিশাল স্রোতের মুখে পড়তে হবে মুজাহিদদের। নিমেষে ওরা কচুকাটা করে ফেলবে মুজাহিদদের। হাসান চিৎকার করে বলল, 'মুজাহিদ ভাইয়েরা! খোলা ময়দান ছেড়ে জলদি প্রাচীর, গম্বুজ থেকে নেমে এসে ফটকের দখল নাও।'

তৎক্ষণাৎ কেল্লার পূর্ব দিকের সমস্ত সৈন্য ছুটল ফটকের দিকে।

মুজাহিদরা দুশমনদের বেপরোয়া হত্যা করে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। একদল মুজাহিদ নিয়ে হাসান ঢুকে গেল দুশমনের ঘেরাওয়ের মধ্যে। বিপুল বিক্রমে আঘাত হেনে হাসান ঘেরাও থেকে বের হয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সহসা একদল শত্রুসৈন্য বল্লম ও তরবারির দেয়াল খাঁড়া করে তার পথরোধ করে দাঁড়াল।

প্রাচীর রক্ষীরা কেল্লার সৈনিকদের কাছে মরক্কো বাহিনীর আগমনের খবর পৌঁছে দিল। কেল্লার সালার রিজার্ভ বাহিনীকে পাঠিয়ে দিল এ সয়লাব রুখতে। এই সংরক্ষিত বাহিনী ময়দানে এসেই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করল। কেল্লার ভেতরে লড়াইরত মুজাহিদদের তুলনায় আহত ও মৃতদের সংখ্যা বেড়ে গেল কয়েকগুণ। মুজাহিদরা একটি তরবারি তুললে তাকে বাঁধা দিতে ছুটে আসতো দুশমনের কয়েকটি তরবারি।

দু দিক থেকে লড়াই করতে করতে ফটকের কাছাকাছি এসে মিলিত হল আহমদ ও হাসান। তাদের সাথে তখন মাত্র সত্তর জন মুজাহিদ ও আটাশজন উপজাতীয় সৈন্য। অন্যান্যরা আহত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে দুশমনের মোকাবেলা করছে। দরজা

আটকে দাঁড়িয়ে আছে দুশমনের তীরন্দাজ বাহিনী।

সালারের নির্দেশে হঠাৎ খৃষ্টান সেনারা ডান ও বাম দিকে সরে গেল। মাঝখান দিয়ে ফটক আটকে দাঁড়ানো তীরন্দাজ বাহিনী মুজাহিদদের প্রতি শুরু করল তীর বর্ষণ। মুজাহিদরা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেল ফটকের দিকে। তীর বৃষ্টির মধ্য দিয়ে অবশেষে ত্রিশজন দুর্ধর্ষ মুজাহিদ ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ফটকে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাদের বর্মগুলোতে অনবরত আঘাত হানছিল ঝাঁক ঝাঁক তীর।

ফটকে পৌঁছেই আহমদ ও তার সংগীরা নারায়ে তাকবীর ধ্বনি তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল রক্ষীদের ওপর। আহমদ তরবারির আঘাতে হত্যা করল এক রক্ষীকে। ফটকের বাইরে থেকেও এ সময় নারায়ে তাকবীর ধ্বনি শোনা গেল। মুজাহিদরা দ্বিগুণ উৎসাহে কয়েকজন খৃষ্টানকে হত্যা করে সামনে বেড়ে ফটক স্পর্শ করল। দুশমন তলোয়ার বের করে তাদের ওপর টুটে পড়লে ওরা দরজার দিকে পিঠ রেখে দুশমনের আঘাত প্রতিহত করতে লাগল।

'দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও' বলতে বলতে হাসান পেছন থেকে ফটক রক্ষীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গ্রানাডার মুজাহিদ ইলিয়াস, দুজন মরক্কো সেনা ও চারজন আলমেরিয়া ও ভিগার মুজাহিদ হাসানের ডানে ও বামে পৌঁছে গেল। তারা সারিবদ্ধভাবে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদেরকে ফটকের কাছ থেকে হটিয়ে দিল। কিন্তু এ সময় আঙিনা থেকে নতুন একদল শত্রুসেনা তরঙ্গের মত তাদের দিকে এগিয়ে এল। শত্রুদের দুটি বর্শা এক সাথে হাসানের বুকে আঘাত করল। কাঁধে এসে পড়ল তরবারির আঘাত। সাথে সাথে সে মাটিতে পড়ে গেল। হাসানের সাথে সাথে ইলিয়াসও আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং খৃষ্টান সেনারা প্রবল বেগে অগ্রসর হয়ে পুনরায় ফটক আটকে দাঁড়াল।

এদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বিশজন মুজাহিদ আবার একত্রিত হয়ে ছুটে এল ফটকের কাছে। তারা আহমদ ও তার সংগীদের নিয়ে দরজা খুলে দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু খৃষ্টানরা প্রতিরোধের দেয়াল তুলে পাঁচজন মুজাহিদকে শহীদ করে দিল। আহমদ ও তার সংগীরা প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে আবার ফটক স্পর্শ করল এবং ফটকের বড় লৌহদণ্ডটি সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হল। আহমদ ও তার বন্ধুরা নারায়ে তাকবীর ধ্বনিতে কেল্লা কাঁপিয়ে ফটকের পাল্লায় ধাক্কা দিল। সংগে সংগে খুলে গেল ফটক।

রাবাতের মুজাহিদরা প্রচণ্ড ধ্বনি তুলে প্রবল ঝড়ের বেগে কেল্লায় প্রবেশ করল। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন স্বয়ং আমীর ইউসুফ বিন তাশফিন। সে সময় স্পেনের মুজাহিদ, খণ্ডরাজ্য শাসকদের বিদ্রোহী সৈন্য এবং উপজাতীয় দলের সৈন্য মিলিয়ে মাত্র দশজন সৈনিক ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আমীর ইউসুফের বাহিনীকে স্বাগত জানাচ্ছিল।

আমীর ইউসুফ কেল্লায় প্রবেশ করেই সাড়াশি আক্রমণ চালালেন। ফটক থেকে

শুরু করে প্রাচীর, গম্বুজ, চত্বর এবং খোলা আঙিনা সর্বত্র খৃষ্টানদের লাশের স্তূপ জমে গেল।

কেল্লার ভেতরের খৃষ্টান সেনারা পরিখার পুল সরিয়ে দিল। ফলে পুলের এপারের কোন খৃষ্টান সৈন্য পালাবার কোন জায়গা খুঁজে না পেয়ে ডানে বায়ে ছুটাছুটি করতে লাগল।

আমীর ইউসুফ তার বাহিনীকে দু'দলে বিভক্ত করলেন। একদল পাঠালেন দক্ষিণে, অন্যদলকে উত্তরে। প্রবল বন্যার মত দুই দল ছুটে গেল দুদিকে। দুশমনদের সকল ঘাঁটি তছনছ করে দিয়ে পশ্চিম দিকে ছুটল তারা।

ইতিমধ্যে সিয়ার বিন আবু বকর এক তীব্র সংঘর্ষের পর পশ্চিমের ফটক দিয়ে কেল্লায় ঢুকে পড়ল। ফলে খৃষ্টানরা দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে চিড়চ্যাপ্টা হয়ে গেল। দ্বিমুখী হামলার শিকার হয়ে ওরা পরিখা ও প্রাচীরের মাঝখানে ছুটাছুটি করতে লাগল। অনেকে আত্মসমর্পণ করল। অনেকে লাফিয়ে পড়ল পরিখার ভেতর। কেউ কেউ ঘোড়ার আস্তাবলে ঢুকে ঘাস ও পশুখাদ্যের স্তূপের নিচে আশ্রয় নিল।

আমীর ইউসুফের সাথে মিলিত হয়ে সিয়ার বিন আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আপনার কি আদেশ?'

আমীর ইউসুফ মূল কেল্লার সর্বোচ্চ মিনারটির দিকে ইশারা করে বললেন, 'আজকের যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের পবিত্র আত্মা ওই মিনারের ওপর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। চূড়ান্ত বিজয়ের পর ও মিনারে ইসলামী ঝাণ্ডা উড়ানোর আগে আমাদের তারবারি কোষবদ্ধ হতে পারে না।'

হিসনুল্লায়েত কেল্লার মূল ভবনের চারপাশ দিয়ে গভীর পরিখা খনন করা ছিল। কেল্লার বহিঃপ্রাচীরের পর একাধিক দেয়াল ও আঙিনা পার হয়ে বিশাল খোলা চত্বর। এ চত্বরে আস্তাবল, গুদামঘর, রান্নাঘর, অস্ত্র মেরামত কারখানা ও রক্ষী ছাউনি ছাড়া বাকী বেশীর ভাগই খোলা প্রাঙ্গণ। এ প্রাঙ্গণের পর পরিখা, এরপর কেল্লার মূল ভবন। মুসলিম বাহিনী ইতিমধ্যেই বহিঃপ্রাচীর, অভ্যন্তরীণ দেয়াল ও আঙিনা পার হয়ে পরিখা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

সায়ের বিন আবু বকর জবাবে বলল, 'এখনো কেল্লার ভেতরে অনেক শত্রুসেনা রয়েছে। আমরা এখানে ঘাঁটি তৈরী করে চারদিক থেকে তাদের অবরোধ করে বসলে তারা খুব শীগগীরই অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।'

আমীর ইউসুফ বললেন, 'এক সময় আমারও ধারণা ছিল, হিসনুল্লায়েত একদিনে দখল করা যাবে না। কিন্তু পূব দিকের প্রাচীর ও তার আশপাশে শোয়া দুহাজার মুজাহিদের লাশ আমার কানে কানে বলছে, আল্লাহতায়ালা এ কেল্লার বিজয় বিলম্বিত করতে চান না। কিছুক্ষণ আগেও মুষ্টিমেয় মুজাহিদ পূবের ফটক খুলতে পারবে কেউ এমনটি ধারনাও করেনি। এর জন্য দরকার ছিল বিরাট বাহিনীর। স্পেনের মুজাহিদরা, খণ্ডরাজ্য শাসকদের

বিশ্বাসঘাতকতার কেবল ক্ষতিপূরণই করেনি, তারা আমাদের বিজয়ের দুয়ারও খুলে দিয়েছে। তুমি এ প্রাচীরের আশেপাশে যে সব ঘাস, খড়, রসদের স্তুপ আছে, এগুলোতে আগুন ধরিয়ে দাও। বাইরের প্রাচীরে দুশমনের পরিত্যক্ত যে মিনজানিক রয়েছে সেগুলো থেকে গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু কর মূল ভবনে।"

নির্দেশ মোতাবেক স্তুপীকৃত ঘাস ও গোলাঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হল। প্রাচীরের ভেতরে চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা লক্‌লক্‌ করতে থাকল। আমীর ইউসুফের নির্দেশে আস্তাবল থেকে সব ঘোড়া বের করে আনা হল। শহীদদের লাশ ও আহতদের পশ্চিম দিকের ফটকে জড় করা হল। আভ্যন্তরীণ প্রাচীরটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

বাতাসের ঝাপটায় আগুনের শিখা কখনো কখনো মূল ভবনের অভ্যন্তরে ঢুকে যাচ্ছিল। প্রাচীরের ওপর থেকে সেনাবাহিনী কেল্লার ভেতরে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করল। সিয়ার বিন আবু বকরের নির্দেশে সৈন্যরা ঘাসের বোঝা নিয়ে মূল ভবনের দক্ষিণ দিকে জড়ো করতে লাগল।

তারপর সেই বিশাল ঘাসের স্তুপে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে আগুন দক্ষিণ দিকের দরজা স্পর্শ করল। চারদিক থেকে আগুনের তাপ, ধোঁয়ার আক্রমণ এবং বাইরের প্রাচীর থেকে গোলা নিক্ষেপের ফলে শত্রুসেনারা আগেই অস্থির হয়ে উঠেছিল। এবার দক্ষিণের দরজায় আগুন জ্বলে ওঠায় তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। হঠাৎ উত্তর দিকের পুলটি পরিখার ওপর নামিয়ে লোহার বর্ম পরে পাঁচ হাজার খৃষ্টানসেনা ছিটকে বেরিয়ে এল ভবনের থেকে।

আমীর ইউসুফ তাদেরকে কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দিলেন। অর্ধেক সৈন্য পুল পার হওয়ার পর অপেক্ষমান বর্শাধারীদের হুকুম দিলেন হামলা করার। অগণিত দুশমন ফৌজ লুটিয়ে পড়ল পরিখা ও তার আশেপাশে। বাকীরা আবার ঢুকে গেল জ্বলন্ত কেল্লায়। কেউ কেউ পুড়ে মরল, কেউ আটকা পড়ল কেল্লায়, বাকীরা পুলের অদূরে দাঁড়িয়েছিল হতবুদ্ধি হয়ে।

যারা বেরিয়ে এসেছিল, বর্শাধারী ও রাবাতী সেনাদের আঘাতে লুটিয়ে পড়ছিল তারা। বাঁচার আশায় বাকীরা প্রবল বেগে ছুটতে চাইছিল বাইরের দরজার দিকে। আমীর ইউসুফ তাদের সামনে উন্মুক্ত তরবারীর প্রাচীর খাড়া করলে সংক্ষিপ্ত অথচ রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ সংঘটিত হল সেখানে। অল্প কয়েকজন খৃষ্টান সেনা প্রথম সারির ঘেরাও থেকে বের হয়ে গিয়ে পড়ল উপজাতীয় সৈন্যদের হাতে।

সেনা পরিচালনা করছিলেন স্বয়ং আমীর ইউসুফ। দুশমনের মাথায় মুজাহিদদের তরবারি বজ্রের মত পড়ছিল। আমীর ইউসুফের লৌহবর্ম রক্তে লাল হয়ে গেল। বার বার তরবারি বদল করলেন তিনি। চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে বাকীরা আত্মসমর্পণ করল।

আমীর ইউসুফ যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিলেন। মুহূর্তে এ আদেশ সর্বত্র প্রচার করা হল। সাথে সাথে তরবারি কোষবদ্ধ করল মুজাহিদরা। খৃষ্টান সেনাদের মনে হল, যেন

আমীর ইউসুফ প্রতিটি সৈনিকের হাত ধরে এক মুহূর্তে যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন।

কেল্লায় আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আমীর ইউসুফ কয়েদীদের বাইরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন।

৭

এ ছিল এক বড় ধরনের বিজয়। এত বড় সাফল্যের পরও আমীর ইউসুফের চেহারায় বিজয়ানন্দের পরিবর্তে ছিল ব্যথা ও বেদনার ছাপ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যিনি দারাজ হাসিতে উদ্ভাসিত করতে পারেন চেহারা তার মুখ আজ বেদনামলিন। চোখে আনন্দের পরিবর্তে কষ্টের অশ্রু। অব্যক্ত কান্নার ছাপ তার মোবারক চেহারায়। অসংখ্য শহীদের লাশ তাকে বেদনা বিধুর করে তুলেছে। খণ্ডরাজ্য শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি।

আবদুল মুনীম ও হাসানের লাশ নিজ হাতে কবরে নামালেন আমীর ইউসুফ। হাসানের মুঠিতে তখনো তরবারির বাট। এক সিপাহী তরবারিটি হাত থেকে খুলতে গেলে আহমদ কেঁদে বলল, 'না না, আমার ভাইয়ের অহংকার ছিনিয়ে নিও না। তরবারির চাইতে কিছুই প্রিয় ছিল না তার। সে বলত, 'তরবারির সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।'

হাসানকে তলোয়ার হাতে ধরা অবস্থায় দাফন করা হলো। তার পাশে ইদ্রিস, ইলিয়াস এবং তার আরো কয়েক বন্ধুকেও সমাহিত করা হলো।

এক সালার এসে আমীর ইউসুফকে বললেন, 'এক আহত সৈনিকের অবস্থা খুবই খারাপ। অজ্ঞান অবস্থায় সে বার বার আপনার নাম উচ্চারণ করছে। মনে হয় আপনাকে কিছু বলতে চায় সে।'

আমীর তাঁবু থেকে বের হয়ে আহত ব্যক্তির কাছে গেলেন। অজ্ঞান অবস্থায়ও বিড়বিড় করে কিছু বলছিল সে। যে সিপাইটি তার সেবা করছিল সে বলল, 'আমি একে চিনি। সে সাদ বিন আবদুল মুনীমের সংগী। কেল্লার উত্তর দিকে প্রাচীরের বাইরে পড়েছিল সে। কি করে ও এখানে এলো তা বুঝতে পারছি না। একটু আগেও সে আলফানসু ... বেঈমানরা ... সুলতান.. বলে বিড়বিড় করছিল। আপনারও নামও বার বার উচ্চারণ করছিল।'

আমীর ইউসুফ এক সিপাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সিয়ার বিন আবু বকরকে ডাকো।'

[illegible]

আবদুল মুনীমের সাথে ছিল। মনে হচ্ছে , সাদ কোন জরুরী খবর দিয়ে তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল। তুমি এখনি একদল অশ্বারোহীকে প্রস্তুত হতে বলো। আমার সন্দেহ হচ্ছে, খণ্ডরাজ্য শাসকরা নতুন কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।'

'খণ্ডরাজ্যের সেনাবাহিনী পালিয়েছে। ভবিষ্যতে আর কখনো শিয়ালের সাথে বাঘের [illegible] ।'দি [illegible]।

আহত সৈনিক বার কয়েক বিড়বিড় করে চোখ খুলল। আমীর ইউসুফকে দেখতে পেয়ে বলল, 'আমি বহু চেষ্টা করেছিলাম আপনার কাছে পৌছতে। কিন্তু আপনি যুদ্ধে লিপ্ত থাকায়.....।'

আমীর ইউসুফ চটজলদি প্রশ্ন করলেন, 'তোমাকে সাদ পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে.... সাদ... সাদ পথে ধরা.... শাহজাদা রশীদ... বলেছে...... ফানসু.. .ফৌজ নিয়ে.... আস...... এ পর্যন্ত বলে সে চোখ বুঁজল।

আহত ব্যক্তির চোখ বন্ধ। হেকিম তার হুশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। পুনরায় চোখ খুলল সে। কিন্তু এবার শুধু তার ঠোঁট কাঁপল, গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হ ল না। আমীর ইউসুফকে দুর্ভাবনার সমুদ্রে ফেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল সৈনিক।

'অশ্বারোহীরা তৈরী।' বললেন সিয়ার বিন আবু বকর।

আমীর ইউসুফ বাইরে এলেন। ছাউনির সামনে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে একদল অশ্বারোহী। আচানক সিয়ার বিন আবু বকর উত্তর দিকে ইশারা করে বললেন, 'ঐ দেখুন একদল অশ্বারোহী ছুটে আসছে। মনে হয় ওরা সাদের লোক।'

থমকে দাঁড়ালেন আমীর ইউসুফ। অবাক হয়ে আগন্তুক অশ্বারোহীদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। একটু তাকিয়ে দ্রুত পায়ে সেদিকে এগুতে শুরু করলেন তিনি। ফৌজি অফিসার অনুসরণ করল তাকে।

অশ্বারোহীরা আমীর ইউসুফের সামনে এসেই দ্রুত ঘোড়া থেকে নামল। আলমাসের ঘোড়ায় এক জখমী। আমীর ইউসুফ তাকালেন জখমীর দিকে। সাদকে দেখেই ধ্বক করে উঠল তার বুক। সাদের বর্মে শুকিয়ে আছে চাপ চাপ রক্ত। জ্ঞান নেই তার। সাদের সংগীরা কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না, এমন মারাত্মক আহত অবস্থায় এত দীর্ঘ সফরের পরও সাদ বেঁচে আছে। কিন্তু মায়মুনার অন্তর বার বার জপছিল, 'তিনি বেঁচে আছেন, তিনি বেঁচে আছেন, আমার প্রিয় স্বামী নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন।'

ঘোড়া থেকে নামিয়ে সাদকে কাছেই এক তাঁবুতে নেয়া হল। পিঠে তীর বিদ্ধ থাকায় তাকে শোয়ানো হল উপুড় করে। মায়মুনা স্থান-কাল ভুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে। আমীর ইউসুফ ঝুঁকে সাদের নাড়ি পরীক্ষা করলেন। এরপর হাতের ইশারায় সকলকে বাইরে যেতে বললেন। সাথে সাথে সকলেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল, রইল শুধু আলমাস ও মায়মুনা।

আমীর ইউসুফ মায়মুনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?'

মায়মুনা তখন এ জগতে ছিল না। আমীর ইউসুফের প্রশ্ন সে শুনতে পায়নি। আলমাস বলল, 'ইনি সাদের স্ত্রী।'

খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল আহমদ। তাঁবুতে ঢুকে ভাইয়ের অবস্থা দেখে

বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল সে অপলক চোখে। দু'জন চিকিৎসক নিয়ে তাঁবুতে ঢুকলেন সিয়ার বিন আবু বকর। তাদের একজন ছিল সেভিলের সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করা হেকিম।

আমীর ইউসুফ হেকিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। আজ যদি এ নওজোয়ানকে আপনারা বাঁচিয়ে তুলতে পারেন, তাহলে আমি মনে করব, আমরা আরেকটি কেল্লা জয় করেছি।'

সেভিলের চিকিৎসক সাদের নাড়ি দেখে বললেন, 'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনি দোয়া করুন এবং সবাইকে বাইরে যেতে বলুন।'

আহমদ ও মায়মুনা ছাড়া সবাই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। আমীর ইউসুফ তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আহমদ, তুমিও এসো। তুমিও এসো মা।'

'এসো বোন।' আহমদ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল।

মায়মুনা ধীর পায়ে তাঁবুর বাইরে এলো। তাঁবুর বাইরে তখন অনেক ফৌজি অফিসার গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমীর ইউসুফ নায়েবে সালারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিভাবে আহত হলো সাদ?'

নায়েবে সালার জেয়াদ ও তার সংগীর গ্রেফতারী থেকে শুরু করে সকল কাহিনী খুলে বলল এবং খণ্ডরাজ্য শাসকদের নামে আলফানসুর পত্র আমীর ইউসুফের হাতে দিল। আমীর ইউসুফ চিঠি পড়া শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, ' সেই কয়েদী কোথায়?'

'তাকে কেল্লায় রেখে এসেছি।'

'কেল্লা রক্ষায় কতজন আছে?'

'আমি বিশজনকে রেখে এসেছি। বলে এসেছি, অন্যান্য ফাঁড়ি থেকে যারা আসবে, তাদেরকেও কেল্লাতেই রেখে দিও।'

আমীর ইউসুফ সিয়ার বিন আবু বকরকে বললেন, 'সিয়ার, এই মুহূর্তে পাঁচশ' সৈন্য কেল্লায় পাঠিয়ে দাও। আর বাকী সেনাদের কাল ভোরেই রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলো।'

এখানে আসা অবধি মায়মুনা কোন কথা বলেনি। স্বামী শোকে বোবা হয়ে গিয়েছিল সে। আমীর ইউসুফের শেষ বাক্যটি যেন তাকে চাবুকের আঘাত হানল। আচানক উঠে দাঁড়াল সে। কম্পিত পায়ে এগিয়ে গেল আমীর ইউসুফের সামনে। হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'ফিরিয়ে নিন আপনার হুকুম, ফিরিয়ে নিন।' তারপর কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ।

এবার ভেসে এল মায়মুনার মিনতি ভরা কণ্ঠ, 'না না আমীর! স্পেনে আপনার হাজারো মা, হাজারো বোনের কান্না এখনো থামেনি, আমাদের এ অসহায় অবস্থায় ফেলে আপনি এখান থেকে যেতে পারেন না। এখনো আপনি বেঈমানদের হিসাব নেননি, জাতির বিশ্বাসঘাতকদের বিচার করেননি। আমার স্বামী যে ভোরের সূর্যোদয়ের আশায়

তার শেষ রক্ত বিন্দু বইয়ে দিয়েছেন, সে সুহাসিনী ভোর আজও আসেনি। স্পেন এখনও গোলামীর শিকলে বাঁধা। এখনও মজলুমদের কাতর আর্তনাদ থামেনি। আপনার বোন ও কন্যাদের চোখের অশ্রু আপনি আজও মুছে দেননি। এ অবস্থায় আপনার বিবেক কি করে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করতে পারল?

আপনি স্পেনের খণ্ডরাজ্য শাসকদের সাহায্যে এসে থাকলে জাল্লাকা বিজয়ের সাথে সাথে আপনার কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বার আপনার আর এ মাটিতে পা দেয়ার কোন দরকার ছিল না। কারণ খণ্ডরাজ্য শাসকরা খৃষ্টানদের সাথে এ রাজ্য ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছিল। কিন্তু যদি আপনি এদেশে ইসলামের পতাকা উড়াতে এসে থাকেন, তাহলে আপনার উদ্দেশ্য আজও সফল হয়নি।

যদি আপনি এখন চলে যান, তাহলে জাল্লাকা ও হিসনুল্লায়েতের শহীদদের রক্ত বৃথা যাবে। বৃথা যাবে তাদের জন্য যারা অশ্রু বিসর্জন করছে তাদের হা-হুতাশ। শিয়াল ও শকুনের হাতে আপনি আমাদের তুলে দিতে পারেন না। আপনি আপনার এ আদেশ প্রত্যাহার করুন।'

কান্নায় মায়মুনার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। ব্যাকুল চাহনি নিয়ে সে তাকিয়ে রইল আমীর ইউসুফের দিকে।

আমীর ইউসুফ মায়মুনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মা, তোমার এ অশ্রু ও তোমার স্বামীর রক্তের শপথ করে বলছি, স্পেন স্বাধীন হবে। জাল্লাকা ও হিসনুল্লায়েতের শহীদদের রক্ত আমি বৃথা যেতে দেবো না। আমি আমার সেনাবাহিনীকে ফিরে যাওয়ার জন্য নয়, আলফানসুর বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্দেশ্যে রওনা করার নির্দেশ দিয়েছি। আলফানসুর সাথে হিসাব-নিকাশ শেষ করার পর সেই সব বিশ্বাসঘাতকদের হিসাব নেবো আমি, যাদের চক্রান্তের কারণে আজ হিসনুল্লায়েতের কেল্লায় মুজাহিদদের লাশ স্তুপীকৃত হয়েছে।

আমি সেই সব নিকৃষ্ট জীবদের কখনো ক্ষমা করবো না, যারা আল্লাহর নামে শপথ করে তা ভঙ্গ করেছে। স্পেন ছেড়ে যাওয়ার আগে আমি অবশ্যই আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানদের গর্দানগুলো এমন হাতে তুলে দিয়ে যাব, যেসব হাত ইস্পাতের চেয়েও কঠিন।'

আমীর ইউসুফ যখন বলছিলেন, শ্রোতাদের মনে হচ্ছিল যেন আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা প্রচণ্ড গর্জন করে বেরিয়ে আসছে।

৮.

গভীর রাত। সাদের জীবন প্রদীপ নিভুনিভু। চিকিৎসক তার জীবন সম্পর্কে আশা-নিরাশার দোলায় দুলছেন। তাঁবুর বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন আমীর ইউসুফ। আগে কখনও তাঁকে এতটা অস্থির ও শোকাচ্ছন্ন হতে দেখেনি কেউ। মায়মুনার কথাগুলো

এখনও তাঁর কানে বাজছে। তিনি আকুতি ভরা চিত্তে দোয়া করছিলেন, 'হে মাওলা! তোমার রহমতের দরিয়া থেকে সামান্য একটি বিন্দু পেলেই লাখো মানুষ তার হারানো সুখ ও আনন্দ ফিরে পেতে পারে। মাওলা! তোমার এ নগন্য বান্দা তার এক মেয়ের চোখের অশ্রু মুছে দেয়ার জন্য সাদের জীবন ভিক্ষা চাইছে। রাহমানুর রাহীম, আমার এ ছোট্ট আবেদনটুকু মেহেরবানী করে কবুল করো।'

আমীর ইউসুফ তাঁবুর বাইরে এক পাথরের ওপর বসলেন। ময়দানে তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে হিসনুল্লায়েত কেল্লা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল যুদ্ধের দৃশ্যপট। শহীদের লাশের স্তুপের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যেন বলছেন, 'হে ঘুমন্ত মর্দে মুজাহিদরা! তোমাদের এ রক্ত বৃথা যাবে না। তোমাদের এ রক্তের বিনিময়ে স্পেনের ইতিহাসে লেখা হবে নতুন অধ্যায়।'

এক অফিসার এসে বলল, 'হে আমীর, ডাক্তার বলেছেন, সাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। শীগগীরই তার জ্ঞান ফিরে আসবে।'

আমীর ইউসুফ দ্রুত সাদের তাঁবুতে ঢুকলেন। তাঁবুর ভেতর মশাল জ্বলছে। সাদের পাশে বসে আছে আহমদ ও আলমাস। তিনি বিজ্ঞ হেকীমের দিকে তাকালেন। হেকিম বললেন, 'ওর হুঁশ ফিরে আসছে, এ কুদরতের অসীম দয়া।'

খানিক পর। আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে এল সাদের। জ্ঞান ফিরে পেয়েই সে অনুচ্চ কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল, 'হিসনুল্লায়েত!'

আমীর ইউসুফ ঝুঁকে ছিলেন তার মুখের ওপর। তিনি বললেন, 'সাদ, হিসনুল্লায়েতে আমরা জয়ী হয়েছি।'

সাদ চোখ খুলল। আমীর ইউসুফ উঠে গিয়ে দরজার পর্দা সরিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওই দেখো হিসনুল্লায়েত জ্বলছে। কাল সেখানে ছাই ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আল্লাহ্ আমাদের বিজয়ী করেছেন।'

সাদ জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনি কি নতুন সৈন্য নিয়ে আলফানসুর আগমন এবং গাদ্দার শাসকদের ষড়যন্ত্রের খবর পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, আমি সবই শুনেছি। ভোরেই আলফানসুর অগ্রগতি রোধ করতে রওনা হচ্ছি আমি। সেখান থেকে ফিরে এসে গাদ্দারদের ফয়সালা করবো।'

সাদের চেহারায় আনন্দের দ্যুতি ফুটে উঠল। কিন্তু তা কেবল মুহূর্তের জন্য। দুর্বলতার কারণে আবার জ্ঞান হারাল সাদ। চিকিৎসক নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন, 'ওর বিশ্রাম দরকার। আমার বিশ্বাস, সকাল নাগাদ ও বিপদ মুক্ত অবস্থায় এসে যাবে।'

আমীর ইউসুফ মায়মুনা ও আহমদকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন।

পরদিন ভোর। এক হাজার সৈন্য শিবিরে রেখে আমীর ইউসুফ পুরো বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন আলফানসুর উদ্দেশ্যে। যাত্রার আগে আমীর ইউসুফ ও সিয়ার বিন আবু বকর এলেন সাদকে দেখতে। সাদ ঘুমিয়ে ছিল। আলমাস ও মায়মুনা বসেছিল তার

পাশে। বর্ম পরে আহমদ এক পাশে দাঁড়িয়ে।

আমীর তাঁবুতে ঢুকে আহমদকে দেখে বললেন, 'আহমদ! তুমি শিবিরেই থাকবে।' তারপর মায়মুনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তোমার স্বামীর অবস্থা এখন কেমন?'

'আলহামদুলিল্লাহ, আগের চেয়ে ভাল।'

'চিকিৎসক কোথায়?'

'তিনি এখনই ঔষধ খাইয়ে গেলেন।'

আহমদ বলল, 'আমি আপনার সাথে যাওয়ার ব্যাপারে ভাইজানের অনুমতি নিয়েছি।'

আমীর ইউসুফ বললেন, 'না, আমাদের সাথে তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানেই তোমার দরকার বেশী।'

৯.

দশদিন পর। একদিন ভোরে আহমদ হিসনুল্লায়েতের শহীদদের কবর জেয়ারত করছে। আবদুল মুনীম, হাসান ও ইদ্রিসের কবরের পাশে অনেকক্ষণ ধরে দোয়া করল। হঠাৎ পেছনে কারো পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। দেখল আলমাস ও মায়মুনার কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে সাদ।

আহমদ ছুটে গেল তাদের কাছে। বলল, 'ভাইজান! বিছানা ছাড়া ঠিক হয়নি আপনার। এখনও জখমগুলো শুকায়নি।'

সাদ বলল, 'আমি ডাক্তারের অনুমতি নিয়েই এসেছি।'

কবরস্তানে পৌঁছে সাদ হাত উঠিয়ে দোয়া করল। তারপর বিষাদ মলিন চেহারা নিয়ে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

আবদুল মুনীম, হাসান ও ইদ্রিসের কবর জেয়ারত শেষে অন্যান্য কবরগুলোর দিকে তাকাল মায়মুনা। অশ্রুতে ভরে গেল চোখ। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল, 'হিসনুল্লায়েতের শহীদগণ! তোমরা সকলেই আমার ভাই। আমি তোমাদের বোন।'

উত্তর দিকের আকাশে ধূলোর মেঘ দেখা গেল। আহমদ সেদিকে ইশারা করে বলল, 'ভাইজান! সেনাবাহিনী ফিরে আসছে।'

চারদিন আগেই শিবিরে খবর এসেছিল, আলফানসু বিনাযুদ্ধেই পিছু হটে পালিয়েছে। আমীর ইউসুফ কয়েক দিন তাদের পিছনে তাড়া করে ফিরে আসছেন।

সেনাবাহিনীকে আসতে দেখে মায়মুনা আলমাসের সাথে তাঁবুতে চলে গেল। সাদ আহমদের হাত ধরে ধীরে ধীরে সেনাদের আগমন পথের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

হিসাব -নিকাশ

হিসনুল্লায়েতের বিজয় সংবাদে স্পেনের মুসলমানরা যতটা না আনন্দিত হল খণ্ডরাজ্য শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত হল তারচে বেশী। গাদ্দার শাসকদের বিরুদ্ধে জনতার মনে জ্বলে উঠল ক্রোধ ও বিক্ষোভের আগুন।

যে শাসকরা মুসলিম জনসাধারণের রক্ত শোষণ করে বিলাস বহুল জীবন যাপন করছে, তাদের বিরুদ্ধে দেশের অলিতে গলিতে জ্বলে উঠল বিদ্রোহের দাবানল। প্রতিটি মসজিদ ও মাদ্রাসা থেকে ওলামারা ফতোয়া দিল, 'খণ্ডরাজ্যের মুসলিম সুলতানরা কর্ডোভার খৃষ্টান শাসকের সাথে মৈত্রী ও ষড়যন্ত্র করার ফলে ইসলামের নিকৃষ্ট দুশমনে পরিণত হয়েছে। আমীর ইউসুফ তাদের সাথে যেসব শর্তের ভিত্তিতে স্পেনে এসেছিলেন তাদেরই বেঈমানীর ফলে তা বাতিল হয়ে গেছে। তাই ইসলামের এ নিকৃষ্ট দুশমনদের ক্ষমতাচ্যুত করা মুসলমানদের ওপর ফরজে আইন। জনগণের জান মাল, ঈমান ও ইজ্জত বাঁচানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা আমীর ইউসুফের দ্বীনী দায়িত্ব।'

সম্মানিত মুফতিগণ আরো ঘোষণা করলেন, 'এ ফতোয়ার জন্য আমরা সরাসরি আল্লাহর কাছে দায়ী। আমীর ইউসুফ যদি আলেমদের এ ফতোয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে দেশকে বর্তমান শাসকদের হাতে রেখে যান তাহলে স্পেন কাফেরদের অধীনে চলে যাবে এবং এ জন্য আমীর ইউসুফকেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে।'

অন্য এক ফতোয়ায় ওলামায়ে কেরাম খণ্ডরাজ্য শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের দীর্ঘ ফিরিস্তি উল্লেখ করেন। তাতে অন্যান্যের সাথে এ অভিযোগও করা হয় যে, রাণী রেমিকা তার স্বামীকে বিলাসিতা ও শরাব পানে মত্ত রেখেছে এবং সেভিলে যত অনাচার ও শরিয়ত বিরোধী কাজ চলছে তার মূলে রয়েছে রাণী রেমিকা।

পরবর্তীতে ইউরোপের ঐতিহাসিকরা আমীর ইউসুফের স্পেন অভিযানকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করলেও তা ধোপে টেকে না। বিপুল অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত খৃষ্টান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পর খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের পক্ষে নিরপেক্ষ মন্তব্য করা সম্ভব ছিল না বলেই তারা আমীরের সমালোচনা করেছে। নইলে আমীর ইউসুফ জাল্লাকা বিজয়ের পর ইচ্ছা করলেই স্পেনে শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। সে সময় বাস্তবে স্পেন তাঁর দখলেই ছিল এবং মুসলমানদের মনে তাঁরই শাসন চলছিল। কিন্তু তিনি স্পেনের সিংহাসনের বদলে ছোট্ট একটা চুক্তিপত্রকে সম্মান দিয়েছিলেন বেশী।

তিনি স্পেনে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাননি বলেই আলেমদের একাধিক ফতোয়ার পরও তিনি স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন। দেশীয় আলেমদের ফতোয়া দিয়ে তাকে রাজি করাতে না পেরে এসব আলেমরা মুসলিম দুনিয়ার মশহুর আলেমদের সমর্থন

জোগাড় করেছিলেন। এমন কি ইমাম গাজ্জালীও (র.) স্পেনের ফকীহদের ফতোয়া সমর্থন করেছিলেন।

স্পেনের জনতাকে জাগিয়ে তোলার জন্য কোন ফতোয়ারই দরকার ছিলনা। শহীদদের রক্ত ও খণ্ডরাজ্য সুলতানদের গাদ্দারীই তাদেরকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়েছিল। গ্রানাডার মুজাহিদরাই প্রথম আমীর আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলেছিল। কাজী আবু জাফর ছিলেন তাদের সংগঠক। আলফানসুর সাহায্যের আশায় আবদুল্লাহ তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার শুরু করেন। মুক্তিকামী মুজাহিদরা আমীর আবদুল্লাহর প্রভাবশালী উজির মুয়াম্মারের নেতৃত্বে গভীর রাতে গ্রানাডা থেকে লুশায় গিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তারা আমীর ইউসুফের প্রতি আনুগত্যও ঘোষণা দেয়। আবদুল্লাহ সামরিক অভিযান চালিয়ে মুয়াম্মার, মুজাহিদ ও বিশিষ্ট আলেমদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। সে এদেরকে পায়ে শিকল পড়িয়ে গ্রানাডার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানোর আদেশ জারী করে।

আমীর ইউসুফ আলফানসুকে তাড়িয়ে দিয়ে শিবিরে ফিরে এলেন। এসেই শুনলেন গ্রানাডার খবর। সাথে সাথে সেনাবাহিনীকে তিনি গ্রানাডার দিকে যাত্রা করার হুকুম দিলেন। আবদুল্লাহকে খবর পাঠালেন, 'আলফানসু আর তোমার সাহায্যে আসতে পারবে না। তাকে আমি কর্ডোভা সীমান্তের অনেক ভেতরে তাড়িয়ে দিয়ে এসেছি। এখন তোমাদের হিসাব নিকাশের দিন। কুকর্মের ফিরিস্তি আর বাড়াতে না চাইলে মুয়াম্মার ও তার সংগীদের অবিলম্বে মুক্তি দান কর।'

আবদুল্লাহ তার মায়ের চাপে এবং আলফানসুর পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে বন্দীদের মুক্তি দিল। আমীর ইউসুফের কাছে দূত পাঠিয়ে খবর দিল, তিনি আমীরের সাথে দেখা করতে চান।

আমীর ইউসুফ আট মাইল দূরে তাঁবু ফেললেন। গ্রানাডা থেকে আবদুল্লাহ বহু উপঢৌকন নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রামাণের চেষ্টা করল। আমীর ইউসুফের নির্দেশে দু'জন কয়েদীকে তার সামনে হাজির করা হল। তাদের একজন গ্রানাডার অধিবাসী, অন্যজন জেয়াদ।

আমীর ইউসুফ আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এদের চেন?'

আবদুল্লাহ নিজের পেরেশানী দমন করে বলল, 'না, এদেরকে চিনি না আমি।'

আমীর ইউসুফ কয়েদীদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা একে চেন?'

জেয়াদ জবাবে বলল, 'তাঁকে না চিনলে আমার চলবে কি করে? গত আট বছর ধরে আমি তাঁর খিদমত করে যাচ্ছি। তাঁর সব অপকর্মের দোসর আমি। তাঁর দূত হিসাবে আলফানসুর সাথে আমিই দেখা করেছি। তাঁর পক্ষ থেকে মূল্যবান মণি মুক্তার থলে আমিই খৃষ্টান সম্রাটকে উপহার দিয়েছি। গ্রানাডার শাহী মহলের সমস্ত কর্মচারী ও চাকর-নফর জানে, আমি আমীর আবদুল্লাহর একজন বিশ্বস্ত গোলাম।'

আবদুল্লাহ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমীর ইউসুফ গর্জন করে বললেন, 'চুপ থাকো বেঈমান! মানবতার এমন জঘন্য অপমান আমি সহ্য করতে পারিনা। নিয়ে যাও তাকে।'

দু'জন সিপাই আবদুল্লাহ্‌কে পাশের তাঁবুতে নিয়ে তার হাতে পায়ে বেড়ী পরিয়ে দিল।

গ্রানাডার সুলতানকে গ্রেফতার করে ইউসুফ বিন তাশফিন শহরের দিকে রওনা হলেন। গ্রানাডার জনগণ প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে বরণ করল তাঁকে। বিনা বাঁধায় শাহী মহলের দরজা খুলে দিল প্রহরীরা।

পরের দিন হাজার হাজার মুসলমান গ্রানাডার জামে মসজিদে সমবেত হল। আমীর ইউসুফ সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'গ্রানাডায় দুঃশাসনের অবসান ঘটেছে। আজ থেকে শরীয়ত বিরোধী সকল প্রকার কর রহিত করা হল। আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী নুতন সরকার গঠিত হবে এবং সে সরকারের দায়িত্ব হবে দেশে ইসলামী আইন চালু করা।'

কয়েক দিনের মধ্যেই আমীর ইউসুফের বাকী সৈন্যরা গ্রানাডায় এসে পৌছল। সাথে এল আহমদ, আলমাস ও মায়মুনা। ততদিনে সাদের জখম শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শরীর তখনো দুর্বল। সেও এসে পৌঁছল গ্রানাডায়।

কয়েক দিন আগেই সকিনা আবদুল মুনীম, হাসান ও ইদ্রিসের শাহাদাতের খবর শুনেছিল। সাদের আহত হওয়ার সংবাদও পেয়েছিল আগেই। সাদকে দেখামাত্র ছুটে গেলেন তিনি তার কাছে। সাদ ছলোছলো চোখে বলল, 'আম্মাজান, শহীদের খুন ব্যর্থ হবে না। তাঁরা যে উদ্দেশ্যে জীবন দিয়েছেন সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আব্বাজানের সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল কর্ডোভার মুক্তি এবং সে শহরের পরিত্যক্ত বাড়িটি সংস্কার করা।'

সকিনা চোখের অশ্রু মুছে বললেন, 'না বাছা! তিনি জীবন দিয়েছেন সমগ্র জাতির মুক্তি ও আজাদীর জন্য। এখন হাজার হাজার পরিত্যক্ত বাড়ি আবাদ হবে। লাখো মানুষের মুখে ফুটে উঠবে স্বস্থির হাসি।'

এ দিকে তাহেরা মায়মুনার গলা জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছিল।

২.

আমীর ইউসুফ খণ্ডরাজ্য শাসকদের সাথে বড় রকমের কোন যুদ্ধের আশংকা করেননি। গণরোষের কারণে স্পেনের নামমাত্র সুলতানদের শাসন ক্ষমতা নিজ নিজ মহলে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশপ্রেমিক জনগণের কাছে আগে থেকেই তারা গণদুশমন ছিল, এখন সুবিধাবাদীরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করায় তারা হয়ে পড়ল পুরোপুরি গণবিচ্ছিন্ন। অবস্থার এ আকস্মিক পটপরিবর্তনে প্রতিটি খণ্ডরাজ্য শাসকের

চেহারাই ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে লোকজন আমীর ইউসুফের হাতে বাইয়াত গ্রহণের জন্য গ্রানাডায় ছুটে আসছিল। গ্রানাডার সুলতান আবু আবদুল্লাহর গ্রেফতারীর খবরে স্পেনের অন্যান্য রাজ্যের শাসনকর্তারা চোখে শর্ষে ফুল দেখল। তারা একদিকে চেষ্টা করল আলফানসুর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার, অন্য দিকে আমীর ইউসুফের কাছে দূত পাঠিয়ে কাকুতি মিনতি করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল।

আমীর ইউসুফ তাদের কাকুতি মিনতির জবাবে সকলকেই বললেন, 'মুসলমান ভেবে আমি তোমাদের সাহায্য করতে এসেছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেদের ইসলামের নিকৃষ্টতম দুশমন হিসাবে প্রমাণ করেছ। তোমরা কেবল জনগণের সাথেই প্রতারণা করোনি, আল্লাহকেও ধোকা দেয়ার চেষ্টা করেছ। তোমাদের গাদ্দারীর কারণে স্পেনের মুসলমানকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। আর নয়, তিন সপ্তাহের মধ্যে তোমরা এসে আমার কাছে আত্মসমর্পণ না করলে এর সমুচিত জবাব তোমরা অচিরেই পাবে।'

তিন সপ্তাহ কেটে গেল। আফ্রিকা থেকে খবর এল সেখানকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল নয়। উপজাতীয় কোন্দল আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমীর ইউসুফ দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ খবর জানতে পেরে স্পেনের খণ্ডরাজ্য শাসকরা খুশী হয়ে পরস্পরকে মুবারকবাদ জানাল। কিন্তু অচিরেই তারা জানতে পারল, আমীর ইউসুফ সিয়ার বিন আবু বকরের হাতে স্পেনের শাসনভার রেখে যাচ্ছেন। এ খবরে তাদের সকল আশা আকাংখাই কেবল নির্মূল হল না, চরম দুশ্চিন্তাও তাদের গ্রাস করল। কারণ, তারা জানতো, সিয়ার বিন আবু বকর এক ইস্পাত কঠিন মানুষ। শুধু তরবারির ভাষাতেই তিনি কথা বলতে জানেন। আর তার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এমন পর্যায়ের, রহমদীল আমীর ইউসুফকে দুবার ধোকা দেয়া গেলেও তাকে একবারও সম্ভব নয়।

সিয়ার বিন আবু বকরের পরামর্শে কাজী আবু জাফর এক চিঠি লিখলেন শাসকদের উদ্দেশ্যে। স্পেনের সকল শাসকদের কাছে সে চিঠির কপি পাঠানো হল। চিঠিতে তিনি লিখলেনঃ 'স্পেনের বর্তমান শাসকবৃন্দ! তোমাদের পাপের ভারে খোদার জমিন পূর্ণ হয়েছে। এ মাটি আর তোমাদের ভার বহন করতে রাজী নয়। এখন হিসাবের দিন। এ হিসাব নেয়ার জন্য আমীর যাঁকে মনোনীত করেছেন ধোকা খাওয়ার অভ্যাস নেই তাঁর। তার হাত ইস্পাতের চেয়েও কঠিন। তিনি কথা বলেন তলোয়ারের ভাষায়। তোমাদের ননীর পুতুল সিপাহীরা তাঁর পথ রোধ করতে এলে কচুকাটা হতে পারবে, কিন্তু তার পথ রোধ করতে পারবে না। তার চলার গতি কালবৈশাখীর চাইতে তীব্র, ঘূর্ণিঝড়ের মত উদ্দাম। খুন খারাবী না চাইলে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করো। এতেই তোমাদের মংগল নিহিত। নইলে শহীদদের প্রতি ফোটা রক্তের বদলা নেয়া হবে তোমাদের খুন ঝরিয়ে। আর এ রক্তপাতের জন্য দায়ী থাকবে তোমরা।'

৩.

গ্রানাডার শাহী মহল। ইউসুফ বিন তাশফিন সচিবকে দিয়ে চিঠি পত্রের জবাব লিখছিলেন। সাদ বিন আবদুল মুনীম কামরায় ঢুকল। সাদের পরণে সামরিক পোশাক। আমীর ইউসুফ তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'বসো।'

সাদ একটি চেয়ারে বসল। আমীর ইউসুফ চিঠি শেষ করে সাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাদ! সামরিক পোশাকে তোমাকে বেশ মানায়। কিন্তু এখনো তো তুমি সুস্থ হওনি।'

'আমি বিলকুল সুস্থ।' সাদ জবাব দিল।

'সাদ, আমি আগামী কাল চলে যাচ্ছি।'

'সিয়ার আমাকে একটু আগে বলেছে। আমার ধারনা ছিল আপনি আরও কিছুদিন থাকবেন।'

'না, আফ্রিকার অবস্থা ভাল নয়। এ জন্যই আমাকে তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছে। আমি তোমার সাথে একটি জরুরী বিষয়ে পরামর্শ করতে চাই। বলতো, কাকে গ্রানাডার গভর্ণর করলে ভাল হয়?'

সাদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'আমার বিবেচনায় কাজী আবু জাফরই যোগ্যতম ব্যক্তি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কাজী আবু জাফর বার্ধক্যের কারণে এ দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন না। তিনি অন্য একজনকে এ দায়িত্ব দিতে খুবই চাপ দিচ্ছেন।'

'তিনি কে?'

'সাদ বিন আবদুল মুনীম।'

সাদ বিন আবদুল মুনীম চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল। আমীর ইউসুফ এক টুকরো কাগজ সাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কাজী আবু জাফর গ্রানাডার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে এ স্মারকলিপিটি জমা দিয়েছেন।'

সাদ স্মারকলিপিতে এক নজর চোখ বুলিয়ে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বললেন, 'আপনি আমাকে পরামর্শের জন্য ডেকেছেন, না আপনার হুকুম শোনানোর জন্য?'

আমীর ইউসুফ হেসে বললেন, 'এখন সম্ভবত আদেশই দিতে হবে। বসো।'

সাদ আবার বসল। আমীর ইউসুফ গভীর মনোযোগ দিয়ে সাদের ভাবান্তর লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি যদি আমার সন্তান হতে আর আমি বিশ্বাস করতাম তুমি এ পদের যোগ্য নও তাহলে আমি কখনও তোমাকে এ দায়িত্ব দিতাম না। গ্রানাডায় তোমার দরকার রয়েছে।'

সাদ বলল, 'এ আপনার আদেশ না হলে আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন।'

'বলো।'

সাদ বলল, 'কর্ডোভার যে বাড়িতে আমার জন্ম হয়েছিল তা বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। একদিন আমার পিতা সেই বাড়ি থেকে বের হয়ে কর্ডোভার কারাগারে ঢুকেছিলেন। তার আশা ছিল, স্পেনে আল্লাহর আইন চালু হবে, জনগণের মুখে আবার হাসি ফুটবে, আল্লাহর এ সাম্রাজ্যে ফিরে আসবে সুখ-শান্তি এবং তিনি আবার প্রশান্ত চিত্তে সেই বাড়িতে ফিরে যাবেন।

তারপর একদিন আমি আমার মা ও ভাইদের হাত ধরে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসি। সেদিন আব্বার মত আমার অন্তরেও একই আকাংখা জেগে উঠেছিল। কয়েক বছর আগে আমি সেই বাড়িতে কয়েকদিন থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু নিজেকে আমার সেই বাড়িতে একজন অতিথি বলে মনে হয়েছিল। সেদিন আমি মনে মনে শপথ নিয়েছিলাম, একদিন কর্ডোভাকে আমি স্বাধীন করবো। স্বাধীনতার আলোকমালায় সাজাবো যে বাড়িটিতে একদিন আমার জন্ম হয়েছিল। যেখানে আমার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। আমার সে স্বপ্ন আজো পূরণ হয়নি। আজো সে বাড়ি পরিত্যক্ত।

আব্বা ও হাসানের শাহাদাতের পর আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তাদের আত্মা ওই বাড়ির সদর দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কর্ডোভা আজাদ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আত্মা সেখানে আমার প্রতীক্ষায় থাকবে। আর কর্ডোভার আজাদী তখনই সম্ভব যখন স্পেনের প্রতিটি শহরে জনপদে আজাদীর ঝাণ্ডা আমরা উত্তোলন করতে পারবো।'

আমীর ইউসুফ স্নেহের সুরে বললেন, 'সাদ, আরেকটু ধৈর্য ধরো। আল্লাহ তোমার নেক এরাদা অবশ্যই পূরণ করবেন। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন তুমি ওই বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম পাঠাবে শহীদদের রূহের উদ্দেশ্যে। আমি এখন মুয়াম্মার সম্পর্কে তোমার অভিমত জানতে চাই। গ্রানাডার ওলামায়ে কেরাম তার সম্পর্কে অত্যন্ত ভাল ধারণা পোষণ করেন।'

'তার ব্যাপারে জনগণের কারো কোন অভিযোগ নেই। উত্তম ব্যক্তি হিসাবে তিনি সবার কাছেই সমাদৃত।'

আমীর ইউসুফ কাগজে কিছু লিখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সাদের দিকে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ভোর রাতেই আমি রওনা হয়ে যাবো। হয়ত তোমার সাথে আর দেখা হবে না।'

'ভোর রাতে? কিন্তু সিয়ার বলছিল, আপনি ফজর পড়ে রওনা হবেন?'

'ইচ্ছা সে রকমই ছিল। কিন্তু জানতে পারলাম, গ্রানাডার জনগণ আমাকে বিদায় জানানোর জন্য শোভাযাত্রার আয়োজন করছে। আমি এসব পছন্দ করি না, সে জন্য সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছি। খোদা হাফিজ।'

'খোদা হাফিজ!' সাদ করুণ মুখে বলল। কামরার দরজায় গিয়ে সাদ মুখ ফিরিয়ে তাকাল। আমীর ইউসুফের মুখে স্নেহ-মাখা হাসি। সাদের চোখে অশ্রুবিন্দু। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে দ্রুত বাইরের দিকে পা বাড়াল।

শেষ রাতের নিস্তব্ধ প্রহর। ঘুমিয়ে আছে গ্রানাডা শহর। চাঁদের ম্লান আলোয় স্বদেশে ফেরার আশায় দাঁড়িয়ে আছে পাঁচশ অশ্বারোহী। আমীর ইউসুফ সিয়ার বিন আবু বকরের সাথে কথা বলতে বলতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। পদস্থ ফৌজি অফিসাররা তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমীর ইউসুফ সকলের সাথে মুসাফাহা করে অশ্বারোহী সারির দিকে এগিয়ে গেলেন।

তাঁবু থেকে সামান্য দূরে এক যুবক আমীর ইউসুফের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিল। আমীর ইউসুফ সিয়ার বিন আবু বকরের সাথে মুসাফাহা করে যুবকের হাত থেকে ঘোড়া নিয়ে তার পিঠে সওয়ার হতে যাবেন, হঠাৎ যুবকের চেহারায় চোখ পড়লে তিনি সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তার চেহারায় ফুটে উঠল প্রশান্ত হাসি। আমীর ইউসুফ বললেন, 'আমি জানতাম, তুমি আসবে।'

সাদ কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু কান্নার গমকে কিছুই বলতে পারল না, অতি কষ্টে শুধু বলল, 'খোদা হাফিজ।'

আমীর ইউসুফ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলেন। সাদ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে বলল, 'খোদা হাফিজ, হে আমার জাতির মহান উপকারী বন্ধু! হে আমার মনিব! খোদা হাফিজ।'

একটু পর। রাতের আঁধার চিরে স্পেনের আকাশে নতুন সূর্য উঠল। সাদের কানে ভাসছিল সে অশ্বারোহীর ঘোড়ার খুরের শব্দ, যিনি তরবারি দিয়ে স্পেনের মুসলমানের জন্য লিখে গেলেন এক নুতন অধ্যায়ের সুবর্ণ ইতিহাস। সাদের চোখ থেকে ঝরছিল কৃতজ্ঞতার অশ্রু। শুধু সাদই নয়, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে সমগ্র জাতি আজ নীরবে তাদের মহান ত্রাণকর্তার জন্য দোয়া করছিল।

ইউসুফ বিন তাশফিন যে জাতিকে লাঞ্ছনার গভীর গহবর থেকে টেনে তুলেছিলেন, আরো চারশো বছর তারা এগিয়ে গিয়েছিল উন্নতি ও অগ্রগতির পথে। তিনি যে অসহায়দের চোখের অশ্রু মুছিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের মুখে আরো চারশো বছর পর্যন্ত সে হাসি ছিল অটুট। তিনি যে ফেরাউনদের ঘাড় মটকে দিয়েছিলেন তারা আরো চারশো বছর পর্যন্ত মাথা তুলতে পারেনি।

আফ্রিকার এই মহামানব ছিলেন এক আঁধার রাতের মুসাফির। তিনি ছিলেন আলোর মশালবাহী এক অসামান্য পথ প্রদর্শক। এক অসহায় জাতির চরম দুর্দিনে আল্লাহর অসীম রহমত নাজিল হয়েছিল তাদের ওপর, আর সে রহমত এসেছিল আমীর ইউসুফের হাত ধরে। স্পেনের মাটিতে সে রহমতের মণিমুক্তা ছড়িয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

এসে গেল হিসাবের দিন। ভেড়ার পালে বাঘের গর্জন শোনা গেল। একে একে ধরাশায়ী হতে শুরু করল গণ ধিকৃত খণ্ডরাজ্য শাসকরা। ইউসুফ বিন তাশফিন চলে যাওয়ার পর সিয়ার বিন আবু বকরের নেতৃত্বে রাবাতের বাহিনী ঝড়ের বেগে আঘাত হানল স্পেনের গাদ্দার সুলতানদের ওপর। খণ্ডরাজ্য শাসকরা যে কেল্লাকে ভাবতো দুর্ভেদ্য দুর্গ ঝড়ের মুখে খড়-কুটের মত উড়ে গেল সে সব।

সিয়ার বিন আবু বকর একেকটি এলাকা জয় করতেন আর সেখানে কায়েম করতেন আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন। বাতিল করে দিতেন সকল অনৈসলামিক বিধি বিধান। মওকুফ করে দিতেন শরীয়ত বিরোধী সকল প্রকার কর। খুঁজে বের করতেন সচ্চরিত্র ও খোদাভীরু লোকদের। তাদের হাতে তুলে দিতেন ক্ষমতার দণ্ড। ফলে শান্তির সুবাতাস পেল জনগণ।

স্পেনের মুসলিম জনসাধারণ কাতারবন্দী হল সিয়ার বিন আবু বকরের পতাকাতলে। প্রবল বিক্রমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল এই জিহাদের ময়দানে। খণ্ডরাজ্য শাসকদের বিরুদ্ধে সিয়ার বিন আবু বকর একটি তলোয়ার তুললে জনসাধারণ তুলে ধরতো শত শত তরবারি। আলমেরিয়া, মর্সিয়া ও আরও কয়েকটি রাজ্য পদানত হওয়ার পর এল সেভিলের ভাগ্য বিড়ম্বনার পালা।

আমীর ইউসুফ মরক্কো পৌঁছে মুতামিদের কাছে খবর পাঠালেন, 'তুমি মুজাহিদদের সাথে মোকাবেলা না করে আমার কাছে চলে আসো। এটাই তোমার জন্য অধিক মঙ্গলজনক হবে।'

ওদিকে আলফান্‌সু মুতামিদকে প্রতিশ্রুতি দিল সিয়ারের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার। আলফানসুর শক্তির প্রতি আস্থা এনে মুতামিদ প্রত্যাখ্যান করল আমীর ইউসুফের প্রস্তাব। একদিন সিয়ার বিন আবু বকরের এক সেনাপতি জারুরুল হাশেমী রান্দার দুর্ভেদ্য কেল্লা আক্রমণ করে মুতামিদের পুত্র রাজীকে হত্যা করল।

আরেক সেনাপতি অবরোধ করে বসল কর্ডোভা। কর্ডোভার জনসাধারণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সিয়ার বিন আবু বকরের সেনাবাহিনীর। রাবাতের ফৌজ ওখানে পৌঁছার সাথে সাথে উত্তেজিত জনতা বিদ্রোহ ঘোষণা করল দুঃশাসনের বিরুদ্ধে। তারা কর্ডোভা শহরের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান ফতেহ বিন মুতামিদকে হত্যা করল। সিয়ার বিন আবু বকর নিজে অগ্রসর হলেন সেভিলের দিকে। পথেমধ্যে কারমুনা জয় করলেন তিনি।

সেভিল অবরোধ করে তিনি খবর পেলেন, আলফান্‌সু ষোল হাজার সৈন্য নিয়ে টলেডো থেকে রওনা হয়েছে মুতামিদের সাহায্যে। সিয়ার বিন আবু বকর সাত হাজার অশ্বারোহী নিয়ে আবু ইসহাক আল্ মান্‌তুনীকে পাঠিয়ে দিলেন আলফান্‌সুকে প্রতিরোধ করার জন্য। আবু ইসহাক উল্কার বেগে ছুটে গিয়ে টলেডোর সামান্য দূরে মাদুর নামক

স্থানে আলফানসুকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল। এ পরাজয়ের ফলে আলফানসুর শেষ আশা ভরসাটুকুও বিলীন হয়ে গেল। অন্যকে সাহায্য করার চেয়ে নিজের জান বাঁচানোই তার কাছে দায় হয়ে দাঁড়াল।

রাবাতের সেনাবাহিনী সেভিলের মুক্তিকামী জনতার সহায়তায় শহর রক্ষা প্রাচীরের একাংশ ভেঙে ফেলল। সেখান দিয়ে স্রোতের মত শহরে ঢুকল রাবাতী যোদ্ধা। তারা মুতামিদের মহল আক্রমণ করল এবং সিঁড়ির সাহায্যে মহলের প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বাঁধা দিতে এসে নিহত হল মুতামিদের পুত্র মালিক।

প্রবল বিক্রমে লড়াই করার আশা নিয়ে বসেছিল মুতামিদ। কিন্তু চারদিকের অবস্থা দেখে হাতিয়ার সমর্পণ করে আত্মরক্ষা করতে চাইল সে।

সিয়ার বিন আবু বকর মুতামিদ, রেমিকা, শাহজাদা রশীদ এবং শাহী খান্দানের অন্যান্য সদস্যদের গ্রেফতার করে তানজাতে নির্বাসন দিল। কয়েদীদের নিয়ে জাহাজ রওনা হলে গোয়াদেল কুইভারের দুই তীরে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ তাদেরকে ঘৃণা ও ধিক্কার দিচ্ছিল। উত্তেজিত জনতার কবল থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য সিয়ার বিন আবু বকরকে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

মুতামিদকে তানজা থেকে মাকনাস্রা এবং মাকনাস্রা থেকে উগামাতে স্থানান্তর করা হল। তার নির্বাসিত জীবন কাটতো কবিতা লিখে।

কয়েদীদের জাহাজে তোলার পর সাদ বিন আবদুল মুনীম জাহাজে ঢুকলেন। জাহাজের কাপ্তান ও মাল্লারা সসম্মানে সরে দাঁড়াল একপাশে। সাদ জাহাজের কাপ্তানকে বললেন, 'আমীরের নির্দেশ হচ্ছে, পথিমধ্যে কয়েদীদের কোন রকম কষ্ট দেবেন না এবং তানজা পৌঁছার আগে জাহাজ কোথাও থামাবেন না।'

কয়েদীরা জাহাজের অন্য পাশে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। রেমিকা সাদকে দেখামাত্র মুতামিদকে বলল, 'আপনি এ যুবককে চিনতে পারছেন? একদিন আমাদের দরবারে দাঁড়িয়ে এ যুবকই আজকের দিনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।'

মুতামিদ ভাবলেশহীন চোখে সাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, আমি চিনতে পারছি না। সম্ভবত আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেকেও আমি চিনতে পারব না।'

রেমিকা বলল, 'আমাদের দরবারে আগুন ঝরা বক্তৃতা করে যে পালিয়ে গিয়েছিল, এ তো সেই যুবক।'

মুতামিদ পুনরায় সাদের দিকে তাকাল, হঠাৎ তার কানে বেজে উঠল সাদের সেদিনের সেই বক্তৃতা।

যে বক্তৃতা ভুলে যাওয়ার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বছরের পর বছর, যে বক্তৃতা তার রাতের ঘুম হারাম করেছে এতটা দিন, সে বক্তৃতা আবার এসে আঘাত হানল তার বুকে।

সাদ কাপ্তানকে নিয়ে কয়েদীদের কামরা পরিদর্শন করল। তারপর মুতামিদের দিকে

একনজর তাকিয়ে নেমে গেল জাহাজ থেকে।

জাহাজ যাত্রা শুরু করলে সেভিলের এক বৃদ্ধ কবি বলল, 'মুতামিদ উদার ছিল, বীর ও সাহসী ছিল, বুদ্ধিমান ছিল কিন্তু এক কুলটা নারী তাকে লাঞ্ছনার একশেষ করে ছাড়ল।'

রাণী রেমিকা জাহাজের কোণে দাঁড়িয়ে দেখছিল তার বিশাল মহল। অশ্রু এসে ঝাপসা করে দিল তার দৃষ্টি। সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, 'আমরা কি আর কখনো এ মহলে ফিরে আসতে পারব না? এ বর্বর লোকটি কি চিরদিনের জন্য আমাদের সেভিল থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে? সেভিলের রঙমহলের গান-বাদ্যের মাহফিল কি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল?'

'রাণী! এসব কথা বলে এখন আর কোন লাভ নেই। প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেলে চোখের পানি দিয়ে তা আর জ্বালিয়ে রাখা যায় না।'

এক জায়গায় কয়েকজন মহিলা কাদাপানিতে একাকার হয়ে কাজ করছিল। 'এদিকে দেখুন!' রেমিকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আপনার কি মনে পড়ে আমি একদিন এভাবে কাদা ঘুঁটতে চেয়েছিলাম। আপনি মেশক ও আতর মিশিয়ে কাদার স্তুপ বানিয়ে দিয়েছিলেন।'

মুতামিদ বেদনার সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে বলল, 'রেমিকা! আল্লাহর ওয়াস্তে তোমার চোখ দু'টি বন্ধ কর এবং অতীতকে ভুলে যাও।'

'না, না, সেই সোনালী অতীতকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না।' রেমিকার দু'চোখ বেয়ে নেমে এল অশ্রুর বন্যা।

৫.

এশার নামাজের পর সাদ ও আহমদ শহরের বাইরে এক তাঁবুতে বসেছিল। এক সিপাই তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল, 'গ্রানাডা থেকে এক লোক আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে।'

সাথে সাথে লোকটি তাঁবুর ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে বলল, 'এক লোক নয়, বল চাচা আলমাস এসেছে।'

সাদ ও আহমদ হাসতে হাসতে উঠে এল। সিপাই কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে গেল। আলমাস সাদ ও আহমদের সাথে মুসাফাহা করে বসলে সাদ জিজ্ঞেস করল, 'চাচা, এ সময় কি মনে করে এলেন? বাড়ির খবর ভাল তো?'

'বাড়িতে সবাই ভাল আছে। আমি জানতে এসেছি, আমরা কবে কর্ডোভা যাব। ওখান থেকে মনিবের কয়েকজন বন্ধু এসেছিলেন, তারা আমাদের কর্ডোভা চলে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে গেছেন।'

'আমি এখন আহমদের সাথে এ নিয়েই আলাপ করছিলাম। আমরা সিদ্ধান্ত

নিয়েছি, আহমদ আপনাদেরকে কর্ডোভা পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

'তাহলে আপনি যাচ্ছেন না? আম্মা চাচ্ছিলেন, সবাই একসাথে কর্ডোভা রওনা হতে।'

সাদ বলল, 'আমারও ইচ্ছা ছিল তাই। কিন্তু আজই আমার ওপর আরেক একটি অভিযানের দায়িত্ব এসেছে। ইনশাল্লাহ্ এক মাসের মধ্যেই আমি কর্ডোভা পৌঁছে যাব। তারপর বাতলিউস, ভ্যালেন্সিয়া ও সারগোসা অভিযানের আগ পর্যন্ত সেখানেই থাকব। তুমি কালকে এখানেই আরাম করো, পরশু আহমদকে নিয়ে রওনা হয়ে যাবে।'

'আপনি কোথায় যাবেন?'

'আমি মর্সিয়া যাচ্ছি। সেখানে খৃষ্টান সেনারা নাকি লুটতরাজ করছে। ঐ অঞ্চলে কয়েকটি প্রতিরক্ষা ফাঁড়ি স্থাপন করার দায়িত্ব এসেছে আমার ওপর।'

'আপনি কখন যাবেন?'

'খুব ভোরে।'

'তাহলে আমিও আহমদকে নিয়ে ভোরে রওনা হয়ে যেতে চাই। আমার বিশ্রামের কোন দরকার নেই।'

পর দিন ভোর। সাদ এক হাজার সৈন্য নিয়ে মর্সিয়া এবং আহমদ আলমাসকে সাথে নিয়ে গ্রানাডা রওয়ানা হয়ে গেল। ওখান থেকে ওরা রওনা হবে কর্ডোভা।

৬.

এক মাস পর। সাদ ইবনে আবদুল মুনীম মর্সিয়ার সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে সিয়ার বিন আবু বকরকে চিঠি লিখল। জানাল, আমি ভ্যালেন্সিয়ার খৃষ্টান লুটেরাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সীমান্তে কতগুলো প্রতিরক্ষা ফাঁড়ি স্থাপন করেছি। স্থানীয় মুজাহিদরা আমাদের সাথে সহযোগিতা করছে। আপাতত কয়েক মাসের মধ্যে দুশমনের হামলার আশংকা নেই। কিন্তু ভ্যালেন্সিয়া থেকে কম্বিডোরের শাসন উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত এ এলাকা পুরোপুরি নিরাপদ হবে না। হিসনুল্লায়েত ও হিসনুল মাদুরের পরাজয়ের পর ইসলামের শত্রুরা এখন ভ্যালেন্সিয়ার শাসনকর্তা কম্বিডোরের চারপাশে জড়ো হচ্ছে। ইবনে হুদ বিশ্বাসঘাতকতা করায় তার এলাকা খৃষ্টানদের ঘাটিতে পরিণত হয়েছে। সারকাস্টা দখল না করলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। নইলে ইয়াহইয়া আল কাদির যেভাবে ভ্যালেন্সিয়াকে কম্বিডোরের দখলে দিয়ে রেখেছে ঠিক সে ভাবেই ইবনে হুদ সারকাস্টাকে আলফানসুর হাতে তুলে দিতে পারে। আমরা অভিযান চালালে এ দু'পক্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।'

কয়েকদিন পর ফিরে এল সাদের পত্রবাহক। সিয়ার বিন আবু বকরের কাছ থেকে নিয়ে এল চিঠির জবাব। সিয়ার লিখেছেন, 'আমীরুল মুমেনীন আপনাকে নতুন দায়িত্বের

জন্য মনোনীত করেছেন। আমি তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে দশ দিনের মধ্যে কর্ডোভা পৌছে যাচ্ছি। আপনি ইবনে হাজ্জকে সীমান্তের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসুন।'

চিঠি থেকে সাদ নতুন দায়িত্বটি কি ধরণের কিছুই বুঝতে পারল না। চিঠি পাওয়ার তিন দিন পর এসে পৌঁছল ইবনে হাজ্জ। সাদ তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে কর্ডোভা রওনা হয়ে গেল।

এক মুজাহিদ বহু বছর পর ফিরে যাচ্ছে নিজের জন্মভূমিতে। যে জন্মভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সে কোরবানী করেছে শৈশবের আনন্দ ও যৌবনের সুখ-সুবিধা। সাদ ইবনে আবদুল মুনীম অনুভব করছিল, কর্ডোভা একটি বাগিচা। আর সে বাগিচাটিকে ফলে ফুলে সুশোভিত করে তোলার জন্য সে শৈশব থেকেই তার রক্ত, ঘাম ও অশ্রু ঢেলে এসেছে। তার কাছে পথের প্রতিটি ধুলিকণাই মনে হচ্ছিল মনোহর। জীবনকে মনে হচ্ছিল আনন্দের এক অফুরন্ত উৎসধারা। সাদের অন্তর বলে উঠল, 'এ মাটি আমার, এ সবুজ ঘেরা বাগান, এ শস্য ভরা ক্ষেত, এ পাহাড় ও নদী সবই আমার। এ দুনিয়ায় আমি আর অপরিচিত নই, নবাগত নই।'

কর্ডোভা আর মাত্র কয়েক মাইল। সাদ ছোট্ট এক গ্রামে ঘোড়া থামাল। এক কৃষকের কাছে চাইল একটু ঠাণ্ডা পানি। কৃষক পানির পরিবর্তে এনে দিল এক বাটি দুধ।

'আমি তো পানি চেয়েছিলাম।' বলল সাদ।

কৃষক হেসে বলল, 'এদেশে আল্লাহর নেক বান্দাদের শাসন কায়েম হয়েছে। এখন থেকে যারা পানি পান করতে চাইবে তারা দুধ পাবে। আপনার ঘোড়া ক্লান্ত। আপনি কিছুক্ষণ আরাম করুন।'

সাদ বলল, 'শুকরিয়া, আমার ঠিকানা বেশী দূরে নয়।'

দুপুর। সাদ কর্ডোভা শহরে ঢুকল। কর্ডোভাতে বয়ে যাচ্ছিল নবজীনের ঢেউ। অত্যাচারে জর্জরিত জনগণের চেহারায় খেলা করছিল নতুন প্রাণের বন্যা। শত শত শহীদের রক্তের ছোঁয়ায় কর্ডোভার বাগানে বইছে বসন্তের সুবাতাস। যে শহর এতদিন মনে হচ্ছিল বিভীষিকাময় সে শহরকে আজ মনে হচ্ছে একান্ত আপন।'

বাড়ির সামনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল সাদ। এক চাকর এগিয়ে এসে ঘোড়ার বাগ ধরল। সাদ বাগানের সবুজ বৃক্ষরাজির দিকে তাকিয়ে দেখল মুগ্ধ চোখে। মনের আয়নায় ভেসে উঠল শৈশবের স্মৃতিময় দিনগুলো। পিতার হাত ধরে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। প্রতিবেশী শিশুদের সাথে খেলাধুলা ও ছুটাছুটি করছে। কত শত দৃশ্য আজ একের পর এক ফুটে উঠছে মনের আয়নায়। বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় সাদ আল্লাহর দরবারে যে দোয়া করেছিল সে স্মৃতিও উদয় হল তার মনে।

আহমদ ও আলমাসকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে সাদ ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। আলমাসের সাথে কুশল বিনিময় করে আহমদের সাথে ঢুকে গেল

বাড়ির অন্দরে।

সকিনা, মায়মুনা ও তাহিরা আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে ছিল। অশ্রুসিক্ত নয়নে সাদ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তাদের দিকে।

৭

আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের প্রতিনিধি কর্ডোভা শহরে আসছেন এ খবর শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সারা শহরে বয়ে গেল আনন্দের বন্যা। শহরের প্রশাসক শহরময় ঘোষণা করে দিলেন, সিয়ার বিন আবু বকর আগামীকাল জুমার আগেই কর্ডোভা পৌঁছবেন এবং কর্ডোভার জামে মসজিদে খোতবা দিবেন।

সাদ ও আহমদ জুমার নামাজের জন্য তৈরী হচ্ছিল, হঠাৎ আলমাস চেঁচিয়ে উঠল, 'সাদ! আহমদ বের হয়ে আসুন! তিনি এসে গেছেন।'

সাদ ও আহমদ ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে এল। আলমাস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তিনি এসে গেছেন! আপনাদের ডাকছেন। শীগগীর আসুন।'

'কে এসেছেন? তুমি এত অস্থির হয়ে উঠলে কেন?' সাদ শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

আলমাস বলল, 'সিয়ার বিন আবু বকর ও কাজী আবু জাফর! আমি তাদের বৈঠকখানায় বসিয়ে এসেছি। তারা সরাসরি আমাদের বাড়িতে এসেছেন। বাড়ির বাইরে জনতার ভীড় বাড়ছে।'

সাদ ও আহমদ বৈঠকখানায় ঢুকে সিয়ার বিন আবু বকর, কাজী আবু জাফর ও শহরের প্রশাসককে দেখতে পেল। দু'ভাই মেহমানদের সাথে মুসাফাহা করল। সিয়ার বিন আবু বকর বললেন, 'সাদ! আমীরুল মুমিনীন লিখেছেন, কর্ডোভায় কখনো এলে প্রথমেই যেন তোমার বাড়িতে উঠি। কিন্তু তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, তিনি এ কথা না লিখলেও আমি সর্বপ্রথম তোমাদের বাড়িতেই পৌঁছতাম। পথে বিলম্ব ঘটে গেল, নইলে ভোরেই তোমাদের বাড়িতে চলে আসতে পারতাম। নামাজের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাই আমি আমিরুল মুমিনীনের দ্বিতীয় আদেশটিও পালন করছি। তাঁর ইচ্ছা, তুমি কর্ডোভার প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ কর।'

সাদ কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বলল, 'আমীরুল মুমিনীনের ইচ্ছা আমার কাছে নির্দেশেরই সমতুল্য।'

সিয়ার বিন আবু বকর মৃদু হেসে কাজী আবু জাফরকে বললেন, 'এখন আর আপনার সুপারিশের দরকার রইল না। আমি আজ কর্ডোভার জনগণকে এ শুভ সংবাদ দিতে পারবো যে, বিজয়ের উত্তম পুরস্কার তাদেরই অংশে এসেছে।'

তারপর তিনি আহমদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহমদ, তোমার জন্যও

আমীরুল মুমিনীনের একখানা আদেশ নিয়ে এসেছি। তোমাকে আলমেরিয়ার গভর্ণর মনোনীত করা হয়েছে। আমি ও কাজী আবু জাফর এ মনোনয়ন সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছি। তাই এ দায়িত্ব থেকে তোমার রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই।'

আহ্মদ বলল, 'নিজের যোগ্যতার ওপর আমার আস্থা নেই। তবে আমীরের মনোনয়নকে ভুল বলে প্রত্যাখান করার দুঃসাহসও আমার নেই।'

'প্রস্তুতির জন্য তোমাকে তিন দিন সময় দেয়া হল। চল, মসজিদে যাই।'

ফটকের বাইরে অনেক লোক জমা হয়েছে। সিয়ার বিন আবু বকর বাড়ি থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে হাঁটা দিলেন। তার পিছনে পিছনে চলল জনতার মিছিল।

কর্ডোভার জামে মসিজদ। জুমার নামাজের পর। কর্ডোভার উদ্বেলিত জনতার সামনে উঠে দাঁড়ালেন সিয়ার বিন আবু বকর। আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের পক্ষ থেকে তিনি ঘোষণা করলেন, সাদ বিন আবদুল মুনীমকে কর্ডোভার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে।

সমবেত জনগণের অনুরোধে সাদ বিন আবদুল মুনীম উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ 'বেরাদরানে মিল্লাত। বিশাল এক গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আমার কাঁধে। আপনারা দোয়া করুন, আমি যেন এ কঠিন দায়িত্বের বোঝা বহন করতে পারি। আমি আল্লাহ্র এ পবিত্র ঘরে দাঁড়িয়ে, আপনাদের সাক্ষী রেখে ওয়াদা করছি, আল্লাহর মর্জি মত আমি এ প্রশাসনকে ঢেলে সাজাবো। যদি আমি এ ওয়াদা লংঘন করি, সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে যদি কখনো আমি বিচ্যুত হই, যদি সরকারী পদকে দ্বীনের পরিবর্তে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করি কখনো, তাহলে আমাকে কান ধরে এ আসন থেকে নামিয়ে দেয়াই হবে আপনাদের পবিত্র কর্তব্য।

আমি আফ্রিকার তপ্ত মরুতে দেখে এসেছি, একজন অতিসাধারণ পশুপালকও প্রকাশ্য রাস্তায় আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের পরণের কাপড় টেনে ধরার সাহস রাখে। ন্যায় বিচারের দাবী জানাতে পারে এবং এ জন্য আমীরের চেহারায় বিরক্তির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

আমি চাই, তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে আমার কাছেও আপনারা একই ব্যবহার আশা করবেন। আর যদি আপনারা তাই চান, তাহলে আপনাদের মনে সদা-সর্বদা সত্য ও ন্যায় কথা বলার সাহস জন্মাতে হবে। যদি আপনারা চান আপনাদের শাসক ন্যায়পরায়ণ হোক, তাহলে আপনাদের হতে হবে নির্ভীক ও সত্যবাদী। নাফরমানদের সামনে কখনও মাথা নত করবেন না। সম্মান ও মর্যাদার হকদার শুধু তারাই, যারা খোদাভীরু, পরহেজগার।

স্পেনের শাসনকর্তাদের অযোগ্যতা ও ভ্রান্ত নীতির কারণে আমরা ধ্বংস ও বরবাদীর মুখোমুখি হয়েছি বার বার। কিন্তু তাদের এ অধপতন ডেকে এনেছে তোশামোদকারী আমীর ওমরা ও কবিরা। তারাই শাসকের ন্যায় অন্যায় প্রতিটি কাজের প্রশংসা করে শাসকদের গোমরাহীর পথে ঠেলে দিয়েছে। এ সব শাসকরা ছিল খৃষ্টানদের তল্পীবাহক, অথচ আমীর ওমরা ও কবি সাহিত্যিকরা তাকে দিয়েছে আমীরুল মোমিনীনের সম্মান।

একদিকে শাসকরা বিলাসী জীবন যাপনের জন্য জনগণের রক্ত শোষণ করছিল, অন্য দিকে মোশাহেবেরা তাদের উল্লেখ করতো দাতা হাতেম তাঈ বলে। সুলতানদের উদারতা ও দানশীলতার প্রশংসায় এরা ছিল পঞ্চমুখ। শাসকরা যতই ইসলামের বিরোধিতা করতো, শরীয়ত বিরোধী কাজ করতো ততই তাদের বলা হত প্রগতিশীল। তারা যখন মদ আর মেয়ে নিয়ে খেলা করতো তখন তাদেরকে আখ্যা দেয়া হত সভ্যতার ধারক বাহক বলে। তারা যখন সুরের তালে মাতোয়ারা হত তখন তাদের বলা হত সংস্কৃতিবান। এসব দরবারীরাই নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য খণ্ড রাজ্য শাসকদের মাথা খেয়েছিল।

মনে রাখবেন, যে জাতি সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, সে জাতির কোলেই মামুন জান্নুন, ইয়াহইয়া আল কাদির ও ইবনে আক্কাশার মত লোক জন্মায়। তারা সভ্যতার দুশমন, মানবতার দুশমন। জনগণ যখন ভণ্ড ও প্রতারক শাসকদের সহ্য করে নেয় আল্লাহ তখন সে জাতির ওপর থেকে রহমত ও বরকত উঠিয়ে নেন। আর যে জাতি সততা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর পথে অবিচল থাকে, তাদের মধ্যে আল্লাহতায়ালা তারিক, জিয়াদ ও আব্দুর রহমানের মত নেতা ও সেনাপতির জন্ম দেন। দুনিয়ার দাম্ভিক আজদাহা তাদের সামনে লুটিয়ে পড়ে। বিজয়ের পর বিজয় এসে তাদের পদচুম্বন করে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ জাতিকে নিয়ে যায় উন্নতি ও অগ্রগতির পথে।

শাসকদের অযোগ্যতা ও আমাদের উদাসীনতার ফলে আমরা ধ্বংসের অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছিলাম। কাফেররা এসে চেপে বসেছিল আমাদের ঘাড়ে। কিন্তু আল্লাহর গুটিকয় নেক বান্দা ও মর্দে মুমীনের উসিলায় আল্লাহর রহম পয়দা হয়েছিল আমাদের ওপর। তাদেরই কারণে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস ও বরবাদী চাননি। আর এ জন্যই আফ্রিকার মরুভূমি থেকে এক মুজাহিদকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন আমাদের মদদগার ও সাহায্যকারী হিসাবে। তিনি এগিয়ে এসে জুলুম ও নির্যাতনের সেই ভয়াল তুফানের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। বিজয় এসে চুম্বন করল তাকে। অন্ধকারের অমানিশায় আমরা পেলাম আলোর দিশা, নির্যাতীতের কান্নার বদলে পেলাম মুক্তির স্বাদ।

কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, অসামান্য ত্যাগ ও কোরবানীর বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এ বিজয়ের স্বাদ। জাল্লাকা ও হিসনুল্লায়াতের সেই সব শহীদদের স্মরণ করুন, যারা নিজেদের পবিত্র রক্তে স্পেনে নুতন ইতিহাস রচনা করে গেছেন। সে সব দরদী ও সাহসী মুজাহিদের স্মরণ করুন, যারা ঘোর-অন্ধকার রাতে প্রবল ঝড় তুফানকে অগ্রাহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। স্মরণ করুন সেই সব বীর মুমিনদের, যারা সত্য ও ন্যায়ের আওয়াজ উঠানোর দরুণ কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন জীবনের সুবর্ণ সময়।

আজ সেই সব ত্যাগী ও মহান বীরদের অনেকেই আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাদের পবিত্র আত্মা আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে স্পেনের আকাশে বাতাসে। আমরা যদি অকৃতজ্ঞ না হই, তাহলে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এ ত্যাগ ও কোরবানী করা

হয়েছিল এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য। তারা নিজেদের যথাসর্বস্ব কোরবানী করেছিলেন ইসলামের পতাকা সমুন্নত করার জন্য, আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র কানুন প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আজকের এ স্পেন শহীদের রক্তে ধোয়া স্পেন, আজকের এ স্পেন শহীদদের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে এক পবিত্র আমানত।

আসুন, যাঁর হাতে আমাদের জীবন মরণ, যাঁর হাতে আমাদের ইহ ও পরকালের সমস্ত কল্যাণ নিহিত, যাঁর হাতে দুনিয়ার সমুদয় সুখ শান্তি ও সম্পদের চাবিকাঠি, সেই মহামহিম আল্লাহর নামে শপথ করি, এ পবিত্র আমানত সম্পর্কে আমরা কখনো বেখেয়াল হবো না, এ আমানত কখনো নষ্ট হতে দেব না। নিজেদের তাজা রক্ত ঢেলে শহীদরা ইসলামের যে বৃক্ষ রোপণ করে গেছেন, তাকে কখনো চৈত্রের খর-রৌদ্রে শুকিয়ে মরতে দেব না। তারা যে শান্তি ও সুখের সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন, সেই মধুকুঞ্জে কখনো রাজতন্ত্রের শকুন, স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের কালসাপকে প্রশ্রয় দেবনা। শহীদরা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন আল্লাহর নেয়ামত, আমরা আগামী প্রজন্মের হাতে অজ্ঞানতা, অশিক্ষা ও খোদাদ্রোহীতার গোলামীর শিকল রেখে যাব না কোন অবস্থাতেই।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে কাল কিয়ামতের মাঠে জাল্লাকা ও হিস্‌নুল্লায়েতের শহীদদের কাছে লজ্জিত করো না, লজ্জিত করো না আমাদের মাসুম সন্তানদের হাতে। যে ঈমানী চেতনা শাহাদাতের তামান্না দিয়েছে আমাদের পূর্ব পুরুষদের, যুগ যুগ ধরে সেই চেতনার বাতিঘর বানিয়ে রেখো আমাদের প্রতিটি অন্তর। আমাদের হৃদয়ের সুবাসে সুবাসিত রেখো তোমার পৃথিবীর বাগান।' তামাম শোধ